হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৮২

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। বৈদেশিক : (রেজেষ্ট্রী খরচ সহ) এক পাউণ্ড পঁচিশ পেন্স এবং চার ডলার।

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না।

প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫.০০ টাকা। অর্ধপৃষ্ঠা ২০০.০০ টাকা। কভার পৃষ্ঠা ৪০০.০০ টাকা ও ৫০০.০০ টাকা

প্রবন্ধাদি বিনিমিয় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ ফোন : ২৪-৬১২৭

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথঠাকুর

ভারতশিল্পে মূর্তি

ভারতীয় শিল্পে মূর্তি গঠনের মূলতত্ত্ব ও সৌন্দর্য অল্প পরিসরে বোঝবার সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ১.৫০ টাকা।

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হয়ে রসের সাহায্যে কী ভাবে আত্মা থেকে চিত্রে এবং চিত্র থেকে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয় শিল্পাচার্য তা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। মূল্য ১.৫০ টাকা।

বাংলার ব্রত

পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতের মনোহারী বিবরণ। শিল্পীর চোখে দেখা ও হাতে লেখা এই বিবরণগুলি সর্বকালের সম্পদ। অনেকগুলি আলপনা-চিত্র সম্বলিত। যন্ত্রস্থ

সহজ চিত্রশিক্ষা

টানটোনের রহস্য, আকৃতির ছাঁদ ও বাঁধ, আঁকাজোঁকার তালমান, চিত্রে ভাবভঙ্গি, চিত্রে রংচং এবং আলো-আঁধারের লুকোচুরি—চিত্রাঙ্কণের এই ছয়টি প্রকরণ শিল্পাচার্যের অতুলনীয় ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। মূল্য ১.৬০ টাকা।

পথে বিপথে

গদ্য কতটা কাব্যধর্মী হতে পারে, বাংলা ভাষায় 'পথে বিপথে' নিঃসন্দেহে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মূল্য ৫.৫০ টাকা।

আলোর ফুলকি

শিশুসাহিত্যের অন্যতম অপরূপ নিদর্শন। ছোটদের হাতে দেবার মত বই। মূল্য ৫.৫০ টাকা।

ঘরোয়া

ঠাকুর পরিবার ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন বাংলাদেশের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের রূপ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। মূল্য ৫.০০ টকা।

জোড়াসাঁকোর ধারে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অপরূপ উপাখ্যান। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জীবনের ছবি। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের কথা শিল্পাচার্যের অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। মূল্য ৬.৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয়: ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা, ১৬

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

রসাতলে

॥ একটি পুরো শহর ॥

পৃথিবীর ইতিহাসে কত শহর হারিয়ে গেছে, রসাতলে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটা ধারণা ছিল কলকাতা এমন একটি শহর যেটা ক্রমশঃ রসাতলে যাচ্ছে। এর উন্নতির আর কোন সম্ভাবনাই নেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে শহর জনসংখ্যার বৃদ্ধির চাপে প্রায় ফেটে পড়েছে, যেখানে অপ্রতুল জল সরবরাহ নানারকম সংক্রামক মহামারীর সৃষ্টি করছে, বহুদিনের জমা ময়লা, দুর্গন্ধ, হতাশা যেখানে দৈনন্দিন জীবনের শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে—সে শহরের ওপর মানুষ প্রথমেই হারায় তাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই যাঁরা ধরে নিয়েছিলেন কলকাতার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই তাঁদের দোষারোপ করা যায় না। এটা প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা। সেই সময়েই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই শহরকে বাঁচাবার ব্রত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি, সংক্ষেপে সি.এম.ডি.এ.। আজ সেই সময় থেকে আমরা পাঁচটি দীর্ঘ বছর এবং বহু সমস্যা পার হয়ে এসেছি। কলকাতা আজও স্বর্গ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কলকাতা আজ আর ঠিক হারিয়ে যাওয়া শহর নয়। কলকাতার দৃঢ় পদক্ষেপ আজ আরোগ্য ও সুস্থতার দিকেই। এই পরিবর্তন আনার জন্যে কি কি করা হয়েছে? সমস্যার তুলনায় হয়তো অতি সামান্যই। প্রায় কুড়িটি প্রধান প্রধান রাস্তা প্রয়োজন অনুযায়ী চওড়া করা হয়েছে যদিও এখনও বহু রাস্তার উন্নতি সাধন বাকি। তিনটি সেতু এবং একটি সাবওয়ে তৈরী করা হয়েছে। যানবাহন এবং যাত্রী চলাচলের সুবিধার জন্যে এ রকম সেতু ও সাবওয়ে আরও অনেক তৈরী করতে হবে। ৩০০ গভীর টিউবওয়েল বসিয়ে এবং পলতার শক্তি বৃদ্ধি করে কলকাতার জল সরবরাহ প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রায় ১০০টি অঞ্চলের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের সুবিধা, শিক্ষার প্রসার, সর্বসাধারণের আমোদপ্রমোদের সুযোগ সুবিধা সব কিছুরই কিছু কিছু উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে এর কোনটিই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি।

সেইজন্যই এখনই আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে শহরটিকে আমরা বাঁচাতে সমর্থ হয়েছি। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে শহরটি হারিয়ে যায়নি, এর ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশার কোনো কারণ নেই।

সি.এম.ডি.এ. আজ আকাশ-ছোঁওয়া অবাস্তব কোন পরিকল্পনা করছে না। এক কথায়, মানুষের বাঁচার ন্যূনতম সমস্যাগুলির মোকাবিলা করাই সি.এম.ডি.এ-র প্রথম লক্ষ্য। কলকাতা শহরে আমরা শুধু থাকি না, এ শহরকে আমরা ভালবাসি।

এত লোকের জীবন যে শহরের ওপর নির্ভরশীল, এত লোকের ভালবাসা যে শহরকে জড়িয়ে আছে—সি.এম.ডি.এ. সে শহরকে নতুন জীবনের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ আরম্ভ করেছে।

When the objective is power and more power

গম বিপ্লব ! সবুজ বিপ্লব !! কৃষি বিপ্লব !!!

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে এরাজ্যে গম বিপ্লব সুরু।
পশ্চিমবাংলায় গমের একর প্রতি ফলন
সারা ভারতের গড় ফলনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

গম বিপ্লবের জোয়ার ক্রমেই বেগবতী হয়ে চলেছে এ রাজ্যে।

	সাল	জমির পরিমাণ (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)
১।	১৯৪৭-৪৮	৯১	২১.৭
২।	১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ (বাৎসরিক গড়)	১১৬	২৫.৪
৩।	১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ (বাৎসরিক গড়)	১১৫	৩১.৯
৪।	১৯৬৭-৬৮	১৯৫	৭১.১
৫।	১৯৬৯-৭০	৫১১	৪৮১.৯
৬।	১৯৭১-৭২	১০৪৪	৯২১.২
৭।	১৯৭৪-৭৫	১০৪২	৮৩৬.৮

গম বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দিশারী।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

বর্ষ ৩৭ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮২

সূচিপত্র

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ১
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। না সূর্য, না চন্দ্রতারকা ৯
মণীন্দ্র রায়। পশুর কান্না ১০
কৃষ্ণ ধর। ভুল শহরে ভুল ঠিকানায় ১২
সুরজিৎ দাশগুপ্ত। আমি এসেছি ১৪
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। স্মৃতি নয়, তুমি খুবই সাম্প্রতিক ১৬
অসীম রায়। আবহমানকাল ১৭
অশোক রুদ্র। স্বর্গের সোপান ৩৮
সত্যেন্দ্র আচার্য। রাজার বাড়ি ৫৩
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। আধুনিক শিল্পজিজ্ঞাসা ৫৯
স্বপ্নময় চক্রবর্তী। নকশী কাঁথার মাঠ ৬৪
সমালোচনা। অশোক মিত্র, অসীম রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, নির্মল ঘোষ,
নৃপেন্দ্র সান্যাল, মিহির সিংহ ৭৩

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৩ থেকে প্রকাশিত।
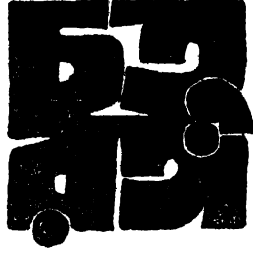
বর্ষ ৩৭ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮২

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) টিরুটানি নামে এক ছোট্ট শহরে রাধাকৃষ্ণণ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। টিরুটানি একটি তীর্থস্থানও বটে। তাঁর পিতামাতা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষা বরাবরই খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিদ্যালয়ে হয়। দক্ষিণ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মিশনারি বিদ্যালয়গুলির বিশেষ সুনাম ছিল। যতদূর বোঝা যায়, রাধাকৃষ্ণণকে ভালভাবে শিক্ষিত করবার আশায় নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে মিশনারিদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। ভেলোরের আমেরিকান মিশন বিদ্যালয় হতে ১৯০৩ সালে প্রবেশিকা ও ১৯০৫ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯০৭ সালে বি. এ. এবং ১৯০৯ সালে এম. এ. পরীক্ষায়ও সম্মানের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হন। লেখাপড়াতে রাধাকৃষ্ণণ বরাবরই মোটামুটি ভাল ছিলেন। তবে তাঁর সহাধ্যায়ীরা মিষ্ট স্বভাবের জন্যই তাঁকে বেশী ভালবাসত। তিনি ছিলেন লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

খ্রীষ্টান মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হওয়ায় তাঁদের ধর্ম ও ধ্যানধারণার প্রভাব যে রাধাকৃষ্ণণের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব রাখবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও আবর্জনা হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তাশীলতার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণণ যে প্রকৃত হিন্দুরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সমর্থ হন, মনে হয় সেটা মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষারই ফল।

এম এ. পাশ করে সে বছরই রাধাকৃষ্ণণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ঐ কলেজের কার্যকাল হতেই অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের খ্যাতি বিদ্বজ্জনমহলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে, ১৯১৮ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার দুবছর পরে, অর্থাৎ ১৯২০ সালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপকের পদের জন্য উপযুক্ত লোকের সন্ধান

করছিলেন। ঐ পদ অলংকৃত করেছিলেন ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ডঃ শীল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ পেলে তাঁর শূন্যপদে স্যার আশুতোষের উদ্যোগে রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ইংলণ্ড ও আমেরিকার দার্শনিক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স বত্রিশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তাঁর "ভারতীয় দর্শন" প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণণের খ্যাতিও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Empire Universities Congress-এর যে অধিবেশন হয় তাতে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ইংলণ্ডে বহুস্থান হতে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণও তিনি পান। এর মধ্যে অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে প্রদত্ত Upton Lectures সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বক্তৃতাগুলি পরবর্তীকালে *The Hindu View of Life* নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে International Congress of Philosophyর ষষ্ঠ অধিবেশনে রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। আমেরিকাতেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা প্রভৃতিতে সকলেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। ফলে দেখা যায় যে তিনি উন্নতির সোপানপরম্পরায় ক্রমশঃই অগ্রসর হয়েছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, ইংলণ্ডে হিবার্ট লেকচার প্রদান, *Encyclopaedia Britannica*তে প্রবন্ধ লিখন, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, লীগ অব নেশন্সের সদস্যপদ লাভ, এই ধরনের নানা পদে রাধাকৃষ্ণণ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩১ সালে গভর্নমেণ্ট তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শুধু অধ্যাপক, হিন্দুজীবনবেদব্যাখাতা, অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে নয়, পরবর্তী জীবনে রাধাকৃষ্ণণ মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবেও অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। ভারতবর্ষের প্রেসিডেণ্ট হিসাবেও তিনি বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

নানাক্ষেত্রে প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেলেও রাধাকৃষ্ণণ 'দার্শনিক' হিসাবেই বিশেষভাবে সর্বত্র পরিচিত। দার্শনিক হিসাবেই তিনি দেশবিদেশের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনও পেয়েছেন। স্যার ফ্রানসিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ যেমন নবীন ভারতের কবি তেমনি রাধাকৃষ্ণণও নবীন ভারতের দার্শনিক।"

রাধাকৃষ্ণণের বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। অনেক ইংরেজ অধ্যাপকও মন্তব্য করেছেন যে, এ ধরনের বাগ্মিতা তাঁদেরও ঈর্ষা, প্রশংসা ও আত্মগ্লানির বিষয়। কোন রকম লিখিত টীকাটিপ্পনীর সাহায্য না নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ এমন নিখুঁত কাব্যধর্মী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতেন যে ভারতীয়দের মধ্যে তো নয়ই, ইংরেজদের মধ্যেও এমন বাগ্মিতা ছিল বিরল।

দার্শনিকেরা সকলেই যে প্রসন্নগম্ভীর লেখা লিখতে পারেন তা নয়। প্লেটো, হিউম, রাসেল, বের্গসঁ, শংকর প্রভৃতির মতো লেখক দার্শনিকমহলে খুব বেশী নেই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণণের রচনাশৈলী ছিল অননুকরণীয়। তাঁর ভাষার সৌন্দর্য, অপরূপ ছন্দোময় ইংরাজি এমনই মনোহারী ছিল যে, বহু বিদেশী মনীষী অকুণ্ঠচিত্তে রাধাকৃষ্ণণের রচনাশৈলীর প্রশংসা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণণ প্রধানত "ভারতীয় দর্শন" (দুই খণ্ড) রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হলেও অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্মমূলক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যৌবনে তিনি *The Reign of Religion in Contemporary Philosophy* নামক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করে সুধী-সমাজে পরিচিত হন। তাঁর "ভারতীয় দর্শন" দেশবিদেশে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় দিয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন করে তোলে।

এ ছাড়া রাধাকৃষ্ণণ-এর *Kalki or the Future Civilisation, The Hindu View of Life, An Idealist View of Life, Religion and Society, The Philosophy of Rabindranath Tagore, Recovery of Faith, Freedom and Culture, India and China* প্রভৃতি গ্রন্থ বহুলপরিচিত। রাধাকৃষ্ণণ ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ধম্মপদ-এর ইংরাজি অনুবাদ টীকাসহ প্রকাশ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর উপর লিখিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন প্রকাশ করেছেন মুখবন্ধ সহ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপর মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণ সংকলিত হলে বেশ কয়েক খণ্ড হবে বলেই মনে হয়।

রাধাকৃষ্ণণ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শনেই পারংগম ছিলেন। বিশেষ করে ইংলণ্ডের নব্য-হেগেলপন্থী স্টারলিং, কেয়ার্ড, গ্রীন ব্রাড্‌লে, বোসাংকে প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ পরিচয়। হিন্দু ষড়্‌দর্শনের মধ্যে রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন শংকর-বেদান্তের ভক্ত। রাধাকৃষ্ণণ নিজে কোন সমগ্র, সুসংহত দর্শনপ্রস্থান প্রতিপন্ন করেন নি। তবে পূর্বপক্ষ খণ্ডন এবং বিভিন্ন দর্শনব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর একটা সুস্পষ্ট জীবনবেদ ফুটে উঠেছে, যে জীবনবেদে একদিকে রয়েছে শংকরের প্রভাব, অন্যদিকে ব্র্যাডলের।

হিন্দু কূপমণ্ডুকতা পরিহার করে, মাদ্রাজী গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজের কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে রাধাকৃষ্ণণ এক উদার সর্বজনীন হিন্দুধর্মের সন্ধানে বেরিয়ে বেদান্ত-দর্শনে উপনীত হন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণী তিনি যেমন একদিকে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি emergent evolution-এর মূল তত্ত্বও তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান, কাব্য, ধর্মশাস্ত্র ও মরমী সাধকদের কাহিনী ঘেঁটে রাধাকৃষ্ণণ গড়ে তুলেছেন এক 'গতিশীল ব্রহ্মবাদ'। এর আকর্ষণ এক যুগে যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

একথা সত্য যে রাধাকৃষ্ণণ কোন সম্পূর্ণ মৌলিক দর্শনপ্রস্থান সৃষ্টি করেন নি। তবুও যে ইউরোপের ও আমেরিকার জ্ঞানীগুণী মহলে তিনি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছেন তার কারণ জীবনের সমস্যাকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন এক অসাম্প্রদায়িক, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে সমন্বয়ের তত্ত্বকথা তিনি প্রচার করেছেন এবং প্রবহমান জীবনকে অস্বীকার করে শুধুই আকাশ-কুসুম রচনা করেন নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাধাকৃষ্ণণ গতিশীল ব্রহ্মবাদের প্রবক্তা। ফলে তাঁকে উপনিষদের ও বেদান্তের নতুন ভাষ্য করতে হয়েছে। [উপনিষদের মূল কথা হল যে, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজিত।] এই পরমাত্মাকে—Universal Spirit—দেখা, শোনা, মনোমনে চিন্তা করা, ধ্যান করা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের মূলকথা। উপনিষদের মতে প্রতিটি বস্তু বা পদার্থ 'আত্মা' ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীর সূক্ষ্মতম কারণ এই পরমাত্মা এবং এটিই একমাত্র সত্যবস্তু। উপনিষদে অবশ্য আছে যে 'অন্নই ব্রহ্ম', অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুই একমাত্র সত্যবস্তু। ঠিক সেই রকম বিভিন্ন অধিকারীর কথা মনে রেখে বলা আছে অন্যত্র যে, 'প্রাণই ব্রহ্ম', 'মনই ব্রহ্ম'—কিংবা বিজ্ঞান বা selfconsciousnessই ব্রহ্ম। এ সমস্ত কথা বিভিন্ন অধিকারীর বেলায় প্রযোজ্য হলেও আসলে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হলেন এমন একটি তত্ত্ব যা অনাদি, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ দিয়ে যা ঘেরা। এঁকে জানলে দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই জানা হয়ে যায়, সব কিছুই পাওয়া যায়,—অজ্ঞাত, অপ্রাপ্ত আর কিছুই থাকে না।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের এই বুনিয়াদ থেকেই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। রাধাকৃষ্ণণও বলেন যে অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ—এ সব কিছুই এক পরমাত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। অন্নে (matter) ব্রহ্ম প্রকাশিত। তবে প্রকাশের স্তরভেদ আছে। প্রাণের লীলাচাঞ্চল্যে ব্রহ্ম প্রকাশিত সত্যতর, উন্নততর ভঙ্গিমায়। মনের স্তরে ব্রহ্মের প্রকাশ আরও উন্নত ও প্রকৃষ্ট ধরনের। এইভাবে অন্ন (matter), প্রাণ (life), মন (mind), বিজ্ঞান (self-consciousness) এবং আনন্দ—সবের মধ্যেই প্রকাশিত, যদিও প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী জগতে অভিনব বিচিত্র সত্তার প্রকাশ,—এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে। এই ভাবেই জগতের ক্রমাভিব্যক্তি।

রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *An Idealist View of Life* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বস্তুবাদকে গ্রহণ করা চলে না। আগেকার আমলের বস্তু ছিল স্থিতিশীল অনড় পদার্থ। আজকের দিনের পরামাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের দৌলতে বস্তুর এই চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বিজ্ঞান দেখিয়েছে 'বস্তু' আসলে শক্তি বা ক্রিয়াশীলতার এক বিশেষ অভিব্যক্তি। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ বস্তুসত্তাও অলীক কল্পনা মাত্র। কাজেই, রাধাকৃষ্ণণও মনে করেন যে, সাবেকি বস্তুবাদের যান্ত্রিক, নিশ্চল, স্থিতিশীল জগৎ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এক নতুন গতিশীল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বস্তুজগৎকে আজকাল দার্শনিকেরা বিচার করছেন।

রাধাকৃষ্ণণ দেখাচ্ছেন যে বস্তু আসলে সৃজনশীল। জগতে সৃজনশীল অগ্রগতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বস্তু থেকে প্রাণের আবির্ভাব। কিন্তু প্রাণের স্তরে ধারাবাহিকতা, অংশ এবং অংশীর নিবিড় সম্পর্ক, প্রাণের সুষমা ও সামঞ্জস্য এমনই অভিনব যে প্রাণহীন জড়শক্তির চাবিকাঠি দিয়ে প্রাণের ব্যাখ্যা চলে না। জীববিজ্ঞান জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে সত্য, কিন্তু আজও জীবনের উৎপত্তি কিংবা ক্রমবিকাশের রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, 'ক্রমবিকাশ' হয়তো বর্ণনা হিসাবে সার্থক, কিন্তু 'ক্রমবিকাশ ঘটেছে' বললে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা হল না। ক্রমবিকাশ আদবে ঘটল কেন, পৃথিবীতে কেনই বা প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট

বক্তব্য আজও নেই। জীববিজ্ঞান শুধু তথ্য ঘেঁটেই মরে, জীবন-রহস্য ব্যাখ্যা করাটা এর সাধ্যের মধ্যে বোধ হয় নেই।

চৈতন্যের আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন আবার নতুনের সঙ্গে, অভিনবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই অভিনব গুণের ব্যাখ্যা শুধু জড়ের কিংবা প্রাণের চাবিকাঠি দিয়ে সম্ভব নয়। রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেন, 'চৈতন্য যখন প্রাণ বা জীবনের স্তর থেকে উদ্ভূত হল তখন চৈতন্য তো প্রাণের মতোই বাস্তব সত্য। অথচ, এ স্তরে আমরা পেলাম এক অভিনবের সাক্ষাৎ যা প্রাণের অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'আত্মসচেতন মানুষ যখন আবির্ভূত হল পৃথিবীতে তখন চৈতন্যেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটল। কারণ মানুষেতর প্রাণীর 'চৈতন্য মানুষের আত্মসচেতনতার সঙ্গে এক নয়। মানুষ প্রকৃতির সন্তান একথা সত্য। কিন্তু বিবর্তনের ধারাপথে যখন মানুষের আবির্ভাব তখন উৎক্রান্তির ভঙ্গিতে যেন বিবর্তনধারা একটা সম্পূর্ণ নতুন স্তরে এসে পৌঁছাল। মানুষে আমরা পেলাম জৈবধর্মের সঙ্গে ভাগবত সত্তার সংমিশ্রণ। বিজ্ঞান এই অপরূপ রূপান্তরের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।'

রাধাকৃষ্ণণ বলছেন, জড় প্রাণ মন বিজ্ঞান—প্রতিটি স্তরেই স্পন্দিত হচ্ছে ক্রিয়াশীলতা। এক স্তর হতে অন্য স্তরে রূপান্তরপ্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে অগ্রগতি এবং এ থেকে এই সমস্ত স্তরের অন্তঃস্থিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হবে; এই তত্ত্বটি কি জড় শক্তি? উত্তরে রাধাকৃষ্ণণ বলেন, না, এটি জড় শক্তি নয়। কারণ জড় শক্তি থেকে 'প্রাণ', 'মন', এই সব উন্নততর তত্ত্ব উদ্ভূত হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণণ ভাববাদী—idealist। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, তত্ত্বটি হল চৈতন্যশক্তি। এই শক্তিরই প্রকাশ জড়ে, প্রাণে, মনে।

রাধাকৃষ্ণণ ধর্মচেতনার দিক থেকে দর্শনের সমস্যার আলোচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণণের যুগে language philosophy (ভাষা-দর্শন), analysis (বিশ্লেষণী দর্শন) phenomenology (প্রতিভাসবিজ্ঞান), existentialism (অস্তিত্ববাদ) দর্শনের রাজ্যে বিপ্লব ঘটায় নি। মার্কসবাদ তখনও ছিল, তবে বিদ্বানমহলে মার্কসবাদ তখনও জাতে ওঠে নি। রাধাকৃষ্ণণ তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন এক ধরনের সমন্বয়ী ব্রহ্মবাদ—ভাববাদী পরিমণ্ডলকে আশ্রয় করে। তিনি প্লেটোর ভাববাদ, শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ব্র্যাডলের ব্রহ্মবাদ এবং নানা দেশের মরমী সাধকদের অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান আহরণ করে নিজস্ব ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেছেন। বলা প্রয়োজন, রাধাকৃষ্ণণ শংকরের ভক্ত। কিন্তু শংকরের মায়াবাদকে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। জগৎ মূলতত্ত্ব নয় নিশ্চয়ই—কিন্তু তাই বলে 'ব্রহ্মে জগৎ বাধিত' (cancelled), শংকরের এই মত তিনি স্বীকার করেন না। বরং ব্র্যাডলে ও রামানুজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি বলেন যে 'জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত'। ব্র্যাডলের কথার প্রতিধ্বনি করে তিনি আরও বলেন যে, জাগতিক ঘটনাসমূহ পারিমার্থিক তত্ত্ব না হলেও এরা কোন না কোন ভাবে ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মসত্তায় সংরক্ষিত (transmuted).

রাধাকৃষ্ণণ বলেন মরমী সাধকদের অপরোক্ষানুভূতিতে যে পরমতত্ত্বটি ধরা পড়ে সেটি হল 'নির্গুণ ব্রহ্ম' (qualityless, Indeterminate Being)। আর ভক্ত যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ পান সেটি হল

'সগুণ ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর। শংকরের মতে ঈশ্বর পরমতত্ত্ব নন। ঈশ্বর বুদ্ধিগম্য, ব্যবহারিক সত্তা। ভক্তের কাছে সগুণ ব্রহ্মেরই শুধু ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। কিন্তু দার্শনিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পরমতত্ত্ব নন। দার্শনিক প্রতীতিতে যে পরমতত্ত্ব ধরা পড়ে সে তত্ত্বটি নির্গুণই। রাধাকৃষ্ণণ নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মের বিরোধের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। তার মতে নির্গুণ ব্রহ্মই আসলে পরমতত্ত্ব - সাধকেরা যাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হন। আর সগুণ বা ঈশ্বর হল বুদ্ধিগম্য পরমতত্ত্ব, ভক্ত-হৃদয়ে যার অধিষ্ঠান। উপলব্ধির স্তরভেদে তত্ত্বের নাম আলাদা।

একদা ইউরোপে ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। বের্গসঁ রহস্য উদ্ঘাটনে intuition-এর (অপরোক্ষানুভূতি) গুণগান করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণণও অপরোক্ষানুভূতির গুণগান করেছেন। তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিকতায় খানিকটা পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যের মনীষীরা বিজ্ঞান, তর্ক, এবং মানবতার পূজারী। কিন্তু ভারতীয় ভাবুকেরা তর্কের উপর অত জোর দেন নি। তাঁদের মতে তর্ক-বুদ্ধি-অতিক্রমী কিন্তু বুদ্ধির চাইতেও গূঢ় ও শক্তিশালী হল বোধি বা অপরোক্ষানুভূতি যা দিয়ে তত্ত্বের অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ভারতীয় দার্শনিকেরা তাই দর্শনকে শুধু 'জ্ঞানের কথা' বলে চিত্রিত করেন নি, 'ভক্তদৃষ্টির কথা' বলেই চিত্রিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করেন শুষ্ক ন্যায়ে, কিংবা কেবল তর্কে পরমতত্ত্বটি ধরা পড়ে না। সমগ্র মানসসত্তাটি যখন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, অন্তর্দৃষ্টি যখন খুলে যায়, তখনই তত্ত্বদর্শন সম্ভব হয়। এই 'দর্শন' (vision)-টাই মুখ্য কথা, শুধু নৈয়ায়িক জ্ঞানটা (logical knowing) নয়।

রাধাকৃষ্ণণ বুদ্ধি ও বোধির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন 'বুদ্ধি হল ব্যবহারিক উপকরণ। বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যদিও বুদ্ধি সত্যের সাক্ষাৎ পায় না। আবার বোধি যদিও সত্যের সাক্ষাৎ পায় তবুও প্রয়োজনের নিরিখে এর বিশেষ গুরুত্ব নেই। বোধি হল পরাজ্ঞান—সার সত্যের দর্শন।'

রাধাকৃষ্ণণ দর্শন-আলোচনায় বোধির প্রয়োজন স্বীকার করেন। এখনকার ভাষায় তিনিও বলতে চান, clarity is not enough। তর্ক-অতিক্রমী, কিন্তু তর্কের চাইতেও শক্তিশালী আরও একটা ক্ষমতা যে আছে তা তিনি মানেন। অনেক দার্শনিক এ ধরনের ক্ষমতা স্বীকারও করেছেন। জগৎ-রহস্য ও জীবনরহস্য উদ্ঘাটনে intuition (বোধি)-এর ভূমিকা যে আছে রাধাকৃষ্ণণ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

রাধাকৃষ্ণণ ভাববাদী হলেও ইহলৌকিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। আজকের দিনের অশান্তি ও সংকটের কথা তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্প-কৌশল আয়ত্ত করেছে; নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়িয়েছে। এর ফলে মানুষের বুদ্ধির গৌরব বেড়েছে। মানুষ মনে করছে যে বুদ্ধি, যুক্তি ও বিজ্ঞান—এ সবই বুঝি মানুষের প্রকৃত গৌরবের কারণ। অথচ দেখা যাবে এত সব উপকরণবাহুল্যের মধ্যেও মানবাত্মার অগ্রগতি তেমন ঘটেনি। বরং নানাদিকে পশ্চাদ্‌গতির স্বাক্ষরও সুস্পষ্ট। জীবনে আজ আর যেন কোন উদ্দেশ্য নেই। উদ্দাম কামনাবাসনার কাছে আত্মসমর্পণ, জাতিগত বৈর ও বিরোধ, পরস্পর হানাহানি—এ সবই যেন আজকের দিনের একমাত্র সত্য।

রাধাকৃষ্ণণের মতে সভ্যতার সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।

আজকের দিনের যে সর্বব্যাপী নাস্তিক্যবুদ্ধি সেটাই হল সংকটের কারণ। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে ধর্মের বিকল্প কোন ব্যবস্থায় মানবাত্মার মুক্তি নেই। থিওসফি বল, খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান বল, মানবতাবাদ বল, সমাজতন্ত্র নব্যপন্থা, সাম্যবাদ—যাই বল না কেন, এর কোনটাই গোটা মানুষটিকে আনন্দ দিতে পারে না। জগতের চারদিকে আজ অনিশ্চয়তা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা। নৈতিক আদর্শ আজ আর নেই। মানুষ আজ তাই চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে—পথের সন্ধান করছে। রাধাকৃষ্ণণ বলছেন, মানবজাতি এখনও নবকলেবর ধারণ করছে। বিবর্তনধারা আজও শেষ হয় নি। ফলে, আমরা যদি উচ্চ আদর্শ উন্নত সংকল্প নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হই তবে অচিন্ত্যপূর্ব স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আজ তাই প্রয়োজন আন্তরবিপ্লব—আধ্যাত্মিক বিপ্লব। শুধু বক্তৃতা, কর্মসূচী কিংবা নানা ধরনের 'ইজম' দিয়ে সভ্যতার সংকট নিরসন করা যাবে না।

রাধাকৃষ্ণণ যে যুগে লেখনীচালনা করেছেন সে যুগে মার্কসবাদ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী মহলে অনীহাটাই ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। তিনি স্বীকার করেছেন যে মার্কসবাদ পৃথিবীর মানুষের চিত্ত ক্রমশই আকর্ষণ করছে। তাঁর "ধর্ম ও সমাজ" নামক গ্রন্থে তিনি তাই মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তাৎকালিক অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে, মৌলিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সেই আলোচনায় তেমন নেই।

রাধাকৃষ্ণণ বলছেন মার্কসবাদীরা শুধু অন্নবস্ত্র, ঐহিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায়, কিন্তু বোঝে না যে, ঐহিক উন্নতির শুধু উপকরণমূল্যই আছে, চরমমূল্য নেই। মানুষের জীবনে জীবিকার সমস্যা আছে, অন্নবস্ত্রের সমস্যা আছে, এ সবই সত্য। কিন্তু মানুষের যে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ আছে তাও তো মিথ্যা নয়। ধর্মবোধের প্রশ্নটাও তো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার মতো বিষয় নয়।

মার্কসবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, কিন্তু কেন? রাধাকৃষ্ণণ বলছেন, মার্কসবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন ধর্মের বহিরঙ্গটা দেখে। প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন। তাই ধর্মের সারবস্তুটাকে না দেখে শুধু ধর্মের খোলসটি নিয়েই তাঁদের মাতামাতি। তাছাড়া মার্কসবাদীরা একদিকে বলেন যে চরম সত্য বলে কিছু নেই, আবার তাঁরাই সমষ্টিকল্যাণ, শ্রমিক-স্বার্থ ও অন্যান্য সামাজিক শ্রেয়ঃকে সনাতনের সিংহাসনে বসিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণণ সিদ্ধান্ত করেছেন: আমাদের এই যুগে 'আমা'কে আমরা হারিয়েছি। দেহ আমাদের বিকল হয় নি। আজ অন্তরস্থিত পুরুষটিই রোগাক্রান্ত। সে কারণে সব দুঃখের উৎপত্তি।

রাধাকৃষ্ণণ কেবল যে পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় জগদ্বরেণ্য হয়েছেন তা নয়, প্রৌঢ়ত্বে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। স্তালিন আমলে রাধাকৃষ্ণণ রাশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। দর্শনে রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন ভাববাদী (idealist), মার্কসবাদ-বিরোধী। তবুও চারিত্র-মাধুর্যে ও হৃদয়ের সদ্‌গুণে এবং সর্বোপরি তাঁর উদার মানবিকতায় তিনি সোভিয়েত জনগণের, এমন কি স্বয়ং স্তালিনেরও শ্রদ্ধাভাজন হন। তাঁরই কূটনৈতিক তৎপরতায় সোভিয়েট-ভারত মৈত্রীসম্পর্কের খানিকটা সূচনা হয়। পরবর্তীকালে সোভিয়েট-ভারত মৈত্রীসম্পর্কের ইতিহাস আলোচকেরা এই বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণের সাফল্য নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতার সংকট প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ,

মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুর জীবন ও কর্মধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়ন করে বলেছেন যে কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের মতে, আন্তর শুদ্ধতা ও অন্তর্জীবনের উৎকর্ষ দিয়েই আধ্যাত্মিক মূল্যগুলি চরিতার্থতা লাভ করে ; দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শুধু বৈরাগ্যসাধনে যে মুক্তি, তা খণ্ড সত্য ; জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই চরম ইষ্ট। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রভাবনায় পাওয়া যায় যারা সবার পিছে, যারা সর্বহারা, তাদের জন্য গভীর দরদ ও সহানুভূতি। রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন : 'যে যুগে কতো প্রাচীন জিনিস ভেঙে পড়ছে এবং কতো হাজারো নতুন জিনিস আমদানি হচ্ছে সেই যুগে একজন ভারতীয় ভাবুককে জীবনের এইসব যথার্থ মূল্যগুলিকে তুলে ধরতে দেখলে গভীর সন্তোষই হয়।'

রাধাকৃষ্ণণ অননুকরণীয় ভাষায় গান্ধীজীর জীবনভাষ্য রচনা করেছেন। নেহরু সম্পর্কে লিখেছেন, 'সেই অনাগত যুগ যে যুগে দেখা দেবে বিশ্বমৈত্রীসম্পন্ন বিশ্বমানব, নেহরু সেই যুগেরই পূর্বাভাস। নেহরু ছিলেন উদারচেতা মানুষদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য—সবারই প্রিয়। তাঁর স্মৃতিকে সম্মানিত করবার প্রকৃষ্ট পথ হল তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা। শান্তির জন্য, ন্যায়ের জন্য, দেশে-বিদেশে স্বাধীনতার জন্য তিনি যে কাজ করে গেছেন সেই কাজকে পূর্ণতা দান করা।'

রাধাকৃষ্ণণ গণতন্ত্র, বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি এবং বিশ্বসমাজের একনিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। তিনি লিখেছেন, আমাদের আদর্শ হচ্ছে বিশ্বসমাজ গঠন করা। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বজনীন নৈতিকতার উপরে। এই আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব যদি আমরা গণতন্ত্রের পথ নিই এবং ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি। তিনি আরও লিখেছেন, গণতন্ত্র তার আদর্শ রূপায়িত করতে চায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, প্রেমের পথে, নৈতিক শক্তির সাহায্যে। হিংসা এবং অসহিষ্ণুতার যন্ত্র গণতন্ত্রের আন্তর প্রকৃতির সঙ্গে একেবারেই অসঙ্গত।

রাধাকৃষ্ণণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এই নীতি ভারতীয় মনীষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতবর্ষের জোটনিরপেক্ষ নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, জোটনিরপেক্ষতার তাৎপর্য পক্ষপাতশূন্যতা নয়। জোটনিরপেক্ষতার তাৎপর্য হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতি সক্রিয় আনুগত্য, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের প্রতি আনুগত্য।

জোটনিরপেক্ষ দেশ নিজের মত প্রকাশ করতে ভীত নয়। ভালমন্দের মধ্যে, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে নিরপেক্ষতার নাম জোটনিরপেক্ষতা নয়। এবং এই বিশ্লেষণের পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণণ নানা নিবন্ধে ও বক্তৃতায় ভারতের বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মনীষা ও হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁর বিনয়। বিদ্যা বিনয় দান করে। এ কথাটি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের পক্ষে যে কতদূর সত্য সে বিষয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা সাক্ষ্য দিতে পারেন। বিদ্বজ্জনসমাজে ও ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিনয় নম্রতা ও সৌজন্যবোধের কোন ইতরবিশেষ ঘটেনি। উনিশ শতকের চারিত্রিক যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'মনুষ্যত্ব' আখ্যা পেত রাধাকৃষ্ণণের সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছিল। রাধাকৃষ্ণণ আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান।

না সূর্য, না চন্দ্রতারা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একে একে মুঠিগুলি বন্ধ হয়ে আসে চারিদিকে,
আলোগুলি নিভে যায়।
না-সূর্য কেটেছে দিন, না-চন্দ্রতারকা তমসায়
কাটে রাত।
এ তোমরা কোথায় গিয়ে কার কাছে শিখে
এসেছ এমন কৃপণতা,
যা এত নিশ্চিন্ত চিত্তে ধনুর ছিলায় রাখে দাঁত,
যা কাউকে জানাতে দেয় না কোনো কথা ?

মুঠিগুলি বন্ধ হয়, চতুর্দিকে নিভে যায় আলো।
মানুষ-গাছপালা-বাড়ি সারে-সারে
না-সূর্যতারকাচন্দ্র নিঃশব্দ আঁধারে
দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কী কৃপণের মত সংসার
সাজিয়েছ ? জীবনে ও না-জীবনে সামান্য আড়ালও
নেই আর। কিছু নেই আর।

হাসে না শিশুও, পাখি ডাকে না, ডাকলেও কেউ সাড়া
না-দিয়ে তাকায় ধূম্রমলিন আকাশে ;
আলোগুলি নিভে যায়, মুঠিগুলি বন্ধ হয়ে আসে,
আঙুলে গলে না জলধারা।

পশুর কান্না

মণীন্দ্র রায়

কাজের লোকেরা যখন
আপিস-আদালত করে,
কি নাড়ি টেপে, কি বাড়ি বানায়,
অথবা অন্যদের কাজকর্মের খুঁৎ ধ'রে
তুলোধোনা করে,
তখন তারই চোখে পড়তে থাকে—
হাসপাতালের মেঝেয় শোয়ানো
কোনো বেড-না-পাওয়া মুমূর্ষু রুগী,
কিম্বা কানে আধপোড়া বিড়ি গোঁজা
বেকার কাঠমিস্ত্রি।
আর, ভালো-ভালো ছবিও সে দেখে বই কি!
মান্যগণ্য সভাপতির গলায় রজনীগন্ধার মালা,
কিম্বা কোনো ঢাউস গাড়িতে হুস করে উড়ে যাওয়া
ভাগ্যবানের মিনি বেরালের মতো বৌ।

তার মনের ওপর ছায়া ফেলে
অনেকরকম এলোমেলো ছবি,
তার কানের মধ্যে ঢুকে পড়ে
অনেক সব শব্দ—
নিমন্ত্রণের ছাদ থেকে নেমে আসা
সুখী মানুষের উদ্গার,
কিম্বা চলন্ত লরি থেকে ঝরে পড়া গমের দানা
রাস্তা থেকে খুঁটে তোলার জন্য
কঙ্কালসার ছেলেমেয়েদের মরিয়া প্রতিযোগিতা।

এইসব নিয়ে
যখন সে কবিতা লিখতে বসে,

তার হাত পা মুণ্ড আর ধড়
ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকে দিক্‌বিদিকে,
আর তার জিহ্বাহীন হৃৎপিণ্ড তখন
ধক্ ধক্ করতে থাকে মায়ের পেটের শিশুর মতো ;
তখন একটিমাত্রই আদিম ইচ্ছা তাকে
ঠেলতে থাকে তার কবিতার দিকে—
যার মধ্যে মিশে থাকে
পশুর কান্না ॥

ভুল শহরে ভুল ঠিকানায়

কৃষ্ণ ধর

ফুটপাথে চলতে চলতে মনে হয়
যেন ভুল করে এসে গেছি এ শহরে
এখানে কোনো পরিচিত ঠিকানা জানা নেই।

একদিন অনেক রোমাঞ্চিত প্রহর কেটেছে
মনে অনেক শিহরণ জাগত
লুকোনো বকুলফুলের সুবাসে এ শহরেই
চমকে উঠতুম গুমটির গায়ে ঘেঁষা চাঁপাগাছ দেখে।

তখন শহরটা খুব চেনাজানা ছিল
ভেসে উঠত কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ে, অ্যালবার্ট হলে
রেলিং-এর ওপারে প্রেসিডেন্সি লনে
সবুজ ছায়ার তলে অনেক অনেক মুখ
কখনো মিছিলে দেখা দিত স্পার্টাকাস।

ময়দানে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতুম
বার্সিলোনা জ্বলে যাচ্ছে, গের্নিকা ছাই
যেন স্বচক্ষে দেখতুম এল্‌ম্‌ গাছের গুঁড়িতে
আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে
ফ্রেদরিকো গারসিয়া লোরকা
বেলেঘাটায় উপোস করছেন মোহনদাস গান্ধীজি এ…

এই সব প্রকৃতই মনে পড়ে ইতিহাসের মতন
ডকুমেন্টারি ফিলম যেন মৃণাল সেনের কোনো ছবি
আমরাও সমসাময়িক হয়ে উঠি
পকেটে কবিতার খাতা, নিষিদ্ধ ভাষার ইস্তাহার
এলোমেলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিই কনফেশন
জ্যাঁ জাক রুশোর মতো অবিকল
নিষ্পাপ সরল।

কোথায় সে চেনা শহর ! পরিচিত পথগুলি খুঁজি
প্রত্যেক গলির মোড়ে থেঁৎলেপড়া ইঁদুরের মতো
প্রিয়তম স্বপ্ন আশা নিহত বরবাদ
দরজায় কড়া নাড়লে ছুচারটে সন্ধানী চোখ
ইতিউতি দেখে নিয়ে কেটে পড়ে অন্ধকারে

এ শহরে আগন্তুক আমি নামহীন ভিড়ে
একাকার হয়ে গিয়ে ভাবতে থাকি
কলকাতা '৭৫ ছবির কনটেন্ট কী হবে ?

আমি এসেছি

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

তুঙ্গ নারী, আমি এসেছি।
পথটা খুব লম্বা ছিল আর ভয়ঙ্কর
দু পাশে সারি সারি বন্ধ দরজা জানলা আর সর্বাঙ্গে
অবিরল বৃষ্টির ছোবল
সমস্ত শরীর দাউদাউ জ্বলে গেছে তীব্র বিষের জ্বালায়
প্রচণ্ড আক্রোশে উথালপাথাল অন্ধকার বারবার ঝাঁপিয়ে
পড়ে চতুর বিদ্যুতের ঘাড়ে
তাদের বেপরোয়া লড়াইয়ে ছিন্নভিন্ন হতে হতে ভেবেছি,
যেতেই হবে
পথটা খুব লম্বা ছিল আর ভয়ঙ্কর
নরবলি দেওয়ার মুহূর্তে কপালে মস্ত গোল সিঁদুরের
ফোঁটার মতো
সূর্য উঠে আসে, জ্বলন্ত কয়লা বিছানো মরুভূমি,
রাত্রির বিশাল আকাশ জুড়ে হিংস্র জন্তুদের চোখগুলো
শিকার খুঁজে ফেরে
আর খ্যাপা মৌমাছির ঝাঁকের মতো শীতের বাতাস
বাবলা কণ্টিকারীর ছায়ায় এলোমেলো ছড়ানো কঙ্কাল
পথটা খুব লম্বা ছিল আর ভয়ঙ্কর
ডানাভাঙা পাখির মতো সূর্যাস্তের মেঘ পাক খেয়ে
পড়েছে অরণ্যের আড়ালে
বিজয়ীর গর্জন আর পরাস্তের আর্তনাদে হঠাৎ জেগে ওঠা
শব্দের গম্বুজ
খানখান ভেঙে পড়ে অরণ্যের বিরাট স্তব্ধতায়
মুষল আঘাতে
অচেনা এবড়োখেবড়ো পথে লাঠি ঠুকে ঠুকে অন্ধের মতো
বাতাস সাবধানে চলে পাতায় পাতায়
বিশ্বাস করো বা না-ই করো মৃত্যুর একটা তীব্র গন্ধ আছে
সেই গন্ধে এক-এক সময় বুক বোবা হয়ে গেছে
আর বোধহয় পারব না তবু যেতেই হবে।

তুঙ্গ নারী, আমি এসেছি
বুকের ভিতর থেকে উপড়ে আনা হৃৎপিণ্ড সাজিয়ে
দিয়েছি শিমূলের ডালে ডালে
বর্ণপুঞ্জ আঁকা তোমার দু করতলের অঞ্জলিতে গ্রহণ করো
এই অর্ঘ্য ॥

স্মৃতি নয়, তুমি খুবই সাম্প্রতিক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

স্মৃতি নয়, তুমি খুবই সাম্প্রতিক। আমি
চোখ না বুজেই দেখতে পাই স্ফীত নাসারন্ধ্র
বুকের উদ্বেল মাংসে ক্রমে শক্ত হয়ে ওঠা সম্মতির কুঁড়ি
সবই শরীর শরীরে চিনে রাখে
মন মনে রাখে না কিছুই :
জাগিয়ে অসংখ্য গন্ধ পুষ্পলিপ্ত সূর্য করে নিস্পৃহ ভ্রমণ
দৃশ্য গড়ে ওঠে, ভাঙে, বদলায়, তারপর
নামে অন্ধকার, সেই অন্ধকারও
চিহ্ন করে কিছু অভিলাষী তারা,
শুরু হয়ে তুমুল খনন, তাৎক্ষণিক খনিগুলি ভরে ওঠে
তুমুল স্রবণে, কিন্তু তাও তো জলীয়, নয় স্থির, বাস্তবিক
নয় আত্মায় উদ্‌গত রমণবিষণ্ণ কোনো বাল্মীকি পয়ার !
যে যায়, এভাবেই যায়, যে আসে কি সহজে এসে
অংশ মাংস অধিকার করে,
এরাই আমার ক্ষণজীবী জ্বরের ঔষধি, নয়
তৃষ্ণার সন্ন্যাসী শব্দ, স্মৃতি — যা ভাষার।

আবহমানকাল

অসীম রায়

সেদিন টিফিনের সময় প্রতাপদের অফিসে বয়স্ক বোসবাবুকে রোগা ছিপছিপে ছোকরা দীপেন বললে, —বোস-দা, মার্ক করেছেন তো? বেটা ভাব করতে এসেছে।

বোসবাবু টিফিনের বাক্স থেকে বৌ-এর তৈরী রুটি-বেগুনভাজা খাচ্ছিলেন। ভাজা বেগুনের খোসা হঠাৎ গলায় লেগে কাশতে লাগলেন। তারপর জল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে বললেন,—ওসব বড় বড় ব্যাপারে কেন? আমরা আদার ব্যাপারী……

দীপেন ফুঁসে বললে,—আপনি জেনেশুনে অমন ন্যাকা কথা বলবেন না। ও ব্যাটা ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি। বিলেত গিয়ে মাগীবাজি করে টাকা উড়িয়েছে। ওর ভাইটা কমিউনিস্ট—জানেন তো?

বোসবাবু টিফিনের ঢাকনি আঁটতে গিয়ে থেমে যান। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলেন,—অতো খবর রাখি না মশাই। নিজের ভাইয়েরই খবর রাখি না।

টাইপরাইটারের কোণে জমা ময়লা ফুঁ দিতে দিতে দীপেন বললে,—এই গেঁধে ব্যাটাই দেশটা শেষ করলে। সমস্ত অত্যাচার অন্যায়গুলো শুধু মাথা পেতে মেনে নিতে শিখিয়েছে।

—সে তোমাদের সময় এলে তোমরা যা খুশি কোরো। যারা রাজ্য চালাচ্ছে তাদের মতে সব চলবে। এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়? তারপর তাঁর ধুতির উপর লম্বা ঝোলা সাদা শার্টের পাশ পকেট থেকে পানের ডাবা বার করে দীপেনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—তুমিও সাহেবের ভাইয়ের দলে নাকি?

দীপেন পান তুলে মুখে গুঁজতে গুঁজতে বললে,—আমি বোস-দা আই.পি আই। তারপর কৌতূহলী বোসবাবুর দিকে চেয়ে বললে,—ইণ্ডিয়ান পার্টি অব ইণ্ডিয়া। হ্যাঁ! ঐ একমাত্র রাস্তা। খালি পেটাও।—পুলিশ পেটাও, সাহেব পেটাও, যেখানে কিছু হচ্ছে না দেখছো পিটিয়ে যাও।

এক চিমটি জর্দা মুখে ফেলে দিয়ে চোখ বুঁজে পান চিবোন বোসবাবু। প্রায় বাইশ বছরের অভ্যেস। বোসবাবু যখন চোখ বুঁজে পান চিবোচ্ছেন তখন আর পাঁচ মিনিট বাকী টিফিন শেষ হতে। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা এই সাহেবী অফিসে বোসবাবুর প্রত্যেকটা কাজ মাপা এক নির্দিষ্ট ছকের অংশ।

চোখ বুঁজে বুঁজেই বলেন,—দেশে কি আইন বলে কিছু নেই?

—আমাদের ব্যাপারেই খালি আইন—না বোস-দা? এদিকে যে অ্যাটকিন্‌সন সাহেব ব্যাবসা ফুঁকে দিয়ে সাউথ আফ্রিকা পালাচ্ছে—সে ব্যাপারে কোন আইন নেই?

বোসবাবু চোখ খোলেন। বিড়বিড় করেন,—মেয়েটার আবার চিকেন পক্স। কাল ছুটা ছুড়িটা পৌছল রাত সাড়ে আটটায়।

এমন সময় দেয়ালঘড়িতে ছুটো বাজে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের মেহাগনী খুপরি থেকে ক্রিং করে আওয়াজ ওঠে। বেয়ারা লালবাতি নিভিয়ে ভেতরে যায়।

বাইরে একটা সাড়া পড়ে। বোসবাবু সচকিত হয়ে তাকান। দু-তিন জন টাইপিস্ট মেশিনে কাগজ পরাতে পরাতে থমকায়। কেবল চাপা উল্লাসে ফেটে পড়ে দীপেন,—কেমন, বলিনি? এখন বড় সাহেবের তলব পড়েছে বোসদাকে! ওদিকে যে গোয়েঙ্কা আসছে হুড়ো দিতে। অ্যাদ্দিন সাহেবদের ল্যাজ ধরে ধরে ক্যালক্যাটা ক্লাব, ছেলেদের সেণ্ট জোসেফ স্কুল। আমাদের কী শালা! ল্যাংটার আবার বাটপারের ভয়!

দীপেনের আন্দাজ ঠিক। প্রতাপের বেয়ারা আসে বোসবাবুর টেবিলে সাহেবের তলব নিয়ে।

—তুমি যে আঁচে বাঘ ধরো দীপেন।

দীপেন বললে,—ঐটাই পারি দাদা। তবে মারতে পারি না।

ফর্সা লালটুকটুকে চকচকে-টাক প্রতাপ গত আট-দশ বছরের মধ্যেই একজন সুদক্ষ মার্কেণ্টাইল এক্সিকিউটিভ। কাজ না থাকলে বড়বাবু কেরানীর সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ নেই। বোসবাবু এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, কাজ বুঝে চলে যান। আজ প্রতাপ সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললে,—বসুন।

বসতেই প্রশ্ন করে,—দীননাথ কটা কন্‌সার্ন কিনল?

বোসবাবু আরাম করে চেয়ারে বসে চোখ বোঁজেন। আঙুলের কর গুনে গুনে বলে যান, ম্যাকে অ্যাণ্ড ম্যাকে, স্ট্যাফর্ড অ্যাণ্ড ট্যালবট, টার্নার রবিনসন, ম্যারি ওয়ালেস—

—ম্যারি ওয়ালেস?

—হ্যাঁ স্যার, ক্ষণজন্মা পুরুষ!

—হোয়াট?

বোসবাবু সর্বজ্ঞের মতো মাথা নাড়ান। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন,—দীননাথের পি. এ. জয়রাম কী বলে জানেন স্যার? বলে, দীননাথ সারা কলকাতাটা কিনে নেবে।

—ইউ মীন ছাট আনলাইসেন্সড্ থাটাল-ওনার? অপরিসীম অবজ্ঞায় নাক কুঁচকায় প্রতাপ। —ও ব্যাটা বিজনেসের কী বোঝে?

বোসবাবু আনন্দে নিজের অজান্তেই থোড়া নাচাতে থাকেন। গত দশটা বছর প্রতাপচন্দ্র প্রবল প্রতাপে এই অফিসে তাঁর রাজত্ব করেছেন, আর রাজত্বের প্রধান হাতিয়ার ছিলেন বোসবাবু। বস্-এর কথা চিন্তা করা, তাঁর মন রক্ষা করা, মন যুগিয়ে কথা বলা, ভবিষ্যতে মন যোগানোর পরিস্থিতি নিজের মনের মধ্যে তৈরি করা—এই নিয়ে বোসবাবুর কেটেছে গত দশ-বারো বছর। বলতে কি, প্রতাপের মাজা গলার হুকুমই ধরে রেখেছে তাঁর জীবনতরণীর হাল। আর যখন বছরে মাসখানেক সপরিবারে প্রতাপ কুলু ভ্যালি বেড়াতে গিয়েছে, পাহালগামে কটেজ নিয়েছে, তখন বোসবাবুর জীবন হয়েছে হালভাঙা নৌকোর মতো। সমস্ত অফিসটা এবং অফিসপরিব্যাপ্ত তাঁর জীবনটাই ম্যাড়মেড়ে ঠেকেছে।

সেই প্রতাপচন্দ্রের রাজত্বের থামগুলো টলছে দীননাথের প্রচণ্ড ধাক্কায়। রাতারাতি এই নাটকীয় পরিবর্তনে বোসবাবু যেমন পুলকিত হন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও বোধ করেন। বাড়িতে

তৈরী বড়ি-আচারের ক্রমশ অন্তর্ধানের মতো সাহেবী অফিসের অভ্যস্ত নিয়মানুবর্তিতাও অন্তর্হিত হবে। থাকবে দীননাথের নিত্য নতুন জিগীষা আর দীপেনদের ইনক্লাব। তার আগে রিটায়ার করে কাশীবাস করা যায় না? বোসবাবুর ঘোড়া নাচানো বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতাপের চাপা অসন্তোষ ফেটে পড়ে,—কী, শুনতে পারছেন না? চুপ করে আছেন কেন?

বোসবাবুর চটকা ভাঙে। হঠাৎ মনে হয় সাত দিন আগেই যে অখণ্ড প্রতাপের জামানায় ছিলেন সেই জামানাতেই আছেন, দীননাথ গোয়েঙ্কার প্রসারিত থাবা সম্পর্কে যে কানাঘুষো চলছিল তা অমূলক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড় সাহেবের টেবিলের সামনে বসে থাকাটা এমন এক অস্বাভাবিক ঘটনা যে অনায়াসে ঘোড়া নাচানো শুরু করেন। আবার গভীর প্রত্যয় আসে তাঁর কথায়,—দীননাথ স্যার, ক্ষণজন্মা পুরুষ! সাড়ে চারকোটি দিয়ে কিনেছে আমাদের কোম্পানি।

—অ্যাবসার্ড! এবার অসন্তোষের বদলে প্রতাপের কণ্ঠে গভীর বিস্ময়।—সাড়ে চা-র কোটি?

—হ্যাঁ স্যার, বিড়লারা তিন কোটি পর্যন্ত উঠেছিল।

—ফ্যানটাস্টিক!

—দীননাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ! যাতে হাত দেয় সোনা ফলে। দুটো সীক্ কটন মিল নিয়েছিল। এ বছর ভালো ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। আরও ভালো মিলগুলো খাবি খাচ্ছে। দীননাথ ড্যাং ড্যাং করে কোম্পানি কিনছে।

—কী করে চালাবে? আমরা একটা চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাই।

বোসবাবু সামনে বসা ফর্সা লালচে অসহায়তার প্রতিমূর্তিটির দিকে চেয়ে তৃপ্তিবোধ করেন। এই লোকটাকে খুশী করার জন্যে মাঠ ভেঙে রোজ আটটা পনেরোর ট্রেন ধরেছেন হাবড়া থেকে গত দশটা বছর। আর এ শালা রোজ সন্ধ্যেবেলা স্কচ খায়। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের আসন্ন পতনে তাঁর নিম্ন-মধ্যবিত্ত সত্তা এক গভীর পুলকে আপ্লুত হয়।

—ওরা তো স্যার আপনাদের মতো চালাবে না, আনন্দে চোখ বুঁজে যায় বোসবাবুর।—জয়রাম বললে স্যার ওরা ম্যারি ওয়ালেসে ঢুকেই ওদের কী পোস্টে সব রাজস্থানী ভাইদের নিয়ে এসেছে।

প্রতাপ চেষ্টা করে তার অসহায়তা ঢাকবার জন্যে। রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলে,—'বারবারাস্'।

—ওরা কিছু পরোয়া করে না। এই আজ কাগজের কল নিলে, পোবাল না সিমেণ্ট ধরল, নইলে চার-পাঁচটা চা-বাগান কিনে ফেললে। ওরাই স্যার আমাদের আসল ভাগ্যবিধাতা। সাহেবরা তো পাততাড়ি গুটাল।

প্রতাপ তার চাপা গলায় বললে,—সারাজীবন একটা নামজাদা বিলিতি ফার্মে কাজ করে এলেন। আর এখন পেটি ট্রেডার আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টে সব এক করে ফেললেন? সব পার্সপেকটিভ হারিয়ে ফেললেন?

—আমাদের স্যার পার্সপেকটিভ থাকলেও আট-টা পনেরো, না থাকলেও আট-টা পনেরো।

প্রতাপের জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল 'আপনি এখন যেতে পারেন' কিন্তু মুখ সামলে বলে,—আচ্ছা বোসবাবু, চার কোটির খবরটা কোথায় পেলেন?

— জয়রামের কাছে স্যার। আপনি তো স্যার জানেন, শেয়ার মার্কেটে ঘুরি। ওখানে জয়রাম বললে কিনা ও আমাদের কোম্পানির ডাইরেক্টর হচ্ছে, তাই……

প্রতাপের গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরোয়। আতঙ্কে চোখ দুটো ঠিকরে বেরোয়। তারপর হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়। ভবিতব্য যাই হোক, পার্কসার্কাসের বাড়ির চারখানা ফ্ল্যাট থেকে অন্তত হাজারখানেক টাকা মাসে মাসে আসবেই। আর শোনা যাচ্ছে পিতৃদেবের শরীর ভাল যাচ্ছে না। তিনি দেহ রাখলে প্রতাপ তাঁর বাড়ির অংশের টাকা দাবি করবে। দুটো ভাইয়ের সঙ্গেই তার বয়সের মেজাজের যথেষ্ট অমিল। একটা অতিমাত্রায় চালাক আর একটা অতিমাত্রায় পাগল। তাদের সঙ্গে না থাকতে চাওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয়। সুন্দর হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে প্রতাপ বোসবাবুকে বললে,—গুজবে কান দিবেন না।

—কেন স্যার, আপনাকে বলেনি অ্যাটকিন্‌সন দীননাথের কথা ?

—না না, বলেছে…আমাকে ছাড়া কাকে আর বলবে · তবে আপনি যেভাবে বলছেন ·· খুব অস্পষ্টভাবে বললে প্রতাপ। তার অসহায়তা ক্রমশই তার অধস্তন কর্মচারীর কাছে প্রকাশিত হচ্ছে ভেবে বিরক্ত বোধ করে। মার্কেন্টাইল ফার্মের তিন-চার-হাজারী মনসবদাররা যে আসলে হুকুমের চিঠি ফেলবার জন্যে এক-একটা ডাকবাক্সমাত্র, এই সত্যটা তাদের কথাবার্তায় এমন ছল্‌কে উঠবে ভাবতে পারে নি।

—আজকেই একটা পার্টিতে দেখা হবে। কোন্ এক ব্রিটিশ অথার এসেছে। তার রিসেপ্‌শান। আমার মনে হয় না বোসবাবু, আপনি যা বলছেন ঠিক।

—তা হলে তো স্যার ভাল…বোসবাবু উঠতে উঠতে বললেন।

সচরাচর মাথা ধরে না প্রতাপের। কিন্তু গত সাতদিন ধরে তাদের অফিসের ওলোট-পালোটের কথা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাও ধরছে বিকেলের দিকে। বেয়ারাকে দিয়ে স্যারিডন আনিয়ে খেলে প্রতাপ। মাথাটা কেন ভার লাগছে বুঝতে পারে না। প্রেশারের জন্যে একটা মেডিকেল চেক-আপের কথা মনে আসে। একবার মনে হল অ্যাট্‌কিন্‌সনের ঘরে যাবে কিনা। ইংরেজদের সম্পর্কে এক প্রবল অভিমানে প্রতাপ অভিভূত হয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখছিল অ্যাট্‌কিন্‌সন রিটায়ার করলে দু-বছর পরে সে এই ফার্মের নাম্বার টু হবে। আজ সেই স্বপ্ন হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। 'হাউ আন্‌গ্রেটফুল্‌!'—শূন্য ঘরে প্রতাপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সেই কলেজ থেকে বেরিয়ে অবধি তার ভাগ্য ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িয়ে গেছে। আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারও তার মনের মধ্যে মোচড়ায়। দীননাথের এই উদ্যত থাবাকে প্রতিরোধ করা যায় না ? পাগলের মতো অনেকগুলো চিন্তা মনে আসে। একবার ভাবল পিন্টুর কাছে যাবে কিনা। এখন তো সে বিশাল বিপ্লবী নেতা, এইসব নামজাদা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফাটকা খেলার বিরুদ্ধে তাদের পার্টির কোন প্রতিবাদ নেই ? সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পিন্টুর ঝটাপট্ সম্ভাব্য উত্তর সে যেন ফোনে শুনতে পায়,—আমাদের পার্টির তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই! তোমাদের ক'টা কর্তাকে সরালো কি না-সরালো, তাতে আমাদের সামান্য মাথা-ব্যথা নেই। ওয়ার্কার

ছাটাই না হলেই হল। কিন্তু প্রতাপ চিন্তা করে, ব্যাপারটা শুধু তাদের কজনার ওপর দিয়েই যাবে না। দীননাথ যেমন সাম্রাজ্য বিস্তার করছে তেমনি সামান্য অসুবিধে দেখলে এ সাম্রাজ্য ফুঁকে দিতে দ্বিধা করবে না। এই সোজা কথাটা বোঝার জন্যে কি দেশে কেউ নেই? সরকার নেই, রাজনৈতিক পার্টি নেই, লেবার ইউনিয়ন নেই? গত দশ-বারো বছরে দেশের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথাটা একবারও প্রতাপের মনে আসেনি। এখন আত্মরক্ষার্থে কথাগুলো মনের মধ্যে দলা পাকায়। দীননাথকে রুখবার জন্যে কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করা যায়? অস্বস্তিতে মিসেস রবিনসনকে ডেকে পাঠায়।

খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ঢোকেন। ক্যাটকেটে লাল লিপস্টিকে আর চেহারায় সাজে খুকী হবার সাধ করুণভাবে প্রকট। প্রতাপ তাঁর ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে। ভদ্রমহিলা গলগল করে তাঁর ছেলে ডেভিডের কথা বলে যান। সম্প্রতি তাঁর ছেলে নিউজিল্যাণ্ডে সেট্‌ল্‌ করেছে। তাকে চাকরিতে নেবার জন্যে জগদ্বিখ্যাত সব ফার্ম নাকি কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতাপ অন্যমনস্কভাবে শুনতে শুনতে মাথা নাড়ায়,—ইট সিম্‌স্‌ ডেভিড উইল বিকাম্‌ দ্য প্রাইম মিনিস্টার!

ভদ্রমহিলা আহত হলেন, উঠে দাঁড়াতে প্রতাপ বললে,—ইউ মে গো মিসেস রবিনসন্‌।

প্রতাপ বিলিতি সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায়। ঘড়ি দেখে। পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট। ফ্যানটাস্টিক!—নিজের মনে মনেই বলে ওঠে। মৈমনসিংহের স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আবৃত্তি করত সে। সে কবিতার নামটা মনের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে—স্বর্গ হইতে বিদায়—ফ্যানটাস্টিক! প্রতাপ বেল বাজায়।

বেয়ারা এলে সচরাচর চোখ তুলে হুকুম দিতে অভ্যস্ত নয় প্রতাপ। আজ উত্তরপ্রদেশ-অধিবাসী অযোধ্যাপ্রসাদের কাঁচাপাকা পুরু গোঁফ, তার পাগড়ি, তার খাকি পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে বলে,—গাঁও মে ক্ষেতি হ্যায়?

বিস্ময়ে অযোধ্যাপ্রসাদের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করায় অযোধ্যাপ্রসাদ হাতজোড় করে বললে, হাঁ সাব।

অযোধ্যার মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় প্রতাপ জিজ্ঞাসা করে বাংলায়,—কতো জমি?

—সাব, হামরা ভাই সুরযুপ্রসাদ, উস্‌কে সাথ কম্‌সে কম্‌ শ-বিঘা। তারপর সাহস পেয়ে বলতে আরম্ভ করে—এক তালাওয়ের পাশে সে এক আমগাছের জঙ্গল নিয়েছে গত বছর। এ বছর যখন ছুটিতে গ্রামে গিয়েছিল তখন খাটিয়া পেতে রাতভোর পাহারা দিত। আর ভোরবেলা অসংখ্য পাখি আসত তালাওয়ে। প্রবল উৎসাহে হাত নেড়ে বললে,—হাম্‌ সমঝেতে থে কি হাম বৈকুণ্ঠ্‌ মে্‌ হ্যায়।

প্রতাপ ভুরু কুঁচকে বললে,—ঠিক হ্যায়, আভি যাও।

সদ্য কেনা গাড়িতে যেতে যেতে কলকাতার অসংখ্য গাড়াগর্তপূর্ণ রাজপথও মসৃণ লাগে। বাড়িতে ঢুকতেই বনানী বললে,—তুমি এত দেরি করলে! আমাদের সাড়ে চারটাতে রাজভবনে শো।

ক্লান্ত প্রতাপ রুপোলী গ্রিল দেওয়া, সবুজ-হলুদ-ফুলকাটা মোজেইকের বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে পড়ে। হাই তুলে বলে,—মেহবুব গাড়িতেই আছে তোমাকে নিয়ে যাবে বলে।

—আজকের স্টেটসম্যানে আমাদের রাইট-আপ দেখেছো? হাস্যোজ্জ্বল বনানী দৈনিক কাগজটা নিয়ে আসে।—কী বিচ্ছিরি আমার ছবিটা উঠেছে ছাখো! যাই বলো, আমি অতো মুটকি নই।

—কই দেখি। প্রতাপ হাত বাড়িয়ে কাগজ নেয়। গতকাল শেয়ালদা প্ল্যাটফর্মে রেফিউজিদের কম্বলদান করছেন গভর্নর, একপাশে বনানী আর একপাশে এক সুন্দরী মহিলা। বনানী কম্বল ধরে আছে।

—এটা কে?

—ঠিক নজরে পড়েছে! বনানী তার মোটাসোটা ফর্সা মুখখানা দোলায়। আমাদের সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট মিসেস খয়তান। রিমার্কেবল লেডি। এই তো সামনের শনিবারে একটা ক্যাবারে শো করছে গ্রেট ইস্টার্নে ফর দ্য রেফিউজিস। ইউ মাস্ট মিট হার প্রতাপ। শী লাভস্ বেঙ্গল।

ফ্রিজশীতল লেমন স্কোয়াশ খেতে খেতে প্রতাপ বলে,—ছেলেদের চিঠি এসেছে নাকি?

—ওমা, তোমাকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি। গোলোর চিঠি এসেছে। গোলো তেনজিং-এর সঙ্গে ছবি তুলেছে। ছাখো, কী সুইট!

সত্যিই গোলো বা কৌশিককে তাদের স্কুলের ব্লেজারে তেনজিং-এর পাশে চমৎকার মানিয়েছে। ছেলেটা লম্বায় প্রতাপের মাথার ওপর উঠেছে। রং চাপা, স্পোর্টসম্যানের মতো চেহারা, তাদের স্কুলের হকি টিমের ক্যাপটেন। বনানী চলে যাবার পর স্বপ্নাবিষ্টের মতো প্রতাপ ছেলের ছবিটা নাড়াচাড়া করে।

বাস্তবিক বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. ফেল করার পর এবং দেশে ফিরে যে পথ হারাবার ভাব এসেছিল গত কয়েক বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছে প্রতাপ। আরও আট-দশটা বছর এভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় না? না হয় সে দিল্লী যাবে। গত বছর দিল্লী গিয়ে দেখেছে মাঠের মধ্যে এন্তার বাড়ি হচ্ছে। দিল্লীতে পাঞ্জাবী সমৃদ্ধির ছবি। সেখানে তার এই বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা কাজে দেবে না? পর মুহূর্তেই ক্লান্তি বোধ করে প্রতাপ। এত বয়সে আবার জীবন শুরু করার কথা ভাবতে পারে না।

সচরাচর কোম্পানির বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অথবা বাণিজ্যজগতের কোন গণ্যমান্য ইংরেজ শহরে এলেই তাঁর সংবর্ধনার জন্যে পার্টি দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ক্যালকাটা ক্লাবে পার্টি ছিল এমন একজন ইংরেজকে নিয়ে যাঁকে কলকাতার ইংরেজ বাণিজ্যজগতের পক্ষে রাখাও যায় না, ফেলাও যায় না। একজন মধ্যবয়সী ইংরেজ যশস্বী লেখকের সংবর্ধনার উপলক্ষে পানসভা। অ্যাটকিন্সনের স্ত্রী বাঁকুড়ার কেটের আঁটসাঁট গাউনে বেশ এক ছিমছাম যৌন সৌন্দর্যের ছবির মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রতাপকে ঢুকতে দেখেই নীচু গলায় বললে, - বাই দ্য ওয়ে, হু ইজ্ হি?

প্রতাপও ঠিক জানে না, আন্দাজে হেসে বললে,—মাস্ট বি সাম্ বিগ্ শট।

—ও ইয়েস, মাস্ট বি। মিসেস অ্যাটকিন্‌সন চোখ মটকালেন।

—হোয়্যার ইজ্‌ জন ?

—ও প্রতাপ, ইউ মাসণ্ট ডু এনি বিজনেস্‌ টক হিয়ার। জন্‌ ইজ্‌ নাউ ফিউরিয়াসলি অ্যান্টিব্রিটিশ।

প্রতাপ হাসি-হাসি মুখে কৌতূহলী হয়ে তাকালে মিসেস অ্যাটকিন্‌সন বলতে থাকেন সম্প্রতি বিলেতে গিয়ে চাকরবাকরের অভাবে তাঁদের কী বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল। এখানে তাঁদের আলিপুর রোডের বাড়িতে মালিসহ আটজন চাকর।

বার্ডের হ্যারিস, ম্যাকিনের ছোকরা টিমথি এসে যোগ দেয়। পুরুষের মতো ছাঁটা চুলে তরুণী মিসেস টিমথি তাঁর সাপ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সিঙ্গাপুরেও তিনি সাপ দেখেছেন বটে, কিন্তু বার্মায় এক রকম সাপ দেখেছেন যা—'বিট্‌স অল কমনসেন্স! ইট ওয়াজ এ রিয়াল কিং কোবরা।' দু-তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন কথাটা।

এমন সময় দুজন ভারতীয় ইণ্টেলেকচ্যুয়ালকে আসতে দেখা যায়। প্রতাপ প্রায় প্রতি পানসভাতেই দুজনের আবির্ভাব লক্ষ্য করেছে। একজন ঢ্যাঙা, আর একজন বেঁটে। এঁরা আসলে কোন্‌ বিষয়ে জ্ঞানী সে সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো প্রতাপের কোনো ধারণা নেই। বেঁটে ভদ্র লোকটি ভীষণ খবর রাখেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সিঙ্গাপুরের সাপের সঙ্গে বার্মার সাপ এবং বার্মার সাপের সঙ্গে বাঁকুড়ার সাপের এক তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন।

প্রতাপের হঠাৎ খুব বোরিং লাগে। আগে লাগত না। কিন্তু আজ নিজে এক পাহাড়ের খাদের মুখে দাঁড়িয়ে, তার গড়িয়ে পড়ার ভবিতব্য ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। কিছু দূরে দীর্ঘকায় টিপিকাল সম্ভ্রান্ত ইংরেজ চেহারা, বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি স্যার রিচার্ডের সঙ্গে গ্রেহাউণ্ড ছুঁচলো হ্যাংলাটে অ্যাট্‌কিনসন এতক্ষণ নীচু গলায় আলাপ করেছিলেন। যশস্বী ইংরেজ লেখকটিকে নিয়ে দু-তিনজন ব্রিটিশ হাই কমিশনের কর্মচারী নামতেই তাঁরা এগিয়ে যান। ভেতরের একখানা ছোটো ঘরে বেয়ারারা স্কচ পরিবেশন করে।

ইংরেজ লেখকটিকে এ সভায় একটু বেমানান রকমের আত্মসচেতন লাগে। বোধহয় ষাট-পঁয়ষট্টি বয়স। একটা পোর্টফোলিও আড়ষ্ট ভাবে ধরে বাদামী চোখ মেলে এদিকে ওদিকে তাকান ও মৃদু মৃদু হাসেন। আলাপ খুব ভালো এগোয় না। বর্তমান ইংরেজী লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন, সেই জন্যে ঠিক ধরতে পারেন না। ইংল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা গেল, বোধহয় তারই প্রতিক্রিয়ায় লেখকেরা পাঠকেরা বড্ড 'প্রিটি' জিনিস পছন্দ করে। এ ধরনের কথাবার্তা কেমন যেন শুকনো নীরস ঠেকে শ্রোতাদের কাছে। মিসেস অ্যাটকিন্‌সনের 'রিয়ালি' ? এবং টিমথির 'ইউ আর ফ্রাইটফুলি ক্লেভার' এই ধরনের সাড়ায় কোন জমাট পরিবেশ তৈরি হয় না। অবশ্য মিসেস টিমথির একটা কথায় আলাপের মোড় ঘুরল। স্কুলে তাঁর বড়দি একদিন এক উপন্যাস নিয়ে এসেছিল। ইণ্ডিয়ার ওপর লেখা সেই বইটাতেই প্রথম আজকের সম্মানিত অতিথির নাম তিনি দেখেন। তবে তখন পড়তে পারেন নি কারণ 'আই জাস্ট নিউ দ্য অ্যালফাবেট্‌স দেন'। বেঁটে ভারতীয় ইণ্টেলেকচ্যুয়ালটি এতক্ষণ খুঁম হয়ে ছিলেন। এবার

তাঁর প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঠিকরে উঠে। কেন ভারতবর্ষের ওপর ইংরেজ ঔপন্যাসিকটি আর লেখেন না? তিনি কি মনে করেন ভারতীয় কণ্টেমপোরারি সীন লেখার যোগ্য নয়? আগে যে ইণ্ডিয়া দেখেছেন আর এখনকার ইণ্ডিয়ার কী তফাত? এখন কি তিনি মনে করেন ইণ্ডিয়া আরও অ্যাণ্টিব্রিটিশ? এই বলে, ভদ্রলোক নিজে কী মনে করেন সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সব কটা প্রশ্নেরই নিজে জবাব দেবার পর আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

ইংরেজ সাহিত্যিকটি তাঁর পোর্টফোলিওতে টোকা দিতে দিতে মাথা নাড়ান ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আর তাঁর সামনে চড়ুই পাখির মতো বেঁটে ভদ্রলোকটি লাফিয়ে লাফিয়ে কণ্টেমপোরারি সীনের ওপর বক্তৃতা করেন।

—আই হ্যাভ থট আই উড্ মিট সাম্ অব দ্য রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস্ হিয়ার। ইংরেজ লেখকটি নীচু গলায় বলেন হাই কমিশনের এক অফিসারকে। তারপর গলা পরিষ্কার করে বললেন, —বাট ওহাট অ্যাবাউট দ্য ইণ্ডিয়ান রাইটার্স?

বেঁটে বঙ্গসন্তানটি কাঁধ কুঁচকে বললেন,—ও, দে আর অল সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আই মীন্ দে আর নট টু বি টেক্‌ন্ সীরিয়াসলি।

মিসেস টিমথি বললেন,—ইউ রোট্ এ ফেমাস বুক অন্ ইণ্ডিয়া। টেল আস্ সামথিং এ-বাউট ইণ্ডিয়ান স্নেক্স্।

—হোয়াট? স্নেক্স? আই ওয়াজ মোর ইণ্টারেস্টেড ইন্ মেন।

বেঁটে বঙ্গসন্তানটি কিন্তু সাপ-প্রসঙ্গ লুফে নেন। স্যার রিচার্ড বললেন যে তাঁর এক কাকা উত্তর প্রদেশের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন 'ইন দ্য গুড ওল্ড ব্রিটিশ ডেস্'। একবার এক ডাকবাংলোয় বসতে গিয়ে দেখেন বেতের চেয়ারের সঙ্গে লেপ্টে আছে করাত সাপ। জি.ই.সি-র অফিসারটি এতক্ষণে কিঞ্চিৎ রসস্থ। তিনিও এ ধরনের পার্টিতে খুব অভ্যস্ত। তাঁর এক মাছ ধরার গল্প আছে, তিনি সেটা শুরু করেন।

প্রতাপ বার দুয়েক আগে শুনেছে গল্পটা। অনেক রাত পর্যন্ত পুকুরের ধারে বসে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর করুণা উদ্রেক করার জন্যে জলে ডুব দিয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মাঝরাতে বাড়ি ফেরার গল্পটা প্রত্যেক বারের মতো এবারেও জমে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সরতে সরতে প্রতাপ অ্যাট্‌কিনসনের কাছে ঘেঁষে এসেছে।—বাই দ্য ওয়ে, আর ইউ প্যাকিং আপ?

—ইয়েস, আই অ্যাম্ সরি প্রতাপ। আই শ্যাল্ পুট ইন এ ওয়ার্ড ফর ইউ টু স্যার রিচার্ড।

—সো দীননাথ ইজ কামিং?

—ইয়েস। হি ইজ এ ব্রিলিয়াণ্ট ম্যান।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রতাপ বলে,—ইট ইজ এ ট্রিজন।

—ডোণ্ট বি সিলি প্রতাপ।

এরপর চারপাশে কী ঘটছে প্রতাপ ঠিক শুনতে পায় না। রাত বাড়ে, স্কচের পরিমাণ বাড়ে, ইংরেজ লেখকটি ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছেন। সবাই পা দাপায় এবং মিসেস অ্যাটকিনসন ও টিমথি

সমস্বরে গান গায়,

হিপি আয় আয় আয়, হিপি আয়—
শি উইল কাম রাউণ্ড দ্য মাউণ্টেন্স, শি উইল কাম ;
শি উইল বি ওয়েরিং সিল্ক পাজামাস্, শি উইল কাম—
হিপি আয় আয়, হিপি আয় !

ভবনাথের বাড়িতে আবার মুখার্জীবাবুকে আনাগোনা করতে দেখা যায়। কালের ধারায় মুখার্জীবাবু তাঁর ধুতি-ঠেলে-ওঠা নেয়াপাতি ভুঁড়ি হারিয়েছেন। কিন্তু পরাক্রম অক্ষুণ্ণ। আবার মিষ্টি দই রাজভোগ খেতে খেতে স্বর্ণসুন্দরীকে আশ্বাস দেন এই অগ্রহায়ণের মধ্যেই বুড়ীর বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

—বয়সটা বেড়ে গেছে কিনা, সেই জন্যেই তাড়া দিচ্ছি, স্বর্ণসুন্দরী বললেন। সম্প্রতি তাঁর চুলের অর্ধেক সাদা এবং সেই দলমলে শরীরখানা কিছু শুকিয়েছে।

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মুখার্জীবাবু বললেন,—এ-রকম কেস আমরা হামেশাই করি। সমস্ত সমাজটার চেহারা দেখছেন না? তেইশ-চব্বিশ তো মিনিমাম বয়স মেয়েদের, তিরিশ পর্যন্ত কিছু আটকায় না। ও দিকের বয়সও তো বেড়ে চলেছে। কাল বাজারে গেসলুম। ঝিঙের দর বলে একটাকা, তবে?

বুড়ী পাশের ঘরে বসে তার বইয়ের তাক ঝাড়ে। নীচের তাক থেকে সযত্নে রক্ষিত ডলুর একতাড়া চিঠি বার করে ছাদের কোণে ছাইয়ের টিনের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর চান করে খেয়ে স্কুলে চলে যায়। ফেরার পথে ট্রাম থেকে না নামতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। গাড়িবারান্দার নীচে রিক্সাওয়ালা কুকুর খেলনার হকার আর স্কুলফেরতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে টুটুল দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ছাঁট এড়িয়ে ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে।

—সেই ঘোড়েলটা আবার আসাযাওয়া করছে, টুটুল বললে।

বুড়ী চুপ করে থাকে। একটা ভেজা পাটকেলি গোরু তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

—কী? কথা বলছিস না যে?

বুড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—আমি আর ভাবি না।……দিদির চিঠি এসেছে কাল। খোকন আর তানির কোলার্ড ছবি পাঠিয়েছে। খোকনটা কী সুইট! একটা হরিণছানার মতো!

—তুই রমেনকে বিয়ে করবি?

—ধ্যাৎ! বড্ড বুড়ো। বুড়ী হেসে ফেলে।

—আচ্ছা বুড়ী, না বিয়ে করলে হয় না?

—তুই বড্ড বাচ্চা আছিস টুটুল।

এ প্রসঙ্গে আর দুজনের মধ্যে কোন কথা হয় নি। টুটুল মনে মনে স্বীকার করে মেয়েদের ব্যাপারে তার অনভিজ্ঞতা। কিন্তু এমন কী হয়েছে বুড়ীর যে সেই ঘোড়েল বুড়োটাকে ডাকতেই হবে একথা ভেবে পায় না।

জিওলজিকাল সার্ভের অনিরুদ্ধ সোম, ক্যালটেক্সের রমেশ কর্মকার, আসামের চা-বাগানের বিপত্নীক ম্যানেজার জ্ঞানেশ দত্ত—এই ধরনের পাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ মারফতে মুখার্জীবাবুর দই আর রাজভোগ ভোজন যখন ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে এবং আবার একটা পারিবারিক অনিশ্চিতির ফাঁপরে যখন স্বর্ণসুন্দরী হাবুডুবু খাচ্ছেন এমনি এক বর্ষণমুখর বিকেলে বুড়ী এসে তার মাকে বললে,—মা, আর ভেবো না বিয়ে ঠিক করে এসেছি। এমন হাল্কাভাবে সে বললে যেন একটা শাড়ি পছন্দ করে এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—বুড়ী, তোর বয়স হচ্ছে। এখন আর ওরকম হাল্কামি সাজে না।

—বয়স হচ্ছে বলেই এক ছোঁড়াকে বিয়ে করছি। আমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে।

—সেটা তোমার জাঁক করে বলতে হবে না।

বুড়ী স্থির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে বলে,—না, জাঁক করার কথা নয়। কিন্তু সত্যি কথাটা আমি মানসের কাছে লুকোই নি। আমি বলেছি, আমার খাঁটি বয়স শুনলে ভড়কে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ও পিছোয় নি।

—আমার সব কটা মেয়েরই মাথা খারাপ, বড়টা ছাড়া, স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

—বড়দি তোমার হাতের পুতুল ছিল মা। আমি যাই হই মা, কারুর হাতের পুতুল হব না।

—মেয়েদের অমন গলা বাজিয়ে বলা সাজে না, ··

—কী হবে? কী হতে পারে? ডলুর সঙ্গে চার বছর যাতায়াত। ও চলে গেলেই কি আমি মরে যাব? আর তোমার এত আতঙ্ক কিসের? মানসের বয়স কম। বোধ হয় টুটুলের বয়স হবে। এখনও ও স্বপ্ন দেখে। বলে, মেয়েদের মধ্যে ক্যারেক্টার চায়। বলে, আমার মধ্যে নাকি ক্যারেক্টার আছে। কী জানি!

স্বর্ণসুন্দরী গম্ভীরভাবে বললেন,—জানিনে বাপু কার পাল্লায় পড়লি? লোফার-টোফার নয় তো?

—তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে তাই।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—না না, রাগ করিস নে বুড়ী। আমি ঠিক বুঝতে পারি না তোদের—তোকে না, চোঙাকে না, টুটুলকেও না। তোদের আমি সব ভয় করি। বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে।

বুড়ী তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—অতো ভাবছো কেন? আমাদেরও তো একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। যদি কোন লোফার বলে, বিয়ে করব তোমায়—সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়ব?

—ছেলে কী করে? স্বর্ণসুন্দরী ভয়ে ভয়ে বলেন।

—কিছু করে না মা, খালি একটা চাকরি করে। চোঙার মতো কেউকেটা নয়; টুটুলের মতো মহাপুরুষ নয়, বেচারা ছেলেমানুষ, আমার বড্ড মায়া হয়।

স্বর্ণসুন্দরী সন্তুষ্ট হলেন না। পাত্র মানেই যে আর্থিক প্রসঙ্গ তা ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারেন না। বুড়ী এত টগবগ করছে যে বিয়ে ব্যাপার নিয়ে সচরাচর যে শলাপরামর্শ করতে স্বর্ণসুন্দরী অভ্যস্ত তার পক্ষে খুব বেমানান লাগে। একবার সন্দেহ হয় সমস্তটাই মিথ্যে। ঘটকের হাত থেকে

বাঁচবার জন্যে সে একটা ফন্দি এঁটেছে কিনা বুঝতে পারেন না।

তার মায়ের বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বুড়ী মিটমিট করে হাসে। বলে,—মাইনের কথা বলছো তো? বেশী পায় না। সবজুড়ে ছশো সাতাশি টাকা তিপ্পান্ন পয়সা।

স্বর্ণসুন্দরী আহত হলেন। বললেন, আমি মাইনের কথাই ভাবছি না।

—ও বাড়ি? না কলকাতায় বাড়ি নেই। একেবারে কাঠ বাঙাল। দাদার ব্যবসা আছে। টিমটিম করে চলে। মানস একটা মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ করে। কী একটা কাজ—স্ট্যাটিসটিকাল অফিসার কি ছাতামাতা!

স্বর্ণসুন্দরী অপ্রসন্ন হয়ে বলেন,—তুই আসল খবরগুলোর ব্যাপারেই উদাসীন।

—না মা, আমি ভেবে দেখছি। মানস বলেছে, আরও বছর খানেক পরে হয়ত ভালো একটা ফার্মে চাকরি হতে পারে। কিন্তু আমি আর ওসব ভাবি না। যদি ইতিমধ্যে চাকরি যায়, যাবে। আমারও তো একটা চাকরি আছে, চালিয়ে নেব। বড়লোক বিপত্নীক বিয়ে করতে পারব না।

—যদি ঠিক করে বলতে পারে তাহলে একবছর অপেক্ষা করতে আপত্তি কী?

স্থিরভাবে তার মায়ের দিকে চেয়ে বুড়ী বললে,—আমি আর অপেক্ষা করব না।

স্বর্ণসুন্দরী এই পাগলামিতে অসন্তুষ্ট হলেন। তাছাড়া তাঁর নিজের দিক থেকেও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। মেয়েকে গুছিয়ে দিতে কে না চায়। আস্তে আস্তে বলেন,—প্রত্যেক মায়েরই ইচ্ছে থাকে মেয়েকে দেবার জন্যে।

বুড়ী আবার চোখ কুঁচকে হাসে। আস্তে আস্তে বলে, রেডিওগ্রাম, ফ্রিজ?

—না কেন?

—মানসের সস্তা একটা রেডিও সেট আছে। ওটাতেই চলবে। মানস বেশ বলে, জানো মা? রেডিও মানে তো দাড়ি কামাবার আবহসঙ্গীত। ভীষণ মজা করে কথা বলতে পারে। বলে, কী দরকার? ফ্রিজের জল খেলে ওর কাশি হয়। আমি ওর ওপরে কোন চাপ দিতে চাই না। আমরা বেশীর ভাগই ভুল করি। আসলে যেটা দরকার সেটা হল মজা পাওয়া, বুড়িয়ে না যাওয়া।

—বুঝবে বুঝবে, কত ধানে কত চাল, তা তো জানো না বাছা। এখন যা বলছো বলছো, দু বছর পর আমাকে কিন্তু দোষ দিও না।

—তোমাদের দোষ দেব না বলেই তো এমনভাবে বিয়ে করছি। এরপর যদি আমরা ঝগড়া করি, চুল-ছেঁড়াছেঁড়ি করি, জানব ওর মধ্যে তোমরা নেই।

—মুখার্জীবাবু বলেন কী জানিস, আজকাল বেশীর ভাগ মডার্ন বাড়িতেই আবার অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ফিরে এসেছে।

একটু চুপ করে থেকে বুড়ী বললে,—ঠিকই বলেন মুখার্জীবাবু। আমারই তো দুটো বন্ধুর বিয়ে হল গত ছ মাসের মধ্যে ঠিক ঐরকম ভাবে। বিয়ের আগে একটু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ভাব করিয়ে নিল। আমিও ভাবছিলাম এ পথেই হয়তো আমাকে যেতে হবে। মাঝখান থেকে মানস এমন লাফ দিয়ে আমার হাত ধরবে তা কি জানতাম! আমার আর কোনো ভয় নেই মা। খালি একটাই ভয়, ওর এই খোলা মনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়।

—মা নেই ? স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

—দাদা ছাড়া ত্রিভুবনে কেউ নেই।

—তুই যেমন পাগল, তোর সঙ্গে হয়তো ঠিকই মানাবে।

বুড়ীর তাড়া সত্ত্বেও তাকে আরও তিনচার মাস অপেক্ষা করতে হল। ফাল্গুনে বৃষ্টি এল, টপটপ করে মোটা মোটা কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া। মেরাপের কানা ওড়ে হাওয়ায়। ভবনাথের বাড়ির সামনে গাড়ির অরণ্য। অবশ্য উৎসবটা আসলে চোঙার জন্যেই। চোঙার বৌ-ভাত আর বুড়ীর বিয়ে স্বর্ণসুন্দরী একই দিনে ম্যানেজ করলেন। চোঙা ফিরেছে মাসখানেক হল। বিয়ে করতে কলকাতায় এসেছে। সম্প্রতি আমেরিকান কোন সাংস্কৃতিক না সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ডাইরেক্টার হওয়ায় টোকিও, ম্যানিলা কিংবা ব্যাংককে দপ্তরের ভার নেবে বিয়ের পরই। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে যখন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে অতিথি-অভ্যর্থনার জন্যে তখন তাকে চমৎকার দেখায়। এত উঁচুপদে সে প্রতিষ্ঠিত অথচ এত অমায়িক তার ব্যবহার—এমন ধরনের কথাবার্তা পাড়ার আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে প্রায়ই আলোচিত হয় আজকাল।

ভবনাথ বাড়ির বাইরে এসে অভিভূত হয়ে পড়েন। এ পাড়ায় এমন জাঁকালো বিয়ে আর হয় নি। নীল-সাদা কাপড়ের বনাতে ঢাকা একদিকের প্রায় সমস্ত ফুটপাথ। ওপরে মন্দিরের চূড়োর মতো তোরণ। আগাগোড়া অজস্র নীল বাল্বের স্নিগ্ধ মোলায়েম আলো। টেপ রেকর্ডে আলী আকবরের স্বরোদ। রবিশঙ্করের সেতার। যতদূর চোখ যায় রাস্তায় কাতার-দেওয়া গাড়ি। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র যে এত গণ্যমান্য তিনি আগে বুঝতে পারেন নি। তারপর একে একে অতিথিরা যখন আসতে শুরু করলেন তখন নিজেকে ভবনাথের কেমন যেন কুণ্ঠিত লাগে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন দুজন মন্ত্রী, আমেরিকান রুশ ইংরেজ দূতাবাসের লোকজন। বো-টাই-পরা লালমুখগুলো চিংড়ির মাথা চিবোচ্ছে দেখে তাঁর অতীতে ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ ভৌতিক লাগে। আর এসেছেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পুলিশ কমিশনার, দক্ষিণপন্থী বামপন্থী পনেরোটা রাজনৈতিক পার্টির রাঘা-বাঘা নেতা, মেয়র, প্রেসিডেন্টের পুরস্কার-প্রাপ্ত চিত্রতারকা, দাড়িওয়ালা তরুণ কবি। তামিল তেলুগু সভার প্রেসিডেন্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ভবনাথের মনে হয় সমস্ত বাংলা দেশটাই উঠে এসেছে।

কিন্তু ভবনাথের চেয়ে আরও ভৌতিক লাগে টুটুলের। আবার সেই পুরনো সত্যটা নতুন করে মনে আসে। বাংলাদেশের জলহাওয়ায় সব ধার ভোঁতা হয়ে যায়, বিপ্লবের ব্যাপারটা শুধু পুলিশের সঙ্গে রাস্তার সংঘর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর বেশীদূর ছড়ায় না। সবাই শেষ পর্যন্ত কিউ দিয়ে দাঁড়ায় বর্তমান অবস্থার তল্পিদার বাহিনীতে যোগ দিতে। কেমন এক ধরনের আত্মগ্লানিতে অভিভূত দেখায় তাকে। আজকের এত আলো উৎসব কলরব শুধু চোঙার বিজয় না, তারও পরাজয়। টুটুল টের পায় তাদের বছরের পর বছর রাস্তায় সংঘর্ষ বাংলাদেশের আসল চেহারায় কোন টোল খাওয়ায় নি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তের স্বপ্ন দেখেছে মাত্র। টুটুল গিয়ে পরিবেশনে হাত লাগায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লুচির চাঙারি আর মাংসের বালতি বাইতে বাইতে ঘামে ভিজে তার স্বাভাবিক চিন্তাগুলো মন থেকে সরে যেতে থাকে।

আর একজন খুব অবাক হয়। সে হল ভবনাথের নতুন জামাই। তার মাথায় টুটুলের মতো বিপ্লব নেই কিন্তু এত আড়ম্বর তার পছন্দ হয়নি। বিয়ের পর বুড়ীকে বলে,—তোমরা এত বড়লোক? আগে জানলে কিন্তু পিছিয়ে যেতাম।

বুড়ী তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে,—এগুলো কিছু না, সব শো। চোঙা শো ভালবাসে। তার চাকরি শো; বিয়েটাও শো।…আগে আমার ছোট ভাই টুটুলকে ভাবতাম পাগল। কিন্তু ওর পাগলামির মানে আছে। ওকে দেখলে, আমার বাবাকে দেখলে, বুঝতে পারবে আমরা কী, আমার কতকটা ওদের মধ্যে আছে।

মানস অস্পষ্টভাবে বলল, তোমার ছোট ভাই বোধহয় আমার সঙ্গে পড়ত কলেজে। কবিতা লিখতো না?

—হ্যাঁ, এখন অনেক পাল্টে গেছে।

আর একজন নবাগতও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। চোঙার বৌ রিতার ক্রমাগত নমস্কার করতে করতে পিঠ ধরে যায়।

—ডেনিস, মাই ওয়াইফ! চোঙার এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঢ্যাঙা আমেরিকান নমস্কার করবার অব্যবহিত পরেই স্থানীয় বামপন্থী এম-এল-এ পান চিবুতে চিবুতে বলেন,—আমরা সবাই বলি, অচিন্ত্যকে রোখা যাবে না। ও হু হু করে উঠবে। কী বলে, কী বলে যেন বাংলা কথাটা? ধূমকেতু, একজ্যাক্‌ট্‌লি ধূমকেতু! ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন।

তারপর চিত্রতারকাটি তাঁর স্থির কোমল দৃষ্টি চোঙার দিকে তুলে বললেন,—হাউ সুইট, ইউ আর লাকি অচিন্ত্য!

একজন বৃদ্ধ পাঁচটা রুপোর টাকা রিতার হাতে গুঁজে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ালেন,—আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাই। পেছন থেকে চোঙা বললে।

গরদের চাদর গলায় স্টেট এক্সপ্রেসের টিন হাতে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে প্রতাপ। সম্প্রতি দীননাথের জামানায় তিনজন উচ্চপদস্থ অফিসারের চাকরি গিয়েছে। তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা বসেছে সে পদে। প্রতাপের অবস্থাও টলমলে। আজ সন্ধ্যায় চোঙার এই জয়যাত্রায় নিজের কাছে নিজের অসহায়তাটা আরও বেড়ে যায়। রুশ ও আমেরিকান ভদ্রলোকদের দিকে এক নজর চেয়ে নিজেই মনেই বিড় বিড় করে পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে,—কী তাজ্জব ব্যাপার মশাই। বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়।

নিজের ভাই বলে বলছি না, 'চোঙা ইজ গ্রেট'! তারপর মহিলামহলের কাছে গিয়ে ডাক দেয়,—বনানী, বনানী, রাত হয়ে গেল।

ঘিয়ে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিতে উড়ু উড়ু বাদামি চুলে আত্মবিশ্বাসের পতাকার মতো চোঙা ঢোকে বাসরঘরে। রিতার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে,—তোমার মনে হয় না রিতা, লাইফ ইজ মীনিংফুল?

—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে, রিতা হাই তোলে।

বাইরে ফাল্গুনের হাওয়ায় এঁটো পাতা ওড়ে। কুকুর আর ভিখিরির চীৎকার বাড়ে।

তিন

গ্যাটম্যাট করে গোটা পার্ক পাক দেন ভবনাথ। তিনবার পাক শেষ না হতেই পার্কের কোণের বেঞ্চিতে স্থায়ী প্রাতভ্র্মণকারী বৃদ্ধের দল যাঁরা ঠুকঠুক করে এসে এতক্ষণ কোষ্ঠ পরিষ্কার বিষয়ে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় মগ্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে তারিণী চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠলেন। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন,—বয়সটা কমছে না বাড়ছে ?

—তুমি কি গ্ল্যাণ্ড ট্ল্যাণ্ড লাগিয়েছো নাকি ভবনাথ ? আর এক বৃদ্ধ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বলেন।

তারিণী চৌধুরীর দুই ছেলেই খুব কৃতী। একজন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, দ্বিতীয় ফিউয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টার। পার্কের গায়ে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। তা সত্ত্বেও তিনি ভবনাথকে আজকাল ঈর্ষা করেন। ভবনাথের দ্বিতীয় সন্তানের ছবি এবং তাঁর কীর্তিকাহিনী আজকাল বিদেশী কাগজেও ঘোষিত।

—"টাইমে" তোমার মেজো ছেলের ইন্টারভিউ বেরিয়েছে দেখলাম। তোমার তিন ছেলের মধ্যে ঐটাই তো ছিল মিডিওকার। আশ্চর্য !

ভবনাথ বিদেশী কাগজ পড়েন না। চোতার বিয়ের পর গত দু বছরে চিঠির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, এই একটা ব্যাপারই লক্ষ্য করেছেন তিনি।

—আর তোমার ছোট ছেলেটা ?

ভবনাথ বুঝতে পারেন টুটুলের প্রসঙ্গে তারিণী চৌধুরীর কৌতূহলের কারণ। ভালই আছে। আজকালকার ছেলেছোকরাদের ব্যাপার ! একটু হাল্কা করবার চেষ্টা করেন ব্যাপারটা।

—না না, এটা কোনো কথা নয়। তুমি কমিউনিস্ট হবে, তার মানে তো বৈরেগী নয়। ওকে তুমি বিলেত পাঠিয়ে দাও ভবনাথ।

তারিণী চৌধুরী আবার গলা ঝেড়ে বললেন,—প্রতাপের অবশ্য কিছু করার নেই। দীননাথ একটা স্কাউণ্ড্রেল। আর দু এক বছরের মধ্যেই ব্যবসা ফুঁকে দেবে। তবে প্রতাপের অবশ্য খুব এসে যাবে না; কী বলো ? ওর বৌ-এর নাম শিবানী না বনানী ? বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছে পার্ক সার্কাসে।

ভবনাথের মুখ ম্লান দেখায়। তারিণী চৌধুরী তাঁদেরই সার্ভিসের লোক। কিন্তু তাঁর কর্মদক্ষতায় সাফল্যের একেবারে শিখরে উঠেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন, অবসর গ্রহণের পরও আর কী কী সব করেছেন। কিন্তু অন্যের ঘা আঁচড়ানোর স্বভাব এখনও ছাড়তে পারেন নি।

মন্মথ বোস এবার উঠে আসেন। হাতে একখানা হলুদ রঙের কাগজ। পুলিশের প্রাক্তন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এখন গরদের পাঞ্জাবি আর গলায় কণ্ঠিতে একেবারে অন্য একটি মানুষ। মন্মথ বোস কাগজখানা ভবনাথের হাতে গুঁজে বললেন,—একদিন এসো না। এই গড়িয়াতেই আশ্রম।

—কোনো ভৈরবী-টৈরবী এনেছো নাকি মন্মথ ?

মন্মথ বোস তারিণী চৌধুরীর কথায় কান না দিয়ে বললেন,—সারা জীবনটা তো সংসার-সংসার করলে। আর কটা দিন ? এখন একটু ধর্মটর্মর দিকে নজর দাও। আর কোনো উদ্দেশ্য

নেই। নেহাত মনে একটু শান্তি পাওয়া, এই তো? এরই জন্যে তো এত কংগ্রেস কমিউনিস্ট! আসলে ব্যাপারটা কী? একটু শান্তি।

—ভব, তুমি ওদিকে যেও না। কদিন যেতে না যেতেই মন্মথ তার আশ্রমের জন্যে চাঁদা চাইবে।—তারিণী চৌধুরী বললেন।

ভবনাথ বললেন,—আমি চলি, আবার বাজার করতে হবে।

—তাই করো। এখন বাজার-সরকারি ছাড়া আর কী করবে? তারিণী চৌধুরী বলেন।

ভবনাথ জোরে জোরে পা ফেলতে ফেলতে শুনতে পান আর-এক প্রাতর্ভ্রমণকারীর মন্তব্য—ভবটা চিরকাল অসামাজিক হয়ে থাকল।

—ও ঐ রকমই! তারিণী চৌধুরী বললেন।

ভবনাথ যখন পার্ক থেকে বেরোলেন তখনও বেশ ফুরফুরে ভোরের হাওয়া—এ হাওয়ায় প্রত্যহের কলকাতাটা মন থেকে সরে যায়। এ হাওয়ায় স্মৃতি বড্ড এগিয়ে আসে। মুন্সীগঞ্জ ইদ্রাকপুর কোর্টের নীচে দিয়ে সুপুরি গাছের সারি, ভোলায় ঝোড়ো হাওয়ায় নারিকেল পাতার মাতামাতি, সদ্যভেজা ট্রামহীন নির্জন রাস্তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। ভবনাথ আরও জোরে জোরে হাঁটেন। ভোরে ইলিশ মাছের লরি আসে। সেটা আজ ধরতে হবে। ভবনাথ কাজ চান। পার্কের কোণে বার্ধক্যের অনিবর্তনীয় ফরমূলার মধ্যে তিনি পড়তে চান না। ডান হাত মুঠো করে কব্জিগুলি পাকান। এখনও সকালে রোজ স্যাণ্ডোপ্রবর্তিত হাত-পা সঞ্চালন তাঁর অব্যাহত। কিন্তু এই এনার্জির কোন রূপ না দিতে পেরে প্রবল বিমর্ষতা বোধ করেন মাঝে মাঝে। সরকারী স্টিল প্ল্যান্টে চাকরির জন্য মাঝখানে দরখাস্ত করেছিলেন, বয়সের দরুন আটকে গেল। আর যে বাড়ির জন্যে তিনি এই ভোরে ইলিশ মাছের ট্রাক ধরতে বেরিয়েছেন, সে বাড়িও তিনি টের পান ভেঙে যাচ্ছে। আর যত টের পান ততো মহিষের স্নেহ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার এক প্রতিমূর্তির মতো সংসারের ভার বইবার জন্যে কাঁধ পেতে ধরেন। জ্যেষ্ঠ সন্তানের অপরিসীম সুযোগ লাভ করেও প্রতাপের রামখোকামি তাঁকে আজকাল পীড়া দেয়। দীননাথের প্রবল আক্রমণে আহত প্রতাপ বাপের কাছে এসে মাঝে মাঝে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে। সে এক শৃঙ্খলিত দেবদূত, কেউ তাকে বুঝলে না,—না বাড়ির লোক, না বন্ধুবান্ধব। বিদেশে জন্মালে তার এলেম লোকে বুঝত। আর ছোটো ছেলের সঙ্গে তাঁর একেবারে বিপরীত সম্পর্ক। নিজের প্রসঙ্গ উঠলেই সে ফেটে পড়ে। ভবনাথ বুঝতে পারেন গত আড়াই বছরের ক্লান্তিকর কেরানী জীবনের আবর্তে সে ছটফটাচ্ছে, এক-আধবার কথাবার্তায় যে সে রকম আঁচ না দেয় তা নয়; কিন্তু তারপরই ঠাণ্ডা। আবার বেশ কিছুদিন তাকে এমন সুন্দর সমাহিত দেখায় যেন তার আর একটা-জীবন আছে; যে জীবন থেকে সে শক্তি সঞ্চয়ে মগ্ন। তার চেয়ে বুড়ী তাঁকে শান্তি দেয়। বিয়ের একবছর যেতে না যেতেই বুড়ী জননী। ছেলেটা গালফুলো টেবাটেবা। এ বাড়িতে এসেই ভবনাথকে সে অধিকার করে নেয়। এতক্ষণে ভবনাথের খেয়াল হয়। বুড়ী এসেছে, তার মানে—নাতির জন্যে শিঙ্গি মাছ। সামনে ফুটো ডোল ভর্তি নীলচে সবুজ কই জল ছিটকায়, পাশে ঝাঁকা থেকে নাক বের করে আছে ইলিশের ঝাঁক। ভবনাথ বিড় বিড় করেন।

খেঁাট কাট! শালাদের পুলিশে দেওয়া উচিত। এমনিতে ভব্য লোক কিন্তু মাছের বাজারে এলেই ভবনাথ কেমন মারমুখী হয়ে ওঠেন। আসলে বলাই চাপরাশীর হাতে দোলানো টকটকে লাল রুই বা মুন্সীগঞ্জে থালুইভর্তি পাবতা টেংরা চিংড়ির স্মৃতি এখনও অটুট। যুদ্ধপরবর্তী এবং আরও সাম্প্রতিক এই ক্লিন্ন কলকাতার জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি এখনও ঠিক ধাতস্থ নন।

কইমাছের ডোলের পাশে তুবার পাক খান ভবনাথ। পেল্লাই সাইজটা তাঁর স্মৃতি নড়ায়। ঘামে ভেজা ছুঁচলো মেছোর মুখে ভাবান্তর নেই।—বললাম তো, একদিন নিয়ে যান।

—তাই বলে দশ টাকা?

—পকেটমারও তো হয় স্যার। না হয় ভাবলেন পকেটমারই গেছে কয়েকটা টাকা।

নাতির জন্যে দুটো ল্যাংলেঙে শিঙি কিনে ঝপ করে একখানা ইলিশ মাছ কিনে ফেলেন। খাওয়ার লোক কমে গেছে একথা ভবনাথ এখনও মেনে নিতে পারেন নি। যেমন তাঁর বার্ধক্য মেনে নেন নি, তেমনি তাঁর পারিবারিক চেহারার পরিবর্তনও তাঁর কাছে অগ্রাহ্য।

মাছ হাতে ওপরে উঠে আসতেই স্বর্ণসুন্দরী ধমকান,—চাকরবাকর তো এখনও আছে!

—আমি মাইশ, আমি মাইশ! বলতে বলতে বুড়ীর ছেলে গামা ভবনাথের পা জড়িয়ে ধরে।

—দাদারে, তোর বিয়েতে কৈ মাছ আনব। নাতিকে কোলে তুলতে তুলতে ভবনাথ বলেন।

স্বর্ণসুন্দরী কুটনো কুটছিলেন। চড় চড় শব্দে মিষ্টি কুমড়ো কালি করতে করতে বলেন, —তোমার এখন চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।

গামার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ভবনাথ বলেন,—আমার জোনাকিই ভালো।

গামা ভবনাথের পাঞ্জাবি তুলে বলে,—এঃ ফোড়া।

ভবনাথ বললেন,—তা তো হবেই বাবু। তুমি কতদিন ডাক্তারি করোনি।

গামা দাদুর গা থেকে পিছলে নেমে পড়ে। পাশের ঘরে খট খট করে বেড়ায়। তারপর একটা পাউডারের কৌটো, হাতভাঙা চিরুনি আর একপাটি মোজা নিয়ে হাজির।

ভবনাথ পাঞ্জাবি ছেড়ে কাগজ পড়ছিলেন। কলকাতার রাস্তায় আবার পুলিশের সঙ্গে জনতার লড়াই চলেছে। ছোট পুত্র বোধহয় সেজন্যেই দেরি করে ফিরছে রাতে। ইংল্যাণ্ডের রানীর ছেলে হওয়ার খবর খুব ঘটা করে ছাপিয়েছে। সেদিকে মন দিতে না দিতেই ভবনাথের পিঠখানা ভিজে ওঠে।

গামার দিকে চোখ পড়তেই সে তার মুখখানা যতখানি সম্ভব সিঁটকে কৈফিয়ত দেয়, ইস্ নোংরা! গন্ধ! তারপর মোজা দিয়ে জল সাফ করতে থাকে।

এবার চুল আঁচড়াবার পালা। চিরুনি হাতে গামা ভবনাথের বুক বেয়ে ওপরে ওঠে আর পিছলে পড়ে। শেষে চেয়ারের হাতলে দাঁড়িয়ে পিঠে পেট লাগিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে।

হঠাৎ ব্যথা পেয়ে 'আঃ!' করে ওঠেন ভবনাথ। ঘন চুলে ঢাকা মাথার পেছনে হাত দিতেই একটা ছোটো আবে হাত পড়ে ভবনাথের। এতদিন খেয়াল হয়নি কেন ভেবে পান না। চিরুনির দাঁতে লেগে কস গড়াচ্ছে। অপ্রসন্নভাবে নাতির দিকে চাইতেই গামা হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে,—তুমি পচা! তুমি পচা!

স্নান করে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বুড়ী বেরিয়ে এসে বলে,—কী হল বাবা ?

—কিছু না কিছু না, একটা ফোড়ার মতো হয়েছিল মাথার পেছনে। একটু লেগে গেছে। কিছু হইনি রে দাদা! ভবনাথ রোরুদ্যমান নাতির দিকে হাত বাড়ান।

—কই দেখি, বুড়ী এগিয়ে আসে। ঘন চুল ফাঁক করতেই, একটা ছোটো তলতলে টিপলি আঙুলে ঠেকে।

—তুমি একবার ডাক্তার দেখাও বাবা।

—দূর, ও আপনা থেকেই সেরে যাবে!

দিন কুড়ি-পঁচিশ পরেও টিপলিটা গেল না। স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—ডাক্তার মুখার্জীর ছেলে এসেছে না বিলেত থেকে ? ওকে একবার দেখাও না।

—ওরা সব মডার্ন সার্জেন। ওদেরকে দেখাতেই ভয় করে।

তারপরও দশ-পনেরো দিন চলে যায়।

প্রাতর্ভ্রমণ, বাজার, খবরের কাগজে ভারতবর্ষ-পাকিস্তানের মধ্যে গণ্ডগোল, নাতির সঙ্গে খেলা, স্ত্রীর কাছ থেকে শ্বশুর মশাইয়ের তুলনায় তার বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবের প্রসঙ্গ এবং প্রতাপ এলে তার মুখে ক্রমাগত অনুযোগ—এরই মাঝখানে ভবনাথের দিন যেমন কাটছিলো তেমনি কাটে। কিন্তু বাদ সাধে টিপলিটা। সেটা নড়ে না, বোধহয় একটু বাড়েও। শেষ পর্যন্ত টুটুল বাপকে চেপে ধরে। বলে,—আজ তোমার বাজার থাক বাবা। আমি অমিয়র সঙ্গে কাল ফোনে কথা বলেছি। হাসপাতালে যাবার আগেই ও যেতে বলেছে। তখনও আটটা বাজেনি।

লম্বা কালো এফ. আর. সি. এস. অমিয় বাপের চেম্বারে বসেছে। দুবছর আগে হঠাৎ কিডনি পচে মারা যান ডাক্তার মুখার্জী। অমিয় কলকাতার বড় বড় সার্জেন এনেও ব্যর্থ হয়েছে।

কালো লম্বা, টুটুলেরই সমবয়সী অমিয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই কানের পাশ দিয়ে দু-চার গাছি চুলে পাক ধরেছে। আঙুল দিয়ে ভবনাথের মাথার চুল সরিয়ে সরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে অমিয়।

—আপনার তো জ্যাঠামশাই ডায়বেটিস নেই ?

ভবনাথ মাথা নাড়লে অমিয় বলে, তাহলে আর অসুবিধেটা কী ?

—আপনি কি কাটতে বলছেন ? টুটুল বলে।

—হ্যাঁ, ফেলে দেওয়াই ভালো। কোনোরকম গ্রোথ না রাখাই ভাল। কিছুই নয়, তাহলেও। ··
—ওটা জ্যাঠামশাই মাসখানেকের মধ্যেই ··

—তোমরা তো আবার হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করো না। ভবনাথ একটু ভয়ে ভয়ে বলেন।

—আমরা সায়েন্সে বিশ্বেস করি জ্যাঠামশাই।

ভবনাথ উঠে পড়লে অমিয় বলে,—জ্যাঠামশাই, ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারের ওপরে সব ছেড়ে দেয়। মনে করুন মরিবাণ্ড কেস্, কিন্তু সেখানেও ডাক্তার যদি ভাবেন পেটটা খোলার দরকার তাহলে পেশেণ্ট দ্বিধা করবে না। এইজন্যই ওদের দেশের প্রগ্রেস এত বেশী।

তারপর একটু থেমে বলে,—তা ছাড়া আপনার তো কিছুই না। ইউ আর হেল অ্যাণ্ড হার্টি। ইউ লুক বিলো ফিফ্‌টি।

—এটা তুমি বাড়াবাড়ি করছো অমিয়।

অমিয় একবার টুটুলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে,—আপনারা সব শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক। আপনারা যদি সায়েন্সে অবিশ্বাস করেন তাহলে দেশের লোকের কী অবস্থা হয় বলুন তো। তারপর দোর পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলে,—আপনি যাই করুন, হোমিওপ্যাথি করুন, জলপটি লাগান—এক মাসের মধ্যে মনস্থির করবেন।

ভবনাথকে নিয়ে পারিবারিক কনফারেন্স বসে সন্ধ্যেবেলা। স্বর্ণসুন্দরী ঠাকুরকে বলেন লুচি আর বেগুনভাজা চাপাতে। অনেক কাল পর মদনের আবির্ভাব। বেশ কয়েক বছরের একটানা ডায়বেটিসে শরীর শুকিয়ে পাকিয়ে একটা ছোট্ট পাখির মতো দেখায়। সম্প্রতি সে রিটায়ার করে নিউ আলিপুরে বাড়ি তুলেছে।

ছড়ি নাড়াতে নাড়াতে মদন বললে,– মায়ের ওখানে কাল এক আশ্চর্য হোমিওপ্যাথের খবর পেলাম। সেইজন্যেই ছুটে এলাম।

—মা মানে ঐ ছুকরী সন্ন্যাসিনী? প্রতাপ সিগারেটের টিন এগিয়ে দিতে দিতে বলে।

মদন লাফিয়ে উঠে বলে,—তোমার অফিস ডুবছে বলে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কাকে কী বলছো খেয়াল নেই।

স্বর্ণসুন্দরী এগিয়ে এসে বলেন,—তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই প্রতাপ। সবাই এসেছো, একটা কিছু স্থির করো। আমি আর কদ্দিন ম্যাও ধরব?

—দেখুন দেখি, মায়ের শয়ে শয়ে শিষ্য। আর তাঁর সম্পর্কে…

স্বর্ণসুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন,—কোন্ হোমিওপ্যাথের কথা বলছো?

—সবাই তো ব্যাবসা করে। এ লোকটা কিন্তু আশ্চর্য! গুরুমায়ের শিষ্য। ইয়ংম্যান, এম বি পাশ, তার ওপর হোমিওপ্যাথি করে। চেম্বারে কাতারে কাতারে লোক আসছে।

—বেশ তো, ওঁকেই আনো না। মিছিমিছি ছেঁড়াকাটা করে কী লাভ?

—ব্যবসা করে না সে আবার ডাক্তার কী? তার মানে অ্যামেচার। ওরকম অ্যামেচারদের দিয়ে চিকিৎসা হয় না।

মদন প্রতাপের একটা পাল্টা জবাব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় নতুন জামাই মানস আসে।

প্রতাপ বললে,—আশ্চর্য, আমাদের সব ফার্ম গুটোচ্ছে। আর তোমাদের কম্পানি নতুন নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে। কী ব্যাপার বলো তো? শ্যামলা ছোটোখাটো শরীরখানা কুঁকড়ে বসে মানস বেতের চেয়ারের কোণে। রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলে,—আমি অতো ব্যাপার জানি না। বম্বেতে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ খুলছে।

—তুমি যাচ্ছো নাকি?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি। বলেছে যেতে।

—আশ্চর্য! এখানে ভাঙছে ওখানে গড়ছে, প্রতাপ বললে।

—সবই মায়ের খেলা। মদন জোর দিয়ে বললে।

—ডোণ্ট বি স্টুপিড ! এগুলো সব লজ্ অব্ ইকনমিক্স ; এর মধ্যে মা কোথায় ?

দুদিন পর একখানা পায়রার ডিম-সবুজে ফিয়াট গাড়ি থেকে আঙুলে চাবি ঘুরোতে ঘুরোতে নামলেন এস. এন. চ্যাটার্জি।

এই নামেই চিকিৎসাজগতে তাঁর খ্যাতি। কয়েকদিন ভবনাথের সামান্য জ্বর। নাড়ি টিপে দেখলেন। চুল সরিয়ে মাথাটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,—ঠিক আছে।

ভবনাথ বললেন,—কেমন দেখছেন ?

—চমৎকার ! কোনো গণ্ডগোল নেই। সামান্য জ্বর। ওষুধ দিচ্ছি ; সেরে যাবে।

চ্যাটার্জির বয়স বোধহয় সাতচল্লিশ আটচল্লিশ কিন্তু বয়স অনেক কম লাগে। সাদা ট্রাউজারের ওপর হাতকাটা হাল্কানীল বুশশার্টে জ্বল জ্বল করেন চ্যাটার্জি তারুণ্যের দীপ্তিতে। আর আশ্চর্য সজীব চোখ দুটো। চোখ দুটোয় বাল্যকাল এখনও আটকে আছে।

ডাক্তারটিকে খুব ভাল লাগে স্বর্ণময়ীর। বলেন,—আপনার ওপরেই ভরসা। কোনো খারাপ-টারাপ কিছু নয়তো।

—কে বলেছে ? সব বাজে কথা ! এরকম কেস্ আমার চেম্বারে প্রচুর এসেছে। ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।

—খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কিছু বাধা আছে ?

—কিছু নেই। আপনার কী ভাল লাগে ? সর্ষেবাটার ঝোল ? বেশ তো, ভাল কইমাছ উঠেছে। ওঁকে সর্ষেবাটা দিয়ে কইমাছ দিন। এমন স্বস্থতায় ঝলমলে ছবি চ্যাটার্জি ডাক্তার যে অসুস্থ লোকের মানসিকতায় সুস্থ-অসুস্থের দুই শিবিরের প্রকাণ্ড ব্যবধান মুহূর্তে উবে যায়। পাশের ঘরে বসিয়ে ডাক্তারবাবুকে কফি খাওয়ান স্বর্ণসুন্দরী।

—কিছু খারাপ-টারাপ নয়তো ? টুটুল প্রশ্ন করে।

—দেখুন ক্যান্সার ইন্সটিটিউট থেকে আমার কাছে রোজ লোক আসে। ওরা কী করতে পারে ? একবার গিয়ে দেখে আসুন। একটা মানুষকে সমানে কেটে চলেছে। তারপর ছেড়ে দেয়।

—আজকাল তো রে-টে সব বেরিয়েছে।

—ওগুলোয় সাময়িকভাবে চাপা থাকে। আরও বেড়ে যায়। তখন আর কিছু করার থাকে না। অবশ্য আপনার বাবার ক্ষেত্রে এসব কথা ওঠেই না। দেখছেন না, চামড়ার কিরকম টেক্শচার ? পেশেণ্টকে পিস্‌মিলভাবে দেখলে চলে না।

দুদিন পরই জ্বর সারে। ভাবনায় স্বর্ণসুন্দরীকে শুকনো দেখাচ্ছিল। তিনি আবার স্বাভাবিক হন। আবার শনিবারের সন্ধ্যেবেলা ছেলে-জামাইদের নিয়ে ভবনাথের বাড়ি গম্‌গম্ করে। ভবনাথ রেগুার্সের টিকিট কাটেন। জ্যোতিষী দিয়ে ঠিকুজী গণনা করান। বৃহস্পতি ও শনির রেষারেষি চলেছে, তবে কেটে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যেই। স্বর্ণসুন্দরী পুরুত ডেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেন। ইতিমধ্যে আরও দুতিনবার এস এন চ্যাটার্জি এসে তাঁর তারুণ্যের প্রভা বিকীর্ণ করে যান। —চ্যাটার্জি লোকটা এত ভাল, এত আপনার করে নিতে পারে সবাইকে ; স্বর্ণসুন্দরী টুটুলের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন।

মাস দেড়েক পরে আবার জ্বর আসে ভবনাথের, সঙ্গে প্রচণ্ড অক্ষিধে। বাবাকে দেখে টুটুলের মনে হয় এই প্রথম তিনি কাবু হলেন। চ্যাটার্জির কাছে ঘন ঘন লোক পাঠান স্বর্ণসুন্দরী। ঘন ঘন ওষুধ পাল্টানো চলে। কিন্তু কাজ দেয় না। ভবনাথ খাবার উগলিয়ে ফেলতে থাকেন। তাঁর কালো স্বাস্থ্যবান সুগঠিত চেহারার চিক্কণ মোলায়েম দীপ্তি নিভতে থাকে। আবার কনফারেন্স বসে। প্রতাপ বললে,—আমি বলছিলাম না; চ্যাটার্জিটা ফ্রড। ব্যাটা ভালো চেহারা ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

টুটুল প্রস্তাব করে,—একবার অমিয়কে বাড়িতে ডাকি মা। আজকেই আমি ফোন করছি।

বুড়ীও বাপকে কদিন হল শুশ্রূষা করছে। সে টুটুলের কথায় সায় দেয়।

অমিয় এসে বললে আগামী রোববার কর্নেল রায়কে সে নিয়ে আসছে। সে নিজেও সঙ্গে থাকবে।

রোববারের দুদিন আগেই ভবনাথ সুস্থ হয়ে উঠলেন। অক্ষিধে চলে গেল। ভোরে টুকটুক করে ছাতে পায়চারি করেন। ভবনাথের ডায়বেটিস নেই, প্রেশার নেই, হার্টের গড়বড়ি নেই। কাজেই ছুরি চালাতে আপত্তি নেই।

তাঁর সুন্দর মোজেইক করা ঘরে সকাল দশটায় অপারেশান হল। ওষুধের গন্ধে সমস্ত দোতলা ভরপুর। খুব ফর্সা সৌম্য চেহারা কর্নেল রায়ের। দুঘণ্টা অপারেশনের পর যখন বাথরুমে টুটুল গোলা সাবানের বোতলটা উপুড় করে দেয় তাঁর হাতে, তখন কর্নেল রায় বলেন,—একটু বড় করেই করলাম। যদি স্টার্ট করে থাকে তাহলে কনটেন করা যাবে। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন,—সবই তো চেষ্টা, কী বলুন! দেখতে হবে চেষ্টা আমরা ঠিকমতো করেছি কিনা।

পরদিন বায়োপ্‌সি রিপোর্ট নিয়ে আসার কথা। টুটুলের অফিসে সেদিন ইউনিয়নের খুব কাজ। পুজোর বোনাস নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই চলছে সওদাগরী অফিসে অফিসে; তার সঙ্গে সরকারি অফিসে পে কমিশন বসানোর জন্যে লড়াই এক করার প্রোগ্রাম হয়তো শেষ পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের দিকে সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে যাবে। এই সব ব্যাপারে মিটিং এবং এই সব ব্যাপারে যে সব অনিবর্তনীয় ফরমুলা অর্থাৎ গেটমিটিং প্রস্তাব পাশ খবরের কাগজের অফিসে তা পৌছানো ইত্যাদি যাবতীয় কাজ থেকে অন্যান্য কর্মীদের আপত্তি সত্ত্বেও ছুটি নিয়ে টুটুল যথাসময়ে বাড়ি ফেরে।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কাছে এক ডাক্তারের ঠিকানা। বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। টুটুলের গা ঘেঁসে একটি তরুণ-তরুণী বেরিয়ে যায়। ধাঁ করে একটা ফুটবল এসে তার পশ্চাদ্দেশ আঘাত করে। এক ঝাঁক পানকৌড়ি লেকের দিকে উড়ে যায়। নতুন গাড়ির সামনে একটি স্থূলকায়া মাড়োয়ারী তরুণী তার সড়িঙ্গে ঢ্যাঙা চোঙাপ্যান্টপরা সঙ্গীটির সঙ্গে ঠোঙায় করে ফুচকা খায়। ডাক্তারের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে, 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, হে গরবিনী।'

টাকাটা দিয়ে সাদা খামখানা হাতে টুটুল নামে তিনতলা থেকে। দোতলার ফ্ল্যাটে দরজা খোলা। ভেতরে একটা সোফার পেছনেই যামিনী রায়ের গাঢ় নীল নর্তকীর ছবি। লাল প্রজাপতি-কাটা হলুদ-ফ্রকপরা দশ-বারো বছরের একটা রোগা মেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে গাইতে গাইতে বেরিয়ে

আসে, 'তুমি কি আমার কাছে আসবে? তুমি কি আমায় ভালবাসবে?' তারপর বিস্মিত টুটুলের দিকে চেয়ে মস্ত বড় জিভ কাটে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ছোট্ট এক লাইনের রিপোর্ট পড়ে টুটুল, 'ম্যালিগ্‌ন্যান্ট সেলস্ স্প্রেডিং টু অ্যাডজয়েনিং এরিয়াজ।'

[ক্রমশ]

স্বর্গের সোপান

অশোক রুদ্র

একটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত। পুরাকালে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিলেন যে কয়জন ক্ষণজন্মা পুরুষ, যুধিষ্ঠির তাঁদের অন্যতম এবং বোধকরি সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। প্রশ্নটা হোল, কোন্ সোপানপথে তিনি মর্ত্য হতে স্বর্গে আরোহণ করতে সমর্থ হলেন? তিনি কোন বস্তুময় সোপানপথে স্বর্গে আরোহণ করেননি। সুররাজ ইন্দ্র এসে তাঁকে তাঁর দিব্যরথে আরোহণ করিয়ে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। একথা অবশ্য আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা বস্তুগত সোপান সম্পর্কিত নয়। আমাদের পুরাকালের চিন্তায় স্বর্গ বলে একটি ধারণা আছে এবং পুণ্য বলে একটি ধারণা আছে, ধর্ম বলে একটি ধারণাপুঞ্জ আছে এবং ধর্ম বা পুণ্যকে স্বর্গের সোপান হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গারোহণ করতে দেওয়ার আগে কুকুরবেশী ধর্ম যে তাঁকে একটি অন্তিম পরীক্ষায় ফেলেন, সে পরীক্ষা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কোন্ ধর্ম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গেল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানতে হয় ধর্মই বা কী, স্বর্গই বা কী। মৎস্যপুরাণে আছে, "স্বর্গীয় নন্দনাদি মুখ্য দেবোদ্যান সকলও পুণ্যদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (১) ধর্ম ও পাপপুণ্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে শিবপুরাণে আছে, "অধর্ম ব্যতীত পাপ হয় না এবং ধর্ম ব্যতীতও পুণ্য হয় না।" (২)

মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, "শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম ও সাধু ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।" (৩) মহাভারতের অনুশাসনপর্বে পাচ্ছি, "মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং স্বর্গনরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্বক মুহূর্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে। এই সময় একমাত্র ধর্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সর্বদা ধর্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়।" (৪)

সুতরাং স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেতে হলে আমাদের ধর্ম অনুসরণ করতে হবে, পুণ্য অর্জন করতে হবে এবং কিভাবে পুণ্য অর্জন করা যায় বা ধর্মই বা কী তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; কারণ স্বর্গ যে অতিশয় কাম্য গন্তব্যস্থল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখা হয়নি। রামায়ণে মহাভারতে পুরাণে স্বর্গের বহু বহু বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এমন কোন ভিন্নতা নেই যার দরুন স্বর্গের স্বরূপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঠতে পারে। মহাভারতের বনপর্বে পাই, "ত্রয়স্ত্রিংশৎযোজন বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান লোকদিগের বিহারভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্বদাই পরমরমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। তথায় শোকতাপ জরা ও আয়াসের লেশ নাই।" (৫) শোকতাপ না থাক,

রিরংসার যে অভাব নেই, তার তৃপ্তির উপায়ও যে বর্তমান, তারও সাক্ষাৎ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন, "তথায় পৃথুনিতম্বিনী, সুচারুকেশা সুরনারীগণ হাবভাবাদিদ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদদ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে।" (৬) নহুষের ইন্দ্রত্বলাভের পর তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তিনি কখনও দেবোদ্যানে, কখনও নন্দনবনে, কখনও কৈলাসে, কখনও হিমালয়ে...কখনও সাগরে কখনও বা সরোবরে অপ্সরা ও দেবকন্যা সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।" (৭)

এহেন স্থানে কে না যেতে চাইবে? বিশেষ করে স্বর্গে না যাওয়া মানেই যখন নরক ভোগ। নরকেরও ভূরি ভূরি বিবরণ পুরাণে মহাকাব্যে পাওয়া যায়; সেখানে কি ধরনের যন্ত্রণা পাপীদের পেতে হয় তার বেশ ভাল ধারণাই কোন কোন ধরনের লোকচিত্র থেকে পাওয়া যায়: "কেহ কেহ একবিংশতি প্রকার, কেহ বা অষ্টবিংশতি প্রকার নরকের উল্লেখ করেছেন—যেমন তমিস্র, অন্ধতমিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি।" (৮) এই একবিংশতি বা অষ্টবিংশতি নরকের থেকে নিজেদের রক্ষা করে স্বর্গে যেতে আমরা স্বভাবতই আগ্রহী।

গোলমাল বাধে পথ নিয়ে। পথের নির্দেশ যে শাস্ত্রে দেওয়া নেই তা নয়, বরং সমস্যাই এই যে বড় বেশি দেওয়া আছে। "ধর্মের অসংখ্যদ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" (৯) কিন্তু দ্বারগুলিকে অন্ততঃ চিনতে তো হবে। কয়েকটা উদাহরণ নিলেই সমস্যা বলতে কী বোঝাচ্ছি তা একটু স্পষ্ট হবে।

অষ্টক মহারাজকে যযাতি বলেন, "তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।" (১০) যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু সর্প বলেন, "আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।" (১১) যযাতি-কথিত সাতটি দ্বারের ছয়টিই সর্পকর্তৃক অনুক্ত থেকে যায়: "যজ্ঞ অধ্যয়ন দান ত্যাগ ক্ষমা দম এবং আলোক।" (১২) এই অষ্টপ্রকার ধর্মের পথের নির্দেশ পাই মহাভারতের বনপর্বে, যাদের অধিকাংশই অন্য দুইটি নির্দেশের মধ্যে অনুপস্থিত। অন্য একটি আটটির তালিকা পাই উদ্যোগপর্বে। প্রজ্ঞা, সৎকুল, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভাসম্পন্ন করে। এই আটটি গুণ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ।" (১৩) নরকে যাওয়ার পথ, যা কিনা স্বর্গগামী পথের বিপরীতমুখী, তাদেরও অজস্র তালিকা পাওয়া যায়। যমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির জানান, "যে ব্যক্তি যাচমান আকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে, যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।" (১৪) একটি দীর্ঘতর এবং বৃহত্তর পরিধির পাপের তালিকা পাওয়া যায় কৌরবপক্ষীয় কিছু রাজাদের অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত একত্রে গৃহীত শপথে: "যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডকাহারী, শরণাগতপরিত্যাগী, অর্থিঘাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, স্বস্তধর্মাপহারী, শাস্ত্রবিহিতপথপরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং

মাতৃ-পরিত্যাগীদিগের যে লোক, যে ব্যক্তি মোহপরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে, যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক···আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব।" (১৫) রাম ভরতকে রাজ্যচালনা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় দ্বাদশ দোষের উল্লেখ করেন: নাস্তিকতা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের অদর্শন, আলস্য, পাপাচরণ, একাকী অর্থচিন্তা ইত্যাদি। এত দ্বার এবং এত পথের সমাবেশে একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে মনে হতে পারে কারও। নিষ্ক্রমণের পথপ্রদর্শন করা হয়নি কি? তাও হয়েছে। একদিকে পাই ধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা। যেমন, কৃষ্ণ বলেছেন, "উহা প্রাণিদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।" (১৬) উমার প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলেন "যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয় তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে।···যে ধর্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে।" (১৭) বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় তত্ত্বব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার বাসনা থাকলে পৌরাণিক সাহিত্য না, যার চর্চার প্রয়োজন তা আমাদের উচ্চমার্গের দর্শনশাস্ত্র।

কিন্তু আমরা উচ্চমার্গের দর্শনশাস্ত্রে আপাতত আগ্রহী নই। এটি একটি সাধারণ গৃহীত ধারণা যে পুরাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনধারা পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়ের মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মোপদেশদ্বারা গভীর ও ব্যাপক ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে, বেদবেদান্ত ষড়দর্শন ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রালোচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব সীমাবদ্ধ থেকে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক উচ্চবর্ণভুক্ত অংশের মধ্যে। আজকের ভারতবাসীদের মধ্যে ভাল কী মন্দ কী উত্তম কী অধম কী সেই সম্পর্কে ধারণা ও ব্যবহারের উৎস সন্ধান করতে পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়েই প্রবেশ করতে হবে মনে হয়। এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, এই উৎস সম্পূর্ণই আমাদের বর্তমান আলোচনার পশ্চাৎপট, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ সম্পর্কিত প্রশ্নটি তুলনায় গৌণ।

কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেই অসংখ্য ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্মটি শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের অসংখ্য দ্বার ও পথের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুগম, সে বিষয়ে অনেক ঘোষণা আছে। মুশকিল হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধর্মকে বিভিন্ন স্থানে "শ্রেষ্ঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একের অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। উদাহরণতঃ, আদিকাণ্ড রামায়ণে (ও অন্যান্য অসংখ্য জায়গায়) পাই "ত্রিলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই।" (১৮) মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে "পণ্ডিতেরা প্রাণিগণকে হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন।" (১৯) পুরুর রাজ্যাভিষেককালে যযাতি যে উপদেশ দেন তাতে বলেন, "জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, জ্ঞান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম আর লক্ষ্য হয় না।" (২০) "যদি ধর্ম পরিত্যাগ করিতেও হয় তাহাও করিবে, তথাপি কোনক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না।" (২১)—এখানে ক্রোধজয়কেই শ্রেষ্ঠধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "অনৃশংস প্রধান ধর্ম।" (২২) "ত্যাগেই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম।" (২৩) বলেছেন ধর্মব্যাধ দ্বিজোত্তম কৌশিককে ধর্মব্যাখ্যাকালে। ব্যাসদেব বলেছেন, "তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখলাভ হয়।" (২৪) দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম আর কিছু নাই" বলেছেন শুকপক্ষী ইন্দ্রকে। আবার সেই অনুশাসনপর্বেই অগ্নিতনয় সুদর্শন

বলেছেন, "গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছু নাই।" (২৫) "যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য আর নাই।" (২৬) এই উক্তি আবার পাই অশ্বমেধিক পর্বে।

দেখা যাচ্ছে, শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে কোন ধর্মকে বিশেষিত করা হয়ে থাকলেও তো জেনে বিশেষ লাভ নেই। অন্যান্য অনেক ভাবে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায়, একটি ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ নেই, তা হল "সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নেই" এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার পরেই দেখা যাচ্ছে, নানা মুনির নানা মত; অথবা একই মুনি বিভিন্ন স্থানেকালে বিভিন্ন মত দিচ্ছেন।

আবার যেকোন একটি ধর্মকে যে বেছে নিয়ে অন্যগুলিকে ভুলে যাব তারও উপায় নেই। উশীনর রাজাকে শ্যেনপক্ষী বলেছে, "যে ধর্ম ধর্মান্তরবিরোধী তাহা কখনও ধর্ম নহে, পরস্পর-অবিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে অথবা উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনাপূর্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই অনুসরণ করিবে।" (২৭) এইরকম বিচার-বিশ্লেষণ মোটেই সহজসাধ্য নয়। সেজন্যই শাস্ত্রকারেরা বারবার বলেছেন, "ধর্মের গতি সূক্ষ্ম," "শাশ্বত ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।" (২৮) "যথার্থ ধর্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য।" (২৯) "ধর্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই।" (৩০) "প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে শুধু ধর্মতত্ত্ব জানাই যে যথেষ্ট নয় তা বোঝাতে একটি চমৎকার উপমার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে: দর্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড়ব্যক্তি সর্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্মজ্ঞ হইতে পারে না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রই সূপরসের আস্বাদ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্মের মর্মগ্রহণ করিতে পারেন।" (৩১) দেখা যাচ্ছে কোন ছকবাঁধা পথে চলে ধার্মিক হওয়া যায় না, ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তাতেও কুলোতে না পারে এবং সেরকম ক্ষেত্রের জন্য কৃষ্ণ বলেছেন: "কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়।" (৩২) প্রকৃতই ধর্মানুসারী যে তাকে সংশয়াকীর্ণ হতেই হবে, "সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের সম্ভাবনা নাই।" (৩৩)

ধর্মসংশয় থেকে নানাবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ধর্মে অনাস্থা। কর্ণ আক্ষেপ করেন, "ধার্মিক ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে ধর্ম ধার্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্মরক্ষণে যত্ন ও ধর্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয় ধর্ম আর নিয়ত ধার্মিককে রক্ষা করেন না।" (৩৪) অন্য একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ধর্মের বিধানের উদ্ধত অস্বীকার। "বলবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদয় দ্রব্যই পথ্য, সমুদয় বস্তুই পবিত্র, সমুদয় কার্যই ধর্ম এবং সমুদয় দ্রব্যই স্বকীয়।" (৩৫) এই ভাবে তুড়ি দিয়ে সমস্ত ধর্মমীমাংসা উড়িয়ে দেন যিনি তিনি কোন নাস্তিক নন, স্বয়ং বেদব্যাস, কুন্তীকে আপন কুমারীধর্মলঙ্ঘন করার পাপ বিষয়ে আশ্বস্ত করার মানসে।

কিন্তু আমরা অনাস্থা বা ঔদ্ধত্যের পথ নেবো না। আমরা ধর্মের অনেকত্ব ও বিভিন্নতার সম্মুখে দিশাহারা না হয়ে তাদের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিতে সমর্থ হব। অবশ্য শ্রেণীবিভাগ যে কিছুই শাস্ত্রেই করা নেই তা নয়। যেমন ভীষ্ম বলেছেন,

"পরহিংসা, চৌর্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ।" (৩৬) কিন্তু এজাতীয় শ্রেণীবিভাগ খুব সাহায্য করে না আমাদের। পশুহিংসা কী অর্থে শারীরিক পাপ? আমরা নিজেদের সুবিধের জন্য ধর্মগুলিকে তাদের চরিত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করে যে ফল পেয়েছি তা এইরকম।

প্রথমে একত্র করতে পারি একজাতীয় অতিশয় তুচ্ছ বিধিনিষেধকে যারা হাঁচি-কাশি-টিকটিকি জাতীয় কুসংস্কারের সমপর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে নূতন কিছু নেই, সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মধ্যেই এদের অল্পবিস্তর প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের কৌতুহল উদ্রেক করে যা তা এই যে, এই তুচ্ছ বিধিনিষেধগুলো, যা প্রায়শই সম্পূর্ণ অর্থহীন বা কৌতুককরও বটে, তারা সহাবস্থান করছে শাস্ত্রকারদের গম্ভীরতম ও গভীরতম ধর্মনির্দেশের সঙ্গে, যার ফলে ইংরাজিতে from the sublime to the ridiculous বলে যে চিন্তাদোষের কথা বলা হয়েছে সেই দোষ খুব বেশী পরিমাণে আমাদের পৌরাণিক ধর্মকথনকে দুষ্ট করে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত একটি পাপের তালিকা দিয়েছেন। তাতে "পাপীয়সী দাসীসম্ভোগ"-এর ঠিক পরেই আছে "সূর্যাভিমুখে মূত্রত্যাগ"; "গুরুহত্যা" যেমন আছে তারই সঙ্গে আছে "একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ" (৩৭) দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করাটা যে শুভফলপ্রদ নিশ্চয়ই হতে পারে, তা আমরাও জানি, কিন্তু গার্গ্য যখন তাকে "মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম" (৩৮) বলে বর্ণনা করেন তখন আশ্চর্য হতে হয়। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলে অভীষ্ট গতি লাভ হয় তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু "যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হয়েন" (৩৯) তাঁকেও একই সঙ্গে সেই গতি প্রতিশ্রুত হয়েছে। এসবের চেয়েও অনেক তুচ্ছ কারণে যে আমরা ঘোর নরকের অধিবাসী হতে চলেছি তা কি আমরা জানতাম? দেবীভাগবতে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, "অপরের নিদ্রাভঙ্গ, কাহারও কথার মধ্যে বাধা দেওয়া, দম্পতির প্রণয়-বিচ্ছেদ, মাতা হইতে শিশুকে পৃথক করা, এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যাতুল্য।" (৪০)

এইসব তুচ্ছ বিধিনিষেধের আগাছা অতিক্রম করার পরই আমরা সম্মুখীন তিনটি প্রধান ধর্মের —যাদের আমরা "আদিম নিষেধ" বলে অভিহিত করব এবং এই বাক্যব্যবহার দ্বারা ইংরাজিতে যাকে taboo বলে মোটামুটি তাই বোঝাব। সমাজকে ধারণ যা করে তাই ধর্ম,—অধিকাংশ ধর্মেরই মূল অনুপ্রেরণা কোন একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার গাঁথুনিকে দৃঢ়বদ্ধ রাখা। কিন্তু ওদেরই মধ্যে দেখা যায় তিনটি বিশেষ নিষেধ, যা সমাজসৃষ্টির একেবারে আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় সব সমাজেই বলবৎ রয়েছে। এই তিনটি হল হত্যার নিষেধ, পরস্বাপহরণ নিষেধ, এবং পরদারগমন নিষেধ। ইচ্ছানুযায়ী হত্যাকে নিবারণ না করলে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনই অসম্ভব। অন্য দুইটি নিষেধের ভিত্তি ব্যক্তিগত মালিকানা। পরদারগমনের ভিত্তি—সভ্যতার আদিমকাল থেকে যে-কোন স্ত্রীকে কোন এক বিশেষ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখা। এই ত্রিবিধ নিষেধ খ্রীষ্টধর্মেও একই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কিন্তু Bible শুধুমাত্র *"thou shalt not kill"*, *"thou shalt not commit adultery"* এবং *"thou shalt not steal"* বলেই ক্ষান্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্যই মনে হয় এই যে নিষেধ অমান্য করার পাপের গুরুত্বকে

ক্ষেত্রনির্ভর করা হয়েছে। এমন কি, এমন ক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করা আছে যেখানে নিষেধ লঙ্ঘন করায় পাপ একেবারেই হয় না (এ জাতীয় ব্যতিক্রমের অনুমোদনের জন্য হয়তো আমাদের এই নিষেধগুলিকে taboo বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয়)। উদাহরণতঃ, হত্যা পাপ, কিন্তু সর্বাধিক পাপ গোহত্যায় এবং ব্রহ্মহত্যায়। স্ত্রীহত্যার নিষেধের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুরুহত্যাও বিশেষ উল্লেখ পায়। তেমনি পায় ভ্রূণঘাতকতা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শত্রুবিনাশই ধর্ম। পরস্বাপহরণ পাপ নিঃসন্দেহ, কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণ বিশেষরূপে পাপ। আবার কোন কোন পাপের শাস্তি হিসাবে পাপাচারী ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের হত্যাও অনুমোদিত হয়েছে, যেমন দেবীভাগবতে (৪১)। তেমনি, "গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করাকে চৌর্যদোষমুক্ত বলে বলা হয়েছে। পরস্ত্রীগমন (বা পরস্ত্রীগমনচিন্তা)-ঘটিত পাপকেও যতরকমের বিশেষ সম্পর্কের পরস্ত্রী হতে পারে তাদের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে: যেমন ভ্রাতৃবধূগমন, পুত্রবধূগমন, মিত্রবধূগমন, বিমাতৃগমন, গুরুপত্নীগমন (এবং হরণ), রাজপত্নীহরণ (গমনোদ্দেশ্যে) ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে গুরুপত্নীগমনের উপর। শেষোক্তকে বলা হয়েছে মহাপাতক, পরদারগমন সাধারণভাবে উপপাতক। যে নিষেধাজ্ঞা যত বেশীবার উচ্চারিত হয়েছে তার সামাজিক প্রয়োজনও সেই পরিমাণ অধিক ছিল—এই যুক্তি যদি মানা যায় তো ধরে নিতে হয়, যত প্রকার পরস্ত্রীরতির চর্চা পুরাকালে হত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হত শিষ্য ও গুরুপত্নীর প্রণয়। এই ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের তটস্থ হয়ে থাকতে হত মনে হয়। যখন তাঁরা জপতপ বেদপাঠ সামগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং পুণ্যবতী নারীদের ঋতুকাল ছাড়া অন্যসময় স্বামিসম্ভোগ করা উচিত কিনা এইসব বিষয়ে পুঁথিপত্র লিখতেন তখন বোধহয় তাঁদের তরুণী ভার্যারা সমবয়স্ক শিষ্যদের সঙ্গে অধিকতর মনোরঞ্জনকর উপায়ে কাল অতিবাহন করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন।

পরস্ত্রীগমন ছাড়াও সমাজমাত্রেই আরও অনেকগুলি যৌনসম্পর্কঘটিত নিষেধ থাকে, আমাদের পৌরাণিক সমাজেও ছিল। যেমন, ভাগনীগমন, পশ্বাদির সঙ্গে মিথুন, বলাৎকার, আপন কন্যার কৌমারাবস্থা দূষিত করা, কুমারীকন্যাদূষণ, দাসীসম্ভোগ ইত্যাদি। বেশ্যাসক্তির উল্লেখও দু-চার জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু পুণ্যকর্মের পুরস্কার হিসেবে অপ্সরাসংসর্গ যে ভাবে প্রতিশ্রুত হয় এবং উৎসবাদিতে সুসজ্জিতা ও সুন্দরী বারনারীদের ভূমিকা যে রকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণিত হয় তাতে মনে হয় না যে বেশ্যাসংসর্গকে খুব হেয় চক্ষে দেখা হত। অবশ্য "নিজকন্যাদ্বারা জীবিকা অর্জন"কে খুবই দূষণীয় মনে করা হত। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ যৌননিষেধের অনুপস্থিতি মনে প্রশ্ন জাগায়। সমকামিতার কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না—এর থেকে কি ধরে নেবো যে এই বিশেষ যৌন সম্পর্কটি পৌরাণিক ভারতবর্ষে অনুপস্থিত ছিল?

আর কয়েকটি যৌনবিধি বিশেষরকমভাবে ভারতীয়। যেমন ঋতুকালে ভার্যাগমন। স্ত্রীর ঋতু বৃথা যেতে দেওয়াটা এতদূর অকর্তব্য মনে করা হত যে ঋতুকালে মাত্র ভার্যাগমন করাটা ব্রহ্মচর্য ধর্মের অন্তর্গত ছিল (মহাভারতের অনুশাসনপর্ব [৪২] দ্রষ্টব্য)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, জনকবংশের রাজা স্বীয় পত্নী পীবরী ঋতুমতী হলে তার ঋতুরক্ষা না করে দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ীতে আসক্ত হন। এই পাপের দরুন ঘোর নরক ভোগ করেন। (৪৩)

যৌনবিধিদের মধ্যেও যে বর্ণাশ্রমঘটিত ভেদচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং শূদ্রের ব্রাহ্মণীগমন যে ঘোর পাপ হিসেবে বর্ণিত হবে কিন্তু উচ্চকুলের পুরুষের যে নীচকুলদাপি রমণীরত্নসম্ভোগকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হবে তা সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু ব্যতিক্রমই ভারতীয় ধর্মচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, অন্তর্বিরোধই আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সুতরাং একদিকে যেমন নির্দেশ পাই, "যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগ-পূর্বক নিকৃষ্ট জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থলে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন।" (৪৪) অপরদিকে পরস্ত্রীকামীরা পুলকিত হবেন জেনে যে, "অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রীসম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না।" (৪৫) অর্থাৎ কিনা বলাৎকার না করা পর্যন্ত পরদারসম্ভোগে কোন পাপ নেই।

এই তিনটি মুখ্য আদিম নিষেধের পাশাপাশি আরও কিছু নিষেধ প্রতি সমাজেই থাকে; যেমন আদিম নিষেধের অন্য এক বিষয়বস্তু ভক্ষ্য দ্রব্য। বর্তমান যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দৈনিক জীবনে ধর্ম বলতে খুব বড় অংশেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধ বুঝিয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক ধর্মশিক্ষায় এই বিশেষ নিষেধগুলির উপর কত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সুরাপান, মদ্যভক্ষণ ও মদ্যবিক্রয় দোষ হিসেবে নিন্দিত হয়েছে কোথাও কোথাও, কিন্তু খুবই ক্ষীণ ভাবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার বিষয় শুধু এই যে মদ্য মাংস বাদ দিয়ে অন্য দ্রব্যের উপরও তো নিষেধ আরোপিত হতে পারত। মদ্যভক্ষণ ও সুরাপান খুব নিন্দিত হয়নি এই কারণেই যে সে যুগে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যেও এদের প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে জতুগৃহদাহের পরিকল্পনায় পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীকেও মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য করানোর কথা ভাবা হয়েছিল এবং যদুবংশ ধ্বংস হল যে লজ্জাকর ঘটনায়, তার সূত্রপাতে ছিল সম্মিলিত স্ত্রী ও পুরুষের মদ্যপানে উন্মত্ততা।

আদিম নিষেধের পরই উল্লেখ করতে হয় সেই শ্রেণীর ধর্মদের যাদের বলা যেতে পারে 'আদিম মন্ত্র'। 'মন্ত্র' দ্বারা আমরা এখানে বোঝাচ্ছি মোটামুটি ভাবে তাকেই যাকে ইংরিজিতে বলা হয় magic। এক ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড যাদের অনুশীলনে স্বর্গ বলা যাক, পরমগতি বলা যাক, সিদ্ধি বলা যাক, জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা "short cut" পথে অর্জন করা যায়। বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা এই যে এইসব ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বালাই নেই, যা আছে তা মানুষে প্রকৃতিতে সম্পর্ক। অর্থাৎ কিনা এগুলো যেন স্বর্গারোহণের যন্ত্রচালিত সোপান বিশেষ। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে এই জাতীয় যান্ত্রিক সোপানের প্রধান উদাহরণ হল যজ্ঞ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধন, মন্ত্রজপ, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য এবং শৌচ।

যজ্ঞকে একদিকে উৎকৃষ্টতম কার্য বলা হয়েছে, অপরদিকে আবার বলা হয়েছে "যেমন পঙ্ক-দ্বারা পঙ্কক্ষালন করা যায় না এবং সুরার কণামাত্রে অপবিত্র হইয়া কোন সামগ্রী প্রভুত সুরায় পবিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যজ্ঞাদিদ্বারা প্রাণিহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব।" (৪৬) তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো, যে কোন অভীষ্ট বর উদ্দিষ্ট দেবতার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া যেতো, পরন্তু এমন কোন পাপ নাই যা এই যন্ত্রদ্বারা পরিশোধিত করা না যেতো। "মদ্যপায়ী, চৌর্যনিরত,

ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্টগতি লাভ করিতে পারে।" (৪৭) কিন্তু "তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ।" (৪৮) অর্জুনকে গন্ধর্বরাজ বলেন, "ব্রহ্মচর্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম। তুমি সেই ধর্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে পরাজয় করিয়াছ।" (৪৯) ইন্দ্রিয়দমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "দমগুণ দান যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (৫০) ইন্দ্রিয়দমনের উপর যে প্রচণ্ড গুরুত্ব আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে দেওয়া হয়েছে তা আমাদের সুবিদিত। তবু আবারও লক্ষ্য করে দেখতে পারি যে, মহাভারতের সবচেয়ে শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত চরিত্র যুধিষ্ঠির নন যিনি সদা সত্য কথা বলতেন এবং সর্বপ্রকারের ধর্মানুষ্ঠান করতেন, কিন্তু ভীষ্ম যিনি ধর্মতত্ত্বে পারঙ্গম ছিলেন বটে কিন্তু যিনি অমরত্বের অধিকারী হয়েছিলেন ইন্দ্রিয়দমনের সত্য রক্ষা করে চলার জন্য। কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে গীতা বলেছেন, "বিচক্ষণ মনুষ্যগণ যত্নসহকারে বিহিত নিয়ম দ্বারা শরীর ক্ষীণ করিয়া ধর্ম লাভ করেন।"

মন্ত্র বা মন্ত্রবৎ ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে এসে আমরা প্রথমেই যে শ্রেণীর ধর্মের সম্মুখীন হই সেগুলো স্পষ্টতই কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে রাখার জন্য এবং সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসাধন করার উদ্দেশ্যে কল্পিত ও প্রচারিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর ধর্মকে আমরা 'শিষ্টাচার' বলব। শিষ্টাচারের সর্বপ্রধান উদাহরণ বর্ণাশ্রমধর্ম ও স্ত্রীধর্ম। অতিথিসেবা, গুরুসেবা, বৃদ্ধের সেবা, স্বজনতোষণ, ব্রাহ্মণের সেবা, বিবাহ করা, পুত্রোৎপাদন, উপযুক্ত সময়ে কন্যাসম্প্রদান করা—এসবেরই পৃথক উল্লেখ ও আলোচনা পাওয়া যায় কিন্তু এদের অধিকাংশই গার্হস্থ্য ধর্মের পর্যায়ভুক্ত। শিষ্টাচারের মূল লক্ষণই এই যে এই ধর্ম সার্বজনীন নয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ধর্ম নির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণের বেদপাঠ কর্তব্য, শূদ্রের বেদপাঠ বা শাস্ত্রচর্চা পাপ; এমনকি শূদ্রদের কোন উপদেশ দেওয়াও পাপ। স্ত্রীধর্মের সারাৎসার নিম্নলিখিত কয়েকটি বাক্যে বিধৃত করা যায়: "স্ত্রীগণের ভর্তাই, মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তারা ভর্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামিনী হইবে।" (৫১) ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম—এসব ধর্মেরই স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়; শুধু তাই না, শিষ্টাচার ধর্মের আপেক্ষিকতা এতই যে অবস্থাভেদেও ধর্মের ভেদ হয়; ফলতঃ বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম একপ্রকার, অবিপন্নব্যক্তির ধর্ম অন্যপ্রকার, আপদ্ধর্মও ভিন্নতর। (এই প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব, পূবার্ধ [৫২] দ্রষ্টব্য)। আপদ্ধর্মের একটি লক্ষণ, "বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম নির্দিষ্ট থাকিলেও আপৎকালে তাহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে।" (৫৩) অবশ্য নীচবর্ণের ব্যক্তিরা কখনও এই ব্যতিক্রমের অধিকারী হয়েছে বলে মনে হয় না। নীচেদের চিরতরে নীচে চেপে রাখার জন্য নীচজাতির সেবাকেও পাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দানকে পুণ্যকর্ম হিসেবে খুবই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, কিন্তু দানকেও শিষ্টাচারের মধ্যেই শ্রেণীভুক্ত করা উচিত, কারণ তা বর্ণধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রতিগ্রহকে ব্রাহ্মণের ধর্ম মনে করা হয়েছে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা পাপ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় দান করবে, ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে।

ধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে অমিলের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপন করেছি। অতএব

আশ্চর্য হতে হয় না যখন দেখি বলা হচ্ছে, "সমুদয় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্মের উৎপত্তি হয়।" (৫৪) শিষ্টাচারের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেও যে এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হবে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দান বা অতিথিসেবা তো পরমধর্মের স্থান শাস্ত্রের কোথাও না কোথাও পাবেই, কিন্তু সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এমনও বলে বসেন, "সন্তানই পরমধর্ম। কি তপস্যা কি যজ্ঞ কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না।" (৫৫)

কিন্তু আচারের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রেই এমন অনেকগুলি চারিত্রিক গুণ বা অনুশীলনের উপর যাকে আমরা বলব 'শীল'। সব ধর্মেরই মূল প্রেরণা বোধ করি বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করা, কোন কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসাধন। কিন্তু ধর্মের ক্রমবিকাশের একটি মূল লক্ষণই মনে হয় তাদের উপর প্রত্যক্ষ গোষ্ঠীস্বার্থের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, তাদের উত্তরোত্তর আপাত দৃষ্টিতে কোন স্বার্থগন্ধহীন হয়ে ওঠা। শীল বলত যেসব চারিত্রিক গুণের কথা বা অনুশীলনের কথা বোঝাচ্ছি তারাও অবশ্যই কোন একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার শোষক, শোষিতের সম্পর্ককে অপরিবর্তিত রাখার সহায়ক ছিল। তবু শিষ্টাচারের সাথে শীলের এইখানেই বিরাট প্রভেদ যে শীলগুলি আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থগন্ধবিহীন।

আমরা পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে যে সব শীলের উল্লেখ পাই তাদের একত্র করলে মোটের উপর এরকম দাঁড়ায় :

সত্যপরায়ণতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, নির্বৈরতা, দয়া শরণাগতকে আশ্রয়, অনুগ্রহ, শরণাগত শত্রুকে রক্ষা, সর্বভূতে দয়া, সর্বলোকহিতৈষণা, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অপরাধী ব্যক্তিদের প্রতিও স্নেহদৃষ্টি, ন্যায়ানুগত্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য, শম, দম, নির্লোভ, নিরাসক্তি, ক্রোধজয়, ক্ষমা, ধৈর্য, অদ্রোহ, অকৃপণতা, অনসূয়া, অহংকারশূন্যতা, মৎসরহীনতা, শ্রী, মৈত্রী, লজ্জা, সন্তোষ, সরলতা, আয়, সমদৃষ্টি, তিতিক্ষা, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সংযম, পরাক্রম, সেবা, পরোপকার, উপকারের প্রত্যুপকার, কৃতজ্ঞতা, শান্তি, মৃদুভাব, বিনয়, নিস্পৃহতা, সহিষ্ণুতা, বিদ্যা, অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, ধার্মিকের শুশ্রূষা, ভৃত্যদের কষ্ট না দেওয়া, বৃদ্ধ গর্ভবতী নারী প্রভৃতিদের প্রতি কৃপাশীল ব্যবহার ইত্যাদি।

অপরদিকে দোষের তালিকায় উপরিউক্ত গুণগুলির বিপরীতগুলিকে বাদ দিলে পাই অভিমান, কৃতঘ্নতা, শাঠ্য, নিন্দা, অদূরদর্শিতা, অনিষ্টচিন্তা, অভিমান, নাস্তিকতা, পরকৃতকার্যকে আত্মকৃত বলে বলা, আলস্য, মোহ, মায়া, গর্ব, বিষয়তৃষ্ণা, অবজ্ঞা, ঔদরিকতা, পরনিন্দাশ্রবণ, বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রামঘাতকতা, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, পরস্ত্রীকাতরতা, দম্ভ, দ্বেষ, আত্মশ্লাঘা, প্রবঞ্চনা, বাক্‌পারুষ্য ইত্যাদি।

এই দুই তালিকার মধ্যে বর্তমান লেখকের কাছে সবচেয়ে বেশী যা আশ্চর্যকর লেগেছে তা হল ভৃত্যদের সম্বন্ধে এবং কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নারীদের সম্বন্ধে যে অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে। এই তীব্রতম রকমে পুরুষশাসিত ও শ্রেণী ও জাতিভেদে বিভক্ত সমাজেও যে নিয়মসৃষ্টিকর্তারা ভৃত্যদের ও নারীদের সম্বন্ধে এতটা অনুগ্রহপরায়ণ হবেন যে বলবেন, "পথিমধ্যে যাবৎকাল ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার না হয় তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে, বধির, স্ত্রী, ভারবাহ ও রাজারা ক্রমান্বয়ে গমন করিবে।" (৫৬) অথবা "ভৃত্য ও অতিথিদের ভোজন না করাইয়া নিজের ভোজন।" (৫৭) বা "গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধজন অভুক্ত থাকিতে ভোজন।" (৫৮) বা "বেতন অপ্রদানে ভৃত্যের দ্বারা দুষ্কর

কর্ম নিষ্পাদন"—এদেরকে গুরুপত্নীগমনের তুল্য পাতক বলে মনে করবেন (৫৯এ ভরতের উক্তি দ্রষ্টব্য) তা জেনে একটু অপ্রত্যাশিত স্বস্তি পাওয়া যায় বৈকি।

শীলগুলিকে তালিকাবদ্ধ করার সময় আমরা গুরুলঘুভেদ উপেক্ষা করেছি, কিন্তু বলাই বাহুল্য এদের প্রত্যেকের উপর সমপরিমাণ মূল্য আরোপ করা হয়নি। বস্তুতঃ, একটু দেখলেই দেখা যায় যে কয়েকটি বিশেষ চারিত্রিক গুণের উপর অত্যন্ত বেশী গুরত্ব আরোপ করে তাদের সনাতন ধর্ম বা পরম ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; যদিও এও আমরা দেখেছি আগেই যে যতকটি ধর্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়েছে ততকটি নিশ্চয়ই একইকালে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। চূড়ান্ত মূল্য বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে ধর্মগুলিকে তারা হল সত্যধর্ম, দয়াধর্ম, অনৃশংসতা, ত্যাগ তথা বৈরাগ্য, ক্ষমাধর্ম। এদের মধ্যে সত্যধর্মের স্থান অবিসংবাদিতভাবেই আর সকলের উর্ধ্বে এবং সত্যধর্ম বলতে আমাদের শাস্ত্রে যা বোঝানো হয়েছে সেজাতীয় কোন ধর্মকে তুলনীয় কোন গুরুত্ব অন্য কোন ধর্মসভ্যতায় দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই কারণে, সত্যধর্ম স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে যে একটি ধারণার প্রচলন করানো হয়েছে যে সত্য ও অহিংসা (যাদের বর্বর অনুবাদ করা হয়েছে truth এবং non-violence এই দুই ইংরিজি শব্দে)—এই দুই হল ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম, তার কোন সমর্থন অন্ততঃ আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সত্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অহিংসাকে তা দেওয়া হয়নি, অহিংসাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা দয়া ত্যাগ ক্ষমা ও বৈরাগ্যকেও দেওয়া হয়েছে। শব্দব্যবহারের বিষয়েও এইটি লক্ষণীয় যে "অহিংস" কথাটি বর্তমান শতাব্দীতে যেরকম একটি মন্ত্রপূত কবচের স্থান পেয়ে গেছে তার কোন ভিত্তি পৌরাণিক সাহিত্যে নেই। সেখানে অহিংসা শব্দটি যতটা ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে বেশীই হয়তো হয়েছে অন্য অনেক শব্দ ও বাক্য—যেমন অনৃশংস্য।" (৬০) হিংসাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্তি (৬১) ইত্যাদি। বৈরাগ্য প্রসঙ্গে সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণীয় যা থেকে ধারণা হয় অধিক ভোগে বদহজমের মধ্যেই ত্যাগের ধারণার জন্ম: "কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশ পরিবর্ধিত হইতে থাকে। যদি একজন এই রত্নগর্ভ পৃথিবীর সমুদয় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট।" (৬২) কিন্তু ত্যাগ সম্বন্ধে গভীরতর চিন্তার উদাহরণও দু-এক জায়গায় পেয়ে যাই, যেমন ভীষ্মের "মানুষ ত্যাগদ্বারা ভোগশীল।" (৬৩) এই উক্তিতে ("তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই দার্শনিক তত্ত্বের কোন আভাস পাই কি এই পৌরাণিক উক্তিতে? ত্যাগ ও নির্লোভ স্বভাবতই সম্পর্কিত। লোভ সম্বন্ধ বলা হয়েছে, "স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ।" (৬৪)

দয়া সম্বন্ধে বাসুদেব বলেছেন, "সর্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় মানস পুত্র।" (৬৫) দয়ার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শরণার্থীর উপর, "শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়।" (৬৬) মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, "আর্তের পরিত্রাণে যাহার প্রবৃত্তি হয় না যজ্ঞ দান ও তপস্যায়ও তাহাকে কোন লোকেই সুখদান করে না।" (৬৭) এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন না উঠেই পারে না। এই ধরনের

বিশেষভাবে চিহ্নিত ক্ষেত্র ও অবস্থা বিশেষে প্রযোজ্য দয়াধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হয়েছে যে ধর্মকে, যাকে ইংরিজিতে বলা হয়েছে Love, তার সঙ্গে মিল বা অমিল কতটা আছে? অবশ্য ক্ষেত্রনির্বিশেষে দয়ার কথাও শাস্ত্রে আছে: সর্ব্বভূতে দয়া (৬৮), অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি (৬৯), শরণাগত শত্রুকেও রক্ষা (৭০), সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করা (৭১)। খ্রীষ্টীয় বিধানে ক্ষমাগুণের যে স্থান আছে তার সঙ্গেও আমাদের শাস্ত্রের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়· "ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম।" (৭২) বলেছেন কৃষ্ণ। "ক্ষমা-প্রদর্শন মহৎকর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বরূপ। ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে।" (৭৩) এসব সত্ত্বেও, বাক্যব্যবহারে সাযুজ্য খুঁজে পেলেও পুরাণপ্রসিদ্ধ এমন কোন ধর্মবীরের কথা কি আমরা মনে আনতে পারি যিনি love thy neighbour জাতীয় কোন ধর্ম পালনের দরুনই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন? বস্তুতঃ বুদ্ধের করুণা বা পরবর্তী কালের বৈষ্ণবদের প্রেমের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় love-এর কতটা মিল অমিল আছে তা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। কিন্তু পুরাণে ও মহাকাব্যদ্বয়ে খ্রীষ্টীয় love-এর কাছাকাছি কোন ধর্মই গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সার্বিকভাবে মিল না থাকলেও কোথাও কোথাও আকস্মিকভাবে এমন এক-একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় যা মনে হয় যেন এক অন্যের প্রতিধ্বনি। উদাহরণতঃ ভীষ্ম যখন বলেন, "ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না।" (৭৪) এমন কি যিশুর "As ye would that men should do to you do ye also to them likewise" এই বাণী মনে পড়ে যায় না?

ধর্মচেতনার উন্মেষের কোন একটা স্তর থেকে ধর্ম পুরস্কারনির্ভরতা থেকে ক্রমে ক্রমে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে শুরু করে। স্বর্গ ছাড়াও অন্য অনেক পুরস্কারের লোভ পুণ্যবানদের দেখানো হয়েছে। মাৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, "ক্রিয়া কৌশল সৌভাগ্য লাবণ্য—সমস্তই ধর্ম হইতে লাভ হয়।···বিচিত্র বিমান সুন্দরী অপ্সরা, তেজঃশীল শরীর এসকল পুণ্যবান জনগণই লাভ করিয়া থাকে···উত্তম অন্নপানীয়, নৃত্য, গীত, মাল্য, অনুলেপন, রত্ন, বস্ত্র এ সকল পুণ্যেরই ফল। পুণ্যবান মানুষেরাই রূপ ও ঔদার্য-গুণোপেত অতি মনোহর রমণীবৃন্দসম্ভোগ ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস লাভ হয়···। (৭৫)" কিন্তু এই পুরস্কার তো অতি স্থূল রুচি ও কল্পনার পরিচায়ক। সূক্ষ্মতর রুচি ও বিচারক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'যাঁহারা ধার্মিক তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখসাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত শাস্ত্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।" (ব্যাধ অর্জ্জুনকে উদ্দিষ্ট গৌতমীর বাণী ৭৬) পুরাণপ্রসিদ্ধ অনেক ধর্মবীরই ধর্মানুসরণের প্রেরণা হিসেবে স্বর্গসুখের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যে যশের ও কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ বনগমনে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হলে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে তিনি যত যুক্তি দেন তাদের একটি হল এই যে পিতৃসত্য রক্ষা করে তিনি যশের ভাগী হতে চান। কর্ণ বলেন, "আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্তিলাভ করিতে বাসনা করি। কীর্তিমান লোকই স্বর্গলাভ করে এবং কীর্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু কুকীর্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে।" (৭৭)

কিন্তু স্বর্গসুখও না, কীর্তিও না—কোন একটা স্তর থেকে ধর্মই ধর্মের পুরস্কাররূপে ধর্মপিপাসুর কাছে প্রতীয়মান হতে থাকে। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম একটি কথা বলেছেন যার মধ্যে এই ভাবটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত : "যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্মের বণিক কীর্তন করা যায়।" (৭৮) একই কালে তিনি বলেছেন, "একাকী ধর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য, ধর্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।" (৭৯) (এই ভীষ্মের বাণীর মধ্যে কি যিশুখৃষ্টের *"let not thy left hand know what thy right hand doeth"* এই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না ?) অর্থাৎ কিনা ধর্মের জন্য যশাকাঙ্ক্ষা যা কর্ণ চেয়েছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও চেয়েছিলেন, তা উচ্চতর স্তরের ধর্মের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিচ্যুত।

কিন্তু ধর্মের জন্যই ধর্মানুষ্ঠান করার মধ্যেও কি জীবনব্যাপী ব্যর্থতার বীজ থেকে যায় না ? এই সূক্ষ্ম প্রশ্নটি তুলে যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করেছেন আর কেউ নন, স্বয়ং বৃকোদর ভীম। "যে ব্যক্তি কেবল ধর্মের নিমিত্তই ধর্মোপার্জন করে সে অশেষ ক্লেশভোগী হয় ; যেমন অন্ধব্যক্তি সূর্যের প্রভা জানিতে পারে না তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্মোপার্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়।" (৮০) (এখানেও যিশুর একটি প্রসিদ্ধ বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি না ?—*"whosoever shall seek to save his life shall lose it and whosoever shall lose his life shall preserve it."*

ধর্ম যখন স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, ধর্মের জন্যই যখন ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্তি-নির্ভরও হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি সংশয়কালে ধর্মনিরূপণ করতে নিজের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতে পারে। যেহেতু সর্বজনসম্মত কোন কষ্টিপাথর সারা শাস্ত্র ঘেঁটেও পাওয়া গেল না। এবং এইভাবে একজন ব্যক্তির নিরূপিত ধর্ম অসৎ ব্যক্তিদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ ঠেকতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের অন্তিম পরীক্ষা, যা দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম, এবার তাইতে ফিরে আসা যাক। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম: "এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া, ধর্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" যুধিষ্ঠির প্রথমে "সুখসংবর্ধিতা পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ"কে ছেড়ে স্বর্গ যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইন্দ্র ওই কারণ গ্রাহ্য না করলে তিনি ওজর তুললেন, যে কুকুরটি তাঁকে অনুসরণ করে আসছিল তাকেও তাঁর সঙ্গে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিতে হবে। ইন্দ্র অনেকক্ষণ অনেক তর্ক করেও তাঁকে রাজি করাতে পারলেন না—যুধিষ্ঠিরের এক কথা : কুকুরকে সঙ্গে না নিতে দিলে তিনি স্বর্গে প্রবেশ করবেন না। অতঃপর সেই কুকুর সাক্ষাৎ ধর্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, "বৎস ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুকুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্মপরায়ণ…"(৮১)

আমাদের প্রশ্নটা ছিল, যুধিষ্ঠিরকে ঠিক কী পরীক্ষায় ফেলা হল ? যুধিষ্ঠির কুকুরটির খাতিরে স্বর্গে প্রবেশেও অস্বীকৃত হলেন কোন্ ধর্মের অনুশাসন মেনে ? তিনি কারণ হিসেবে যা যা দেখিয়েছিলেন কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যেমন তিনি বলেছেন, "ভক্তজনকে পরিত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ

মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।" কিন্তু কুকুরটি তো ভক্তজন ছিল না, তার সঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাটাকে পরিত্যাগ করা বলাও ঠিক নয়। "ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে" এই কথাটিরও সমর্থন করা যায় না। যুধিষ্ঠির যে কুকুরটির কোন সেবাযত্ন করেছিলেন তা তো নয়, যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতিতে তার কোন ক্লেশ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। যুধিষ্ঠির অনৃশংসতা ধর্ম পালন করছিলেন বললে ঐ বিশেষ ধর্মটিকেই বড় লঘু করে দেখা হয়।

যুধিষ্ঠিরের এই অন্তিম মুহূর্তে অবলীলাক্রমে স্বর্গ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে উদ্যত হওয়ার মধ্যে একটা মহত্ত্ব আছে যা আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে; এতে যুধিষ্ঠিরের চূড়ান্ত ধর্মপরায়ণতার কোন প্রমাণ হয় না। যা প্রমাণ হয় তা এই যে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। প্রতিপদে ধর্মের কথা স্মরণ করে তিনি পারেননি নিজের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ দমন করে রাখতে, যে মনুষ্যত্বের একটি লক্ষণই হল অন্ততঃ কিয়দংশে impredictable হওয়া। মানুষ যদি পুরোপুরি ভাবে predictable হত মানুষে যন্ত্রে তফাত থাকত না। সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে ধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করে অন্তিম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যা তাঁর সারাজীবনে শেখা কোন ধর্মের ছকেই পড়ে না। আরও একটা জিনিস প্রমাণ হয়। মহাভারত খুব বৃহদংশেই একটি ধর্মগ্রন্থ বটে, কিন্তু তা কাব্যও। মহাভারতকার (তিনি কোন একজন ব্যক্তিবিশেষ তা বলা হচ্ছে না) কী অসীম ধৈর্যসহকারে হাজার হাজার শ্লোক ব্যবহার করে ধর্ম কী অধর্ম কী পাপ কী পুণ্য কী বুঝিয়েছেন : বিশেষ করে শান্তিপর্বে অনুশাসনপর্বে তো পাণ্ডব বা কৌরবদের সংক্রান্ত কিছু নেই বললেই চলে, আছে শুধু ধর্মোপদেশ, কিন্তু তবু মহাভারতকার শেষবিচারে কবিই। ধর্মোপদেশের উপর উপদেষ্টার যে সম্পূর্ণ দখল থাকে কবিতার উপর কবির তা থাকে না। কবি যা বলতে চান তাঁর কবিতা সবসময়ে সেই কথা বলে না। মহাভারতকার হয়তো চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণ ধর্মপরায়ণ দেখাতে ; কিন্তু মাঝেমাঝেই যুধিষ্ঠির ধর্মের ক্ষুরবৎ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং প্রস্থানের পথে যাত্রা শুরু করিয়ে দেওয়ার পর কবির সৃষ্ট যুধিষ্ঠির-চরিত্র কবির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। সেই কবির সৃষ্ট মনুষ্যচরিত্র এমন একটি মানবিক কাজ করে বসলেন যা না শিষ্টাচার না শীল, না সংস্কার না সনাতন ধর্ম। যন্তপি তাকে সাধুবাদ না দিয়ে মহাভারতকারও পারেননি, স্বয়ং ধর্মও পারেননি, আমরাও পারি না।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। মৎস্যপুরাণ, ২১২ অধ্যায়
২। শিবপুরাণ, ৫৬ অধ্যায়
৩। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, ৬০ অধ্যায় *
৪। অনুশাসনপর্ব, ১১১ অধ্যায়
৫। বনপর্ব, ২৬০ অধ্যায়
৬। অনুশাসনপর্ব, ৭৬ অধ্যায়
৭। উদ্যোগপর্ব, ১৩ অধ্যায়
৮। দেবীভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১৮ অধ্যায়
৯। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৭৪ অধ্যায়
১০। আদিপর্ব, ৯০ অধ্যায়
১১। বনপর্ব, ১৮১ অধ্যায়
১২। বনপর্ব, ২ অধ্যায়
১৩। উদ্যোগপর্ব, ৩৪ অধ্যায়
১৪। বনপর্ব, ৩১২ অধ্যায়
১৫। দ্রোণপর্ব, ১৭ অধ্যায়
১৬। কর্ণপর্ব, ৭০ অধ্যায়
১৭। অনুশাসনপর্ব, ১৪১ অধ্যায়
১৮। অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ সর্গ*
১৯। দ্রোণপর্ব, ১৯৩ অধ্যায়
২০। আদিপর্ব, ৮৭ অধ্যায়
২১। বনপর্ব, ২৯ অধ্যায় (কৃষ্ণের উক্তি)
২২। বনপর্ব, ৩১২ অধ্যায়
২৩। বনপর্ব, ২০৬ অধ্যায়
২৪। বনপর্ব, ২৫৮ অধ্যায়
২৫। অনুশাসনপর্ব, ২য় ও ৫ম অধ্যায়
২৬। অশ্বমেধিকপর্ব, ৩ অধ্যায়
২৭। বনপর্ব, ১৩ অধ্যায়
২৮। বনপর্ব, ২০৫ অধ্যায়
২৯। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১০৯ অধ্যায়
৩০। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ৬২ অধ্যায়
৩১। সৌপ্তিকপর্ব, ৫ অধ্যায়
৩২। কর্ণপর্ব, ৭০ অধ্যায়
৩৩। আদিপর্ব, ১৫৫ অধ্যায়
৩৪। কর্ণপর্ব, ৯১ অধ্যায়
৩৫। আশ্রমবাসিকপর্ব, ৩০ অধ্যায়
৩৬। অনুশাসনপর্ব, ১৩ অধ্যায়
৩৭। অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৯ সর্গ
৩৮। অনুশাসনপর্ব, ১২৭ অধ্যায়
৩৯। অনুশাসনপর্ব, ৭ম অধ্যায়
৪০। দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, ৫০ অধ্যায়
৪১। দেবীভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়
৪২। অনুশাসনপর্ব, ৯৩ অধ্যায়
৪৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১২-১৩ অধ্যায়
৪৪। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৬৫ অধ্যায়
৪৫। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ৩৪ অধ্যায়
৪৬। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়
৪৭। অনুশাসনপর্ব, ১২২ অধ্যায়
৪৮। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৯ অধ্যায়
৪৯। আদিপর্ব, ১৭০ অধ্যায়
৫০। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৬২ অধ্যায়
৫১। লিঙ্গপুরাণ, ৭১ অধ্যায়
৫২। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, ৬০-৬২ অধ্যায়
৫৩। উদ্যোগপর্ব, ২৭ অধ্যায়
৫৪। অনুশাসনপর্ব, ১৪৯ অধ্যায়
৫৫। আদিপর্ব, ৪৫ অধ্যায়
৫৬। বনপর্ব, ১৩৩ অধ্যায়
৫৭। অনুশাসনপর্ব, ১১৭ অধ্যায়
৫৮। অনুশাসনপর্ব, ১৫৭ অধ্যায়
৫৯। অযোধ্যাকাণ্ড, ৭১ সর্গ
৬০। বনপর্ব, ৩১২ অধ্যায়
৬১। মৎস্যপুরাণ, ১৮৬ অধ্যায়
৬২। আদিপর্ব, ৭৫ অধ্যায়
৬৩। অনুশাসনপর্ব, ১৬৩ অধ্যায়
৬৪। অশ্বমেধিকপর্ব, ৯০ অধ্যায়
৬৫। অশ্বমেধিকপর্ব, ৫৪ অধ্যায়
৬৬। অনুশাসনপর্ব, ৯৬ অধ্যায়
৬৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১৫ অধ্যায়
৬৮। বনপর্ব, ১৯০ অধ্যায়
৬৯। অনুশাসনপর্ব, ২৩ অধ্যায়
৭০। যুদ্ধকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়

৭১। অনুশাসনপর্ব, ১৪২ অধ্যায়
৭২। বনপর্ব, ২৯ অধ্যায়
৭৩। আদিকাণ্ড, ৩৩ অধ্যায়
৭৪। অনুশাসনপর্ব, ১১৩ অধ্যায়
৭৫। মৎস্যপুরাণ, ২১২ অধ্যায়
৭৬। অনুশাসনপর্ব, ১ম অধ্যায়
৭৭। বনপর্ব, ২৯১ অধ্যায়
৭৮। অনুশাসনপর্ব, ১৬২ অধ্যায়
৭৯। অনুশাসনপর্ব, ১৬২ অধ্যায়
৮০। বনপর্ব, ৩৩ অধ্যায়
৮১। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ৩ অধ্যায়

*দ্রষ্টব্য : রামায়ণ ও মহাভারত থেকেই অধিকাংশ উদ্‌ধৃতি নেওয়া হয়েছে। এই কারণে বারংবার 'রামায়ণ' 'মহাভারত' না লিখে শুধু পর্ব ও কাণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ এবং রামায়ণের ক্ষেত্রে আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশন থেকে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসৃত হয়েছে।

রাজার বাড়ি

সত্যেন্দ্র আচার্য

সবুজ বনের ভেতর দিয়ে কখনো ডাইনে বেঁকে, কখনো বাঁয়ে ঘুরে, টাঙ্গা থেকে যখন আমরা নামলাম তখন মধ্যাহ্ন। ইতিহাস অনেক পুরনো দিনের গল্প বলে, বুঝলে ? পুরাকাহিনীর। কিন্তু এত কাছে যখন তখন ঘুরে আসতে দোষ কী মুখার্জী ? তাই ফেরার পথেই রাজবাড়িটা ঘুরে আসব, এমন পরিকল্পনা আমরা তিনজনেই রচনা করে রেখেছিলাম।

নেমে রাজবাড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যিই আমরা অবাক হলাম তিনজনে। সূর্য এখন মাথার উপর। কিন্তু হাওয়ায় এরই মধ্যে শীতের আমেজ, তাই রোদ্দুর তীব্র হলেও তীক্ষ্ণ নয়। রাজবাড়ি ডিঙিয়ে ওপারে তাকালে ঘন সবুজ রেখার মত একটা পাহাড়ের রেঞ্জ চোখে পড়ে। রোদ্দুরের সোনা রঙ শালঝোপ আর পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজবাড়িটা বাঁয়ে রেখে কিশোরী নদীটা দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে। রাজবাড়ির রঙের মত দুধারে সাদা নুড়ি ছড়িয়ে আছে। জলের দাগে কেউ ভিজেছে, কেউ মন্থর গতির ভেতর যেন লুকিয়ে-লুকিয়ে একটুখানি গড়িয়ে-গড়িয়ে থেমে যাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকতেই ন্যুব্জদেহ একজন প্রৌঢ়গোছের রাজপুত পুরুষ আমাদের দেখে হাসলেন, তারপর বিনয়ে আর একটু ধনুক হয়ে বললেন, আগে প্রণাম করুন দশরাজকে। তারপর বললেন, ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে দেখুন সব। ইচ্ছা হলে রানীকুয়োর জল খান, দেখবেন নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাচ্ছে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, আমি এবাড়ির মুন্সীজী, দেখাশোনা করি।

আমরা তিনজনে তাঁকে কিছু দিতে গেলে তিনি চটে উঠলেন। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, টাকা কেন ?

—বকশিশ।

— কেন ?

আমরা অবাক চোখে তাকালে মুন্সীজী বললেন, রানীজীর আত্মা ব্যথা পাবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মুন্সীজী। তারপর মাটির দিকে চোখ রেখেই বললেন, মানুষ চিরকাল থাকে না। মন্দ ভাল, দুঃখ সুখ—এসবের চেয়ে সত্য আর কী আছে বলুন ? এবার আমাদের সারা শরীর তীব্র দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করে বললেন, যা সার তার বিনাশ নেই, সত্য যা নিত্যকার কাজে, তা চিরকাল অবিকৃত। তার ক্ষয় নেই। আসুন আসুন, আমিই ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি সমস্ত রাজবাড়িটা।

মুন্সীজী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটলেন। সিঁড়িগুলো বিশাল কিন্তু কাঠের। কালের চিহ্ন বুকে নিয়ে নিশিদিন শুয়ে আছে। মাড়িয়ে-মাড়িয়ে আমরা চারজনে উঠছিলাম উপরে।—ওই দেখুন, বলে থমকে দাঁড়ালেন মুন্সীজী। কয়েক সিঁড়ি উঠেই চৌকো বারান্দা। জাফরি আর সূক্ষ্ম কারুকাজ দেওয়ালে। মুন্সীজী আঙুল তুলে বললেন, —ওই হল রাজার ঘর।

আমরা মুন্সীজীর চোখে তাকালে মুন্সীজী স্মিত হাসলেন। হেসে বললেন, —কিন্তু সম্পর্কের ব্যবধান সমুদ্রের মত। অথচ দেখুন ওই রানীজীর কামরা। কত কাছে। পাশাপাশি।

বহুকালের পরিত্যক্ত রাজবাড়িটায় এখন আমরা চারজন মাত্র দাঁড়িয়ে। হয়ত সাময়িককালে আর কেউ আসেনি ওপরে। অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছিল আমাদের। একটা পুরনো ভ্যাপসা গন্ধ, ইতস্ততঃ জঞ্জালের স্তূপ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পুরনো দিনের কারুকাজের নক্শাগুলি বিবর্ণ। চুনবালি ঝরে পড়ে আছে কোথাও।

মুন্সীজী হেঁট হয়ে কী যেন খুঁটে তুললেন, তারপর পায়রাগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে ছুড়ে দেয়ার ভঙ্গী করে শব্দ করলেন,—হেই, হেই! করে বললেন, রাজার চোখের উপর চিতা জ্বলত, কপালের উপর কড়ির মত একরাশি দুঃখ চকচক করত।

দেখতে দেখতে মধ্যাহ্নসূর্য হেলে পড়ছিল। রোদ্দুরের তেজ কমে আসছিল। দূরের পাহাড় মৌন, আর সূর্যের বিবর্ণ আলোয় এই রাজবাড়িটা কারা যেন ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল।

—ঘুমোলে? দরজার আড়াল থেকে মিনতি ছুড়ে দিত রাজা ভেতরে। শেষে রাজা বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজার বাইরে। নিঃশ্বাস ঘন হত। প্রেতাত্মার মত বিরাট ছায়াটা রাজাজীর চোখের উপর দাঁড়িয়ে থাকত। রানীজীর ঘর থেকে কস্তুরীর গন্ধ বাতাসে ভেসে আসত বাইরে। তরল জ্যোৎস্নায় কিংবা অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিত রাজা বুক ভরে। রাজাজী নড়লেই ছায়াটা নড়ত।—ঘুমোলে?

অথচ এই বিরাট, নিঃসীম, নিঃসঙ্গ দ্বীপের উপর যে শূন্যতা তার বাইরে কিন্তু রাজা তৃপ্ত। সারা রাত্তির ধরে রাজার ইচ্ছার মত ঘরে ঘরে বাতিদান জ্বলত। আর ওই দেখুন খাঁচা। অজগরের। তার নিঃশ্বাস রাজাজী শুনতেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আস্তাবল, হাতিশালা, ময়ূরমঞ্চ বাইরে। সব দেখাব আপনাদের।

এই বিশালতার ভেতর দাঁড়িয়ে আমরা যেমন অবাক হচ্ছিলাম। অথচ জানেন, দিনের আলোয় নির্মম হতেন রাজা। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আরো যেন ক্রুদ্ধ হতেন। দরবারে ঢুকলে চাপা গুঞ্জন উঠত। সান্ত্রীকে ডাকতেন, শংকরমাছের চাবুক নিয়ে এস।

সান্ত্রী! রানীজীর গলা শোনা যেত উপরে। রাজাজী আরো নিষ্ঠুর হতেন। রাজাজী হাসতেন মন্দিরে নিয়ে যাও ওদের, আমি আসছি। ভীরু পায়ে রাজা মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে রানীজী গর্জাতেন,—আবার এসেছ? একটা কাফের।

বলিষ্ঠ বুকের ভিতর দ্রুত নিঃশ্বাস বরফের মত জমাট হয়ে যেত। বাদ্যধ্বনিতে মন্দির ভরে যেত, রানীজী দাঁতে দাঁত চেপে গর্জাতেন, যাও বলছি!

—না। কণ্ঠে অনুনয়ের সুর বাজত রাজাজীর।

—না? ওই কথাটাকেই লুফে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতেন আবার।—না?

—না। নম্রগলায় রাজাজী বলতেন, তুমি বকলেও আমি যাব না। তোমাকে খালি দেখব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। স্থির দাঁড়িয়ে ঠিক বোকার মত চেয়ে থাকতেন রাজাজী। দেখতেন রূপ। ভুরু। শাদা কপাল। খোঁপার কারুকাজ। উদ্ধত স্তন। চুলের রুপোলী জরি আর চোখের কাজল থেকে ঘ্রাণ নিতেন রাজা।

কোন কোন দিন সব অন্ধকার করে দিতেন রাজা। গোটা রাজবাড়ি অন্ধকারে ডুবে যেত। শুধু রাজার ইচ্ছায় রানীজীর ঘরে, রানীজীর সুন্দর মুখের ছায়া ভাসিয়ে সারা রাত্তির বাত্তি জলত রানীজীর ঘরে। গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেলে, ময়ূরমঞ্চে ময়ূর-ময়ূরীর নড়াচড়া স্তব্ধ হলে, অজগরের নিঃশ্বাস আরো মন্থর হলে রাজাজী ঘুরে বেড়াতেন গোটা বাড়িটা। হাতিশালা স্তব্ধ। আস্তাবল। সব—সব স্তব্ধতার ভেতর ডুবে গেলে একসময় অন্ধকারে ডুব দিয়ে চুপিচুপি পাতালে নামতেন রাজা।—চলুন—

মধ্যাহ্ন আর নেই। নদীর উপর থেকে রোদ্দুরের ছায়া জলের ভিতর ডুবে যাচ্ছিল। দূরের পাহাড় আরো বিবর্ণ হচ্ছিল। আমরা তিনজনে সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মুন্সীজীর পেছন পেছন মাটির তলায় যে প্রকোষ্ঠ তা দেখতে নামছিলাম এবার। যেন পাতালে নামছিলাম। গোটা বিশ সিঁড়ি ভেঙে মাটির তলায় এঘরে এসে দাঁড়ালে মুন্সীজী বললেন,—এঘরে আগে থাকত সন্ধিপত্র। স্বনামাঙ্কিত গুপ্ত পাঞ্জা। বুঝলেন ?

অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।—জানেন, মুন্সীজী বললেন, কি অন্ধকার, কি আলোয় আজ আর কিছুই চোখে পড়বে না। সব গেছে। সান্ত্রী-সিপাইদের কসরত। দক্ষ মাহুতদের দম্ভ। সব—সব। আজ দশরাজের ভগ্নমন্দির শুধু দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। রাজার যন্ত্রণা, রানীজীর বেদনা—সব আজ গল্পের মত।

হ্যাঁ, এই সেই ঘর। রাজা নীরবে অন্ধকারে নেমে আসতেন এঘরে। ডাকতেন রাজবৈদ্যকে। —বৈদ্যজী জেগে আছেন ? তারপর দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বলতেন,—পাঁচমোহর আপনার নজরানা নিন। কিছু পেলেন ?

—না।

আবার সিঁড়িগুলো ভেঙে-ভেঙে উঠে আসতেন উপরে। এসে বসতেন রূপকুণ্ডের পাড়ে। নদী থেকে জলধারা ধরে এনে কৃত্রিম ঝরনা তৈরি করেছিলেন পূর্বপুরুষরা। তখন জল থৈ থৈ করত, জ্যোৎস্না পড়ত জলে। গোটাদশেক যুবতী উদ্ধত যৌবন নিয়ে জলের উপর ভাসত। শ্বেতপাথরের শঙ্খ-শাদা স্তূপের উপর বসে পূর্বপুরুষরা লক্ষ করতেন নগ্নদেহগুলো। তারপর হয়ত জলে নামতেন কিংবা জল থেকে কারোকে তুলে এনে শ্বেতপাথরের স্তূপের উপর শুইয়ে দিতেন।

কিন্তু রাজা, শেষ রাজা ? জল আজ নেই। শিশির আজো ঝরে দাঁতবেরকরা ইটের ফাটলের উপর। কিন্তু রাজা ? কী নেই ? রানী আছে, ঐশ্বর্য আছে, নেই ? গ্রীষ্মবর্ষা, শীতবসন্ত সেই পূর্বপুরুষদের মতই এ বাড়িকে স্পর্শ করত। নদী সুন্দর হত সেই আগের মতই, বর্ষায় পাহাড়ের উপর শ্যামল শোভা সেই আগের মতই রমণীয় হত। কিন্তু রাজা ? গভীর রাতে বড় অসহায় হয়ে যেতেন রাজা। আবার নামতেন পাতালে। কিছু পেলেন ? শীতগ্রীষ্মবর্ষাবসন্তের ভেতর বড় অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতেন রাজা।

রাজকবিরাজ চুপ।

অপরিচ্ছন্ন শ্বেতপাথরের ভগ্নস্তূপের উপর ফিরে এসে বসে পড়তেন রাজা। শীত গ্রীষ্মে, অন্ধকারে বর্ষাবসন্তে বড় অসহায় ভাবে বেঁচে আছেন বলে মনে হত রাজার।

লজ্জা লজ্জা। অথচ নিজের যন্ত্রণা আর রানীজীর দুঃখকে বাদ দিলে রাজা তুষ্ট। তৃপ্ত। সেই লজ্জায় সারারাত সবকটি কক্ষ ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে ঘুরে প্রেতায়ু অন্ধকার দেখতেন সারা বাড়িটায়। কিন্তু যখনই রানীজীর মুখ মনে পড়ত, তখনই সব সাহস কোথায় মিলিয়ে যেত। চোখে চিতা জ্বলত, কপালের উপর একরাশ দুঃখ তখন চকচক করত। তখনি আবার পাতালে নামেন। কবিরাজের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নমিত গলায় ডাকেন,—বৈদ্যজী!

—বলুন।

—কিছু পেলেন ?

—না।

—কী মনে হয় ?

—জানি না।

—আমি কিন্তু ঘুমোইনি।

বৈদ্যজী চুপ।

সকাল হতে দেরি নেই।

তবু কোন উত্তর দেয় না রাজবৈদ্য।

অনুচ্চ গলায় রাজা তবু বলেন,—আশা নেই ?

এখন আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে রাজবৈদ্য।—ভয় নেই, ভাববেন না বেশি।

—কিন্তু আমার যে কিছু নেই। পৌরুষ নেই, আমি হীনবল। একটা কাফের।

—ভাববেন না। রানীর মন্দির আছে। দশরাজ আছে। রানী ধর্মিষ্ঠা, কৃপাবতী। প্রজাপ্রাণা।

—কিন্তু আমি যে ভগ্ন। আমার কিছু নেই। রানীর যৌবনের কাছে আমার দম্ভ নিষ্ফল।

—সিন্দুকের তলা থেকে জীর্ণ শাস্ত্রের পাতাগুলো আমি উদ্ধারের চেষ্টা করছি। নিশ্চিত হোন। শত রমণীর আকাঙ্ক্ষা আপনি তৃপ্ত করবেন। শত রমণীর দম্ভ আপনি একাসনে খর্ব করবেন।

—মোহর নিন। নজরানা। রাজা মোহর রাখেন দরজার বাইরে। তারপর বড় অসহায় আর বেদনাভরা কণ্ঠে আবার বলেন,—কবে ?

—উদ্ধার হলেই। ঘরের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর বাইরে আসে। তবু দরজা খোলেন না রাজবৈদ্য। রাজাকে ঢুকতে দেন না। গলেযাওয়া, ঝরেপড়া জীর্ণ আয়ুর্বেদের পাতাগুলো ঘাঁটতে আমি কসুর করছি না রাজা। পারবেন। শত রমণীর উপভোগ আপনার ভাগ্যে।

পাতালের অন্ধকারে অপলক তাকান রাজা। খোলা আকাশ, রাশিনক্ষত্র এখান থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু রানীর মুখ মনে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে তবু বলেন, শত রমণী আমার ভাগ্যে ?

—হ্যাঁ। কণ্ঠস্বর আবার বেরিয়ে আসে। ভেতর থেকে সারার্থ উচ্চারণ করেন বৈদ্যপ্রধান। 'বিবিধ ভোজন, বিবিধ পান, স্পর্শ সুখ, স্রক, চন্দ্রতিলকশোভিতা যামিনী, নবযৌবনা কামিনী, শ্রোত্র-মনোহারী গীত, তাম্বুল, মদিরা, মাল্য এবং মনের অপ্রতিঘাত এই সকল বিষয়ে মানবমনকে কামভোগে সমর্থ করে। ক্লৈব্য ষড়্ প্রকার। জন্মপ্রভৃতি যে ব্যক্তি ক্লীব তাহার ক্লৈব্যকে সহজ ক্লৈব্য কহা যায়।

যে ক্লৈব্য সহজ তাহা অসাধ্য।

—অসাধ্য?

ও ঘর থেকে আর কোন সাড়া আসে না।

—বৈদ্যজী, বিষাদে আমি নীল হয়ে যাচ্ছি, এই অন্ধকারেও তা আপনি দেখতে পাবেন। দরজা খুলুন।

তবু দরজা বন্ধই থাকে।

—যতদিন আমি একলা ছিলাম, আমার কোন দুঃখ ছিল না। দুর্বলতা আমার ছিল, সাধ ছিল, কিন্তু দ্বারস্থ আমি হইনি কারো।

তবুও খোলে না দরজা।

যেন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রাজা আবার উপরে উঠে আসেন। আকাশে চোখ রাখেন। অজস্র তারা আকাশে। রানীর ঘরে কস্তুরীর গন্ধ।

তবুও ওপরে ঢুকতে পারবেন না রাজা। বাধা নেই, কিন্তু সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান। অথচ প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর রাজা এই অন্ধকারে কত দুর্বল, কত অসহায়। এই দীর্ঘ রাত্রি আর দুর্মর ক্লান্তি যেন কত দ্রুত বয়েসের দিকে, অপূর্ণতার দিকে কত সহজে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চিন্তাজ্বর কী নিপুণতার সঙ্গে বার্ধক্যের আগেই বৃদ্ধ সাজাচ্ছে তাঁকে। কানের পাশে এই অকালেই শুভ্র কেশ তাঁর চোখে পড়ছে। রাজা আরো অস্থির হন। আরো জোরে গর্জান, সান্ত্রী—

রানীজী তক্ষুনি ত্রস্ত গলায় বলেন,—সান্ত্রী, ওদের হাতপায়ের বাঁধন খুলে দাও।

রাজা আরো ওপরে গলা তোলেন।—সান্ত্রী, ওদের অভুক্ত রাখো।

রানীর গলা আবার বেজে ওঠে।—ওদের ফলাহার দাও সান্ত্রী। আমার কুয়োর জল দাও।

টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে রাজার চোখ দিয়ে। জলের একটা ফোঁটা রাজা চেটে নেন। রক্তের স্বাদ। অসহনীয় অপমানের জমাট লাল রক্ত যেন গলে-গলে জল হয়ে ঝরছে।

মুঠোয় ভরে নজরানা রানীকুয়োর জলে ছুড়ে ফেলে দেন বৈদ্যপ্রধান। বৃদ্ধ রাজবৈদ্যের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। এই শুশ্রুতসংহিতার প্রতিপাদ্য পড়েছেন রাজবৈদ্য। দিনের আলোয় কত উদার অথচ কত কৃপণ অন্ধকারে। কত নিষ্ঠুর সূর্যের আলোয়, কিন্তু কত বিচলিত চন্দ্রালোকে। বাতি জেলে-জেলে প্রতিপাদ্য পড়েছেন, এই যে বাইরের জগৎ এত সুন্দর, জীবন এগোচ্ছে, মানুষ হাসছে, হাঁটছে, এই যে দিনরাত্রির হাত ধরে মানুষগুলো ঘর বাঁধছে, ভাসছে, একটা দুর্লঙ্ঘ্য চেতনায় এই যে অবিরত ঘুরছে, আবর্তিত হচ্ছে দুঃখ সুখে,—সব মিথ্যা—সব। দেহবাদের যূপকাষ্ঠে সব মোহ এক। সব বীজ সমান। পৃথিবীর ওপর সূর্যের আলোয় চিরে-চিরে পরীক্ষা করো সব দেহগুলোকে, তারপর ফুঁ দিয়ে অন্ধকার করো সারা জগৎটা, সব সমান। সব এক। সব সৌষ্ঠব, সব সৌন্দর্য অন্ধকারের রঙে একাকার। ধনী-নির্ধন, মার্জিত-অমার্জিত, সুন্দর-কুৎসিত যে যার স্বকীয় বৃত্তে এই যে আবর্তিত হচ্ছে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সব বৃত্ত আলাদা কিন্তু আবর্তন এক।

গতকাল বৈদ্যপ্রধান সামনের দিকে বয়সের ভারে আর একটু ঝুঁকে পড়েছেন। এই পাতালের অন্ধকারে সূর্যালোকপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে জীবনের সব মানে জেনেছেন। বাতির আলোয় খুঁটে-খুটে

যৌবনের প্রতিপাদ্য পড়েছেন। দারিদ্র্য বল, স্বাচ্ছন্দ বল, সবের উর্ধ্বে ওই একই চেতনা। নারী বল, পুরুষ বল, সকলের ভেতর ওই একই কামনা। জীর্ণ পুঁথি থেকে নির্গলিতার্থ উদ্ধার করেছেন, কামনা অন্তহীন, অগ্নিশিখার মত। সব নির্ধন, সব ধনী, সব রুচিশীল, সব অশালীন, সব কুৎসিত, সব সুন্দর—সকলের ভেতর সেই একই প্রভাব অনির্বাণ জলছে। তাৎপর্যের খাতিরে ব্যতিক্রম শুধু উত্তাপের।

অসহ অপমানে এই যে তিনি দগ্ধ হচ্ছেন, অথচ কী নেই? আজও প্রধান পুরোহিত রানীজীর সুখনিদ্রার জন্য প্রহরে প্রহরে প্রার্থনা করেন। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে আজও সানাইয়ের সুর ঝরে। আজও কোষঘর খুললে রাজকোষের জৌলুস চোখকে অবাক করে দেয়। স্বর্ণখচিত ময়ূরপালঙ্কে আজও শোয় রানীজী। শিশু হরিণের মসৃণ চামড়ার কাঁচুলিতে আজও তো পরিচারিকারা রানীজীর উদ্ধত স্তনকে পেছনে দাঁড়িয়ে সজোরে ফাঁস লাগিয়ে বন্দী করে।

চমকালেন বৈদ্যপ্রধান। মুখ তুললেন বাতির আলোয়। রাজার কণ্ঠস্বর পুনরায় বেজে ওঠে:

—বৈদ্যজী, বিষাদে আমি নীল হয়ে যাচ্ছি, এই অন্ধকারেও তা আপনি দেখতে পাবেন।

তবু দরজা বন্ধই থাকে।

—যতদিন আমি একলা ছিলাম, দুঃখ ছিল না।

তবুও খোলে না দরজা।

—জানেন বৈদ্যপ্রধান, রানীজী এখনো ঘুমোয়নি।

—জানি।

—কী করে জানলেন? রাজা করাঘাত করেন পাতালের দরজায়।

—স্বর্গের মানুষ পাতালেও নামেন রাজাজী। বৈদ্যপ্রধানের অস্পষ্ট স্বর বাইরে বেরিয়ে আসে। রানীজী এসেছিলেন এ ঘরে।

এতক্ষণ পরে মুন্সীজী থামলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। মুছে বললেন—চলুন, ওপরে উঠি। দেবতাপ্রাণা রানীজীর দশরাজের দশটি মন্দির দেখবেন চলুন। সম্পূর্ণ মহাভারত রানীজী নিজে হাতে দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আধুনিক শিল্পজিজ্ঞাসা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

আর্ট কথাটির অর্থ এবং গ্রীক, লাটিন ও জার্মানে কথাটির প্রতিশব্দ অতীতে খুব অস্পষ্ট ছিল; ফলে বস্তুটির সংজ্ঞা নিরূপণের সমস্ত প্রয়াস স্বতোবিরোধী এবং অনেক সময় পুরোপুরি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে লোককে চালিত করতো। আর্টের অধিকতর সংযত এবং বিশুদ্ধ নান্দনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন আধুনিক চিন্তাবিদেরা।

গ্রীক, লাটিন ও জার্মান-এ পুরনো অর্থে আর্ট বলতে বোঝাতো দক্ষতা বা ক্ষমতা—যা ধৈর্যশীল অনুশীলনের দ্বারা লভ্য। স্থির কোন লক্ষ্যের দিকে এ অনুশীলন প্রযুক্ত হতো—সে লক্ষ্য নান্দনিক, নৈতিক অথবা প্রয়োজনীয়—যাই হোক না কেন। লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁরা আর্টকে মোটামুটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন—তার মধ্যে সুকুমার শিল্প অন্যতম। এ ধরনের শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরকে লাভ করা। আধুনিক এবং সীমিত অর্থে আর্ট হলো সেই ধরনের মানবিক ক্রিয়া যার গতি সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে। শিল্পতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, সঙ্গীত, কবিতা, নাটক প্রভৃতি যে সমস্ত অভিব্যক্তিতে গতির প্রকাশ সুস্পষ্ট সেগুলিতে সৌন্দর্যের প্রকাশও বেশি।

শিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্লেটো এবং শীলার থেকে শুরু করে কে. লেঞ্জ পর্যন্ত অনেক সৌন্দর্যতত্ত্ববাদী শিল্পের ভেতর বাস্তবধর্মিতা এবং প্রয়োজনবাদের অভাব দেখে শিল্পকে খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ মত আধুনিক শিল্পমতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। হার্ডার, ভারনন লী শিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেও শিল্পের মৌলিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। ক্রোচে শিল্পকে সজ্ঞার সমার্থক মনে করেছেন। তবে এর মধ্যেও শিল্পসমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। সান্তায়নের 'বস্তুতে রূপান্তরিত আনন্দ' মতবাদের মধ্যেও শিল্পসমস্যার অন্তিম সমাধান মিলবে না। সে সমাধান আরও কম পাওয়া যায় লোকপ্রিয় শিল্পসংজ্ঞার মধ্যে যাতে বলা হয়েছে শিল্প মর্জিমাফিক দেখা প্রকৃতি মাত্র। সকল প্রকার শৈল্পিক অভিব্যক্তির জন্য আবেগময় অনুভূতির ওপর জোর দিয়ে টলস্টয় সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় তাঁর মতবাদকে বিশদ করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, শিল্পের বাস্তব রূপ কী? প্রকৃত পক্ষে শিল্পের শুরু হয় এমন একটি অবস্থায় যখন শিল্পী স্বভাবের অনুকরণ না করে নিজস্ব সৃষ্টিচাতুর্যের সাহায্যে স্বভাবকে সুন্দরের মূর্তি দান করেন। শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পী স্বভাবের সঙ্গে একাত্ম হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ একাত্মতাও শিল্পসৃষ্টির জন্য সব নয়। শিল্পসৃষ্টির জন্য অনিবার্য প্রয়োজন অপ্রতিরোধ্য অন্তঃপ্রেরণা এবং শিল্পীর সৃষ্টিকৌশল। এ দুয়ের সমন্বয়ে যা গড়ে ওঠে তাকে বলা যায় শিল্পকর্ম বা আর্ট।

শিল্প স্বভাবের অনুকরণ সন্দেহ নেই, তাহলেও শিল্প স্বভাবাতিরিক্ত। ফোটোগ্রাফি শিল্প নয়, যেহেতু তা স্বভাবকে অনিয়ন্ত্রিত এবং অসংশোধিত ভাবে গ্রহণ করে। অনুকরণের পথে এ নিয়ন্ত্রণশক্তি

এবং উদ্দেশ্যমূলক সংশোধনই শিল্পসৃষ্টির সহায়ক।

শিল্পের কাজ সৌন্দর্যসৃষ্টি। এমন কোন সৌন্দর্য নেই যা শিল্প উদ্‌ঘাটিত করেনি। স্বভাবের ভেতর সুন্দর বা কুৎসিত বলে কিছু নেই। শিল্পীর আবেগাত্মক প্রতিক্রিয়াই এই সুন্দর বা কুৎসিত সৃষ্টি করে। নান্দনিক আবেগের বস্তুরূপের মধ্যেই সৌন্দর্য এ ভাবে রূপ গ্রহণ করে। এই আবেগকে দৃশ্যমান বা শ্রুতিগোচর করার শক্তি শিল্পীর আছে। সে শক্তির সাহায্যে তিনি দর্শক বা শ্রোতাকে তাঁর আনন্দদায়ক অনুভূতির অংশীদার করে তোলেন। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়েই আমরা প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্য দেখি, মানবজগতে কুৎসিতকেও সুন্দর করে দেখি।

প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা মানবদেহনির্ভর সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যে সামঞ্জস্য এবং ছন্দময় সম্পূর্ণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা প্রকৃতিতেও দুর্লভ। ইতালিতে রেনেসাঁসের আগে পর্যন্ত পার্বত্য দৃশ্যের সৌন্দর্য মধ্যযুগের মানুষের কাছে ছিল অনুদ্‌ঘাটিত। গিটো এবং তাঁর অনুবর্তীরা সে পার্বত্য দৃশ্যকে তাঁদের চিত্রে ফুটিয়ে তোলবার পর থেকেই তা মানুষের চোখে সুন্দর মনে হতে থাকে।

সৌন্দর্যের আদর্শ যুগে যুগে শুধু পরিবর্তিত হয় না, জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে তা ভিন্নরূপও লাভ করে। শিল্পনির্দিষ্ট সৌন্দর্যমানই স্থায়ী হয়। এই সৌন্দর্যমানের উপলব্ধি শিল্প বিষয়ে অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্য সকল শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য হলেও সৌন্দর্যের কোন সম্ভাব্য এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। এরূপ সংজ্ঞার সন্ধান করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন শিল্পের কোঠায় যে অনন্ত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তার একটা সাধারণ গোষ্ঠীনাম বের করা—সে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা যা শিল্পসৃষ্টিকে স্বাভাবিক শক্তিসম্ভূত সৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ শ্রমশিল্প থেকে পৃথক করে।

শিল্পসৃষ্টির কৌশলনৈপুণ্য নিকৃষ্ট শিল্প থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকে পৃথক করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির জন্য এ সৃষ্টিকৌশলের ওপর অধিকারটিই সব নয়—তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিল্পীর অভিব্যক্তি দেবার ক্ষমতা। শিল্প যদি স্বভাবের অনুকরণ মাত্র হয়, শিল্পসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়ে শিল্পী যদি নিজের অন্তরোদ্ভূত কোন অনুভূতিকে সুন্দর অভিব্যক্তি দিতে না পারেন, তবে তা কখনও শ্রেষ্ঠ শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হবে না। যে সৃষ্টিতে শিল্পীর অকৃত্রিম আবেগ, অভিব্যক্তি ও ছন্দোময়তা নেই—তাকে ঠিক শিল্প বলা চলে না।

শিল্পের অর্থ সম্পর্কে সংজ্ঞা দেওয়া যেমন শক্ত, শিল্পের ভূমিকা নির্ণয়ও তেমনি কঠিন কাজ। আনন্দ দেওয়া যে শিল্পের প্রধান কাজ এটা স্পষ্ট। এ কারণে কেউ কেউ শিল্পকে অলস ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয় বিলাস বলে মনে করেছেন। বাস্তবধর্মিতার দিক থেকে শিল্প অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু শিল্প মানুষের হিতকর কিছু সৃষ্টি করে না। তাহলেও শিল্প সর্বযুগে মানবজাতির নিকট অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলে বিবেচিত হয়েছে। সভ্যতার পক্ষেও শিল্পের প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রত্যেক জাতির শিল্প তার সভ্যতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। জীবন ও শিল্প পরস্পর সম্পর্কিত—কিন্তু জীবনের চাইতে শিল্পের স্থায়িত্ব বেশি। অতীতের শিল্পবিশেষ থেকেই আমরা অতীতের জীবন ও সভ্যতার পরিচয় আহরণ করি। শিল্পের মাধ্যমেই ইতিহাস আমাদের নিকট জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষের মনে পর্যন্ত শিল্প আনন্দ বিতরণ করে। প্রাত্যহিক জীবনের ইতর অস্তিত্ব থেকে শিল্প মানুষকে মুক্তি দেয়। দেহের ক্ষুধার মত কল্পনার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি

না ঘটলে মানুষ বাঁচতে পারে না, এবং শিল্পের অফুরন্ত উৎস থেকেই মানুষের কল্পনা জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে। শিল্পের অস্তিত্ব ছাড়া জীবন অসহ্য, অকল্পনীয়।

গতিময়তা যেমন জীবনের অন্যতম লক্ষণ তেমনি শিল্পেরও। গতিহীন জীবন যেমন মৃত প্রেরণা-হীন, শিল্পও তেমনি। গতিকে সুন্দরতর করে ছন্দোময়তা—যা শিল্পেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, শিল্পের উপভোগ্যতা বৃদ্ধির সবচাইতে বেশী সহায়ক হলো গীতি, ছন্দ, নির্মাণকৌশল এবং পরিমাণ-বোধ।

আধুনিক বিজ্ঞান শিল্পবিকাশের সহায়ক হয়েছে। যে বস্তুর সাহায্যে শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন তার প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানদান করে, শিল্পসৃষ্টির উন্নত মানের উপাদান ও যন্ত্র সরবরাহ করে বিজ্ঞান শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেছে। ধ্বনির উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করেছে আধুনিক গবেষণা। আধুনিক যন্ত্র রূপ এবং রেখার নতুন সামঞ্জস্যবোধ সৃষ্টি করেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া নাট্যশিল্পেরও অনন্যসাধারণ উন্নতি ঘটিয়েছে।

শিল্পবিকাশের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্তি এবং জীবনের প্রতি সুস্থ সবল মুক্ত দৃষ্টি। সুস্থ সবল বিস্তৃত ও গভীর মন নিয়ে শিল্পীকে প্রবেশ করতে হবে বস্তুর অন্তর্লোকে—যে বস্তু তার শিল্পসৃষ্টির উপাদান। সৃষ্টির অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং অনন্যসাধারণ দক্ষ শিল্পকৌশলের সাহায্যে সে বস্তুগত উপাদানকে রূপের মধ্যে অভিব্যক্তি দিতে হবে। তবেই হবে শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। শিল্পবোধ পুরুষানুক্রমে আগত না অর্জিত তা বলা শক্ত। শিল্পকৌশল অবশ্য অনুশীলনের দ্বারা লভ্য। কিন্তু প্রত্যেক শিল্পীর শিল্প-উপভোগের ক্ষমতা নির্ভরশীল শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষের পরিমাণের ওপর।

যে আবেগময় প্রেরণা বিভিন্ন যুগে সভ্য মানুষকে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে তা বিভিন্ন প্রভাবজাত। কোন সময় প্রকৃতি শিল্পীকে নব সৃষ্টিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে (যেমন চীনে), কিংবা প্রকৃতিকে আদর্শায়িত রূপ দেবার প্রয়াস (যেমন গ্রীসে), প্রতীকসৃষ্টির সাহায্যে বর্তমান জীবন থেকে পলায়ন-প্রয়াস, প্রেতাত্মার সন্তুষ্টিবিধান, কিংবা ব্যক্তিমহিমাকে তুলে ধরবার ইচ্ছা। শিল্পসৃষ্টির এ ধরনের প্রেরণা পূর্বযুগে যেমন এ যুগেও তেমনি দেখা যায়।

আধুনিক অনেক শিল্পসমালোচক শিল্পকে গীতধর্মী বা বিশুদ্ধ সজ্ঞালব্ধ বস্তু বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাই যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে শিল্প সম্পর্কে এ নেতিবাচক কথাগুলি স্বভাবতই মনে আসে :

১। শিল্প দর্শন নয়। যেহেতু দর্শনের উদ্ভব জাগতিক বিষয়ের যুক্তিবাদী চিন্তার ওপর, আর শিল্প ব্যক্তির চিন্তাহীন সজ্ঞা, তাই বলে শিল্পকে যুক্তিহীন বা যুক্তিবিরোধী বলা যায় না। তবে শিল্পের যুক্তির জগৎ আলাদা। সে জগতের অদ্ভুত এবং অনন্য চরিত্রকে রূপ দেবার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে 'বোধের যুক্তি' অথবা 'কান্তিবাদ' প্রভৃতি শব্দ।

২। শিল্প ইতিহাস নয়, যেহেতু ইতিহাস বাস্তব এবং অবাস্তব—এ দুটিকে পৃথক করে দেখায়, শিল্পে এখনও সে পার্থক্য স্বীকৃত নয়। শিল্পের অস্তিত্ব নির্ভরশীল বিশুদ্ধ রূপমূর্তির ওপর।

৩। শিল্প প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়—যেহেতু শিল্পের যে গাণিতিক ভিত্তি তাও একটা রূপকালঙ্কার মাত্র—কবিমনের একটি সৃষ্টিশীল, সংহত, এবং ঐক্যবোধক শক্তির রূপকাশ্রিত অভিব্যক্তি—যে

মন নিজের জগতে রূপমূর্তি সৃষ্টি করে চলে।

৪। শিল্প খেয়ালী কল্পনার খেলা নয়, যেহেতু এ ধরনের খেলা বৈচিত্র্যের সন্ধানে, অবসর বিলাসের জন্য, অথবা বিনোদনের উদ্দেশ্যে এক মূর্তি থেকে ভিন্ন মূর্তিতে রূপ লাভ করে। একই ধরনের বস্তু দেখে আমোদ পাওয়া, অথবা আবেগময় এবং করুণ কৌতূহল সৃষ্টি এ পর্যায়ের খেলার লক্ষ্য। অথচ শিল্প বিচ্ছিন্ন অনুভূতিকে একটা স্বচ্ছ সজ্জায় রূপান্তরিত করে। সে রূপান্তরিত অনুভূতিকে আর খেয়ালী কল্পনা বলতে পারি না—বলি, কল্পনা বা সৃষ্টিধর্মী কল্পনা।

৫। শিল্প অবিলম্ব অনুভূতি নয়—অনুভূতির তাৎক্ষণিক রূপ দেওয়া শিল্পের ধর্ম নয়। আবেগ-প্রসূত অনুভূতি শান্ত হয়ে এলে শিল্প তাকে রূপের মধ্যে বিধৃত করে। এ কারণেই সে অনুভূতি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি সীমায় জগতে আবদ্ধ, আর শান্ত অনুভূতির আবেদন অনন্তের অভিমুখী। এ ধরনের অনুভূতিকেই শিল্পবাদীরা বলেছেন,—সর্বজনীন অথবা বৈশ্বিক অনুভূতি। এ পর্যায়ের অনুভূতির আবেদন মনের জগতে চিরকালীন।

৬। শিল্পের কাজ উপদেশ দেওয়া নয়, ভাষণ দেওয়াও নয় :
যে কোন প্রকার বাস্তব লক্ষ্য সাধনের জন্য শিল্প নিয়োজিত নয়। দার্শনিক, ঐতিহাসিক অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের উদ্‌ঘাটন, অথবা বিশেষ কোন অনুভূতির, অথবা সে অনুভূতি-প্রভাবিত কাজের সমর্থনও শিল্পের কাজ নয়। বক্তৃতা দেবার প্রবৃত্তি শিল্পের অসীমতা এবং স্বাধীনতা তৎক্ষণাৎ হরণ করে। শিল্পের লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রয়াস সেখানে সমাপ্ত হয়ে যায়।

৭। বাস্তব কোন কাজ—যেমন উপদেশদান বা বক্তৃতা করার সঙ্গে জড়িত নয় বলে পরিণত সৃষ্টিশীল কোন কাজ—যেমন, আনন্দ, উপভোগ, প্রয়োজনীয়তা, মঙ্গল অথবা ন্যায়পরতা প্রভৃতির সঙ্গে শিল্পকে গুলিয়ে ফেলাও ঠিক নয়। শিল্পের কোঠা থেকে জমকালো রচনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হয়। তাতেও অবশ্য চলে না। শিল্পকোঠা থেকে সে সমস্ত রচনাকেও বাদ দিতে হবে যেগুলি মানুষের ভালো করবার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে যেগুলি শিল্পচেতনাহীন এবং অরুচিকর।

এই তো গেল শিল্পবিষয়ক নেতিবাদী আলোচনা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে শিল্পের প্রকৃত স্বরূপ কী?

যে বস্তুস্বরূপ মানুষের নিকট অনুদ্‌ঘাটিত, তাকে আলোকিত করে শিল্প। সুতরাং শিল্পীমন শূন্য-গর্ভ অথবা বুদ্ধিহীন হলে চলে না। বিশুদ্ধ শিল্পবাদী বা কলাকৈবল্যবাদী শিল্পী জীবন-যন্ত্রণার প্রতি উদাসীন। তাঁদের মতে, মানুষের চিন্তাপ্রযত্ন সৃষ্টির ফসল ফলাতে পারে না। যদি কিছু পারে অপরের অনুকরণের মধ্যে বা মনোযোগকেন্দ্রহীন ভাবসৃষ্টিতেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় কাব্য বা শিল্পের ভিত্তিতে যে মানব-ব্যক্তিত্ব—এটা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না—যেহেতু মানবব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণতা খুঁজে পায় নৈতিকতার মধ্যে—যে নৈতিক চেতনা সকল শিল্পের মূল ভিত্তি। তাই বলে শিল্পী একজন নীতিবাদী বা ধার্মিক হবেন—এটা বোঝায় না। কিন্তু বাস্তব চিন্তা ও কর্মের জগতের তিনি অবশ্যই অংশীদার হবেন। এ চিন্তা এবং কর্ম তাঁর ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করে, অথবা অপরের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করে। সেই সহানুভূতির প্রভাবে সমস্ত মানবব্রহ্মকে তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে পারেন। নীতিবোধে উদ্‌বুদ্ধ হলে পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা, ন্যায়পরতা,

এবং পাপ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল সম্পর্কে তাঁর বোধ তীক্ষ্ণ হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সাহসিকতার অধিকারী তিনি না হতে পারেন, এমন কি ভীতি ও কাপুরুষতার চিহ্নও তাঁর ব্যক্তিত্বে দেখা দিতে পারে, কিন্তু সাহসিকতার মর্যাদা তাঁকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে।

শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উৎস কবিকল্পনা। এই কবিকল্পনাই অনুভূতি-ক্রিয়াকে চিন্তাশীল রূপ দেয়, অস্পষ্ট ধারণাকে সজ্ঞাসম্পন্ন অভিব্যক্তি দেয়। বস্তুত পক্ষে কবিকল্পনা না হলে যুক্তিনির্ভর চিন্তারও উদ্ভব হতো না। মানুষ যতই যুক্তিবাদী, মননশীল, সমালোচক, বৈজ্ঞানিক, কিংবা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কর্তব্যপরায়ণ—যাই হোন না কেন, তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে থাকে কল্পনা ও কবিতার গোপন সঞ্চয়—এ সঞ্চয় না থাকলে তাঁকে মানুষই বলা যেত না, তিনি মননশীল মানুষও হতেন না। কল্পনার এ সঞ্চয় ব্যক্তির মধ্যে যে পরিমাণে কম সে পরিমাণে তাঁর চিন্তাও উপরিতলবিহারী এবং শুষ্ক—তাঁর কর্মে আসে শিথিলতা।

শিল্পস্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—সৌন্দর্যশাস্ত্র—যাকে অপর কথায় বলা যায় শিল্পবিজ্ঞান—তা কোন পরিবর্তনহীন বস্তু নয়। বরং শিল্প বিষয়ে যুগে যুগে যে সমস্ত নতুন নতুন চিন্তা হয়েছে, সমস্যা দেখা দিয়েছে—সৌন্দর্যশাস্ত্র বা কান্তিবিদ্যা সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করেছে এবং আলোচনা-সমালোচনার সাহায্যে শিল্প বিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং শিল্পোৎকর্ষের মান বিষয়ক কোন চিন্তাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না—সে চিন্তা নতুন নতুন রূপে ক্রমবর্ধিত।

শিল্পচিন্তা গতিশীল, ক্রমবর্ধমান স্বীকার করে নিলেও শিল্পের দার্শনিক ভিত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত পক্ষে সৌন্দর্যশাস্ত্র দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়, তবে এ দর্শন বিশেষ করে শিল্প সম্পর্কিত। কেউ কেউ সাধারণ দার্শনিক অর্থব্যঞ্জনাহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌন্দর্যশাস্ত্রের কথা বলেছেন, অথচ এক বা একাধিক দার্শনিক মতের সঙ্গে সে সৌন্দর্যশাস্ত্রের সামঞ্জস্য খুঁজেছেন। তাঁদের এ দাবি স্বতোবিরোধী, যেহেতু তাঁদের দাবির ভেতর বস্তুবাদী দর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে।

নক্‌শী কাঁথার মাঠ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

ভোরবেলা দুহাতে গোবর মাখতে মাখতে জগার বউ ভাবছিল এ সময়ে টুঙুস্‌-টাঙুস্‌ চুড়ির শব্দ হলে মানাতো মন্দ না। বাপের বাড়ির বিয়ের পাওয়া রূপোর চুড়ি ছ গাছা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শোনালো— লক্ষীলো করে নিয়ে গিয়ে হালের বলদ কিনেছে তার মিন্‌সে—বিয়ের জল না শুকুতেই।

গোবর মাখবার জন্য যতটা বলপ্রয়োগ সাধারণতঃ প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী জোর খাটাচ্ছে জগার বউ, মাঝে মাঝে গোবরের চাপড়া তুলে ভচাম্‌ শব্দে আছাড় মারছে। কারণ ওর এখন মন ভাল নয়। শরীরে রাগ।

সোয়ামী গেছে তারকনাথে হত্যে দিতে। শাউড়ি গেছে দত্তবাড়ি ধান ঝাড়তে। যাবার সময় কষে গাল দিয়ে গ্যাছে তার পুতের বউকে—বাপ্‌-পিতেমো তুলে। শরীল এত নরম ঝ্যানো ননীর পুতুল, সাতমাস গভভ পড়ল এখনই ছেরাব হতিছে, পায়ে ফুলো দিতেছে—যতবার গভভো হয় ততবার এই ঝ্যামেলি। পায়ে রসা হলে, অন্য মেয়েছেলের তেলাকুচোর রস তিনদিন খাওয়ালেই ফুলো মিশকে যায়। ঢ্যাম্‌নী বউয়ের শহরের হাসপাতালের নাল মিচকার চাই,—এঁ… :। আদর বিবি চাদর গায় ভাত পায় না ভাতার চায়।

জগার বউয়ের গা-সওয়া এইসব। তবু রোগব্যাধি নিয়ে দিবানিশি আঁক্‌সী মারলে ভাল লাগে? বল দিনি! জগার বউ কাছে দাঁড়ানো খেঁকী কুকুরকে মনে মনে শুধোয়।

ভাতার খেটেখুটে ভাত দেয় মোর মুখি, সত্য বটে, লাজ্য বটে, কিন্তু আমিও তো দেখদিনি লোকের বাড়ির গোবর মেঙে ঘুটে দিতেছি বেচব বলে, সেই পয়সা জমা করেই না ছেলের তরে গুড়মিছরি কিন্‌তেছি। শাউড়ি তবু ঠারবে। বউ নাকি ভাতারখাকী। পুতের মাথা খেয়ে শুধু বিয়োবার ফিকির আর খুঁটো গাড়াবার কম্মো ছাড়া কিছু জানে না মোটে।

—মরণও হয় না গো—ও-ও-ও। যদি শাউড়ি মরে সকালে, খেয়েদেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকেলে।

হাত ধুয়ে কোলের বাচ্চাকে মাই খাওয়াতে বসে জগার বউ। দক্ষিণে যতদূর চোখ যায়—মাঠ। চোতের রদদুরে সোনার গয়নার মত মাঠের রঙ। সামনেই বোরো ধান এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে। আমের বকুলের গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। উঠানের আমড়া গাছের ডালপালায় ঠিক্‌রে উঠছে নতুন পাতা। মাদার গাছে এয়োতি সিঁদুরের লাল ছোপ। করবী গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে ঝিরঝিরে রোদদুর সোনা ব্যাঙের মতন উঠোনে লাফায়। ভোরবেলাকার পাতলা কুয়াশা দূরে মাঠের গায়ে দুধের সরের মত লেপ্টে রয়েছে।

কোলের বাচ্চাটা দুধ না পেয়ে কচিকচি দাঁত দিয়ে বোঁটা কামড়াতে শুরু করলে ধু-র্‌রো বলে উঠোনে ছেড়ে দিয়ে কোমরের তাগায় দড়ি বেঁধে বাঁশের খুটোয় বেঁধে দেয়। তারপর লক্ষীর দুয়ার কাছে গতকালের বাসি পদ্মফুলের পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে মাঝখান থেকে পদ্মমুড়ি বার করে বা

হাতের তালুতে জমা করে ছেলেটার সামনে ছড়িয়ে দেয়। থাক্, খুঁটে খুঁটে খাক্।

বুন্দুরটা এতক্ষণে ঝিলিক্ মেরে উঠেছে। এভাবে ঝিম্ মেরে বসে থাকলে চলবেনি। ততক্ষণে ক্ষার-দেয়া কাঁথাটা পুকুর থেকে জলকাচা করে আনে জগার বউ। তারপর উঠোনে বাঁশের উপর শুকুতে দেয়।

দিদি-শাউড়ির তৈরী-করা কাঁথা। হাতে ভেল্কি ছিল বটে। দুইজোড়া হলুদ মাছের সারি দেয়া পাড়, কাঁথার মধ্যখানে এক পদ্মফুল, চারদিক থেকে চার প্রজাপতি, দুপাশে সাহেব মেম দুজোড়া। পাড়ের পাশে সবুজ সুতোর লতা আর লাল সুতোর ফুল।

গল্পকথা শুনেছে জগার বউ ওর দিদিশাউড়ির আমলের—চাল নাকি ছিল দুই টাকা মন। দুধ একপয়সা সের। ইছামতির জেলেরা হাঁক পেড়ে বলত, দুটো মাছ নে যাও কত্তা, একটা পয়সা থাকলি ছুড়ি দিও। এরকম কাল ছিল বলেই না রস ছিল অন্তরে। কাঁথাটার দিকে তাকিয়ে থাকে জগার বউ। কী মায়াভরা পাড়!

এই রোদে-দেয়া কাঁথাটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কলকাতার বাবুরা, দুমাস আগে। বাবুরা কলকাতা থেকে এসেছিল মাঘী পুন্নিমের মেলায়। ওম্ ধরাবার জন্য রোদে-দেয়া কাঁথাটা দেখে বাবুদের মনে ধরেছিল, বলেছিল এই কাঁথাটা ওরা কিনে নিয়ে যাবে। কলকাতা শহরে এক বিরাট পাকা দালানের মধ্যে এক মস্তো কাঁচের বাক্সের মধ্যে রেখে দেবে কাঁথাটা। কোলকাতা শহরের লোকেরা টিকিট কেটে দেখবে।

'কিন্তু মাঘের শীত বাঘের গায়ে লাগে যে'—এই মাঘ মাসে কাঁথাটা বেচে দিলে গায়ে দেবে কী! তাই ফাল্গুনের শেষাশেষি আসতে বলেছিল জগা। জগা কলকাতায় তেনাদের ঠিকানা চেয়েছিল, ভেবেছিল শীতটা গ'লে নিজেই কলকাতার বাড়ি খুঁজে কাঁথাটা দিয়ে আসবে। ওরা বলেছিল বারই ফাল্গুন হাড়োয়ার মেলায় যাবার পথে ওরাই যেচে নিয়ে যাবে।

হোক্ না বাপ-পিতেমোর স্মৃতি, এই ক্যাঁথা কত যত্ন-আত্তি করে বিছিয়ে দিয়েছিল জগার ঠাকুমা,—তার নতুন বে-হওয়া ছেলে-ছেলেবৌকে,—এই কাঁথার সেলাইয়ের খাঁজে গর্তে বাপ-পিতেমোর নিশ্বেস, শরীলের গন্ধ, গায়ের ঘাম মিশে আছে। বেচে দিতে মায়া হয়, তবু ন্যাজ্য কথাটা মনে লাগে—দুটো পয়সা হলে যাহোক্, দেনা কিছু শোধা যায়।

মেলার দিন জগা আর জগার বউ সারাটা দিনমান দাওয়ায় বসে, বাবুরা এল না। পরদিনও নয়। এখনো আশায় আশায় আছে জগার বউ, হুট্ করে বাবুরা এসে যাবে একদিন।

শাউড়ি এলে তারপরে উননে আঁচ পড়বে। ঢেঁকিতে চাল কোটার ঢিপিক্ ঢিপিক্ শব্দ। সামনের বিলে ধানের লুটোপুটি। শ্যালোপাম্পের শব্দ আসছে দূর থেকে, বুলবুলি পাখি ঠোঁটে করে নিয়ে যায় বাসা বাঁধবার খড়, চারিদিকের বাতাসে বেঁচে থাকার শব্দ, কোলের বাচ্চাটা উঠোনে পড়ে থাকা হলুদ কাঁঠালপাতা মুখে পোরে, বুড়ো ব্যাং ঘাড় উঁচু করে বসে থাকে জগার বউয়ের সামনে। ফরফর শব্দ করে ঘরের খুঁটোর বাঁশের ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে বোলতা। জগার বউয়ের কিছু ভাল লাগে না।

—হ্যাগা বড়ঠাকুরন, হ্যাগা পিতৃপুরুষ! তোমরা কি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের হরিনামের

ঝোলার পঞ্চাশ অস্তরী সোনার কলকা ছুটো এখন কোন বাবুবাড়ির বৌ-এর হাতের বাজু হয়ে গ্যাছে! হ্যাগো বড়্‌ঠাকুরন, এই ক্যাথায় আছে তোমার গায়ের পরশ, তোমার চরণের ধুল গো, নাকের নিঃশ্বেস। ভাঙ খাবার পর দুধ খেয়ে ঘুমজড়ানো চোখে এখানে মুছেছ তোমার মুখ, এখানেই আমাদের জন্মকথা আছে। তবু এভাবে বেচে দেব কেনে। পঞ্চাশডা টাকায় কত আরাম বল দিনি, বাস্তু যে বন্ধকী।

যদি বল কেনে! তবে তো তোমাদেরই গেরো-গঞ্জনা দিত্তি হয়—সোয়ামীর হ্যাবা রোগ হলি তোমাদেরকে স্মরেছি কত, কমলনি তো। শহরের হাসপাতালে তিরিশ টাকার ওষুধ খেয়ে গতর সারা। হালের বলদ জোড়া ঝিম্ ধরে ম'ল, তারপর হ্যাবার পোঙায় নতুন সব্বনাশের ব্যামো ধরলে উদরী। পেটে জল জমলে নাকি বাঁচে না। উদুরী বাদুরী যক্ষা—এ তিনে নাই রক্ষা। তবু বিন্‌চিকেচ্ছায় রাখা যায়, বল, তোমরাই বল। বিপত্তারিণী ব্রত কত করনু—কত। শেষে হাসপাতালে জবাব দিলে আমার ভাইয়েরা সব ধরে লিয়ে গেল টাকীর রায় ডাক্তারের কাছে। রাংতামোড়া ওষুধের দাম রুপোর গয়নার সমান পেরায়। কপালে থাক্‌লি আর ভগমানের দয়া থাকলি বাস্তু গেলে ফিরে পাব, কিন্তু যমের কাছে খাতির নেইকো, বল, যমে নিলে আর ফিরতি দেয় না। কজনা সাবিত্রীর মত সতী—যে যমের থিক্যে ভাতার ছেনাতে পারে।

ছুশো টাকা দেছে দত্ত,—বাস্তু বন্ধকী লিয়ে। সুদ দেবার তরে হপ্তায় দু'দিন বিনি মাগনায় গতর খেটে দিতে হয়। আমি যাই,—নইলে শাউড়ি ··

শাউড়ির চিৎকার শুনতে পায় জগার বউ, দূরের বাঁশঝাড় থেকে চিৎকার পাড়ছে বুড়ি,—আয় দিনি অ—বউ···। জগার বউ তেড়ে যায়। গিয়ে ছ্যাখে এক থলে চাল শাউড়ির কাঁখে। —অ্যাত্তো চাল, চোখকে পেত্যয় যায় না।

বাবুবাড়ি থেকে চাল মেগে এনেছে জগার মা, বাগ্দীবৌ পাঁচির শলায় মেতেছে বুড়ি। পাঁচি চালের ব্যাবসা করে। পাঁচি শলা দিয়েছে।—ঝ্যামেলির কিছু নেইকো মাসীমা, কোনরকমে বারাসাত তক্ যাত্তি পাল্লিই হল। ইস্টিশনের কাছেই পাইকার আছে। বুড়ি তার বৌমার জটাচুলে বিলি কাটতে কাটতে বললে,—গতর থাকলি আমিই যেতাম রে বউ। পাঁচি হেসেব দিলে বার কেজিতে দশ টাকা লাভ। তাই শুনে মার হাতে পায়ে ধরে এনেছি চালকটা। পাঁচি আজ ছুটোর গাড়ি ধরবে।—যাবার সময় আসবার তরে বললাম! তুই যাবি বৌ?

পাঁচি জগার বৌকে নিয়ে যাবার সময় বললে—কোন ভয় নাই মাসীমা, সব আমার চেনাজানা। ওরা রেলের কামরার কোনায় ঘুপটি মেরে বসল। পাঁচি আঁচল দিয়ে চালের ব্যাগটাকে ঢেকে নিল আর জগার বউএর দুই পা ফাঁক করিয়ে শাড়িটা একটু তুলে দুই পায়ের ফাঁকে বসিয়ে শাড়িটা নামিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল। ঘোমটা টেনে জগার বউ পাঁচির মুখের দিকে তাকাল। পাঁচি ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল। চোখ বলছে—ঠিক আছে তো সব? ট্রেন ছাড়ল। জয় গণেশ! পাঁচি বললে,—পেরথম দিন একটু-আধটু খারাপ লাগবেই রে মত্তি, পেরথম রাতের স্বামীর ঘরের কথা ভাব, পেরথম রাতেই ভয়ডর,—তারপর ঢ্যামোন ত্যামোন। কথায় আছে না,—অল্পশোকে কাতর—অনেক শোকে পাথর। –ও মত্তি—পুলিশ এলে ঘুপটি মেরে ওঁয়াদের চোখ চাইবিনি মোটে।

জাল্না পানে চেয়ে থাকবি।

একটু পরেই পাঁচি বল্লে,—পয়সা থাকে তো পাঁচটা লয়া বার কর্ দিনি। জগার বউ গিট্টু খুলে পাঁচটা পয়সা বের করে।—কেনেরে,—আইস্‌কিরিম খাবি? পাঁচি বললে,—দূর! সামনের খাল এলেই মনসা মেগে পয়সা ফেলে দিবি। ঐ জলে পীর আছে, বল্লি কথা শোনে। তেনার দয়া হলি দেখিস্ পুলিশে ছোঁবেনি। নে, হাত বাইর করে রাখ্।

ট্রেনগাড়ি চলে,—চার-পাঁচটা স্টেশন পেরিয়ে যায়, জানালার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই দুটি ছেলে এসে সমস্ত চালের লোকেদের কাছে পয়সা চায়। ওরা পাঁচিকে দেখায়,—পাঁচি ওদের চল্লিশ পয়সা দেয়। জগার বউ পাঁচিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই পাঁচি ফিস্‌ফিস্ করে বলে, বাবুদের খরচ।

ট্রেনগাড়ি চলে,—জানলার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে হুহু বাতাসে জগার বউয়ের মনখারাপের কথা মনে পড়ে। কি প্রকারে মহিষের মত মনিষ্যিটা বছর ঘুরতেই শুকিয়ে গেল। মেলায় ছাখা যুবতীর কঙ্কাল হওয়ার খেলাটার কথা মনে পড়ে, ঢাকঢোলের বাজনার তালে তালে তালে এক মেয়ে-মানুষের যৈবন গলে পড়ল আর শেষে কিনা, মাগো,—জগার বউয়ের বুকের মধ্যে ভীষণ জোরে ঢাক-ঢোলের বাজনা লাফাতে থাকে।

—হেই,—আজ বোধহয় চেকিং নাই, এখনো এল না যখন,···তুই পয়া আছিস্‌রে মতি! পাঁচি কনুইয়ে খোঁচা মারে জগার বউকে।

জগার বউয়ের মনে বড় আনন্দ হয়। ও পাঁচির হাতটা টেনে নেয়। হাতের উপর হাত বুলোয়। আঙুলের ফাঁক্‌ফোকড়ে জলহাজার ঘা; তবু, আশ্চর্য এক নরম মমতায় এবং নির্ভরতায় পাঁচির আঙুলের গাঁট চেপে ধরে। জগার বউয়ের তখন নিজেকে তার বাস্তুভিটের তুলসীতলার কাছের অপরাজিতা ফুলগাছের মত লাগে। পাঁচি কি তবে সজনে গাছ?—যাকে জড়িয়ে ধরেই অপরাজিতা গাছের বাড়বাড়ন্ত?

শনিঠাকুরের দয়ায় এই রকম নির্বিঘ্নে কয়দিন কেনাবেচা করতে পারলেই একটা বলদ কেনার পয়সা কি জমবে না? তারপর মামাশ্বশুরের কাছ থেকে আরেকটা চেয়েচিন্তে আনবে। স্বামীর হাতে টাকা কটা দিলি পরেই···আ মরণ, ঝপ্ করে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর প্রতিমার কথা মনে পড়ে তার,—নিজে যেন হাত বাড়িয়েছে তার স্বামীর দিকে।—আর তার স্বামী মহাদেবের মতন—ছি ছি—মনের ভীমরতি! কি আস্তাজ বলদিনি,—ঠাকুর দেবতার সাথে নিজেদের তুলনা?

জগার বউ জানালা দিয়ে উদলো গায়ের মাঠ ছাখে। জট্‌পাকানো চুলের মধ্যে বাতাস, শাড়ির ফাঁকফোকড় দিয়ে শরীরের মধ্যে কিলবিল করে বাতাস, কল্পনায় দেখে তার স্বামী ফিরে পেয়েছে তার শরীর, তার বুকের লোম বর্ষার হিঞ্চেশাকের মত তরতাজা। যেন বাঁ হাতের মুঠো উল্টো করে ধরে মুখের মধ্যে গলিয়ে দিল কাঁচা চাল, তারপর চাল চিবোবার কড়মড় কড়মড় শব্দ। ডানহাতের ঘটি থেকে হুড়হুড় করে মুখের মধ্যে ঢালছে জল, ঢকঢক করে গিলতে থাকলে গলার চাক্কি চডুইয়ের মত লাফায়।

সোয়ামী যাবে নাঙল দিতে। নাঙল দেয়া হয়ে গেলে জোড়া বলদে জোড়া থাকবে মই,

তার উপর দাঁড়িয়ে দুহাতে বলদের ল্যাজ ধরে হেই—হেই –হুররুরে হেই! রেলের জানালা দিয়ে যতদূর পজ্জন্ত ছাখা যায়, যেখানে আকাশ মিশেছে মাটিতে, সেখানে থেকে মইয়ে চেপে ছুটে আসছে হু-হু হাওয়ার মত হেই—হেই—হেইরে: তার পায়ের তলায় চেপে বসেছে মই। শক্ত মাটির চ্যালাগুলো মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো হচ্ছে,—প্রান্তরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছে ওর মনের মানুষ——সব জমি চষতে চষতে—হেই—হেই হুররুরে।

ইস্টিশনে থেমেছে গাড়ি, করসিং আছে মনে হয়।

মঙ্গলচণ্ডিকা তুমি অমঙ্গল হর
মোর প্রতি শুভঙ্করী শুভদৃষ্টি কর।
মহামায়া তব মায়া মোহিত এ জনে
ত্রাণ কর কৃপাময়ী কৃপা বিতরণে॥

মা কালীর শতনামের বই বেচতে এসেছে এক বুড়ো। এই গ্রন্থ যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে / কালীদেবী তুষ্ট হয় সবার উপরে। ফেরার পথে একটা শতনামের বই নিয়ে যাবে। একটা কলাই-করা থালার বড় দরকার। চালে লাভ হলে মুদি-দোকানে এট্টু নারকেল তেল কিনে চুলে দেবে। শাউড়ির কাপড়ে গণ্ডা দুই গেরো—একটি কাপড় কিনে নে গেলি, শাউড়ির হাতে দিলি বড় রগড় হয়।—যদি বল ক্যানো,—না তুমি আমারে আঁকুশী মারো,- তবু মোর তরে না লিয়ে তোর তরে শাড়ি নে এনু—মরণ! গরু না বিয়োতে ঘিএর দর। চাল রইল কাপড়ের তলায়, এখনি সওদা কেনার ফিকির।

আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো যেন মুরগীর কচিকচি ছানা। নিজের শরীলের ওমে ওদের জম্মো। সব্বদাই কাছে কাছে থাকে। ছুটোছুটি করে, লাচে। তেলাপোকার বাচ্চা পেলে ছানাগুলো কাড়াকাড়ি করে খায়। আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির মুরগীর ছানার মতন নরম শরীল, পাল বেঁধে বড় হয়, বড় হলে হাটের মহাজন ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে সদানন্দের হোটেলে বেচে দেয়।

দু হাত মট্‌কে হাই তোলে পাঁচি। সামনের ইশটিশন সোদ্দালিয়া, তারপরই বারাসত। ফিরতি গাড়িতেই ফিরে যাব রে মতি,—রাত নটার এধারেই ফিরব। ফিরে আজ আবার রান্না আছে।

ঝমঝম শব্দে ক্রসিংএর ট্রেন এসে পড়ে। জানালার থেকে মুখ বাড়িয়ে ওধারের ট্রেনের কেউ কেউ হেঁকে ওঠে—সোদ্দালিয়ায় পেশাল চেকিং, চেকিং হে···

পাঁচির আঙুলের ফাঁক দিয়ে জগার বউ ওর নিজের আঙুলগুলো সেঁধিয়ে দেয়। জলহাজার ভেজা স্পর্শ। পাঁচি হাতের চাপে নির্ভয় জানাতে চায়। জগার বউ রা কাড়ে না। ট্রেনের শব্দের মধ্যে—ভয় নেই তোর, ভয় নেই তোর, ভয় নেই তোর।

জগার বউ ছাখে যাদের কাছে চাল আছে, তারা কেউ রেলের পাইখানায় গ্যাছে চাল লুকোতে, কেউ ছাতের ফোকরে চাল রাখছে, কেউ গাড়ির চপ্‌টা উঠিয়ে তার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করছে। এক বুড়ী, এক লজেন্সওয়ালাকে বললে,—খাবার তরে তিন কেজি নিয়ে যাচ্ছিরে ভাই, তোর ব্যাগের মধ্যে রাখ্‌নারে—।

—অত সুবিধের খায় না। তোমার চাল বাঁচিয়ে দিলে একটাকা আমার চাই। এইসব দেখে

শুনে বড় ভয় পেল জগার বউ। পাঁচিও একটু ভয় পেল। চেয়ারে বসা একবাবুকে বিনয়-মিনতি করে বললে,—আপনার পিছনে রেখে দেবেন বাবু চালটা, হাত জোড়ছি। বাবু কট্‌মট্‌ করে তাকালে।

পাঁচি ফিস্‌ফিস্‌ করে গজরাল,—চাল কিনতে এনারাই থলি বাড়িয়ে আসে,—আবার দরে না পোষালে বলে সামাল্‌গার।

জগার বউয়ের ছিদাম পটোর কথা মনে পড়ে,—জ্যাঠা বলে ডাকতো ওনাকে, বাবুর পটের 'বোলান' মনে পড়ে—

যত আছে ভদ্দর লোক মিঠে মিঠে কথা।
এঁয়ারাই চিরকাল সমাজের মাথা॥
এঁয়াদেরই হাতে পড়ে অবস্থা কাহিল।
পুঁটুকীতে হাত বুলাইয়া কম্ম করে হাসিল॥

এইসব গান বেঁধে বুড়ো বয়সে ছিদাম পটো লোকের হাতে পেষাই খেয়েছিল।

—এখন কি আর এসব কথা ভাববার সময়! সামনের ইশটিশনেই রাজার ব্যাটা মদন হাস খায় খোলা ফেলায় শাঁস। তবুও বেগতিক বুঝলে দু পা জড়িয়ে ধরে উল্‌টি খেয়ে পড়লে মায়া-মমতা একটু কি হবে না? হোক না পুলিশ, তবুও মনিষ্যি তো বটে।

বাপ্‌রে ··। যেন বর্ষাকালের পুকুরপাড়ের সার-দেয়া ব্যাঙের ছাতা। ইস্টিশনের চাতাল জুড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেপাই-পুলিশ।

ট্রেনটা থামতেই ছিত্তিছান-হওয়া ডেঁয়ো পিপড়ের মত পিলপিল করে মানুষগুলো ছুটতে লাগল। যে যেদিকে পারে। মা এক আদানে পড়ে রইল তো ঝি ছুটল আরেক আদানে। কারুর মাথায়, কারুর কোলে, কোলের শিশুর মত চাল। কারুর কাঁখে তেষ্টার কলস যেমন। ছুটছে। —রেল লাইন পেরিয়ে ভাট্‌ফুল আর থাম্‌চি কাঁটার জঙ্গল পেরিয়ে মাঠের দিকে পিছন পিছন লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ—

জগার বউয়ের কামরায় চার-পাঁচজন পুলিশ এসে ঢুকল। খট্‌খট্‌ বুটের শব্দ। জগার বৌয়ের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়া পড়ে। ওরা ঢুকেই কলঘরের দিকে যায়। কালী ঠাকুরের হাতের মুঠিতে যেমন ধরা থাকে মরা মানুষের মাথার চুল,—ঠিক্‌ সে রকম মুঠি করে ওরা চালের ব্যাগ বের করে আনে। তারপর পাঁচিকে বলে, তোমার মালপত্তর বার কর। পাঁচি বলে, অনেক দিন পরে আজ নেমেছি, ছেড়ে ছ্যান ভাই।—

—আজ পেশাল চেকিং আছে দেরি কোরো না, বার করো।

—ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন, হেড পুলিশ আমার ভাই।

—ভাই! মজা মারাচ্ছো? কি রকম ভাই?

—পাতানো।

—কে হেড পুলিশ!

—ঐ যে গো, —লম্বাপানা, মুখে মায়ের দয়ার চিন্ন,—

এমন সময় ফুল প্যাণ্টলুন আর জামার জেবে তক্‌মামারা এক বাবু এসে হাঁক পাড়লে,—এক

কামরায় এতক্ষণ লাগে। একজন ছোট প্যান্ট্ পরা পুলিশ দাঁতমাজার আঙুল দিয়ে পাঁচিকে দেখায়।—না স্যার—এ বলছিল ও নাকি আপনার পাতানো বোন।

—এ রকম বোন অনেক থাকে। মাল বার করো। এই—

পাঁচি হেড পুলিশের কালো বুটে তার দুই হাত রাখে। —বাবু আজ অনেকদিন পর নাইনে এসেচি বাবু। কালীর কিরে, মিথ্যে বললে কুষ্ঠব্যাধি হবে। আজ ছেড়ে দেন বাবু। ইতিমধ্যে দুজন হাফ্ প্যান্টপরা পুলিশ পাঁচির চাল কেড়ে নিয়েছে।

জগার বৌ ভাবছিল ও বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেল। চুপচাপ ঠায় বসে পায়ে মাজায় ঝিম্ ধরে গেছে। জগার বউ মনে মনে তারকনাথের নাম করে।

জগার বউয়ের চোখের পানে এক নজর চায় হেড পুলিশ। জগার বউ বাঁ হাতে শাড়িটা তলার দিকে টেনে দেয়। আচম্বিতে বজ্রপাতের মত হেড পুলিশ হেঁকে ওঠে—কাপড়টা ওঠাও। বলতে না বলতেই একজন পুলিশ জগার বউয়ের দুই পায়ের মাঝখানে একটা সরু লোহার শলা গলিয়ে দেয়।

—এটা কী, অ্যাঁ! পাক্কা স্মাগলার দেখছি। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেও পুলিশকে ফাঁকি দেয়া যায় না।

তারপর কতগুলো হাত, যে হাত দিয়ে মানুষ পাঁঠা কাটে,—যে হাত কংস রাজার মত,—নৃসিংহ অবতারের নখর—সেই হাত এগিয়ে আসে তার দিকে। এগিয়ে আসা হাতগুলো কাপড়ের তলায় চালের বস্তা বার করে। জগার বউ কুঁকড়ে গিয়ে চালের বস্তাকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে। জগার বউ ভীষণ জোরে চালের বস্তাটা চেপে রাখবার সময় মনে মনে ভাবে দানাদানা চালের কণা তার শরীরের গভীরে ঢুকে যাক—যেমন তুলোর গভীরে ভরা থাকে ওম্।

এ চাল দেবনি,—এ আমার গতর খাটুনির চাল। আমার অক্তজলের চাল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন, সাপের মত জোরে জোরে প্রশ্বাস পড়ে ওর। ঝড়ের নারকোল গাছের মত মাথা নাড়ায়। আমি গরিব মানুষ বাবু, তোমরা না দেখলে মরি যাব বাবু।—চুলগুলো উৎপাটিত গাছের শেকড়ের মত ওর চোখের সামনে ঝুলছে।

—লেক্‌চার ঝাড়িস্ নি। চাল দে।—জগার বউ চালকটা দেয় না। জগার বউ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, শপথ আর আর প্রতিজ্ঞা দিয়ে চেপে রাখে তার চাল। টানাটানিতে বস্তার সুতো ছিঁড়ে যায়, তলা দিয়ে পড়ে একটা একটা চাল। পাঁচি ততক্ষণে পরপুরুষের পা ছেড়ে দিয়ে ঝুরঝুর করে পড়া চালগুলো আঁচল পেতে জমা করে।

কতটুকুই বা শক্তি থাকে জগার বউয়ের পেশীতে। শেষ পর্যন্ত চালের বস্তাটা ওরা নিয়ে যায়।

ঘূর্ণিঝড়ে ওড়া টুক্‌রো কাগজের মত কিছু সর্বস্ব-হারানো মানুষ বুটের শব্দের পিছন পিছন ছুটে চলে। প্রত্যেকের বুকে একটা করে গোটা কামারশালা। কালো কড়াইয়ের উপর তপ্ত বালির নাড়াচাড়ায় যেমন শাদা খইয়ের জন্ম, সে রকম। তবুও বেঁচে থাকার ইচ্ছে। জগার বউ ডাঙায় ওঠানো মাগুর মাছের মত ইস্টিশনের চাতালে লুটোপুটি খায়—যেখানে থামের মত বুটওয়ালা পা দাঁড়ানো আছে। সমবেত কান্নার মধ্যে জগার বউয়ের কান্নার আলাদা কোন অর্থ নেই। —যেমন

প্রতিটি শাপলাফুলের ডুবে যাবার একই রকম আর্ট, যেমন শীতের দিনে শিরীষ গাছের প্রতিটি পাতা একই অর্থ নিয়ে ঝরে যায়, যেমন মৃতদেহের কাছে প্রিয়জন কাঁদে, সেরকম সমবেত কান্নার মধ্যে পাঁচি, জগার বউ কিংবা ল্যাংড়া লোকটা—প্রত্যেকের চোখ থেকে একই রকম বৃত্তান্ত বয়ে আনে জল। জগার বউ শেষ বারের মত পা জড়িয়ে ধরে,—পরপুরুষের পা। সেই পরপুরুষের হাঁটুর কাছে জগার বউএর মাথা।—আর আসব না হুজুর—

পিপড়ে ধরে গেলে কোন জিনিস যে ভাবে ঝাড়তে হয়, সে রকম ঝাড়া দিয়ে ওঠে পরপুরুষের পা। জগার বউ তারপর কপাল থাবড়ায়।

তারপর শেষকালে সমস্ত চাল একটা কালো ভ্যানগাড়িতে ওঠানো হয়। ভ্যানটা ছেড়ে দিলে কিছু নিঃস্ব আতুর তাদের শরীরের অংশের জন্য কালো গাড়ির পিছন পিছন ছুটে যায়। জগার বউও ছুটে যায়। হাওয়ায় দু হাত, উন্মুক্ত বুক—ধুলোয় আঁচল। কতদূর যেতে পারে হবিবগঞ্জের জগার বউ ?

তারপর সন্ধ্যে হয়। পাঁচি আর জগার বউ ইস্টিশনে আটটার গাড়ির জন্য বসে থাকে। খোলা মাঠে কেঁদে মরে চাঁদের আলো।

জগার বৌ ভাবে ও হচ্ছে অলক্ষ্মীর অলক্ষ্মী। বে হতে না হতেই স্বামীর ব্যামো,—বাস্তু গেল বন্ধকী। ও ভাবতেই পারে না এই চালের টাকা শুধবে কী করে।

ধম্মশাস্তরের সতীর কথা মনে পড়ে। ও যদি পারতো লণ্ডভণ্ড করে দিত বিশ্বজগৎ—রেল লাইন, বসিরহাটের বাজার, রায় ডাক্তারের দোকান, দত্তবাড়ির গোলা !

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে জগার বউয়ের। রেলের কলে জল নেই। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়।

জগার বউ ভাবে রাত্রেই কাপড়ে আগুন দেবে ও। ল্যাম্পের মধ্যে যেটুকু কেরোসিন আছে তাই ছিটিয়ে দেবে। দাউদাউ জ্বলবে। যে শরীলের মধ্যে সেলাই করা সবুজ রং-এর পাতা আর লাল রং-এর ফুলের মত আশা-আকাঙ্ক্ষা। যেমন একটা পুরুষ্ট খোকার সাধ, হলুদ সুতোর সাহেব মেম্—যেমন স্বামীর সোহাগ, নীল সুতোর প্রজাপতি—মশলা দিয়ে তপশে মাছ। নকৃশী কাঁথার মত শরীরের মধ্যে যেসব বাসনাগুলো সেলাই করা, সে শরীর জ্বলবে। জ্বলতে জ্বলতে ওর দেহের আগুন ঘর ছাড়িয়ে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে। ওর কোলের 'কচি' আগুনের ভাষা বুঝে চিৎকার করবে,—ওর শাশুড়ী চিৎকার করবে, পাড়ার লোকেরা ওকে বাঁচাবার জন্য ভারী কম্বল বা তোশক কিছুই পাবে না। তখন কলকাতার বাবুদের জন্য তুলে রাখা নকৃশী কাঁথাটাই পাবে। নিজে তো আর আগুনের ভিতর থেকে হাত নেড়ে বলতে পারবে না যে ওটা নয়, ওটা নিও না গো।

তারপর নকৃশী কাথাটা পুড়বে। ঠিক্ হবে, বেশ হবে ! 'তোমরাও পেলে না গো কলকাতার লোক'। আশা দিয়ে চলে গেল, আর এল না, সে সময় যদি তোমরা আস, দেখবে জগার বউ মত্তি পুড়ছে,—ওর আগুনে পুড়ছে নকৃশী কাঁথা, পুড়ছে সবুজ সুতোর পাতা আর লাল সুতোর ফুল, পুড়ে যাচ্ছে হলুদ সুতোর জোড়া মাছ—সুখে থাকার সাধ, পুড়ে যাচ্ছে পদ্মফুল, পুড়ে যাচ্ছে প্রজাপতি।

ছিদাম পটো যদি বেঁচে থাকতো এখন, তা হলে একটা পট আঁকতে পারত, গাইতে পারতো,

হবিবগঞ্জের বউ মতি নাম যার
তাহার দুঃখের কথা করিনু প্রচার।
বসনে আগুন দিয়া ত্যজিল জীবন
সেই বেত্তান্ত ভাই বর্ণিব এখন।

জগার বৌ হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ বসে ছিল। পাঁচি ওর চুলে হাত বুলোয়। পাঁচির সারা হাতে জলহাজার ঘা। বলে,—চ। পাঁচি তারপর নিঝুম স্টেশনে, এবং শ্মশানের মত চৈত্রের মাঠে একটা দীর্ঘ প্রশ্বাস ছড়িয়ে বলে,—কপালটাই খারাপ আমাদের। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে চ—চ মতি। রেলের সিংগেল দেয়নি এখনো। চলগে, খুঁজে পেতে জল খেয়ে আসি।

চিন্তা করিস্‌নি। তোতে পুলিশে টানাটানির সময় পড়ে যাওয়া কিছু চাল আমি আঁজলা পেতে জমা করেছি। কিলোটাক হবে। তুই নিস্‌। কালকের দিন পরশুর দিন চলে যাবে যাহোক্‌। তার পরের ভাবনা পরে।

—চালটা ধর্‌।

স মা লো চ না

পরিপ্রশ্ন—জ্যোতি ভট্টাচার্য। সুপত্রা। কলিকাতা, ৫। মূল্য পনেরো টাকা

"পরিপ্রশ্ন": ব্যাপৃত জিজ্ঞাসা, অনেক সময় একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে ছাপিয়ে-ওঠা আলোচনা। অত্যন্ত যথাযথ নামকরণ হয়েছে এই গ্রন্থের।

বাংলা গদ্যের তথা বাংলা প্রবন্ধের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত সময় যাচ্ছে। সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার মধ্যবর্তী সীমারেখা একাকার হয়ে আসছে, যথেচ্ছাচার বাড়ছে, যে-কেউ যা খুশি লিখছেন, ব্যাকরণ বানান বাক্যগাঠনিক অনুশাসন সব-কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে। মাথার উপর বলবার কেউ নেই, লিখে গেলেই হলো। এই প্রবণতাহেতু প্রতীপ ফলও ঘটছে। বাংলা প্রবন্ধ পাঠের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, পাঠকের সংখ্যাও তাই কমে এসেছে।

এবং সেজন্যই জ্যোতি ভট্টাচার্যকে আরো বেশি করে কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা হয় "পরিপ্রশ্ন"-র জন্য। জ্যোতি ভট্টাচার্য ব্যস্ত মানুষ। বিদগ্ধ মানুষ। সাহিত্যের অধ্যাপনার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতি-চর্চার সাযুজ্য ঘটিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিমান পুরুষ তিনি। অনুমান করি, নিছক লেখার সময় তাঁর সীমিত। কর্মঠাসা দিনযাপনের ফাঁকে "পরিপ্রশ্ন"-র প্রবন্ধাবলী রচিত হয়েছে। তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত প্রবন্ধগুলি: 'বানভট্টের "হর্ষচরিত"', 'কালচার ও সংস্কৃতি', 'রাজনীতির ভাষা'। বিষয়বস্তু নিয়ে অব্যবহিত পরে আমি আলোচনা করবো, আপাতত আমার মন্তব্য জ্যোতি ভট্টাচার্যের বিভঙ্গ নিয়ে। তিনি অবশ্যই পণ্ডিত মানুষ, বেশ-কিছু 'পণ্ডিতি' সমস্যাও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে-আলোচনায় পণ্ডিতম্মন্যতা আদৌ প্রবেশ করেনি। পুরো বইতে আসলে এক কথকতার স্বাদ। সোজা, সচ্ছল ভাষাব্যবহার, কোনো বাঁকাচোরা ভাব নেই, কালোয়াতি নেই, উদ্ধৃতি ইত্যাদি বেশির ভাগই পরিশিষ্টে অথবা সংযোজনায় আবদ্ধ। এই গুণই হয়তো সদর্থে সংস্কৃতির পরিচায়ক।

'বাণভট্টের "হর্ষচরিত"' সাদামাটা সাহিত্য-আলোচনা নয় আদৌ। বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন, রাজারাজড়ার গুণগান তাই অবশ্যই গাইতে হতো তাঁকে, কিন্তু, জ্যোতিবাবু দেখিয়েছেন, 'হর্ষচরিত' তন্নিষ্ঠমন হয়ে পড়লে উলুখড়দের জীবনযাত্রার বহু বিবরণ পাওয়া সম্ভব: সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রার বর্ণনা, কৃষিকর্মের বিবরণ, জীবনানন্দ দাশের ভাষায় যা পুকুর-নদী-ঘাস হিসেবে বর্ণিত, সেই দৈনন্দিন অভ্যস্ত নিসর্গশোভা, সৈন্যদের পদভরে টলমল ধরাতল, সে-অবস্থায় পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা, হর্ষবর্ধনের সমকালীন যুগে সামন্ততন্ত্রের আকার প্রকরণ। বাণভট্টের রচনায় জ্যোতিবাবু একটি সুসংস্কৃত মন আবিষ্কার করেছেন, এমনকি একটি সমাজচেতন মনও, যে-মন রাজসভার আরক্ত ভিড়ে রুদ্ধশ্বাস, রাজপ্রশস্তির ছলে বাণভট্ট তাই যেন বাঁকাচোরা কথা শোনান, সুযোগ পেলেই সাধারণ দেশবাসীর প্রসঙ্গে অভিগমন করেন। যদি জ্যোতিবাবুর পৌরোহিত্য স্বীকার করে নিই, তাহলে এ-ও বলতে হয় বাণভট্টের রচনায় এমনকি সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের সূত্রপাত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, 'কালচার ও সংস্কৃতি', গ্রন্থের প্রধান অংশ। আপাতবিচারে অনেকগুলি টুকরো-টুকরো লেখার সমাবেশ এখানে, হয়তো কোনো সাময়িক পত্রিকার কিস্তি মেটানোর তাগিদে পর পর রচিত, ম্যাথু আর্নল্ড রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণ অনুপস্থিত নেই, বুদ্ধদেব থেকে বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য থেকে শৌচাগার, লেনিন থেকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, রাজা লীয়রের আত্মজিজ্ঞাসা থেকে পণ্ডিতি বাংলায় হালে যে-প্রসঙ্গকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ, জ্যোতিবাবু সংস্কৃতির আলোচনায় অনেক মহলে সমান সাচ্ছন্দ্যে প্রব্রজ্যা করেছেন, এবং তা পেরেছেন কারণ তাঁর বিচারবিহারে মার্ক্সীয় প্রজ্ঞার আয়োজন প্রভাস : '…সংস্কৃতি বলতে শুধু সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক-সাহিত্য নয়, শূকর-পালনও সংস্কৃতির অন্তর্গত। আরেকভাবে দেখলে, সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক-সাহিত্য ও নানা চারুকলার পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে সে উদ্দেশ্য সংস্কৃতি বর্জিত হতে পারে, সংস্কৃতি-বিরোধী হতে পারে। সংস্কৃতির সংগ্রাম মানুষের রুচিবোধ, নীতিবোধ, ন্যায়বোধ, বিচারবোধ সবকিছুকে নিয়েই, কারণ এগুলো পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার নয়, পরস্পর সম্পর্কিত।' (পৃষ্ঠা ১৫৭) এই অনুচ্ছেদে জ্যোতিবাবুর প্রাঞ্জলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। জীবনের নানা অবধারিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা এমন ঋজু না হলে যেন মানাতো না, অথচ এই ঋজুতা সহজে আসে না। "পরিপ্রশ্নে" এসেছে : কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, বিধৃত মতের সঙ্গে কোথাও যদি আপনার সামান্য অমিলও থাকে, এই গ্রন্থ তাহলেও, আমার দৃঢ় ধারণা, আপনার বিরক্তি উদ্রেক করবে না, রচনার প্রসাদগুণে আপনি বাঁধা পড়ে যাবেন।

'বুদ্ধদেব' বিষয়ে প্রবন্ধটি বিশেষ করে অনেককে চমৎকার করবে : এখানে জ্যোতিবাবু শুধু কথক নন, গবেষকও। বুদ্ধদেব বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন, এই লোকপ্রবাদ দুর্মর। জ্যোতিবাবু 'মহাবগ্গপালি' থেকে পংক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, যা রটেছে তাতে খাদ আছে, আমরা যাদের ইদানীং কায়েমী স্বার্থ বলি তাঁদের চাপে পড়ে তথাগত বিধান দিয়েছিলেন দাসদের, তথা রাজকার্যে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের, প্রব্রজ্যায় অধিকার নেই ('ন, ভিক্খবে, দাসো পবনজেতব্বো')। বুদ্ধদেব এবং প্লেটো একাকার হয়ে যান, অন্তত এ-ব্যাপারে যান, "পরিপ্রশ্ন" প'ড়ে আমাদের জ্ঞান ব্যাপ্ততর হলো, মস্ত লাভ এটা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'রাজনীতির ভাষা' নিয়ে আলোচনা। জ্যোতিবাবু সক্রিয় রাজনীতি করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যের অধ্যাপক, ভাষাবিদ, রাজনীতির ভাষা বিষয়ে তিনি ঠেকে শিখেছেন, দেখে শিখেছেন। সমস্যা দ্বিবিধ। প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্তরা এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের অভ্যস্ত ভাষার সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের আকাশপাতাল ব্যবধান, এখানে মেলাবার প্রশ্ন প্রকাণ্ড বড়ো। তাছাড়া, সাম্যবাদী তত্ত্বের একটি প্রধান অংশ বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় ছড়ানো-ছিটানো, আমাদের স্ব-স্ব ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন, এই অনুবাদকর্মে পরিচিকীর্ষার অভাব ঘটলে কী মারাত্মক ফল হতে পারে তা নিয়ে জ্যোতিবাবু চিন্তিত। পরাধীনতার নিগড়ে বহুদিন বন্দী-থাকার পরিণামে যে-বাঁধা বুলির ঐতিহ্য, তিনি সে-সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, রেখে-ঢেকে বলেননি, মধ্যবিত্তসুলভ ভদ্রতা এখানে সর্বনেশে, ভাষার মুক্তির সঙ্গে রাজনীতি ও সংস্কৃতির যে-গভীর নৈকট্য, তা তীক্ষ্ণ ভাষায় বিবৃত করেছেন।

সব-মিলিয়ে বলবো, "পরিপ্রশ্ন" বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তে এক মূল্যবান সংযোজন। এই

গ্রন্থে জ্ঞান এবং আনন্দ একই সঙ্গে পরিব্যাপ্ত। জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ, তিনি আরো লিখুন।

অশোক মিত্র

ন হন্যতে—মৈত্রেয়ী দেবী। মনীষা। কলিকাতা, ১২। মূল্য কুড়ি টাকা

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী খরস্রোতা নদী নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ও এ শতাব্দীর প্রথমে কিছু সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ তাঁদের লেখায় তৎকালীন বঙ্গসমাজের চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন, "জীবনস্মৃতি"-তে এক প্রকাণ্ড মনের প্রকাণ্ড প্রকাশ। কিন্তু আত্মকথা বলতে বহুবর্ষব্যাপী যে ইউরোপীয় চেষ্টা—যেখানে মানুষ নিজেকে নগ্নভাবে মেলে ধরেছে পাঠকের সামনে, সেই তীব্র উপলব্ধির চেহারা দুর্লভ। আমাদের আত্মজীবনীতে বিশিষ্টতা অর্জনের ঝোঁক বড় বেশী। আত্মজীবনী লিখতে বসলেই মোপাসাঁর গল্পে কবরখানায় উৎকীর্ণ অতিরঞ্জন ও মিথ্যাচার আমাদের পেয়ে বসে। আবার কখনও অত্যধিক সারল্যে পেয়ে বসে, যেমন একদা হেমচন্দ্রকে দেখবার জন্যে নদীর দুধারে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হয়েছিল, এ বর্ণনা আজ হাস্যোদ্রেকের কারণ। এমনকি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাসের আত্মকথার কিছু অংশও এই কারণে হাস্যকর। এই অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এমন জোরাল যে নিজেদের শৈশবের কাপট্য উদ্ঘাটনেও (যেমন জাঁ পল সার্ত্রের শৈশব-স্মৃতিচারণ) লেখকেরা তৎপর। এদিক থেকে স্বাভাবিকতায় সজীব গ্রাহাম গ্রীনের আত্মকথা। গ্রীন এক বিশিষ্ট পরিবার এবং গ্রীন নিজেও তো পরাক্রমশালী লেখক। কিন্তু সর্বদাই তাঁর আবেগ ও আত্মানুসন্ধান সাধারণ্যের খোলা হাওয়ায় মিশে আছে।

"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"-এর মতো একটি সুখপাঠ্য বইয়ের লেখিকার সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস নামে বর্ণিত আত্মজীবনীতে আমাদের সব কিছু প্রত্যাশা মিটে যাবে এমন ভাবনা ভুল। বাংলা আত্মজীবনীতে বিশিষ্টতা প্রকাশের যে সংক্রামক ঝোঁক তা থেকে লেখিকা মোটেই মুক্ত নন। তিনি যে অনন্যা, একথা নানাভাবে বলেছেন, তবে পাঠকের কাছে তা অসহ্য হয় নি। তার প্রধান কারণ নায়িকার আত্মীয়স্বজন পরিবেশ বর্ণনায় তিনি সুন্দর সাহস দেখিয়েছেন। তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা করেছেন নিকটতম আত্মীয়ের। বাঙালী মহিলা লেখিকার পক্ষে এ সাহস দুর্লভ ও সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

এ গ্রন্থের মূল আখ্যান একটি প্রেমকাহিনী। ষোল-সতেরো বছর বয়সের একটি প্রায়-কিশোরীর সঙ্গে ইয়োরোপীয় তরুণের প্রণয়। এ অংশটি, বিশেষ করে গ্রন্থের প্রথম পর্ব, সবচেয়ে সুলিখিত। বাঙালী উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি কিশোরীর আত্মদানে মানসিক দ্বন্দ্ব, দেহ ও মনের বিরোধ সাবালক মনকেও কাড়ে। এখানে লেখিকা যেমন গতানুগতিকতা-পন্থীও নন, তেমনি চটকের প্রতি আকর্ষণও কম। নায়িকাদের বাড়ি থেকে নায়কের বিদায় মর্মস্পর্শ করে।

সবচেয়ে অস্বস্তির কারণ ঘটান অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ গ্রন্থের প্রাথমিক দুর্বলতা এইখানেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আমাদের দেশের মানুষের আবেগকে নানাভাবে পরিণতির পথে নিয়েছে কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে কার ভাঙাহৃদয় জোড়া লাগাতে সাহায্য করেছেন তা প্রেমের কাহিনীতে বাহু। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ আসেন স্বাভাবিকভাবে অবসর যাপনে কিন্তু অমৃতা-মিটার প্রেমকাহিনীতে মহাপুরুষের উপস্থিতি অবান্তর। এই কারণেই বিরক্তিকর রবীন্দ্রনাথের ক্রমাগত কোটেশান। আমরা তো সকলেই জানি লেখিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা !

তাছাড়া স্মৃতিচারণের ঢঙে লেখা উপন্যাস লেখার চেষ্টায় যা সচরাচর মার খায় তা হোল গড়ন। চরিত্র ও ঘটনার আবর্তনে যে কাহিনীর গতি তার সম্ভাবনা ছিল প্রথম পর্বে, কিন্তু বাকী তিনটে পর্বে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি, এবং জোর করে টেনে চলে মূল কাহিনী। পার্শ্বকাহিনী, যেমন নায়িকার দাম্পত্যজীবন, যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে তা জোড়ে না। নায়িকার ইয়োরোপ যাওয়া এবং শেষ দৃশ্যে অন্ধ নায়কের দর্শনলাভ কষ্টকল্পিত। প্রথম পর্বে নায়কের বিদায় মর্মস্পর্শী কারণ তা জীবন্ত, শেষ দৃশ্য চেষ্টা করে তৈরী, কৌশলমাত্র। "ন হন্যতে" র যে আগুন লেখিকা জ্বালিয়েছিলেন ক্রমাগত নাড়াচাড়িতে তা ক্রমশ ছাই। পাঠক গ্রন্থ শেষ করেন এক মিশ্র অনুভূতিতে, একই সঙ্গে তৃপ্তি ও অতৃপ্তির মাঝখানে।

অসীম রায়

The Debt Trap. *By* Cheryl Payer. Penguin Books. London. Rupa & Co., Calcutta, 12. 60*p*.

ঋণের ফাঁদ পাতা তৃতীয় ভুবনে এবং কে কখন ধরা পড়ে কে জানে! এই ফাঁদ পেতেছেন মার্কিন সরকার এবং তাঁর বশংবদ রাষ্ট্রগুলো। উদ্দেশ্য, তৃতীয় ভুবনের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করা।

আলোচ্য পুস্তকের বক্তব্য এই। লেখিকার বয়স ৩৪, মার্কিন ছাত্রী, হার্ভার্ডের রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পিএইচ. ডি., চীন সম্পর্কে কৌতূহলী, ওয়াশিংটনে এজেন্সি কর ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট-এ স্বল্পকালের জন্য কর্মী। ইণ্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড, সংক্ষেপে আই এম. এফ. সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হন হ্যারি ম্যাগডফ-এর আনুকূল্যে। মোটামুটি এই পরিচয় থেকে, লেখিকার বিশ্ববীক্ষা সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ চেরিল পেয়ার বামপন্থী মার্কিন এবং তৃতীয় ভুবনকে মার্কিন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করতে চান। কী কারণে তিনি মার্কিন তথা আই. এম. এফ. তথা ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন, তা তিনি ভূমিকাতে বলে নিয়েছেন। ভূমিকাটি নাটকীয় এবং যাঁরা এই বিষয়ে কৌতূহলী তাঁদের এই পুস্তকটি পড়তে বাধ্য করবে।

ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, কাম্বোডিয়া এবং আর্জেন্টিনায় সশস্ত্র বাহিনী যখন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয়, তার সপ্তাহ কয়েকের পরই আই. এম. এফ. থেকে বিশেষজ্ঞরা হাজির হন অর্থনীতি বিষয়ে সেই সব দেশের শাসকদের উপদেশ দিতে।

ফিলিপিনস, কলম্বিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় নির্বাচনের সময় আই. এম. এফ-বিরোধী আওয়াজ দিয়ে যাঁরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে তাঁরা সত্বর আই. এম. এফ.-এর হুকুমদার হয়ে উঠলেন।

যুগোস্লাভিয়াতে ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে আই. এম. এফ. ক্রমশই সেই দেশের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে লাওস এবং কাম্বোডিয়াতে আই. এম :এফ. ছাড়া কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকার চলতে পারত না এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো, আলোচ্য পুস্তকের প্রকাশকাল ১৯৭৪।

এই আই. এম. এফ. লেখিকার বিবেচনায় একটি দানবীয় বিশ্বশক্তি। এর রসদ জোগায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। ১৯৭৪ সালে এর হাতে ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আদায় করা চাঁদা, ২৯ বিলিয়ন ডলার, ধরা যাক ২৩০০০ কোটি টাকা। যদি কোনো দেশ আই. এম. এফ.-এর পরামর্শ না শোনে, তাহলে পুঁজিবাদী দেশ থেকে কোনো রকম সরকারী বেসরকারী ঋণ পাওয়া দুষ্কর। আর যে দেশে আই. এম. এফ. থেকে ঋণ নিয়েছে, সেই দেশের সাম্রাজ্যবাদী খপ্পর থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। লেখিকার বিবেচনায়, তৃতীয় ভুবনের যে-কোনো রাষ্ট্র কতটুকু স্বাধীন তা আঁচ করা যাবে সেই দেশ আই. এম. এফ. থেকে কতটুকু ধার নিয়েছে তা থেকে।

এই ঘোরতর আই এম. এফ বিরোধী বক্তব্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যাঁরা আই. এম. এফ.-এ কাজ করেন তাঁরা সব কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী। লেখিকা অবশ্য এইসব কর্মীদের সোজাসুজি কুচক্রী বলতে চান না, হয়তো এঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এক বৃহত্তর কুচক্রীদের স্বার্থে কাজ করছেন। কিন্তু অর্থনীতির মাধ্যমে রাজনীতির প্রসার পরিষ্কার হয়ে আসে আই. এম এফ. কার্যের ফল থেকে এবং লেখিকার উদ্দেশ্য আই. এম. এফ.-এর এই পূর্ণ ব্যবস্থাপনার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর লেখিকা আলোচনা করেছেন পরপর অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো: তৃতীয় ভুবনের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট, আই. এম. এফ.-এর ঋণ দেওয়ার শর্ত, ফিলিপিনস্, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, যুগোস্লাভিয়া, ব্রাজিল, ভারত, চিলি, গানার আই. এম এফ. থেকে ঋণ পাওয়ার পর দশা, উত্তর কোরিয়ার ফাঁদ থেকে অতঃপর তিনি আই. এম. এফ.-এর সঙ্গে ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের সম্পর্ক, আই. এম. এফ.-এর সঙ্গে মার্কিন সরকারের সম্পর্ক, আই. এম. এফ-এর সংস্কারের সম্ভাব্যতা-বিহীনতা এবং স্বাধীন থাকার উপায় সম্পর্কে তাঁর মতামত দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, কোনো দেশের অর্থনীতি দু-দশ পাতায় বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আলোচ্য পুস্তকটি পড়ে পাঠকমাত্রই আই এম. এফ.-এর বদমাইশি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে যাবেন এটা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই পুস্তক পাঠের পর কোনো পাঠকই সম্ভবত একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারবেন না যে, ধার করা এমন কি গর্হিত ব্যাপার, ধার তো সব দেশই করে, ধার করা মানেই স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া নয়। বরং এই আলোচনা পড়ে এটা মনে হওয়া খুবই সঙ্গত, যে দেশের ধার করে ধার শোধ করার মত ক্ষমতা নেই, সেই দেশের ধার করাটা আজ সংকট উত্তরণের উপায় হতে পারে, কিন্তু আখের পরিণাম সম্ভবত ভয়াবহ।

যাঁরা অর্থনীতির কেতাবী ছাত্র নন, অথচ অর্থনীতির ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে আগ্রহী, তাঁদের

পক্ষে চেরিল পেয়ার সহজপাঠ্য। গ্রন্থের প্রথমভাগেই তিনি ব্যালান্স অব পেমেণ্ট কীভাবে পড়তে হয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে কোন আগ্রহী পাঠকই এই ব্যাখ্যা থেকে ভারতের ব্যালান্স অব পেমেণ্ট বুঝে নিতে পারেন। ভারত সরকারের প্রকাশিত সহজলভ্য *India 1975, India 1974* ইত্যাদি তথ্যসংক্রান্ত পুস্তকগুলোতেই এই ব্যালান্স অব পেমেণ্ট প্রত্যেক বৎসরই মুদ্রিত হয়।

আই. এম এফ. যে-সব শর্ত পালিত হলে ঋণ দেয়, তা মোটামুটি এই :

(ক) বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ কড়াকড়ি হ্রাস এবং আমদানি ব্যাপারে ঋণ-গ্রহীতা রাষ্ট্রের উদার মনোভাব। এর অর্থ হলো : বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করার জন্য রাষ্ট্রটি কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখবে না, বাজারের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করবে, আমদানি করবে। এর উদ্দেশ্য বলাই বাহুল্য। দরিদ্র দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় এর ফলে অতি সত্বর শেষ হবে, বৈদেশিক ঋণ আসার পথ সহজতর হবে।

(খ) বিনিময় হারের মূল্যহ্রাস। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার উপর আর একটা ঘা।

(গ) মুদ্রাস্ফীতি রোধ এই উপায়ে

(১) ব্যাঙ্ক ঋণের নিয়ন্ত্রণ : ঋণের উপর সুদের হার বৃদ্ধি

(২) সরকারী ঘাটতি রোধ : বেশি খরচ করা চলবে না, ট্যাক্স বাড়াতে হবে, রাষ্ট্রীয় সংস্থা নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ভরতুকি রোধ, ইত্যাদি

(৩) বেতনবৃদ্ধি রোধ চলবে না।

(৪) মূল্যনিয়ন্ত্রণ চলবে না।

(ঘ) বৈদেশিক পুঁজিকে যথেচ্ছ সাদরে নিমন্ত্রণ।

আই. এম. এফ যখনই কোনো দেশকে ঋণ দেয় তখনই সেই দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার পরামর্শ দেয়। এবং সুদৃঢ় করার উপায় হচ্ছে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো। পরামর্শ না শুনলে ঋণ পাওয়া দুষ্কর, শুনলে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বজায় রাখা দুষ্কর। আই. এম এফ-এর ঋণ নেওয়া হলো, পরামর্শ নেওয়া হলো না—তার ফল হলো : ব্রাজিল, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, ফিলিপিনস-এ রাষ্ট্রক্ষমতা মিলিটারির হাতে চলে যাওয়া ; শ্রীলঙ্কায় আই. এম. এফ.-বিরোধী বিপ্লবের চেষ্টা (১৯৭১) এবং ফলে পরবর্তী প্রায়-মিলিটারি শাসন ; চিলিতে আলেন্দের পতন।

আর আই. এম এফ.-এর পরামর্শ শুনলে কী হয়? দেশী ব্যবসায়ীরা মার খায় বিদেশী ব্যবসায়ীর কাছে। দেশী শিল্পপতির দ্রব্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়, কারণ যত আমদানির দাম বাড়ে, ব্যাঙ্কঋণ পাওয়া দুরূহ হয়, বাজার বিদেশীদের কাছে মুক্ত হয়ে যাওয়াতে প্রতিযোগিতা কঠোর হয়। বিদেশী শিল্পপতিদের সুবিধা হয়, নিজেদের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ঋণগ্রহীতার দেশে চালিয়ে দেওয়া সহজ হয় ; নিজের দেশে যে দামে এইসব জিনিস পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি দামে সেগুলো ধার্য হয়। ফলে দেশী ব্যবসায়ী শিল্পপতি পাততাড়ি গুটোয়, সেগুলো চলে যায় বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে। বিদেশীদের বেশি টাকা, বেশি ক্ষমতা, ফলে বেশি দামে ব্যাঙ্কঋণ নিতেও তারা পিছপা হয় না। ফলে দেশী কাঁচামাল থেকে লাভ করে বিদেশীরা। দেশী ব্যবসায়ী পুঁজি-পতিরা তখন স্বাধীনতা হারিয়ে হয় বিদেশীদের আমলা। আর বিদেশী সংস্থার কর্মীরা হয় নিরুপায়

ভাগ্যনির্ভর যন্ত্রমাত্র, তাদের চাকরি যখন তখন চলে যায়, মাইনে বাড়ে না। দেশের রপ্তানি বাড়ে বটে, তবে তার অর্থ দেশের অনেক প্রয়োজনীয় পণ্য চলে যায় বিদেশের বাজারে, দেশের লোকের ভোগে সেটা আর লাগে না। দরিদ্র দেশের রপ্তানি তাই বিদেশী-মুদ্রা আনে বটে, তবে বেশি দামে, দেশকে বঞ্চিত করে। যেহেতু অনেক অত্যাবশ্যক পণ্যের উপর ভরতুকি উঠে যায়, ফলে সেইসব পণ্যের দাম বাড়ে, সাধারণের জীবনযাপন আরে. মহার্ঘ হয়ে ওঠে। শ্রীলঙ্কায় বিনামূল্যে চাল বিতরণ আই. এম এফ.-এর কৃপায় যেমন কমতে কমতে নামেই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গ চেরিল পেয়ার একটি কৌতূহল-উদ্দীপক ফর্মুলা দিয়েছেন। আই এম এফ ঋণদানের ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের সব রাষ্ট্রের প্রতি যে সমান কঠোর, তা নয়। যে দেশে সরকার-বিরোধী পক্ষ বামপন্থী, সেসব রাষ্ট্রের ব্যাপারে আই. এম. এফ. ঋণদানে এবং তার পরামর্শ কার্যকর করার ব্যাপারে বেশ নরম। অর্থাৎ সেই সরকারকে ঋণ না দিয়ে বেশি বিব্রত আই এম এফ. করতে চায় না। কিন্তু যেখানে সরকারবিরোধী হল দক্ষিণপন্থী সেখানে আই. এম. এফ নিষ্করুণ। উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

এই যে আই এম এফ—এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কী সম্পর্ক?

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আই. এম এফ-এর জন্ম। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এতে যুক্তরাষ্ট্র ছিল সর্বেসর্বা। ১৯৬০-এর পর থেকে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এবং জাপান তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কিছুটা চিড় খেয়েছে। তার মত না নিয়ে আই এম. এফ-এর কোনো কাজই সম্পন্ন হতে পারে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একদেশ-একভোট আই. এম এফ.-এ চলে না, চলে যে রাষ্ট্র বেশি চাঁদা দেয় তার মত অনুযায়ী। এর জন্মের সময় যুক্তরাষ্ট্র দিত মোট চাঁদার শতকরা ছত্রিশ ভাগ, এখন দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। দুদিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার উশুল তুলেছে। আই এম. এফ-এর মাধ্যমে ধার দিয়ে অন্য রাষ্ট্রগুলোকে সে যেমন সেসব রাষ্ট্র থেকে সুবিধা আদায় করেছে, আই. এম এফ থেকে ধার নিয়েও সে তার দেশের ঘাটতি পূর্ণ করেছে। শুনে অনেকে অবাক হবেন, পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র। তবে আই এম. এফ.-এর ধার দেওয়ার শর্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় খুবই নরম। আর গানা চিলি ইত্যাদির ধার নেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ধার নেওয়া অনেকটা গরীব চাষীর ধার নেওয়া আর ধনী শিল্পপতির ধার নেওয়ার মতো, একটার ফল নাভিশ্বাস, আর একটির ফল ঐশ্বর্যবৃদ্ধি।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

Iron Earth, Copper Sky. *By* Yashar Kemal. Collins and Harvill Press. London. £ 2.75

বৈদেশিক পরিবেশ ও মানব-সম্পর্কের বহুতর জটিল বিষয় সর্বদা আমাদের বোধের আয়ত্তাধীন নয়; বুদ্ধিবাদী আকর্ষণে যে সেতু শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়, তার দ্বারা অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণতঃ লাভবান্ হয় কিনা সে বিষয়ে অদ্যাবধি আমি সংশয়ান্বিত। তত্রাচ অনস্বীকার্য যে, সামাজিক সমুদয় বিষয়াবলীর প্রত্যক্ষ স্বাদেশিক অভিজ্ঞতার সম্যক্ প্রকাশ ব্যতিরেকে কোনও উপন্যাসের সার্থকতা অসম্ভব; অবশ্য এ প্রসঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বীক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলীও বিন্দুমাত্র অবহেলার পাত্র নয়। স্বভাবতঃই কেবল মাত্র ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বা অনায়াস রচনাশৈলীতে কোনও তাৎপর্যের অবতারণা বাতুলতা মাত্র। ব্যক্তির একান্ত অভিজ্ঞতা, যা বাস্তব পটভূমির মুখাপেক্ষী অথচ প্রতিক্রিয়ায় ভিন্নধর্মী, অথবা বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় মানবসম্পর্কের জটিলতার বিষয়াদি, তা একই সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্ব অর্জনে এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিকীকরণের সহায়ক; অথবা বলা চলে, বিষয়বিন্যাস, যে লেখকের প্রকরণগত বলিষ্ঠতা বা দৌর্বল্যের পরিচয়বাহক এবং মানসিকতার যথার্থ প্রতিবিম্বন, ইত্যাদি সমগ্রের আলোচনা ব্যতিরেকে উপন্যাসের প্রকৃত অনুধাবন সম্ভবতঃ অর্থহীন। এতৎসত্ত্বেও উপন্যাসের কিছু সর্বজনীনতা অথবা বলা উচিত সর্বমানবিকতা, যা অনায়াসে রুশদেশ বা ভারতবর্ষে ভেদ রাখে না, অথবা তুরস্কের কৃষকের বেঁচে থাকার সংগ্রামে অনায়াসে চিত্রায়িত হয় বাংলা বা ভারতবর্ষের কৃষিজীবী মানুষ।

ইয়েসার কেমালের বর্তমান তাৎপর্যময় উপন্যাসটি প্রসঙ্গে উক্ত ভূমিকা অনিবার্য। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আস্থা সুগভীর, যদিচ তিনি ঐতিহ্যবাদী লেখক নন, হার্ডি বা তল্‌স্তয় তাঁর পরমাত্মীয় অথচ পংক্তিভোজনে তিনি এদের সারিতে বসতে সর্বদাই নারাজ। এর মূল সম্ভবতঃ নিহিত আছে তাঁর আপন জীবনচর্যায়। নিতান্ত শৈশবে ভূস্বামী পিতাকে নিহত হতে দেখেন মসজিদে প্রার্থনা-কালে আর এরই প্রতিক্রিয়া প্রায় যৌবনকাল পর্যন্ত তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন আনাতোলীয় লোক-সংগীতে। স্বগ্রামে অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল তুলা চাষের সঙ্গে সংযুক্ত; তিনি দেখেছেন ফিউডাল ব্যবস্থায় চাষীদের শারীরিক ও মানসিক আমরণ সংগ্রাম। এমত প্রত্যক্ষতার প্রতিক্রিয়ায় কেবলমাত্র তাঁর নিরাসক্ত বীক্ষণক্ষমতাই অর্জিত হয় নি, সেইসঙ্গে চৈতন্যের সামাজিকীকরণের সমুদয় বাস্তবতায় তাঁর মানসিকতায় সংক্রামিত। স্বভাবতই স্বদেশীয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, কারাবাস ইত্যাদি ঘটনা তাঁর জীবনেই হয়ে ওঠে অনিবার্য। এমত ব্যক্তিগত জীবন অথবা বলা উচিত পরিবেশে সৃজিত ব্যক্তিত্ব কদাচ সৃজনশীল আত্মপ্রকাশ ব্যতিরেকে স্বধর্মে জীবনযাপনে স্থিত হতে পারে না; বলা চলে, সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে উপন্যাস লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত কেমালের সমুদয় কর্মকাণ্ড উক্ত সূত্রেরই বিন্যস্ত প্রতিফলন।

বর্তমান উপন্যাসে বর্ণিত তুলাচাষীদের জীবন ও জগৎ কেমালের কেবলমাত্র পরিচিতই নয়, ঘনিষ্ঠও। গ্রামসুবাদে এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আশৈশব। এবং সৌভাগ্য যে, নিতান্ত ইম্‌প্রেশনিস্ট চিত্রধর্মে তাঁর আসক্তি যথেষ্ট এবং পর্যান্তরে সমগ্র বিষয়টিকে দার্শনিকতায় উত্তরণে তাঁর আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এখানে দার্শনিকতা শব্দটির ব্যবহারে কোনও শুচিবায়ুগ্রস্তের মর্মপীড়ার কারণ হতে আমি

অনিচ্ছুক; কারণ উপন্যাসের সার্থকতার প্রাথমিক শর্তাদি বিষয়ে আমার অবহিতি আপাততঃ কোনও বিতর্কের মধ্যে যেতে নারাজ। কেমাল-কথিত তুলাচাষীদের দারিদ্র্য, ফসলের স্বপ্ন অথবা অজন্মা হলে মহাজনের অত্যাচার বা অত্যাচারের ভয়ে এক দুঃসহ শঙ্কিত জীবন এবং শেষপর্যন্ত, স্বগোত্র কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরমহিমার আরোপ ইত্যাদি ঘটনাবলী প্রায়ই সর্বজনীন: অন্ততঃ আমাদের মতো আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশে তো অবশ্যই। ভারতীয় ভাষায় এবম্প্রকার ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে লিখিত উপন্যাসও বিরল নয়। কিন্তু কেমালের গৌরব অন্যত্র.। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং সমগ্রতায় যে যে কেবলমাত্র তুরস্ক ও ভারতবর্ষের ভেদ ঘোচে তাই নয়, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গ পদযাত্রায় শেষ পর্যন্ত প্রকটিত হয় এক অনন্য জীবনদর্শন যা সর্বদাই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির জয়জয়কার ঘোষণা করে। এবং তা কোন ক্রমেই এদেশীয় প্রগতি-বিলাসীর ভাবসাধনা নয়; পক্ষান্তরে জীবনচর্যার সঙ্গেই তার উদ্ভব ও বিকাশের সমগ্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ। একারণেই কেমাল সর্বদা সৎপাঠককে ভাবিত করে তোলেন; নিতান্ত উপন্যাসপাঠক সৃষ্টি তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত। টার্কিশ ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য কেমাল ১৯৭১-এ কারামুক্তির পর একদা নিজেই উপস্থাপনা করেন এমত বক্তব্য।

কোনও এক বৎসর অজন্মার দরুন তুলাচাষীদের পক্ষে মহাজনকে দেয় অর্থাদি ফেরত দিতে অপারগতার ফলে তাদের মানসে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে শঙ্কা গভীরতর হতে থাকে; প্রত্যেকদিন তারা অপেক্ষা করে থাকে মহাজন আদিল এফেন্দির জন্যে, যে আসবে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নিয়ে; সে আসেনি, অথচ এক ভয় ক্রমশঃ ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে থাকে এবং এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমস্ত গ্রামকে ঘিরে ফেলে। এমত কালে তারা আবিষ্কার করে তাসবাসকে; তাদেরই স্বজন অথচ ব্যক্তিত্বে মহামহিম; চাষীকুলের স্বার্থে সংগ্রাম করেছে জয়পরাজয়ের অনিশ্চিত ভাগ্যকে মেনে নিয়েই। এই মুহূর্তে ভয়ের কালো ছায়ার বিরুদ্ধে জনমানসে তার উপস্থিতি সর্বাংশে সংগ্রামী চেতনার প্রতীকী। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত হতে পারেন হাওয়ার্ড ফাস্ট, যদিচ প্রকরণগত চারিত্রে উভয়ের অবস্থান একই মেরুতে নয়! অধিকন্তু ফিউডাল সমাজব্যবস্থার কারণেই তাসবাস শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে ঈশ্বরপ্রতিম, পাপপুণ্যের বিচারে স্বভাবতই যার একান্ত অধিকার। এমত চরিত্রচিত্রণে কেমালের কাব্যিক ভাষাব্যবহার এবং প্রতীকধর্মিতা বহুলাংশেই সহায়ক; নাগরিকতা ও গ্রাম্যজীবনযাত্রার স্বাভাবিক ভেদ কার্যতঃ এ-কারণেই যেন সিদ্ধিলাভ ঘটায়। পারিপার্শ্বিক অনায়াসেই চরিত্র হয়ে ওঠে।

কেমাল আপাতবিবেচনায় কোনও দর্শনের প্রবক্তা নন; উপন্যাসে কোনও জটিল বাগবিস্তার কদাচ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রগতিবাদী মানসিকতা সর্বদা সাধারণ্যে মিলনাগ্রহী। অথবা তাঁর সমাজচিত্রন ও চরিত্রাঙ্কনে কেবলমাত্র উপন্যাসই সার্থকতা পায় না, সেই সঙ্গে স্থানিক চলমান জীবনপ্রবাহও পায় এক আন্তর্জাতিকতা। এমত সাধারণ প্রচলিত মন্তব্যে কেমালকে যথার্থ চিহ্নিত করা অসম্ভব।

কেমালের উপন্যাস সমস্ত ঘটনাবলী ছাড়িয়ে পাঠকের যে অন্য চিন্তারাজ্যে উত্তরণ ঘটায়, তার তাৎপর্য অনুধাবনই আমার বিবেচনায় কর্তব্য। এখানে যে ফিয়ার কমপ্লেক্স, যাকে প্রায়শঃ চরিত্র বলেই মনে হয়, অথবা তাসবাসের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়া অথবা কোনও নির্জন, নিঃসঙ্গ প্রান্তরে

প্রকৃতির প্রেক্ষিতে কোনও দেবতার কাছে তার প্রার্থনা ইত্যাদি চিত্রাবলী, আমার বিবেচনায় প্রতীকী। এবং সর্বাংশে এক দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্যোতক। ফিউডাল সমাজব্যবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তারাজ্যেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। কেমালের কাহিনীতে তার পরিচয় খোঁজা পণ্ডশ্রম, কিন্তু সম্ভাবনা অস্পষ্ট নয় : প্রকরণগত এমত সংযম ভারতীয় কিংবা বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের প্রগতি সাহিত্যেও কদাচিৎ লক্ষণীয়।

নির্মল ঘোষ

স্বপ্ন হতে বিদায়—নবগোপাল দাস। প্রকাশ ভবন। কলিকাতা, ১২। মূল্য আট টাকা।

নবগোপাল দাস বাঙলার বুদ্ধিগ্রাহ্য পাঠকের কাছে কোনো নতুন নাম নয়। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, এবং এর একটির অনেকগুলি সংস্করণ নিঃশেষিত। লিখেছেন স্মৃতিকাহিনী। সেটিও একটি মুদ্রণেই সীমিত নয়। আর রচনা করেছেন বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক প্রবন্ধ। অধিকাংশই দেশের অর্থনীতি এবং শ্রম-সম্পর্ক বিষয়ে। স্বাভাবিক কারণেই তিনি দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। তাঁর অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি যেমন বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, তেমনি তাঁর উপন্যাস-চিন্তাও সকলের কাছে সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে। কি প্রবন্ধ, কি উপন্যাস—বক্তব্য বিষয় তাঁর যাই হোক, পাঠককে নিঃসন্দেহে তিনি ভাবিয়ে তোলেন। তাঁর রচনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে বাধ্য করেন।

"স্বপ্ন হতে বিদায়" নবগোপাল দাসের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। এবং উল্লিখিত কারণেই আশা করা যায়, এই উপন্যাস পাঠে পাঠকদের প্রলুব্ধ করবে।

উপন্যাসটি সম্পর্কে সবথেকে বড়ো কথা এই যে আধুনিক কালের চরিত্রসন্নিবেশ সত্ত্বেও উৎকেন্দ্রিক আধুনিকতায় তিনি নিমজ্জিত হননি। চরিত্রগুলি যেন তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন, হয়তো তাই বুঝেওছেন। সেকারণে চরিত্রগুলি কষ্টকল্পনা মনে হয়নি। কোথাও ঘটনাসন্নিবেশে বিন্যাসের অভাব ঘটেনি।

আলেয়া, অর্জুন, অথবা স্বপ্না—এদের সাক্ষাৎ আমরা আজকের সমাজে পাই। কিন্তু এদের গতিপথ এবং প্রান্তিক স্থিতিও কি এই আধুনিকতার পরিপূরক? এই প্রশ্ন আমার লেখকের কাছে নয়, আমার নিজের কাছেই এবং পাঠক হিসেবে।

স্বপ্না অথবা আলেয়ার প্রাক-বিবাহ অভিজ্ঞতা এই উপন্যাস গঠনে কতোটুকু সাহায্য করেছে জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আধুনিকতা এবং আধুনিক জীবনের।নীতিবোধ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হয়। আধুনিক মন থেকে সংস্কার দূর হয়েছে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে, এবং এর সঙ্গে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে লেখক অর্জুন-আলেয়া অথবা অনিমেষ-স্বপ্নার ঘনিষ্ঠতার আবহ উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে কিন্তু যৌন স্বাধীনতার সুদূর সম্পর্ক।

উপন্যাসটি বেশ এগিয়ে চলেছিল। কমল, বিশাখা - এদের ঘিরে স্বপ্নার নতুন জীবন। প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন ঘটনার সমাবেশ। তৈরী হয় নতুন প্রত্যাশা। মনকে প্রস্তুত করে নিতে ইচ্ছে হয় সমাপ্তি শুরুর প্রস্তাবনা মিথ্যে প্রমাণ করবে—এই চমকের জন্য। কিন্তু প্রভাতের আবির্ভাব যেন সমস্ত আয়োজনের মোড় ঘুরিয়ে এক অনিবার্যতায়- নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। এ কিন্তু উপন্যাস-ধারণার যথার্থ পরিপূরক নয়।

আরো একটি দৃঢ়মূল সংশয় গ্রন্থটি সৃষ্টি করেছে। আধুনিকতা যে সমসাময়িকতা নয়, তারও প্রমাণ এই উপন্যাস। কারণ লেখক এই সমসাময়িকতা উপেক্ষা করেছেন। যার ফলে চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্বেও সেগুলি কেমন ভাসা-ভাসা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে পায়ের নিচে যেন মাটি নেই।

এই কলকাতায় এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর যুবকের সাক্ষাৎ স্বপ্না পেল না, এ বড়ো দুঃখের কথা।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

PEN : New Texts of German Authors. Shakuntala Publishing House. Bombay.

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক হাইনরিখ্ ব্যোলের নাম কিছু দিন আগে আমরা ঘন ঘন শুনেছি। রুশ সাহিত্যিক সল্‌ঝেনিৎসিন্ যখন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে পৌছলেন তখন প্রথম অতিথি সৎকারের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ব্যোল। দুই দিকপালের যুগল আলোকচিত্র তখন সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে।

এই ঘটনার আগে লেখা ব্যোলের একটি কথিকা পড়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম কী অদ্ভুত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি !

কথিকাটির নাম : না ওরা (উড়ে) পালায়নি। ব্যাপারটি হল, স্থানীয় চিড়িয়াখানায় রানী-রূপা এক শ্বেত পেচকীর দরবারে ব্যোলের বার্ষিক হাজিরা নিয়ে। লেখকের মতে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচারে এইটাই বছরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মেজাজী পক্ষী-রানীর সঙ্গে তাঁর এ-বছরকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীনতার আঙ্গিক ও উপাদান। লেখক তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে পেলিক্যান্ ও কশুবুদের মতন তাঁকেও খোলা আঙিনায় বাস করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন যে খাঁচাতেই থাকবেন। তাঁর মতন বিচক্ষণ জীবের পক্ষে এটা নিতান্তই বোকামি বলে মনে হওয়ায় ব্যোল চুপ করেই রইলেন।

পক্ষী-রানী জিজ্ঞাসা করলেন,—পেলিক্যান্ আর কশুবুরা কী করছে তা দেখনি ?

—নিশ্চয়ই দেখেছি। আমি দেখলাম ওরা বিশাল সুন্দর ডানাগুলি মেলছে, ঝাপটাচ্ছে, সৌন্দর্যের লহরী তুলছে।

—আর, তুমি কি দেখলে যে ওরা উড়ে চলে যাচ্ছে ?

—না, পালায় নি তো ওরা।

—কেন পালায়নি বোকারাম ? কেননা, ওরা ডানা ঝাপটাতে পারে, মেলতে পারে, চোখ ঝলসাতে পারে, কিন্তু উড়তে পারে না : ওদের ডানাগুলি ছাঁটা। সেই কারণেই আমি আমার খাঁচার মধ্যে থাকাটাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করি। খোলা আঙিনা মানে, গরাদ নেই, কিন্তু ডানা কাটা। খাঁচা মানে, গরাদ, কিন্তু না-কাটা ডানা।

লিপিকার ধাঁচে লেখা এই ছোট্ট কথিকাটিতে বহু না-বলা কথা যেন বিনা আয়াসে বলা হয়ে গেল, পুনরুক্ত বহু কথায় নতুন তাৎপর্য।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্থা PEN-এর পক্ষে, এই পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত মূল্যবান গদ্য-পদ্য প্রবন্ধের সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন মার্টিন্ গ্রেগর-ডেলিন্। আর্নস্ট্ ব্লখ্, গুণ্টার গ্রাস্, হাইন্‌রিখ্ ব্যোল ছাড়াও, আরো জনা আশী কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিকদের লেখায় সমৃদ্ধ এই সঙ্কলন। অনেকগুলি লেখাই এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোনো বইয়ে স্থান পায়নি।

ভাষান্তরিত কবিতার পুনরনুবাদ সাহস করি না। হান্স্ সাহ্‌ল্-এর ছয় লাইনের কবিতাটি ইংরেজিতেই তুলে দিলাম।

The fruit ate me, the sea
Drank me up, my flesh
Cut into the knife, the car
Of the night spoke to me, I slept
On its mouth, my eye looked
At me long and deep.

কবিতাটির নাম, বলা বাহুল্য, My eye looked at me.

থিলো কশের রচনাটি এক খ্যাতনাম্নী প্রবীণাকে নিয়ে। এটি একটি ছোট গল্পও হতে পারত, এতই নিটোল এবং সুন্দর। মহিলার নাম আল্‌মা। দীর্ঘ জীবনে তিনি স্বামী হিসাবে পর-পর পেয়েছিলেন ইয়োরোপের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা, এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও জনৈক শ্রেষ্ঠ স্থপতিকে। উপরন্তু, প্রেয়সী ছিলেন চতুর্থ এক জগদ্বিখ্যাত শিল্পীর, কী দারুণ ব্যক্তিত্ব না জানি তাঁর ছিল! কশ্ মুগ্ধ তাঁর আত্মজীবনী পড়ে, কিন্তু অতৃপ্ত তাঁর কৌতূহল। গেলেন নিউ ইয়র্কে, সেখানে আত্মজীবনীর প্রকাশকের কাছ থেকে জানা গেল তাঁর ঠিকানা, হ্যাঁ, মহিলা এখনও জীবিতা, বাসস্থান এক মোটামুটি অভিজাত পাড়ায়। গেলেন সেখানে, যাওয়ার পথে এক রহস্যময়ী প্রতীকী মূর্তির সঙ্গে দেখা। তারপরে দরজা খোলে বোবা মধ্যবয়স্কা পরিচারিকা, দিবা দ্বিপ্রহরে পর্দাটানা অন্ধকারে সংক্ষিপ্ত দীপালোকে অতি-সজ্জিতা প্রবীণা, তাঁর অবিশ্রান্ত কথার স্রোত, অবশেষে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি একান্তই বধির, লেখকের কোন কথা তিনি আদৌ শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তবুও দুই পক্ষেই স্বাভাবিকতার মর্মন্তুদ অভিনয়। কোনো সময়ে কশ্ নিষ্ক্রান্ত—বাইরে তখন উজ্জ্বল সূর্যালোক, পথের ধারের সন্ন্যাসী-মূর্তি উধাও, শূন্যতার এক অবিস্মরণীয় চিত্র।

মনে থাকবার মতন লেখা গুন্টার্ গ্রাসের ভাষণের অনুলিপিটি: তরুণ নাগরিকদের প্রতি। শিরোনামার মধ্যেই মর্মার্থ প্রকাশিত: Uber Erwachsene und Verwachsene: erwachsene মানে প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালক মানুষ, verwchsene মানে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত মানুষ! অর্থাৎ, এই সমাজে বা সভ্যতায়, প্রাপ্তবয়স্ক হতে গেলেই মানসিক বিকৃতি বা বৈকল্যের দাম দিতেই হবে। যৌক্তিকতা এখানে সাধারণ ভাবেই পর্যুদস্ত, চতুর্দিকে কেবল বয়ঃপ্রাপ্তদের ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাজনিত ধ্বংসস্তূপ। কাজেই নতুন সাবালকদের প্রতি যুগন্ধর সাহিত্যিকের শেষ পরামর্শ: নিজেকে নিয়ে হাসতে পারার ক্ষমতা খুবই প্রয়োজন। যখন তারাও বয়ঃপ্রাপ্তসুলভ বিকৃত মনের অধিকারী হবে, বিশেষত যখন জীবনের হীনতার কাছে চোট খাবে, তখন নিজেদেরকে বেশী দাম দিলে চলবে না।

সঙ্কলনটি মনে রাখবার মতন। সর্বশেষে সংযোজিত সম্পাদকীয় আলোচনাটুকুও তো গুন্টার গ্রাসের ঐ সাবধানবাণীরই এক চমৎকার প্রতিরূপ: The Sense and Nonsense of Anthologies.

মিহির সিংহ

দুঃস্বপ্নের একদিন !

"আশমান হইল টুভাটুভা
জমিন হইল ফাডা
ম্যাঘরাজা ঘুমাইয়া রইছে
পানি দিব ক্যাডা।"

চাষের জন্য অসহায় কৃষককে
একদিন আকাশের এক চিলতে
মেঘের দিকে হা-পিত্যেশ করে
তাকিয়ে থাকতে হত। বিপন্ন
কৃষকের সে ছিল দুঃস্বপ্নের দিন।

আর আজ...... ?

সেচের আশ্চর্য অফুরন্ত জলধারায়
বিপ্লব এসে গেছে কালান্তরে।
সোনালী ফসল গড়ে তুলতে
রূপালী অনন্ত জলধারার আমরা
আজ ভগীরথ নতুন দিনে।

ক্ষুদ্র সেচের ক্রমবর্ধমান এলাকা
(লক্ষ একর)

★ ১৯৪৭-৪৮ : ১৬·২৬

★ ১৯৭১-৭২ : ২৬·৪৪

★ ১৯৭৩-৭৪ : ৩০·৫১

★ ১৯৭৪-৭৫ : ৩১.৩৮

—পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত—

পশ্চিমবঙ্গে হস্তশিল্পে অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অধিকার করে আছে হস্তশিল্প। রাজ্যের হস্তশিল্পে সম্পূর্ণভাবে অথবা অংশতঃ ১,৫০,০০০ জন লোক সারা বছর ধরে নিযুক্ত রয়েছে। এদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিদেশের বাজারে বিপুল চাহিদায় বিক্রীত হয়। হস্তশিল্পে বার্ষিক উৎপাদনের অর্থমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার হস্তশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে শংখ শিল্পের ৬,০০০ জন কারিগরকে ১৫ লক্ষ টাকার কাঁচামাল সরবরাহ করেছেন। ১২টি শাখা (ইউনিট) যুক্ত মাদুর শিল্প সমবায় সমিতিকে সাহায্য করা হয়েছে রাজ্যের মাদুর শিল্পের কারিগরদের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য। পিতল ও কাঁসা কারিগরদের (যাদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ জন) বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা সরকার ভাবছেন এবং এজন্য ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত চামড়ার জিনিসপত্র এবং এর মধ্যে শিল্পসম্মত কাজ ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে এবং এইসব জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচকে শিং-এর দ্রব্যাদির শিল্পগুণ যথেষ্ট থাকায় বিদেশের বাজারে আগাম চাহিদা রয়েছে। ২০০ জন কারিগর এই সুকুমার শিল্পে জীবিকার্জন করেন।

সুসম ও সমন্বিত ভিত্তিতে হস্তশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন জেলায় সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সমীক্ষা শেষ করা হয়েছে। একটি হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। এই কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে দেবে। একটি চামড়া শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনও ঐ একই উদ্দেশ্যে গঠিত হতে চলেছে।

বয়নশিল্প ছাড়া হস্তশিল্পে এ পর্যন্ত শিল্প-সমবায় সমিতির সংখ্যা এ রাজ্যে দাঁড়িয়েছে ৪০৮টি এবং এই সমিতি সংশ্লিষ্ট কর্মী-সদস্যের সংখ্যা হলো ১০,০০০ জন। ৪০৮টি সমিতির ২৫০টিকে রাজ্য সরকার সরাসরি নানাভাবে সাহায্য করেন। বাকিগুলিও পরোক্ষভাবে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে। গত চার বছর ধরে এ রাজ্যে এইসব সমবায় সমিতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বহু নতুন সমিতি গঠিত হয়েছে এবং মুমূর্ষু সমিতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। গত চার বছরে দেয় সাহায্য এই রকম—

(ক) অনুদান : ২৫'৬৩ লক্ষ টাকা।

(খ) ঋণ : ৩৮.৫৮ লক্ষ টাকা।

(গ) শেয়ার ক্রয়ে রাজ্য সরকারের ভাগ : ১২'৯৯ লক্ষ টাকা।

রাজ্যের সমস্ত শিল্প সমবায় সমিতিগুলির সমীক্ষা করা রাজ্য সরকারের সর্বশেষ কৃতিত্ব। এই সব সমিতিগুলির সর্বাত্মক উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন।

-প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৩৮০২।৭৫

ঠিক যে তেলটি আমি চাই!
রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে
সবসময়ই আমাকে কাজে
বেরোতে হয়—কিন্তু
চুল আমার এলোমেলো হলে
চলে না—আর তাই
আমার পছন্দ মৃদুসুবাসিত
কেয়ো-কার্পিন
কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয় না।
285 ml.
DELIGHTFULLY PERFUMED
A HAIR OIL OF DISTINCTION
FOOD & TONIC FOR HAIR
DEY'S MEDICAL STORES LTD.
CALCUTTA-16
দে'জ
মেডিক্যালের
তৈরী
PX/DM/KE 1/75

শীতের দিনের
উষ্ণ আরাম
কুভাদিস্ ৪৬
সাইজ ৫-১০
টা ৪০.৯৫
ওয়েফাইণ্ডার্স্ ১৭
সাইজ ৯-১১,১২-১, ২-৬
টা ২৪.৯৫
২৮.৯৫, ৩২.৯৫
ওয়েফাইণ্ডার্স্ ৫৩
সাইজ ৯-১১,১২-১, ২-৬
টা ২৪.৯৫
২৮.৯৫, ৩৪.৯৫
অ্যাডমিরাল ৯৮
সাইজ ৫-১০
টা ৭২.৯৫
ওরিয়েন্টা ৭০
সাইজ ২-৭
টা ১৯.৯৫
এক্সক্লুসিভ ০৮
মুন সারকেস
সাইজ ৫-১০
টা ৬৫.৯৫
উষা ৬৫
সাইজ ২-৭
টা ২৬.৯৫
Bata

বর্ষ ৩৭ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮২
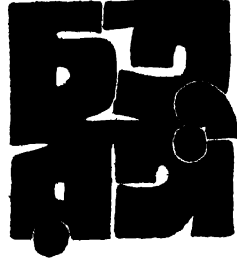
সূচিপত্র

অশোক রুদ্র। সত্যরক্ষা ৮৭

লোকনাথ ভট্টাচার্য। সময় খায় মেয়েকে ৯৯

রত্নেশ্বর হাজরা। সঙ্গী ছিলাম—আছি ১০২

কঙ্কণ নন্দী। এক টুকরো হাওয়া ১০৩

রবীন সুর। শিল্পে বোধে কম ১০৪

অসীম রায়। আবহমানকাল ১০৫

শামসুর রাহমানের কবিতা। অমলেন্দু বসু ১২৮

আবু রুশদ্। ছিনতাই ১৪৬

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা ১৫২

সমালোচনা। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, অসীম রায়, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী, পুণ্যশ্লোক রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু ১৬৪

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৭ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮২

সত্যরক্ষা

অশোক রুদ্র

বিভিন্ন ধর্ম বা মূল্যবোধের মধ্যে তুলনা বা তাদের আপেক্ষিক মূল্যায়ন কিভাবে করা যেতে পারে? সমস্যাটি জটিল নিঃসন্দেহে; এই জটিল সমস্যার একটি সহজ সমাধান করা হয়েছিল আমাদের পৌরাণিক যুগে 'তুলাদণ্ডে'র সাহায্য নিয়ে। এই তুলাদণ্ডে ওজন নেওয়ার ঘটনার উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। রামকে বনবাসে পাঠানোর কথা ওঠার পরে দশরথের রাজপুরীতে যে সংকট দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে দশরথের উদ্দেশ্যে কৌশল্যার মুখে আমরা উল্লেখ পাই, 'স্বয়ং স্বয়ম্ভূকীর্তিত পুরাণপ্রসিদ্ধ' শ্লোকের 'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্য আমি তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়াছিলাম; তুলনা করিয়া দেখিলাম সত্যই অধিক ভারবিশিষ্ট হইল। ভূমণ্ডলে সাধুগণ এই কারণে জীবন বিসর্জন করিয়াও সত্য রক্ষা করিয়া থাকেন।'[১] যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন ক'রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম বলেন: 'সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে।'[২] একই অবস্থায় ভীষ্মের অপর এক উক্তি, 'সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য এবং ধর্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়।'[৩]

দেবীভাগবতে পাই হরিশ্চন্দ্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বিশ্বামিত্র বলছেন: 'একদা ভগবান ব্রহ্মা সত্যের গুরুত্ব জানিবার জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে সত্য ও অপরদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থাপন করেন, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যেরই গুরুত্ব দেখিয়াছিলেন।'[৪] দুষ্মন্তকে উদ্দেশ্য করে শকুন্তলা বলেন, 'আত্মকৃত সত্যধর্ম প্রতিপালন কর।.. দেখ, শত শত কূপ খনন করা অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলনা করিলে

সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সর্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ।'[৫]

আমাদের শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী ধারণা ও মূল্যবোধের নমুনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু সত্যের গুরুত্বের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত দেখা যায় না: 'ত্রিলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই।'[৬] এর বিপরীত কোনো বিচার কোথাও পাওয়া যায় না। আদর্শ পুরুষের কী কী গুণ থাকা উচিত তদ্বিষয়ক আলোচনায়, কী কী গুণ থাকলে মানুষ স্বর্গে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে তৎসংক্রান্ত আলোচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে সত্য। রামায়ণে রামকে যতবিধ বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই সত্যসংশ্লিষ্ট: যথা, সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যে আবদ্ধ, সত্যে অবহিত, সত্যবাদী, সত্যপাশে বদ্ধ, সত্যবাক্, সত্যজ্ঞ, সত্যসন্ধ।

সত্যের গুণকীর্তনে মহাকবিরা ও পুরাণকারেরা ক্লান্তিহীন। ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বিদুর সত্যকে 'স্বর্গের সোপান' এবং 'সংসার-সাগরের তরী' বলে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন,'যে ধর্মে সত্য নাই তাহা ধর্মই নয়।'[৭] একই ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে মহর্ষি সনৎসুজাত বলেন, 'সত্যই মুক্তির আধার —বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে সত্যই সাধুলোকের একমাত্র ব্রত।'[৮] বৃহৎ-ধর্মে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাপসকলও একমাত্র সত্যপালনরূপ পুণ্যে বিনষ্ট হয়।'[৯] একই জায়গায় বলা হয়েছে, 'মানুষ সত্যবহিষ্কৃত হইলে শ্মশানের ন্যায় বর্জনীয় হইয়া থাকে,… স্বসত্য পরিপালন পুরুষের যাদৃশ পরমধর্ম এমন আর কিছুই নাই।'[১০] রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে: 'সত্যপরায়ণ মানবগণ এক সত্যের দ্বারা যে সমস্ত লোকে গমন করিয়া থাকেন মিথ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ শত শত যজ্ঞ করিয়াও সেই সমস্ত লোকে গমন করিতে পারে না।'[১১] সত্যের প্রভাব সম্পর্কে ভীষ্ম বলেছেন, 'মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটি দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে।'[১২] সত্যের প্রভাবে মৃত্যু কিভাবে পরাহত হয় তার একাধিক উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে হৈহয়কুলচূড়ামণি একজন কুমার নৃপতির কথা বলা হয়েছে যিনি মৃগয়াভিলাষে ভ্রমণকালে কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিতকলেবর এক মুনিবরকে কৃষ্ণসারভ্রমে সংহার করেন। হৈহয়রাজগণ কার পুত্র জানবার নিমিত্ত ভ্রমণ করতে করতে কশ্যপনন্দন ঋষিবর অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপনীত হন। অরিষ্টনেমা অনায়াসে মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করলেন। কী উপায়ে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী তিনি হলেন এই প্রশ্নের উত্তরে কাশ্যপবংশীয়দের অন্যতম ঋষি তার্ক্ষ্য বলেন, 'মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয় এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি, আমাদিগের মন মিথ্যাতে কখনও অনুরক্ত হয় না। আমরা সর্বদা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই।'[১৩] এইরকম আর-একটা কাহিনী পাই দেবীভাগবতে। দেব-দৈত্যদের যুদ্ধে দৈত্যগণ ভৃগুর পত্নী শুক্র-জননীর আশ্রয় লাভ করলে এবং দেবগণ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন সেই স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করেন। ভৃগু বলেন, 'যদি ধর্ম আচরণ করিয়া থাকি, যদি সত্যবাদী হই তবে তুমি জীবিত হও'[১৪] এবং প্রকৃতই ভৃগুপত্নী পুনর্জীবন লাভ করেন। মহাভারতের কথিত পাওয়া যায় যযাতির উপাখ্যান। পুণ্যক্ষীণতা-প্রাপ্তিহেতু তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হন,

কিন্তু তাঁর চারটি দৌহিত্র তাদের পুণ্যের অংশ দান করে তাঁকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। উশীনর-নন্দন শিবি বলেন, 'আমি বরং রাজ্য, প্রাণ, অর্থ ও সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন'[১৫] এবং এই সত্যের প্রভাবের সমক্ষে স্বর্গের দ্বার খুলে যেতে বাধ্য হয়। মিথ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। এই অন্ধকারের প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে।'[১৬] এই অধঃপাতের হাত থেকে স্বয়ং শ্রীহরিরও নিস্তার নেই। 'বিষ্ণু ছলাবলম্বী হইয়া বামনত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই, সেই সত্য নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া হরি বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন।'[১৭]

সনাতন ধর্মে সত্যের স্থান যে সর্বোচ্চে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখা হয়নি ; কিন্তু সত্য জিনিসটা কী, যার এবংবিধ মহিমা তার উত্তর সহজলভ্য নয় এবং বিভিন্ন জায়গায় সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও সবসময় পরস্পরবিরোধিতাশূন্য নয়। সত্যের স্তুতি করার সময়ে এমন অনেক কথাই বলা হয়েছে যা এই ঘোর কলিকালের মিথ্যার প্রভাবে আচ্ছন্ন, বর্তমান লেখকের মতো স্বল্পজ্ঞান, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির বোধের অগম্য। যেমন ধরুন, শিবপুরাণে এইভাবে বাক্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, 'সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সত্যই অসাধারণ যজ্ঞ, সত্যই অদ্বিতীয় বিদ্যা, সত্যই দান, সত্যই মন্ত্র, সত্যই দেবী সরস্বতী, সত্যই ব্রতচারণ ; সত্যই ওংকার।'[১৭] ভীষ্মও খুব সাহায্য করেন না যখন তিনি বলেন, 'সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ—তপস্যা, ধর্ম, দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্যা, ওংকার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তানসন্ততি সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে'[১৮] এও বলেন। 'সত্যপ্রভাবেই সূর্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে এবং সত্যপ্রভাবেই অগ্নি প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।'[১৯] রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডেও এই জাতীয় স্তুতি পাই যার থেকে সত্য যে মানুষের দোষগুণ সম্পর্কিত কোনো ধারণা তাতেই আস্থা রাখা যায় না। সত্য হইতে সোম, সোম হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অমৃত, অমৃত হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।'[২০] তেমনি যে 'সত্যই দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং ভূলোক ধারণ করিতেছে[২১] তা নিশ্চয়ই কোনো মানবিক গুণ নয়।

তবে আমাদের সৌভাগ্য, অন্যবিধ সংজ্ঞাও পাই। খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এই সংজ্ঞাটি পাই লিঙ্গপুরাণে, 'লোকে যেটি যথার্থ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং যেটি সন্তুনমিত ও যেটি যথার্থ নিজে অনুভব করিয়া থাকে তদ্বিষয় পরপীড়াশূন্য কথনকেও সত্য বলিয়াই সাধুগণ কীর্তন করেন ; অশ্লীল বাক্য কীর্তন করিবে না, ব্রাহ্মণের এই প্রকার শ্রুতি আছে, এটিও সত্য।'[২২] বেদব্যাস সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'মিথ্যাকথা না বলা, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, প্রিয়বাক্যকথন, গুরুসেবা, দৃঢ়ব্রত, আস্তিক্য, সাধুসঙ্গ, মাতাপিতার প্রীতি উৎপাদন, বাহ্য শৌচ, আন্তর শৌচ, লজ্জা ও অকার্পণ্য—এই দ্বাদশ প্রকার সত্য।'[২৩] সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তালিকা পাই ভীষ্মের কাছ থেকে, 'সত্য ত্রয়োদশ প্রকার : অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য, দয়া ও অহিংসা।'[২৪] এখন আমাদের মুশকিল অন্য ধরনের। তালিকার প্রত্যেকটি গুণকেই মানবিক গুণ

হিসেবে চিনে ও বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রশ্ন জাগে : এই দ্বাদশ এবং এই ত্রয়োদশ, এই সবই যদি 'সত্য' তো বিভিন্ন গুণের মধ্যে বাকি রইল কী কী ? এতগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবকে একত্র ক'রে তাদের সত্য আখ্যা দিয়ে অর্থ পরিষ্কার করা হল, না, ঘোলা করা হল ? আবার সম্পূর্ণ অন্য কথা বলা হয়েছে মহাভারতের বনপর্বে। দ্বিজোত্তম কৌশিককে কোনো নারী বলেন, 'যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন তবে মিথিলায় গমনপূর্বক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন।' কৌশিক সেই বাক্যানুসরণ ক'রে ধর্মব্যাধের সমীপে উপস্থিত হয়ে সত্য কী এই তত্ত্ব-প্রশ্ন রাখেন। ধর্মব্যাধ উত্তর দেন, 'যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য।'[২৫] এতে অবশ্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন তোলা হল, কারণ এখানে কৌশিকের প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল, 'হিত' কী ? এবং তার উত্তর দিতে হলে আরও অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হত। অন্যত্র নারদও বলেছেন, 'যে বাক্যদ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল হয় তাহাই সত্য বাক্য।'[২৬] কিন্তু মঙ্গল কী, সেই প্রশ্নের চোরাবালি এড়িয়ে গেছেন।

'সত্য কী' ? এই প্রশ্নের উত্তর যেখানে যেখানে সোজাসুজি ভাবে দেওয়া হয়েছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে যত অসংখ্য কাহিনী রামায়ণ,মহাভারত ও পুরাণে পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায় 'সত্য' বলতে বেশীরভাগ সময়েই ব্যাসদেবের উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রথম দুইটি সংজ্ঞার কোন একটিকে বা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'মিথ্যাকথা না বলা' এবং 'অঙ্গীকার রক্ষা করা'। আপাতদৃষ্টিতে 'মিথ্যা কথা না বলা' এবং 'অঙ্গীকার রক্ষা করা' এই দুইটি ভাব সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তাদের মধ্যে একটি মৌলিক একতা আবিষ্কার করা যায়। সত্য হল কোনো ঘটনা এবং তৎসম্পর্কিত কোনো কথনের মধ্যে একটি সম্পর্ক। কথন যদি সত্যের যথার্থ প্রতিফলন হয় তো সত্য অনুসৃত হল। তা যদি না হয় তো হল সত্যভঙ্গ। ঘটনা যদি কথনের পূর্ববর্তীকালীন হয়ে থাকে তো তা হলে মিথ্যাকথা না বলার অর্থে সত্যরক্ষা ঘটবে। অন্যবিধ অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে, শাপ বা বরের ফলপ্রাপ্তি ঘটবে। প্রথমক্ষেত্রে সত্যবাদী ব্যক্তি কথনকে ঘটনার অনুযায়ী করাবেন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ঘটনাকে করাবেন কথনের অনুগামী। এই দুই সত্যের ধারণার মধ্যে ভেদ তাহলে মাত্র কালের গতির দিক (arrow of time) এর উপর নির্ভর করছে। কালের গতির দিককে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে মিথ্যা কথা না বলা ও অঙ্গীকার রক্ষা করা—এই দ্বিবিধ ভাবকে একীকরণ করে দেখা যায়। উদাহরণতঃ নেওয়া যাক রামের দশরথ সম্বন্ধে এই উক্তিকে : 'পুণ্যচরিত্র ধর্মাত্মা সত্যধর্মপরায়ণ লোকোপদেষ্টা নৃপতিকে মিথ্যা কহান আমার কর্তব্য নহে।'[২৭]

মিথ্যাকথা না বলার অর্থে সত্যকে আমাদের শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সত্যের সর্বপ্রসিদ্ধ ধারক বোধহয় যুধিষ্ঠির যিনি সারা জীবনে মাত্র একটি অর্ধমিথ্যা উচ্চারণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি তাঁর পিতৃদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করার দৃঢ় ব্রতে অটুট থাকার জন্য, কিন্তু তিনি মিথ্যাকথা না বলার অর্থেও সত্যবাদী ছিলেন। সীতা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন, জীবনরক্ষার প্রয়োজনেও তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।'[২৮] অযোধ্যাকাণ্ডে রাম নিজে বলেছেন, 'আকাশ পতিত হইতে পারে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র

শুরু হইতে পারে কিন্তু আমি কোনো সময়ে পরিহাসালাপেও মিথ্যা বলিতে পারি না।'[২৯] এইরকম সত্যবাদী আরেকজন ছিলেন উশীনরনন্দন শিবি, যাঁর উক্তি, 'আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে, লোকের মৃত্যুসময়ে, আপৎকালে এবং ব্যসনসময়েও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই।'[৩০] কিন্তু এই রকম আক্ষরিক সত্যকথা বলাকে খুব বেশী অনুমোদন আমাদের শাস্ত্রে করা হয়নি। মিথ্যাকথা না বলাকে নানান শর্তের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই এরকম শর্ত করা হয়েছে, কথনকে ঘটনার সুষ্ঠু প্রতিফলন হলেই চলবে না, তাকে পরপীড়াশূন্য হতে হবে। লিঙ্গপুরাণ থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তাতে এই শর্ত লক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনা অনুযায়ী কথনকে বারণই ক'রে দেওয়া হয়েছে। যেমন নারদ বলেছেন,'কিন্তু যে স্থলে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয় সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগপূর্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য।'[৩১] ভীষ্ম বলেছেন, 'যেস্থানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্যবাক্য না কহিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য;'[৩২] বৃহৎধর্মে আছে, 'স্থলবিশেষে মিথ্যাও ধর্ম ও সত্যও অধর্ম হইয়া থাকে-স্ত্রীলোকের নিকট, পরিহাসস্থলে, বিবাহবিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে, গোব্রাহ্মণার্থ ও প্রাণিবধবিষয়ে মিথ্যা দূষণীয় নহে।'[৩৩] অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেন, 'বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ, সর্বস্বাপহরণ এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক।'[৩৪] এই বিশেষ মর্ম বোঝাবার জন্য কৃষ্ণ সত্যবাদী কৌকিওর কাহিনী বর্ণনা করেন। একদা তস্করভয়ে ভীত কিছু লোক এক বনমধ্যে আশ্রয় নেয়, তস্করেরা সেই সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্যকথা বলে দেয়, ফলে সেই লোকেরা তস্করের হাতে নিহত হয়। এই সত্যবাক্যজনিত পাপের দরুন সেই ব্রাহ্মণকে ঘোর নরকে নিপতিত হতে হয়। তা না হয় ভালই হয়েছিল, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা স্থানবিশেষে সত্যকথা বলার যে সব ব্যতিক্রম অনুমোদন করেছেন (যেমন বিবাহবিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে ইত্যাদি) তা থেকে এই প্রশ্ন না জেগেই পারে না: এসব অবস্থাতেই যদি মিথ্যা বলা ধর্মসঙ্গত হয় তো কোন্ ক্ষেত্র বাকী রইল যেখানে তা নয়? তবে সত্যবাদী হিসেবে পুরাণপ্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তি এইসব সুযোগ নিয়েছেন তার উদাহরণ বেশী পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশে দ্রোণকে যে অর্ধমিথ্যা বলেন তাকেও মহাভারতকার পাপ হিসেবে গণ্য করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিয়ে শাস্তি পাওয়ান। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অর্থে সত্যরক্ষা বিষয়ে কিন্তু কোনো ব্যতিক্রমেরই পথ খোলা রাখা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যাকথা বলার অনুমোদন করেছেন যে ভীষ্ম সেই ভীষ্মই নিজ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি অভীষ্টতম বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না… ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না।'[৩৫] একই অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন রাম বনগমনের ব্যাপারে —নিজ সত্য রক্ষার জন্যও নয়, পিতৃসত্য রক্ষার জন্য। একই মনোভাব থেকে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের হাত থেকে মেনে নেন কল্পনাতীত ও সম্পূর্ণ অকারণ নির্যাতন। সত্যরক্ষার খাতিরে কর্ণ ব্রাহ্মণরূপী ছলনাকারী ইন্দ্রকে বিনাদ্বিধায় নিজের কবচকুণ্ডল কেটে দিয়ে নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দেন

বলেই না জনচিত্তে আজও কর্ণ এত সম্মানিত। এই ব্যতিক্রমহীন সত্যধর্ম সম্বন্ধে দশরথকে উদ্দেশ ক'রে কৈকেয়ী বলেন, 'শৈব্যনামক ভূপতি প্রতিশ্রুতিদান করিয়া নিজ শরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। অতি তেজস্বী রাজা অলর্ক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে নিজ নয়নযুগল উৎপাটিত করিয়া প্রসন্ন চিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন।' 'সীমালঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বসময়েও অতিশয় সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না।'[৩৬] রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অর্থে সত্যরক্ষার উপাখ্যান বহু পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপাখ্যানের রস বিভিন্ন কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য একই—'সত্যই পরম ধর্ম'। মিথ্যা কথা সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাণসংশয়ে মিথ্যাকথা বলা দূষণীয় নয়। কিন্তু প্রাণসংশয়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার সমর্থন কোথাও নেই। সত্যরক্ষার জন্য প্রাণদানের একটি মনোরম উপাখ্যান রুরুদ্রুহ ও মৃগমৃগীদের সম্পর্কিত। রুরুদ্রুহ চৌর্যবৃত্তি ও মৃগহত্যা করে জীবিকা অর্জন করত। একদা সে মৃগয়ার্থে পুকুরধারে একটি বিল্ববৃক্ষে বসে থাকে। একটি মৃগী জল পান করতে এলে ব্যাধ তাকে মারতে উদ্যত হয়। মৃগী বলে, 'এই বৃথা দেহের মাংসে কাহারো যদি সুখ হয় তো আমি ধন্য হইব...কিন্তু আমার গৃহে কতকগুলি বালক সন্তান রহিয়াছে, তাহাদিগকে ভগিনী এবং স্বামীর নিকটে যথাবিধ সমর্পণ করিয়া পুনর্বার আগমন করিব, আমার মাংস দ্বারা তোমার সর্বপ্রকার উত্তম তৃপ্তি হইবে।' এরপর ঐ মৃগীর ভগিনী ও তারপরে উভয়ের স্বামী মৃগ একইভাবে আসে এবং একই ভাবে পুনরায় আগমন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ফিরে যায়। গৃহে মিলিত হয়ে তারা 'যেহেতু আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি অতএব আমাদিগকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে' এই বলে বালকগণ সমেত তিনজনেই তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, 'হে ব্যাধ, শীঘ্র মাংস ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের দেহকে সার্থক কর।'[৩৭] বলাবাহুল্য ব্যাধের তখন জ্ঞানোদয় হল। সে মৃগমৃগীদের ছেড়ে দিল, নিজেও শিবদ্বারা এই সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত হল।

এই গল্পটি মোটামুটি স্নিগ্ধ রসেরই। কিন্তু সত্যরক্ষার অনেক গল্প ভয়ংকররসাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। ভয়ংকর রসের একটি গল্প: একদা ইন্দ্র পক্ষিরূপ গ্রহণ ক'রে সুকৃষনামক মুনিসত্তমের কাছে গমন করেন এবং প্রাণধারণের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেন। সুকৃষ খাদ্যবস্তু দিতে স্বীকৃত হলে পক্ষী বলেন, একমাত্র মনুষ্যমাংসেই তার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। সুকৃষ রাম বা বিশ্বামিত্রের মত বিনা প্রতিবাদে নির্যাতন মেনে নেন নি। তিনি পক্ষীকে তিরস্কার ক'রে বলেন, 'অয়ি অণ্ডজ! তুমি নিশ্চয়ই এখন বার্ধক্য-দশায় পদার্পণ করিয়াছ, দেখ এই বৃদ্ধদশায় লোক মাত্রেরই কামনাজাল বিগলিত হইয়া থাকে, তবে তুমি ঈদৃশ অবস্থাতেও কি জন্য নিরতিশয় নৃশংসাত্মা হইয়াছ।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও স্বীকার ক'রে নেন, 'অঙ্গীকার করিয়া প্রদান করা সর্বদাই কর্তব্য।' অতঃপর সুকৃষ তাঁর আত্মজদের নিজেদের পক্ষীর আহারে পরিণত হতে বললেন। আত্মজরা দশরথপুত্র রামের মতন পিতৃসত্যকে নিজ সত্যে পরিণত করলেন না। বললেন, 'এ কার্য কখনই হইবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরদেহের জন্য নিজ দেহ কিরূপে বিনষ্ট করিতে পারেন?' তাতে রুষ্ট হয়ে সুকৃষ তাদের শাপ দিলেন এবং অতঃপর নিজেকেই ভক্ষ্য হিসেবে পক্ষীকে নিবেদন করলেন। পক্ষী জীবিতদেহ ভক্ষণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় সুকৃষ যোগ অবলম্বন ক'রে নিজ দেহকে প্রাণহীন করতে উদ্যত হলেন। এই সময়ে যা

হওয়ার তাই হল, অর্থাৎ পক্ষিরূপ ত্যাগ করে ইন্দ্র নিজরূপে প্রকাশিত হয়ে শুকদেবের সত্য প্রতিজ্ঞার প্রশংসা করলেন ইত্যাদি।[৩৮]

অন্য একটি গল্প সুদর্শন-ওঘবতীর। সুদর্শন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'গৃহাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিব' এবং পত্নী ওঘবতীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইও না।' একদিন সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হলে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম এসে ওঘবতীর কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগ বাসনা করি।' ওঘবতী অনেক আপত্তির পর সলজ্জভাবে আত্মনিবেদন করলেন। সুদর্শন ফিরে এসে অবস্থা জ্ঞাত হয়ে, 'ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্বক' হাস্যমুখে অতিথিকে বলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনি পরমসুখে আমার ভার্যা লইয়া সম্ভোগ করুন।'[৩৯]

সত্যরক্ষা বিষয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, বেশ কিছু যে প্রসিদ্ধ ও তত-প্রসিদ্ধ-নয় উদাহরণের উল্লেখ করলাম, তার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য এখন কতগুলি প্রশ্ন তোলা যা আমাদের মনে জাগে কিন্তু যার উত্তর আমাদের জানা নেই। প্রথমতঃ লক্ষণীয়, অধুনাকালে একটি ধারণার বহুল প্রচার ঘটানো হয়েছে যে আমাদের সনাতন ধর্মের দুটি পদ, সত্য ও অহিংসা। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সত্যকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'অহিংসা'-জাতীয় কোনো ধারণাকে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেওয়া হয়নি। অবশ্য আমরা ইচ্ছে করেই মহাকাব্য ও পুরাণের বাইরে অন্যান্য শাস্ত্রের ভিতরে যাচ্ছি না। এই কারণে যে, যে-ধর্মের ধারণা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে নেই কিন্তু অন্য উচ্চতর মার্গের শাস্ত্রে আছে তা জনজীবনকে কোনোকালেই তেমনভাবে স্পর্শ করেনি বলে আমরা মনে করি। এদেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকালে (এবং পরবর্তী কালে) কি-জাতীয় ধর্মচিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তাই আমাদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, অধুনাকালে এই সত্যকে ইংরিজিতে TRUTH এই বাক্যে অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদ সর্বতোভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সত্য কী বলতে আলোচনায় আমরা সত্যের যত রকম সংজ্ঞা পেয়েছি তাদের কোনটির সঙ্গেই ইংরিজি TRUTH-এর কোনো সম্পর্ক নেই। (অবশ্য true to one's word —এই ভাবাশ্রিত ভাবের সঙ্গে অঙ্গীকার পালন অর্থে সত্যের ক্ষীণ একটা সম্পর্ক পাই)। এমন কি মিথ্যা কথা না বলার অর্থে সত্যও TRUTH-এর সমার্থবাচক নয় এই কারণে যে, সেখানেও সত্যকথনকে পরপীড়াশূন্য হতে হবে এই-জাতীয় শর্তের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। পাশ্চাত্য ধর্মীয় চিন্তাধারায় সত্যের ধারণার কাছাকাছি কোনো ধারণারই মনে হয় হদিশ পাওয়া যায় না। TRUTH, যা কি না আমরা এইমাত্র বললাম আমাদের ঐতিহ্যের সত্যের ধারণার সমার্থবাচক নয়, যদিও মিথ্যা কথা না বলার ধারণার কাছাকাছি বটে, এই TRUTHও খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় চিন্তায় বা প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় চিন্তায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে আমার জানা নেই। খ্রীষ্টীয় ধর্মে স্বর্গের সোপান স্পষ্টতঃই সেই গুণ যাকে ইংরিজিতে বলা হয়েছে LOVE। এবং এও খুবই আশ্চর্য বলেই আমার কাছে মনে হয় যে সত্যের কাছাকাছি কোনো ধারণা যেমন পাশ্চাত্য ধর্মীয় কোনো চিন্তায় কোনো স্থান পায় না, তেমনি LOVE-এর

কাছাকাছি কোনো ধারণাই আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে গুরুত্ব পায়নি। এ বিষয়ে আমার জ্ঞানের পরিসীমা অতি সংকীর্ণ। অধিকতর জ্ঞানশালী কোনো পাঠক এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করলে আমার এই প্রসঙ্গটা এখানে উত্থাপন করাটা সার্থক হবে মনে করব।

তৃতীয় যে প্রসঙ্গ উঠে পড়ে তা এই, সত্যকে যে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধর্মীয় চিন্তায় একটা ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে কি? সত্যধর্ম সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠধর্ম ব'লে স্বীকৃত হলেও অন্য অনেক ধর্মের কথাই একই শাস্ত্রকারেরা বহুভাবে বলে গেছেন। সত্য স্বর্গের সোপানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু অন্য অনেক সোপানের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়দমন, শরণাগতকে আশ্রয়, অনৃশংসতা, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, গোব্রাহ্মণের সেবা— এমন ভূরি ভূরি উদাহরণের কথা ভাবা যেতে পারে যাদের সম্যক্ আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।* জীবনে এমন অনেক অবস্থারই উদ্ভব হয় যেখানে একটি ধর্মকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্য কোনো ধর্মকে লঙ্ঘন করতে হয়। এই জাতীয় ধর্মের সংঘর্ষ ধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মসংকটের সম্মুখীন করে। আমাদের মহাকাব্য এবং পুরাণে জীবন এমন সরল মোটেই ছিল না যে তাতে ধর্মসংকট দেখা দিত না—পদেপদেই দিত। রামায়ণের আখ্যানভাগ তো পুরোপুরিই ধর্মসংকট সংক্রান্ত। কিন্তু যা দেখে আশ্চর্য হতে হয় তা এই যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ বলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন তাঁরা যেন সত্যের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের সংঘর্ষকে সংকট বলেই মনে করেন নি। অনায়াসে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মকে পদদলিত ক'রে লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় সত্যধর্ম পালন করে গেছেন। এবং সেজন্যেই তাঁদের ধন্য ধন্য করা হয়েছে। ভীষ্মই বোধহয় তাঁর প্রসিদ্ধ দুটি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের সময়ে অন্যকোনো ধর্মকে লঙ্ঘন করেননি (যদি না অবশ্য সন্তানোৎপাদন করে পিতৃঋণ শোধ করাকে অন্যতম ধর্মের দাবি বলে মানা যায়।) কিন্তু কর্ণ এককথায় ভেকধারী ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল কেটে দান করে দিয়ে নিজের আত্মহননের জন্যই শুধু দায়ী হলেন না, কৌরবপক্ষের পরাজয়েরও কারণ হলেন। অপরদিকে অপক্ষপাতকে সত্যের একটি সংজ্ঞা বলে ভীষ্ম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইন্দ্র যে খলতার আশ্রয় নিয়ে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে তাঁকে জিতিয়ে দিলেন এদোষের জন্য ইন্দ্রের বা অর্জুনের ততটা নিন্দা মহাভারতকার করলেন না যতটা প্রশংসা করলেন কর্ণের সত্যরক্ষার। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের ঘটনা তো আরও চমকপ্রদ। শ্রীরামচন্দ্র বনে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন ; কৌশল্যা, লক্ষ্মণ ও ভরতের সর্ববিধ আজ্ঞা, অনুরোধ ও যুক্তি উপেক্ষা করে। তাঁর বনে যাওয়ার ফলে দশরথ শোকে দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন, কৌশল্যা হলেন জীবন্মৃতা। অযোধ্যাবাসিগণ হলেন অনাথ, সীতাকে পেতে হল চূড়ান্ত নিগ্রহ, লক্ষ্মণের পত্নী হলেন উপেক্ষিতা। এসবই ঘটল রামের নিজ সত্যরক্ষার খাতিরে নয়, পিতৃসত্যরক্ষার খাতিরে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে রামকে বনবাসে পাঠানোর আজ্ঞা দশরথ নিজমুখে উচ্চারণও করতে পারেন নি। আজ্ঞা দিয়েছিলেন কৈকেয়ী এবং তার পিছনে প্ররোচনা ছিল একটি দুষ্টাবুদ্ধি তুচ্ছ রমণীর। এই দুষ্টাবুদ্ধি তুচ্ছ রমণী মন্থরার নির্দেশনাকে অনড়, অটল ভবিতব্যের স্থান দিয়ে বসলেন রাম তাঁর পিতৃসত্য রক্ষার ধারণার ভিত্তিতে। অথচ এখানে স্পষ্টতঃই একাধিক ধর্মের

* চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮২ সংখ্যায় লেখকের 'স্বর্গের সোপান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংঘর্ষ ঘটছিল। কৌশল্যা বলেছিলেন, 'পিতা দশরথ তোমার যেমন পূজনীয় আমিও মাতৃরূপে সেই রূপেই পূজা পাইবার যোগ্য, আমি তোমায় বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না। অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়।'[৪০] লক্ষ্মণ ভৎর্সনা করে বলেন, 'ধর্মহানিসম্ভাবনায় এবং পিতৃবাক্য পালন না করিয়া লোকমর্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকেরা সৎপথভ্রষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় আপনার বনগমনে যে বিশেষ ব্যগ্রতা হইয়াছে তাহা সত্যই অসঙ্গত... যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিপর্যয় হইয়াছে, যাহা দ্বারা আপনার মোহবশ হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি।'[৪১] ভরত বলেন, 'পিতৃদেব লোকসমাজে ধর্মকে অতিক্রম করিয়া যে অসাধু কার্য করিয়াছেন আপনি সেই কার্যের অনুসরণ করিবেন না। যাহার দ্বারা প্রজাগণের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায় সেই অভিষেকই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম। কোনো ক্ষত্রিয় এইরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মত্যাগ করিয়া সংশয়স্থিত, লক্ষণরহিত, পরিণামে আচরণীয় ও অনিশ্চিতভাবাপন্ন ধর্মের আচরণ করিয়া থাকে?'[৪২]

কিন্তু এসব কোনো যুক্তিই রাম মানলেন না, তাঁর মতৈক্য ঘটল শুধু কৈকেয়ীর সঙ্গে : 'রামকে নির্বাসন ধর্মই হউক কিংবা অধর্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহার অন্যথা হইতে পারে না।'[৪৩] এ যেন সব বিচারবুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞানকে শিকেয় তুলে রেখে দৈবের কাছে নতিস্বীকার করা যে দৈব সৃষ্ট হয়ে যায় মুহূর্তকালমধ্যে এক দুষ্টারমণীর বাক্য উচ্চারণমাত্রে। এ ছাড়াও যে অন্যবিধ ধর্ম আছে তার ঘোষণা করেন লক্ষ্মণ এইভাবে : 'পৌরুষহীন ব্যক্তিগণই একমাত্র দৈবের প্রশংসা করে, পুরুষকারের করে না।'[৪৪] শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য পৌরুষহীন ছিলেন না, সেই পৌরুষ ব্যবহার করে তিনি এমন ভাবে ধর্মপালন করলেন যাতে মনে হয় নিজেকে ক্লেশ দেওয়া এবং অপরের ক্লেশে উদাসীন থাকাই যেন তাঁর ধর্মের মূল লক্ষ্য।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান সত্যরক্ষার উপাখ্যান হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু তা অধিকতর মাত্রায় বিশ্বামিত্রের খলতা ও নৃশংসতার উপাখ্যান বলে পরিগণিত হতে পারত। আশ্চর্যের বিষয়, আখ্যানকার ঐ খলতা ও নৃশংসতার কোন নিন্দা করেন না, হরিশ্চন্দ্রের সত্যধর্মের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত থাকেন। হরিশ্চন্দ্র নাহয় বরুণদেবের কাছে অপরাধ করেছিলেন, তাঁর পুত্রকে বলি দেবেন বলে অঙ্গীকার ক'রে পরে স্নেহমোহবশতঃ ঐ নৃশংস কর্ম ক'রে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বিশ্বামিত্র যে হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের ভৃত্য করিয়ে ছাড়লেন, তাঁর দোষলেশহীনা স্ত্রী শৈব্যাকে যে অকথ্য শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ও অপমানে ভোগালেন, তার সপক্ষে কোনো যুক্তির কথা ভাবা যায় কি? অবশ্য হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা যখন চিতারোহণ করতে যাচ্ছেন তখন দেবতাপরিবৃত হয়ে এসে বিশ্বামিত্র বলেন, তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল মাত্র। কিন্তু এ কী মারাত্মক ধরনের পরীক্ষা! পরীক্ষা করার নামে এ কী চূড়ান্ত অত্যাচার! অথচ এত সত্ত্বেও বিশ্বামিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। উপাখ্যানটি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে যেন হরিশ্চন্দ্রের ঐভাবে অকারণ নিগ্রহ মেনে নেওয়াটা ধর্মশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটি অনুসরণ-যোগ্য মহৎ আদর্শ।

সুদর্শন ও ওঘবতীর উপাখ্যানে সুদর্শন তো ক্রোধ ও ঈর্ষা জয় করতে পারার জন্য প্রশংসনীয় হলেন, সত্যরক্ষা করার জন্য মহিমা অর্জন করলেন, কিন্তু ওঘবতীর উপর যে চরম অত্যাচার করা হল, তাঁকে যে পতিবাক্য অনুসরণ করা এবং, পরপুরুষ গমন না করার উভয় সংকটে ফেলা হল,

বিশেষ করে যে পুরুষের দিকে যখন তাঁর বিন্দুমাত্র কামনা ছিল না, তার কোন আভাস কাহিনীর বিবৃতিতে পাই না।

এই ভারসাম্যের মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মীয় ধারণা মনে হয় একেবারে চাপা পড়ে গেছে; অথবা ঐ ধারণাটি হয়তো ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তায় কোন স্থানই কোনদিন অর্জন করতে পারেনি। আমরা বলছি সেই ধর্মের কথা যাকে ইংরিজিতে বলা হয় JUSTICE। সীতার উপর, ঊর্মিলার উপর, কৌশল্যার উপর, হরিশ্চন্দ্রের উপর, শৈব্যার উপর, ওঘবতীর উপর কি পরিমাণ INJUSTICE করা হয়েছে! কিন্তু মহাকাব্যকার-পুরাণকারেরা যেন সে বিষয়ে অবহিতও নন।

চতুর্থ প্রশ্ন মনে জাগে: সত্যরক্ষা, যাকে এমন চূড়ান্ত গুরুত্ব আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্মবোধ কোথায় গেল পরবর্তী কালের ভারতবর্ষে? কি কি ভাবে এই বিশিষ্ট ধর্মধারণাটি ভারতবাসীর জীবনকে পরবর্তী যুগে প্রভাবিত করেছে? প্রভাবিত কোন না কোন ভাবে নিশ্চয়ই করেছে। কারণ জাতির মানসিকতার উপর আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় চিন্তাধারার প্রভাব অতিশয় গভীর ও ব্যাপক হয়েছে বলেই মনে করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-সাহিত্যের, যার অসংখ্য গল্পকথা লোকসাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে নানান বিকৃত ও অবিকৃত আকারে। এও আমরা জানি যে লোকমানসে প্রভাবের অনুপ্রবেশ লিখিত সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল থেকে যায়নি। নিরক্ষর জনতাও সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। কিন্তু পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক যুগেই কি ভারতবর্ষের অধিবাসীরা সমকালীন অন্য কোন সভ্যতাপ্রাপ্ত দেশের অধিবাসী-দের চেয়ে অধিকতর মাত্রায় মিথ্যা কথা না বলা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা অর্থে সত্যনিষ্ঠা দেখিয়েছে বলে কোন নজির আছে? মুসলমানদের আগমনের আগে পর্যন্ত এই ব্যাপারে ভারতীয়দের নৈতিক-মান সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা পরস্পরবিরোধিতাশূন্য নয়, কিন্তু এ তো আমরা জানি যে রাজপুত বীরদের মধ্যে, মারাঠা রাজপুরুষদের মধ্যে ভীষ্ম বা কর্ণের আদর্শ অনুযায়ী কোন পুরুষের নজিরই পাওয়া যায় না; এই যুগের বীরত্বকাহিনী প্রায়শঃই শঠতার কাহিনী, বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। ইংরেজ-ফরাসীরা যখন এদেশে হাজির হল তখন তো ভারতবাসীদের পরম দুর্নামই রটে গেছে, ভারতবাসীরা পরম মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য। এই দুর্নাম সবটা যথার্থ না হলেও ভীষ্ম, কর্ণ, ও রামচন্দ্রের আদর্শকে যে জাতি যুগ যুগ ধরে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছে তার এবংবিধ দুর্নাম রটার সূত্রই বা এলো কোথা থেকে? আর একেবারে যদি স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে চলে আসি তো এ কথা কি বলতে পারি যে অন্যান্য দেশ, যাদের ঐতিহ্যে সত্যধর্মের কোন গন্ধও নেই, সেসব দেশের অধিবাসীদের তুলনায় মিথ্যা কথা না বলা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা—এ দুয়ের কোন্ অর্থে আমরা ভারতবাসীরা অধিক সত্যনিষ্ঠ? বরং ধর্মের মধ্যে যে ভারসাম্যের অভাবের কথা বলা হয়েছে তারই যেন ব্যাপক প্রভাব আমাদের আধুনিক ভারতবাসীদের মানসিকতায় লক্ষ্য করা যায়। আমাদের আধুনিক ভারতবাসীদের ধর্মধারণা খুবই জগাখিচুড়িপাকানো ধরনের মনে হয়। প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাব, তার সঙ্গে খাপছাড়াভাবে খানিক খানিক পাশ্চাত্ত্য ধ্যান-ধারণার গোঁজামিল। সব নিয়ে আকারহীন, সংগতিহীন এক ধারণাপুঞ্জ, যা থেকে বিভিন্ন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি একই অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মসংগত পন্থার নির্দেশ পেতে পারেন।

আমার প্রশ্নটা এই : উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সত্যধর্ম থেকে কী পেয়েছি? সত্যের প্রতি অসাধারণ ও তুলনাতীত নিষ্ঠা? নাকি সত্যধর্মের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যে ভারসাম্যের অভাবের সৃষ্টি সেই প্রাচীন যুগের ধর্মীয় চিন্তাতেই ঘটেছিল, সেই ভারবৈষম্যটা মাত্র?

উদ্‌ধৃতি-নির্দেশক

১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ সর্গ (অমরেশ্বর ঠাকুরের অনুবাদ)
২। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৭৫ অধ্যায়। (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)
৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১০৯ অধ্যায়। (ঐ)
৪। দেবীভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়। (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
৫। মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৪ অধ্যায়। (ঐ)
৬। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ সর্গ (ঐ)
৭। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪ অধ্যায়। (ঐ)
৮। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪ অধ্যায়। (ঐ)
৯। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৪২ অধ্যায়। (ঐ)
১০। বৃহৎ ধর্ম, মধ্যমখণ্ড, ২৬ অধ্যায় (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
১১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ সর্গ। (ঐ)
১২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৭৫ অধ্যায়। (ঐ)
১৩। মহাভারত, বনপর্ব, ১৮৪ অধ্যায়। "
১৪। দেবীভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়। "
১৫। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১২১ অধ্যায়। "
১৬। দেবীভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়। "
১৭। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ২২ অধ্যায়। (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
১৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১০৯ অধ্যায়। (ঐ)
১৯। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৭৫ অধ্যায়।
২০। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ অধ্যায়। "
২১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬১ অধ্যায়। "
২২। লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ, ৮ম অধ্যায়। (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
২৩। বৃহৎ ধর্ম, পূর্বখণ্ড, ২য় অধ্যায়। "
২৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৬২ অধ্যায় "
২৫। মহাভারত, বনপর্ব, ২১২ অধ্যায়। "
২৬। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, ৩৩০ অধ্যায়। "
২৭। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২১ সর্গ। "
২৮। বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ। (কালীপদ তর্কাচার্য ও জীব ভট্টাচার্যের অনুঃ)

২৯। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫ সর্গ (১ বং)
৩০। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৯২ অধ্যায় (ঐ)
৩১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, ৩৩০ অধ্যায় „
৩২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, ১৯৯ অধ্যায় „
৩৩। বৃহৎধর্ম, মধ্যকাণ্ড, ১৭ অধ্যায় „
৩৪। মহাভারত, বনপর্ব, ৭০ অধ্যায় „
৩৫। মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৩ অধ্যায়। „
৩৬। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১৪ সর্গ (২৮ বং)
৩৭। শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা, ১৪ অধ্যায় „
৩৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩য় অধ্যায় (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
৩৯। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ২য় অধ্যায়। „
৪০। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২১ সর্গ (২৮ বং)
৪১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩ সর্গ (২৮ বং)
৪২। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৬ সর্গ (২৮ বং)
৪৩। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১২ সর্গ (২৮ বং)
৪৪। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২০ সর্গ (বং)

সময় খায় মেয়েকে

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ঝটিকায় দম বন্ধ হয়ে আসে যার ও যাকে এমন যুদ্ধের মধ্যে
ফেলে দিয়ে তুমি দেখেও দেখছ না, সে প্রথম পা-টি কখন
ফেলছে বা ফেলার আগেই কুপোকাৎ হয়ে পড়ল কিনা,
সে-প্রশ্নে তোমার উদ্ধত ঔদাসীন্য যেন তোমাকে এ-গোধূলির
হেয় না করে। তবু যেহেতু তাকে রক্ষা তুমি ভিন্ন করতে
পারে না কেউ, হাতে যোগান দেওয়ার মতো অস্ত্র কারুরই
নেই, ঘর তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে,
সহানুভূতিশীল হয়েও ঘরের বাইরে বন উদ্‌ভ্রান্ত, বনের
ওপারে আকাশ ধড়াচূড়া পরেও রক্তিম নৈরাশ্যেই নীরব।

অস্ত্র তো দাওইনি, কাপড়টা পরিয়েছ এত শতছিন্ন যে তার
স্তনও ঢাকে না, কণ্ঠে দোলাতে বেছে-বেছে যোগাড় করেছ
কালি-মাখা খোলামকুচি, গেঁথেছ মালা, ভাববার মতো বুকের
কলসের ভিতর যা-কিছু পুরেছ তা বহু ব্যবহারে জীর্ণ
কথাই, স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছ তার স্মৃতি হতে।

শুভঙ্করীর ছাত্র, তুমি আপাতত চাও সময় নিয়েই যোগ-
বিয়োগ-গুণ-ভাগ, কখন শুইয়ে দাও টান-টান করে একটি
সরল রেখা যার প্রান্ত হতে প্রান্ত হবে তোমার হতভাগিনীর
যাত্রাকাল, পরে রেখাটা কাটতে বসো এই গোড়ায় এই
মাঝখানে, পরে ত্যাখো ছিন্ন অংশগুলি সাজালে মোটামুটি
কোনো শরীরে দাঁড়াচ্ছে কিনা, মাথার জায়গায় মাথা পায়ের
জায়গায় পা তলপেটে তলপেট, যদিও চোখ চাইল কিনা
বা বাঁশি বাজল কিনা বা এমন-কি এককালে জীবন ছিল
বলেই আজ মৃতদেহও হল কিনা যাতে শ্মশানে অন্তত নিয়ে
যাওয়া চলে মন্ত্র পড়া যায়, বলা বাহুল্য সে-চিন্তাও
জাগেনি তোমার মনে। একমাত্র কাম্য, যেন পারে যতক্ষণ,
সময় ও মেয়েটা মাখামাখি হয়ে থাকুক, একজন আরেক-

জনকে শেষ করুক, হত বা হন্তা, আবেগ নেই তোমার
কাউকে নিয়েই।

এত দম্ভ, এই ক্রূরতা কোথাও নজরে পড়েছে কিনা, দাঙ্গা-
হাঙ্গামায় বা শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে কোনো পুরা-
কালের পারস্যে, তা ভেবে তাকের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো
ইতিহাসের বইটা মগ্ন আত্মবীক্ষণে, যেহেতু ঘরের এসব জিনিস
আগাগোড়া ব্যাপারটা এত কাছে থেকে দেখছে বলেই। দেয়ালের
পেরেকও ভাবছে হাতুড়ির মারটা কি এর চেয়ে ভীষণ
ছিল, যখন

তুমি ঠিকই চলছ আঙুলের দাগের পর দাগে, গুনছ এক-
দুই-তিন-চার, কুড়িতে পৌঁছেই ফিরে শুরু করা এক, যেন
ধাপ হতে ধাপ ধরে মইয়ে ওঠা-নামা, চূড়ায় পৌঁছোলে
পায়চারি করার মতো ছাদ নেই বলেই সঙ্গে-সঙ্গে নিম্নগামী
এবং নামতে-নামতে শেষ ধাপে ঠেকেও কিছুতে ছোঁবে না
জমি পাছে ফুলের গন্ধ আসে নাকে বা দৃষ্টি কাড়তে চায়
পথচারী কেউ—শুধু হিসেব যা রাখছ মনে-মনে তা
কতগুলো মই ওঠা হল, কতটা উচ্চতা, বা এক-কুড়ি দু-কুড়ি
তিন-কুড়ি করে সরল রেখাটার পেরোলে কতখানি এবং
এখনো কতটা যাওয়ার আছে। পুনরাবৃত্তিতে খেদ নেই,
মৃত্যুতে নির্বিকার, শুধু একটি সংকল্পেরই ভূতে-পাওয়া
জন্তু এমন আর কোন্ অরণ্য কোথায় চষে বেড়ায়,
তা ভেবে নিশ্চয় অদূরের অগভীর বনেরও ভিরমি
লাগে।

যারা আছে কাছে তারা তো দেখছেই, যারা দূরে আছে
তাদের কল্পনা আছে, তবু সকলেই ধীরে-ধীরে মেয়েটা
ছেড়ে তোমাকে নিয়েই হতচকিত, এমন-কি একের প্রতি
অনুকম্পা অন্যকে নিয়ে বিস্ময়েই ক্রমশ রূপান্তরিত,
যাতে যে-তুমি দর্শক সে-ই দাঁড়াচ্ছ দৃশ্যে, অর্থাৎ
মেয়ের যদি দর্শক তুমি তো তোমার দর্শক ঘর-বন-গোধূলি-
আকাশ, যারা কে জানে এতক্ষণে তোমারই অনুকরণে

হয়তো শুনতে শুরু করেছে এক-দুই-তিন-চার
এক-কুড়ি দু-কুড়ি তিন-কুড়ি। দেখছ না, তবু মই
তোমারই একলারই নেই আজ সন্ধ্যায়।

সময় খায় মেয়েকে না মেয়ে খায় সময়কে ও তা
দেখার পরে যে-তৃপ্তি হয়তো জাগবে তোমাতে, তাকে
তুমি খাও না সে তোমায় খায়, বেড়ার ওপারে
বেড়ায় এই ভাবনাতে দুলছে যাদের মন, তারাও
হয়তো অন্তিম ফলাফলের প্রশ্নে ইতিমধ্যে আস্তে-
আস্তে উদাসীন, এই যখন ঘর ক্রমশই ঘর নয়,
মুক্ত অঙ্গন, যেখানে একে-একে জমায়েত কুতূহলী
বিশ্বজন, আর সকল ধূলা সকল সম্পদ বিস্ময় বা
ভয় স্নাত হচ্ছে সূর্যাস্তের এমন কিছু গৈরিক
অবলোকনে যাতে আর যা-ই থাক, এখনো কারুরই
প্রতি ঘৃণার অবকাশ নেই।

তাই সেরকম প্রার্থনা করো বা না-ই করো—করছ
যে না, তা দেখাই যাচ্ছে—এমনিতেই তুমি এ-গোধূলির
হেয় হচ্ছ না।

সঙ্গী ছিলাম—আছি

রত্নেশ্বর হাজরা

আশ্চর্য রঙের দুঃখ সঙ্গে ছিল আনন্দের—এখনো রয়েছে, আছে
কাছে থাকে সমস্ত সময়
ভয় ও নির্ভয় ছিল—কষ্ট ছিল হরেকরকম
যেমন মানুষ ছিল, থাকে
গভীর অসুখ ছিল, সুখ ছিল—রোগ ও আরোগ্য, বিষাদের
বেলাভূমিগুলো ছিল, এবং বানিয়েছিল—এখনো বানায় আত্মা
আত্মার ভিতরে পরমাকে।
আনন্দ একদা রাত্রে পাথরে পাথর ঘষে অগ্নিকে পেয়েছে
(আগে চিনত না আগুন)
আগুনে করেছে উষ্ণ শীতকাল, পুড়িয়েছে কাঁচা মাছ
ময়ালের বাচ্চা আর পোয়াতি হরিণ
সন্ততিকে চিনিয়েছে বাঁচার কৌশল, মৃত্যু—
চিনিয়ে দিয়েছে শূন্য—১ দুই ৩
কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস হয়ে গেছে—পরে সে বিষাদ—একা
পরিত্যক্ত বাড়ি বা লেগুন।

আনন্দ অনেক দিন লুঠেরা হয়েছে, তার দলে থাকতো লোলুপ মানুষ
দেখেছে বনের মধ্যে শিকারীরা পলাতক
জ্যোৎস্নায় রয়েছে পড়ে পাখি আর অদ্ভুত কুড়ুল
মন্দির ও অহংকার পাশাপাশি উড়ে যায়
ফুলের ভিতরে গিয়ে অন্ধকার রেখেছে গুগ্‌গুল
আনন্দ দেখেছে—গুহা মূর্তিময় হয়ে ওঠে
মূর্তির হৃৎপিণ্ডে দোলে মানুষের হুঁশ।
আশ্চর্য রঙের গন্ধ সঙ্গে ছিল আনন্দের, এখনো রয়েছে, থাকে—খুব কাছাকাছি
যখন অসুখ শুনে আরোগ্য ফিরেছে বাড়ি—
আমিও এলাম, আছি—বহুক্ষণ আছি……

একটুকরো হাওয়া

কঙ্কণ নন্দী

একটুকরো হাওয়া এসে এলোমেলো করে গেলো সব

কে যেনো আমার নামে ডাক দিলো হাওয়ার ভিতর
টিনের চাল থেকে চৈত্রের রোদ
পিছলে গিয়ে যেভাবে ঝলসে ওঠে
কার কণ্ঠস্বরে আমিও তেমনি চম্‌কে উঠলাম
উতলা হাওয়ার মধ্যে এক উতলা স্মৃতির আর্তনাদ
আমি কানে নয় চোখের ভিতর দিয়ে দেখলাম

এই উতলা হাওয়ার ভিতর আমি কাকে যেনো পেলাম
কার শরীরের গন্ধ, গতায়ু যৌবন— দীর্ঘশ্বাস,
'একটুকরো হাওয়া, তুমি কতদূর থেকে ছুটে আসছো ?'
তোমার সাথে আমার কেমন যেনো এক
মাঝামাঝি সম্পর্ক—প্রেম

একটুকরো হাওয়া এসে এলোমেলো করে গেলো সব
এ যেনো যৌবন নয়—গতায়ু আমারই উৎসব

প্রতিটি সন্ধ্যায় এই হাওয়া আসে এলোমেলো করে দেয় সব
আমি বসে থাকি এই একটুকরো হাওয়ার জন্যে
এই বিদেহী স্মৃতির জন্যে গতায়ু যৌবন
এবং ভালোবাসাবাসির এই সময়টার জন্যে

শিল্পে রোধে ক্ষয়

রবীন সুর

তোমার কাছাকাছি যদি না যেতে পারি
কথার স্বরলিপি, গানের গূঢ় ভাষা
ঝালাতে দিন কাটে। কোথায় শুকসারী

প্রাচীন কাহিনীর শোনায় কথকতা,
গোপনে জেনে রাখি কে গড়ে তার আশা—
বেদনা কতখানি জানাবে তরুলতা?

পাহাড় খুঁড়ে খুঁড়ে কে পায় স্বাদু জল?
গহন বনে ঘুরে মানুষে বাঁধে বাসা,
যা নেই তারি খোঁজে ফোটায় শতদল!

যে মুখ মরে যায়, স্মৃতির কারুকাজে
প্রায়শঃ সেই থাকে ছেনির মুখে জাগা
পাথরে প্রতিমায়—কালাতিশয়ী তাজে।

র‍্যাদার পালিশের দীপ্র দারুময়
ক্ষণকে বেঁধে রাখে, দুচোখে ঘোরলাগা
শোকের অমাবাতে শিল্পে রোধে ক্ষয়।

তোমার কাছাকাছি যদি না যেতে পারি
একাই ছবি গানে যে কোনো রাতজাগা
শুদ্ধ সমারোহে তাড়াই মহামারী।

আবহমানকাল

অসীম রায়

—অনিন্দ্য-দা, ইউ আর মাইরি গ্রেট, সত্যজিৎ বললে খালাসীটোলায়। সারা দুপুরের রোদ্দুরের তাত তখনও মরেনি। হাওয়ায় টিনের চাল থেকে ভ্যাপসা গরম এখনও নামছে রাত আটটায়। সামনে সার সার বেঞ্চি জুড়ে অবাঙালী শ্রমিক বাঙালী কেরানী। সচরাচর যে নারকীয় পরিবেশ ভাবা হয় দেশী মদের দোকানে তা মোটেই নেই। বরং সেই ঘর্মাক্ত মানুষগুলোর নীচুগলার আলাপে বেশ বুঁদ হয়ে থাকার আরাম পরিলক্ষিত। তরুণ কতগুলো আধুনিক কবি সত্যজিৎকে দেখে রসস্থ অবস্থায় চেঁচায়, 'এই যে নদের নিমাই', 'চাঁদু', 'পিসীমা' ইত্যাদি নানারকম আহ্বান জানায়। সত্যজিৎ সেদিকে না চেয়ে সার সার শোয়ানো ড্রামগুলোর ওপর এসে বসে।

টুটুল তার পাশে বসে বললে,—আজ সন্ধ্যায় কাউকে গ্রেট বানানো দরকার, না?

—ঠাট্টা করছো। আমি সত্যি বলছি, অনেকেই তো পার্টি করে দেখি। কিন্তু তোমার মেজাজ নেই।

—এসব কী বাজে কথা বলছো সত্যজিৎ? আমার কাছে ব্যাপারটা অনেক সীরিয়াস। তোমার সঙ্গে মদ খেতে বসেছি বলে ব্যাপারটা হালকা হয়ে যায়নি।

—এই তো, এই তো! এইটাই তোমার পছন্দ হয় না।···তুমি উপন্যাস লিখছো? এমন ঝপ করে সত্যজিৎ প্রশ্ন করে যে, টুটুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়,—হ্যাঁ, তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,—মানে সেরকম একটা ভাববার চেষ্টা করছি।

—এই এই জিনিস আমার ভাল লাগে না তোমার মধ্যে। তুমি যেন সব সময় নিজের চারিদিকে একটা পাঁচিল তুলে আছো। এটা কিন্তু ফল্‌স্‌। মানিকবাবুর পুতুলনাচের ইতিকথা পড়েছো? গ্রেট! ওরকম লিখতে পারবে? পারবে না। তুমি পারবে না অনিন্দ্য-দা। কারণ তুমি ইন্টেলেকচ্যুয়াল। অ্যাণ্ড আই হেট ইন্টেলেকচ্যুয়ালস।

বোধহয় দেশী মদের গরমে টুটুলও গরম হয়ে ওঠে। তারও মুখ চারপাশের মানুষগুলোর মুখের মতো থমথম করে। সত্যজিৎ তার হাত চেপে ধরে তাতে হাত বোলাতে থাকে।—ইন্টেলেকচ্যুয়াল হয়ো না, মরবে।

—আমি তোমাদের এইসব টার্মস বুঝি না। আমি যেসব রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কাজ করি তাদেরও কতগুলো টার্মস আমি মানি না, আর তোমরা সাহিত্যিকরা লেখককে যেরকম বাউণ্ডুলে বলে দাঁড় করাও তাও মানি না।

—এসব টার্মস-ফার্মসের কথা কী বলছো? আমি বলছি মানিক বাঁড়ুজ্জের কথা। মানিক বাড়ুজ্জে আসতো খালাসীটোলায়। মানিক বাঁড়ুজ্জে র-লাইফ দেখেছিল, তুমি দেখেছো অনিন্দ্য চৌধুরী?

—আমি দেখিনি।

—তাহলে? তাহলে কী লিখবে?

টুটুল স্থিরভাবে সামনের লোকগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে,—আমি লিখব আমার কালের কথা! আমার চারপাশের বাংলাদেশটা পাল্টে যাচ্ছে, আমাদের শৈশব যৌবন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, এই সব কথা।

—কলকাতা দেখেছো কখনো? হিজড়ের নাচ? কাপড় তুলে তুলে? আমি তোমাকে নিয়ে যাব, এই কাছেই। একটা গ্যারাজের মধ্যে।

টুটুল সত্যজিতের দিকে ঝুঁকে বলে,—এত নাটক কেন সত্যজিৎ? এত নাটক কেন? আধুনিক মানেই কি নাটকীয়? আজগুবি?

—নইলে যে সব ভাল লাগে অনিন্দ্য-দা। সব ভাল। এই বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন। এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত, সংসার করতে গিয়ে প্যানপ্যানানি, তারপর ইন্সিওরেন্স, এর মাঝখানে তোমাদের লালপতাকা, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—এই তো জীবন? এ নিয়ে কী লিখবে অনিন্দ্য-দা?

—তাহলে কী লিখব?

—একেবারে র-লাইফ লিখবে। যা এখন বাংলাদেশে ঘটছে। ছেলেগুলো বয়ে যাচ্ছে, মেয়েগুলো রাস্তায় নামছে, সব ভেঙে পড়ছে। এই ভাঙা নড়বড়ে জিনিসগুলো ধরে কী লাভ? একে আর এক ঠোক্কর মারো। তোমাদের সেই শ্লোগানটা আমার বড্ড ভাল লাগে,—এই সরি-গলি সরকারকো এক ঠোক্কর ওউর দো। তোমার ওসব ইন্টেলেকচুয়ালিজম মাড়িয়ে কিছু হবে না।

—তুমি লেখো না এই সব কথা।

—আমি? সত্যজিতের সরু মুখখানার মধ্যে তার চোখ দুটো জলজল করে ওঠে।—আমি এই সব কথা লিখব অনিন্দ্য-দা। আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি র-লাইফ দেখেছি। আমার বাবা জানো দফতরি ছিলেন। নিজের হাতে বই বাঁধাতেন। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি হাঁকাননি। কী দরকার জানো? আসলে কী দরকার জানো?

সত্যজিতের রোগা কালো ঘামে-ভেজা শরীরখানা টুটুলের প্রায় কোলের ওপর উঠে আসে।—আসলে কী দরকার জানো? একটা গ্র্যাণ্ড টুইস্ট। সেই টুইস্টটা দিতে পারলেই, ব্যস!

এরপর সত্যজিৎ এত হাই হয়ে উঠল যে, টুটুলের সঙ্গ আর ভাল লাগে না। সে দু-তিনজন অপরিচিত পানাহারে মগ্ন মানুষের গাল টিপে আদর করতে করতে টপ্পা গান ধরে। তারপর টুটুলের গালে হাত দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—আমার সারা দুনিয়াই বন্ধু। যেখানে মদ আছে এবং তার সমজদার আছে সেখানেই সত্যজিৎ সেন একটু জায়গা করে নেবে। কী বলো?

—তোমাকে কি বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে?

সত্যজিৎ ঘুষি পাকিয়ে বললে,—গেট আউট, ইউ ইন্টেলেকচ্যুয়াল।

পরদিনও সত্যজিৎ অফিসে আসে টিফিনের সময়। কাছেই পাবলিসিটি ফার্ম থেকে বেরিয়ে আড্ডা দিতে আসে।

—আজ প্রোসেশানে আসছো? টুটুল বললে।

—প্রোসেশানে? আমি? ঠাট্টা করছো অনিন্দ্য-দা।

—ঠাট্টা মানে! এতগুলো মানুষকে পুলিশ গুলি করে মারল। তার জন্যে সারা কলকাতা প্রতিবাদ করছে, তুমি তার মধ্যে থাকবে না কেন?

—আমার রাজনীতি বড্ড বোরিং লাগে। সেই এক চলবে না চলবে না। তুমি কী করে সহ্য করো বলো তো এই সব ঝামেলা?

—সহ্য করি মানে? এইটাই তো সবচেয়ে জীবন্ত ব্যাপার।

সত্যজিৎ কেক কামড়াতে কামড়াতে বললে,—ও ব্যাপারটা আমার একেবারে এলার্জি।

—এই যে হাজার হাজার ছেলে রাস্তায় নামছে, শ্লোগান দিচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে লড়াই করছে, ঐটা কিছু না? তা যদি ভাবো আমি বলব তুমি একটা মরা মানুষ। বুঝব তুমি মরে গেছো সত্যজিৎ, যদি বাংলাদেশের এই চেহারাটা তোমার চোখে না পড়ে।

—বাংলাদেশের আর কোন চেহারা নেই? সত্যজিৎ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে।

—যে চেহারাই হোক তার অনেকটা জুড়েই এই রাজনীতি।

—আমার এগুলো নামতা পড়ার মতো ক্লান্তিকর লাগে।

—ওসব স্মার্ট কথা বোলো না সত্যজিৎ। আমি যদি কোনোদিন লেখক হই তাহলে এই সব কথাই লিখবো। আমাদের এই সময়ের কথা।

—কেউ পড়বে না।

—না পড়ুক।

সত্যজিৎ চলে যাবার পর তপন আসে। তপন গত দু-তিন বছরের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব অর্জনে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। শোনা যায় তার সাফল্যের অন্যতম কারণ তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ঠিক কোন্ পর্যায়ে আন্দোলন নিয়ে যেতে হবে এই সাধারণ বিচার-বিবেচনা ছাড়াও তার আর-একটা গুণ মালিকপক্ষকে চাপ দিয়ে শ্রমিকদের পাওনা ঠিক আদায় করে নিতে পারে। বলতে কি ভাল বক্তৃতা সে দিতে পারে না। হিন্দীতে তো একেবারেই না। কিন্তু মালিকপক্ষের সঙ্গে পরামর্শে তাকে ডাকা প্রায় অবধারিত। ব্যাপারটা সে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে যেমন গড়াতে দেয় না, তেমনি ঘাবড়ে যাবার বান্দাও সে একেবারে নয়। মালিক পক্ষও তাকে ভয় করে, কারণ দ্বিপাক্ষিক কি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে নতুন ফ্যাকড়া তুলে বিপক্ষকে একেবারে ধরাশায়ী করতে ওস্তাদ। এই বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্যে টুটুলও তাকে মনে মনে তারিফ করে। তপন কিন্তু টুটুলকে দেখামাত্র ঠাট্টা করে,—এই যে, আমাদের সাহিত্যিক কী বলে?

টুটুল আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। তপন চা খেতে খেতে চুরুট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে,—তুই কেমন যেন ভাল হয়ে গেছিস টুটুল। চারদিক এখন ফেটে পড়ছে। এতদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আর তোরা বসে যাচ্ছিস।

তপনের শেষ কথাটায় টুটুলের বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে।

—হ্যাঁ বসে যাচ্ছিস। ওরকম নমো নমো করে তো পার্টির কাজ হয় না। তোকে তো আমি দেখেছি। না হয় সাহিত্যই কর। এই তো সাহিত্য করবার সময়। সমস্ত বাংলাদেশটা আজ এক আগ্নেয়গিরি। আমাদের এখন চাই এক নতুন ম্যাক্সিম গর্কি।

টুটুল চায়ে চুমুক দেয়। সে জানে তপনকে সে বোঝাতে পারবে না। সে কী করে বোঝাবে যে, চারপাশে সাধারণ মানুষের জয়যাত্রা যতো বাড়ছে ততো সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই জয়যাত্রার যে অপরিসীম শক্তি তা তো পরিষ্কার, এমনকি রোজকার খবরের কাগজের পাতাতেও তা পরিষ্কার। কিন্তু এই জয়যাত্রার রূপের সঙ্গে তার প্রথম যৌবনে সাম্যবাদের স্বপ্নটা সে ঠিক মেলাতে পারছে না। এই পৌনঃপুনিক বিরোধ এবং পৌনঃপুনিক আপোস যেভাবে চলেছে তাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খেটে-খাওয়া মানুষের কিছু মাইনে বাড়ছে বটে কিন্তু এই জয়যাত্রা অগ্রসর না হয়ে যেন এক বিরাট চক্রমণ। একবার কালীঘাট পার্কের মাথায় খুব মেঘ করেছিল। প্রায় ফাঁকা মাঠে একটা বাচ্চা মেয়ে দড়ি লাফাতে লাফাতে গান গাইছিল: 'আমরা ঘুরিফিরি এই বাবলা গাছের বনে, আমরা ঘুরিফিরি এই বাবলা গাছের বনে।' অনেকদিন ধরে সেই বেসুরো গলার গানটা টুটুলের মাথায় ঘুরেছিল। এখন তপনের কথায় আবার সেই গানটা মনে পড়ে যায়। গত আট-দশটা বছরে অপরিসীম বীরত্ব ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও তারা কি এক অবিচ্ছিন্ন বাবলার বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে না? কিংবা হয়তো সবটাই তার দেখার ভুল। এবং একদা সেই ভুল ভাঙবে, চারপাশের মানুষের এক আলোকোজ্জ্বল জয়যাত্রার ছবি তার সমস্ত মনের পট জুড়ে থাকবে—এই আশাতেই তো সে লেগে আছে ব্যাপারটার সঙ্গে। সত্যজিতের মতো স্মার্ট হতে পারছে না।

—হয়ত আমারই ভুল তপন। আমারই ভুল। কিন্তু যেভাবে আমরা সেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তোর তো মনে আছে? সামনে একটা ভবিষ্যৎ জলজল করছিল।

তপন ক্লান্তভাবে বললে,— কম বয়সে ওরকমই লাগে। ওসব স্বপ্নটপ্ন তো আসল ব্যাপার না। আসল ব্যাপার হল কাজ। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল।

—তা এইভাবেই সম্ভব হবে?

তখন হঠাৎ তেতে উঠে বললে,—আসলে তোর ব্যাপারটা আর কিছুই না টুটুল। সেই মিডল ক্লাশ ভ্যাসিলেশান। পলিটিক্সটা বলার ব্যাপার নয়—করার ব্যাপার। যে রাস্তায় গেলে কাজ হয় আমরা সেই রাস্তায় যাব।

বিকেলে বিরাট মিছিল বের হয়। অসংখ্য লালপতাকা ফেস্টুনে ঢাকা সেই মিছিলে অসংখ্য লোক, শহরতলী থেকে শ্রমিক চাষী রিফিউজি। সাম্প্রতিক পুলিশের গুলিচালনার বিরুদ্ধে বিরাট মুখর প্রতিবাদ। আকাশ কালো করে মেঘ উঠে আসে। বিদ্যুৎ চমকায়। গরমে ঘামে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে অসংখ্য নর-নারীর জীবন্ত এক জয়যাত্রা ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। অনেক কিশোর যুবক প্রৌঢ় মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে টুটুল হাঁক দেয়, —ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

এই প্রবল প্রাত্যহিকতার মাঝখানে টুটুল লিখতে শুরু করে। লিখবার কয়েকদিন আগে থেকেই জেলের ভেতর থেকে দীনেশ বা নসুর বোনকে লেখা চিঠিটার কথা মনে আসে। কোন একটা বড় কাজ করতে গেলে শুদ্ধ হতে হবে। আর এই আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একাগ্রতা। টুটুলকে সারাদিন নানা কাজে ঘুরতে হয়। অফিস, ইউনিয়ন ছাড়াও সম্প্রতি ভবনাথের অসুখের দরুন ডাক্তারবাড়ি ছোটাছুটিও বেড়ে গেছে। এরই মাঝখানে টুটুল রোজ ভোরবেলাটায়

জন্মে অপেক্ষা করে। এই ভোরে সে প্রাত্যহিককে আরও দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। টুটুল লেখে তার সময়ের কথা। খানিকটা বাল্যকাল, তারপর কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা, তারপর কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমানের বিরাট দাঙ্গা উনিশশো ছেচল্লিশ সালের তিনটে পর পর রাত্রির —এই সব। অর্থাৎ যে প্রাত্যহিকতাকে সত্যজিৎ মনে করে ক্লান্তিকর, একটা মুখস্থ নোট বইয়ের মতো, সেই প্রাত্যহিকতাই তার বিষয়। লিখবার আগে যে প্রচণ্ড আড়ষ্টতা ছিল লিখতে লিখতে তা কাটতে থাকে। যে অপরিচিত আনন্দের কথা সে কল্পনা করে এসেছিল তা এখন খুব কাছের ব্যাপার মনে হয় আর যেরকম তন্ময়ভাবে সে ডুবে গিয়েছিল কলেজ-শেষে রাজনীতিতে তেমনি সে ডুবতে থাকে লেখায়। তার যেন দুটো সত্তা, বাইরে সমান্তরাল, কিন্তু কোথাও এক গভীর অর্থে তাদের প্রকাণ্ড মিল আছে। বাইরে সে আরও পাঁচটা মানুষের মতো চেঁচাচ্ছে, অনুযোগ করছে, প্রতিবাদ করছে কিন্তু লিখবার সময় সে খুঁটিয়ে দেখছে, প্রশ্ন করছে, ভাবছে। যখন কর্মী হিসেবে সে কথা বলেছে তখন যেসব চিন্তা করেনি এখন লিখতে গিয়ে সেসব কথা মাথায় আসছে। আর মানুষের আলাপে মুখের কথা আর মনের কথার মধ্যে যে প্রবল ফারাক থাকে তা লিখবার আগে বেশী পীড়া দেয়নি। যেমন ভালো লাগার কথাগুলো যে নিছক ভাবালুতা নয়, তার যে একটা শক্ত হাড়ের খাঁচা আছে—এ কথাটা পাঠককে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে বাংলা ভাষা নিয়েও ভাবতে হয়। আর অতীতটাও তো জাদুঘরের ব্যাপার না। জীবন্ত প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক কালের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য। খুব চোখা ধারালো লেখা যায় যদি মানুষের স্মৃতি একেবারে গোর দেওয়া যায়। কিন্তু সেই অতীত-বিরহিত চকচকে ঝকঝকে বর্তমান তাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

সম্প্রতি সত্যজিৎ তাকে চমকিয়ে দিয়েছে। ক্যান্টিনে দেখা হবার দুদিন পরই বাড়িতে এসেছিল তার নতুন বই নিয়ে। নামজাদা প্রকাশকের ছাপা রগরগে বর্তমান জীবনের কাহিনী। পড়তে পড়তে সত্যজিতের সেদিনের কথাটা টুটুলের মনে আসছিল—ছেলেগুলো বয়ে যাচ্ছে, মেয়েগুলো রাস্তায় নামছে। বেশ জবরদস্তভাবে লিখেছে সত্যজিৎ। কথাবার্তায় যেমন ভালবাসায় ঢলঢল লেখায় ঠিক সেরকম নয়। স্বল্পপরিসর বইখানায় তিন-চারটে ছেলে-মেয়ের প্রবল জড়াজড়ি, দুটো খুন।—খুব কন্টেম্পোরারি, আপনার হয়তো ততো ভালো লাগবে না। তবু দেখবেন। সত্যজিৎ বইটা দিতে দিতে বলেছিল। টুটুল ইংরেজীতে অগ্র-পশ্চাৎহীন মানুষ নিয়ে উপন্যাস পড়েছে। কিন্তু বাংলায় এই প্রথম পড়ল। কোনো স্মৃতি নেই, কোন অতীত নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই ক্ষণের নায়ক-নায়িকাদের কাহিনী পড়তে পড়তে টুটুলের যেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তেমনি হাতেও খিল ধরে গেল। তার যে প্রধান সমস্যা অর্থাৎ আবহমানকালের মাঝখানে একাল দাঁড় করানো—তা তার মন থেকে সরে যায়। এক-একবার ভাবে, তার কি দেখার ভুল হচ্ছে? দুভাবেই তো পরিষ্কার একাল ধরা পড়ে। তপন যখন বলে ঠিক এই সময়ই চারদিক প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে তখনই লিখবার সময় সেই একভাবে আর সত্যজিৎ যখন র-লাইফের কথা বলে সেই ভাবে। এই দুটোই তো পথ। অর্থাৎ পরম্পরাহীন মানুষের কাহিনী এক তীব্র নাটকীয়তা অর্জন করে যা লোককে হয়তো টানে। তার লেখা কি পাঠককে টানবে?

পাঁচ

দিন দশ-বারো একেবারে বাঁজা যায়। আবার আস্তে আস্তে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে একাকার কাহিনী ধরতে বসে টুটুল, কখনও খুব ঠেকে ঠেকে, কখনও আবার ঝড়ের মতো গতিতে। ইতিমধ্যে ভবনাথের অসুখও ঝড়ের গতিতে বাড়ে। প্রথম অপারেশানের ঠিক এক বছর পর দ্বিতীয় অপারেশন হয়। এর পরিধি আরও বিস্তৃত। একেবারে ঘাড় পর্যন্ত মাংস কুরে কুরে তোলা হয়। উরুর এক বিস্তৃত অংশ থেকে চামড়া কেটে জোড়া দেয়া হয় মাথায়। দ্বিতীয়বার অপারেশনে কিঞ্চিৎ কাবু হন। কিন্তু বাইরে থেকে বিশেষ বোঝা যায় না। শরীর যে খুব শুকিয়ে যায় তা নয়। বরং যখন জ্বর থাকে না, অক্ষিধে কমে তখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে তাঁর পুরনো অভ্যাসমতো যখন ক্রসওয়ার্ড পাজল করেন, বুড়ীর ছেলে গামার অন্তহীন বকবকানি শোনেন, তখন মনে হয় মাথার পেছনের ব্যাপারটা একেবারে আঞ্চলিক, তার সঙ্গে শরীরের অন্য অংশের বোধহয় বিশেষ যোগাযোগ নেই।

ইতিমধ্যে বুড়ী একদিন তার মেডিকেল-পড়া এক ননদকে নিয়ে হাজির হয়। চোখে চশমাপরা রোগা ফর্সাটে মেয়েটাকে টুটুলের সামনে নিয়ে এসে বলে,—কী, পছন্দ হয়?

টুটুল দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—বসুন, বসুন।

বুড়ী বললে,—না, বসব না। পছন্দ হয়েছে কি না বল্।

টুটুল অপ্রস্তুতবোধ করে, কিন্তু মেয়েটি লজ্জা পায় না। একবার শুধু বললে,—বুড়ীদি, এটা কী হচ্ছে?

—আমি ঠিকই বলছি। তোর দ্বারা তো আর প্রেম-ট্রেম হবে না। তুই সোজা বিয়ে করে প্রেম কর। এরকমই তো হচ্ছে আজকাল।

—তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বুড়ী।

মেয়েটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে টুটুল। তার দাদার সঙ্গে চেহারায় প্রচণ্ড অমিল। রোল্ডগোল্ডের চশমাপরা ফ্যাকাশে মেয়েটা বোধহয় বয়সের তুলনায় একটু কম পড়ছে এরকম ধারণা হয় টুটুলের। মেয়েটার চোখ দুটি ভালো। কিন্তু চড়া পাওয়ারের জন্যে নিষ্প্রভ, চাহনি ঠাণ্ডা। ঠোঁট দুটি পুরু কালচে। সুন্দর নয় কিন্তু আকর্ষণীয় সে মুখ। শেলফের বইগুলোর দিকে একনজর চেয়ে বললে,—আপনার বুঝি বই পড়তে খুব ভালো লাগে। আমার একদম না। যেটুকু ছিল মেডিকেলের বই মুখস্থ করতে করতে একদম পালিয়ে গেছে। এখন খবরের কাগজ পড়তে হাই ওঠে।

—আপনার কী ভালো লাগে?

—আমার? খেতে—চীনে রেস্টুরেন্টে।

টুটুলের মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয়,—বাঃ!

—সত্যি বলছি, খাওয়ার মতো কিচ্ছু ভালো লাগে না।

বুড়ী তার মায়ের ঘরে গেলে টুটুল বললে,—আমাকে আপনার ভাল লাগবে না।

—কেন? আপনার খেতে ভালো লাগে না?

টুটুল ভুরু কুঁচকায়। লিলির হাসিতে যোগ দিয়ে বলে,—না, খেতে আপনার মতোই ভাল লাগে। আমি বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি।

—আপনি আমার চেয়ে বছর-দুতিনেক বড় হবেন। লিলি যেন তাকে ঠাট্টা করছে। আর টুটুল বুঝতে পারে এ হাল্কামি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু না দিয়েও পারে না।

—আপনার ভালো নামটা কী ?

—কাবেরী।

—বাঃ, বেশ ফিল্মস্টারের মতো নাম !

—সেইরকমই লাগতো আমার নিজেকে, বছর পাঁচেক আগে। তারপর যেদিন দুপুরে বরেন চাপা পড়ল ···ও, আপনি শোনেননি ? আমার বিয়ে হয়েছিল বুড়ীদি বলেনি আপনাকে ?

স্তব্ধ টুটুলের দিকে চেয়ে লিলি বললে,—এক বছরও তো হয়নি বিয়ের পর। সব ওলোটপালট হয়ে গেল। তারপর মেডিকেল পড়তে এলাম কী যেন বলে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে।

লিলির সঙ্গে আলাপ করতে টুটুলের খুব অসোয়াস্তি হয় না। বরং বেশ স্বাভাবিক লাগছিল। মেয়েদের একান্ত মেয়ে ভেবে আলাপ করতে সে অক্ষম এবং এই অক্ষমতার সচেতনতা তাকে মাঝে-মাঝে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু লিলি ঠিক ফুলের মতো নয়—এই বাঁচোয়া।

—আপনি খুব রাজনীতি করেন, না ?

—খুব নয়, তবে করি।

—আর কিছু ভাবেন না ?

—আর কিছু মানে ?

লিলি পা নাচাতে নাচাতে বললে,—এই যেমন বেঁচে থাকা মরে যাওয়া।

টুটুল হেসে উঠে বললে,—বাঃ, এ নিয়ে কী ভাববো ! বেঁচে থাকলে বেঁচে থাকব, মরে গেলে মরে যাব।

লিলি পা নাচানো বন্ধ করে গম্ভীরভাবে বললে,—আমি কিন্তু ভাবি। বোধহয় বরেনের ব্যাপারটার জন্যেই। মাঝে মাঝে ভীষণ আনসার্টেন লাগে।

—এইরকম অনিশ্চিত অবস্থা সব সময়ই ছিল। সব সময়ই থাকবে। তাই না ? আপনার ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপারটা আরও গুরুতর।

লিলি মুখভঙ্গী করে বললে,—কী জানি ! তাই হয়তো হবে। আগে একথাগুলো মনে হত না। মা-র মরে যাওয়াটা চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু তাতে কখনও এরকম ধাক্কা খাইনি। এই ধরুন আপনারা যখন মিছিল করেন, স্লোগান দেন, পার্টির ঠিক লাইন হচ্ছে না বলে খুনোখুনি করেন তখন আমার কি রকম আনরিয়াল লাগে। আপনারা কখনো ভাবেন আমরা কতো অনায়াসে টপ করে মরে যেতে পারি ?

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লিলির দিকে। আস্তে আস্তে বলে, —আপনি যে লেখকদের মতো কথা বলছেন।

—না না, ওসব সাহিত্য টাহিত্য আমি কিচ্ছু বুঝি না। ইস্কুলে আমি অঙ্কে ভালো ছিলাম।

কবিতার ব্যাখ্যা দিলেই রসগোল্লা পেতাম। আপনার নিশ্চয় খুব আজগুবি লাগছে আমার কথাগুলো ?

—না না, বলুন। আমার ভালো লাগছে আপনার কথা শুনতে, টুটুল অকপটেই বললে।

—এসব কথা বলতে গেলে লোক হাসবে, আমি জানি। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তারা তো সঙ্গে সঙ্গে বলবে মেডিকেল লাইন ছেড়ে দিতে। কিন্তু এই জন্যেই আমাদের লাইনটা আমার ভালো লাগে। আমাদের লাইনটা খুব রিয়াল, মানুষের এই শরীরটা যেমন রিয়াল। এই ধরুন গত মঙ্গলবার···হ্যাঁ, গত মঙ্গলবার। সন্ধ্যেবেলা হাওড়া থেকে একটা পাঞ্জাবিপরা পাটজোয়ান লোক হাসপাতালে অ্যাডমিশন নিল। কোন্ প্রেসের মালিক। পেটে কদিন হল ব্যথা হচ্ছে। পরদিন সকাল দশটায় ওয়ার্ড ডিউটি ছিল। দেখি বেড খালি। নার্স বললে, মর্গে নিয়ে গেছে।

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লিলির দিকে। না, মোটেই ফুলের মতো নয়। বরং সে একটা ছোটো ঝাঁকড়া গাছ যার ওপর দিয়ে অনেক বর্ষা-বজ্র-বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে। কয়েকটা ডালও ঝলসে গেছে বোধহয়।

—নার্স বললে মাঝরাত্তিরে বেসিন ভরে রক্তবমি করে লোকটা এসে শুয়ে পড়েছে। আর ওঠেনি।···আজগুবি গল্প মনে হয়—না ? সন্ধ্যেবেলা লোকটা আমাদের সঙ্গে গল্প করছিল, জার্মানি থেকে প্রেসের নতুন মেশিন আমদানি করেছে। আমাদের নেমন্তন্ন করলে ওর হাওড়ার ফ্যাক্টরি দেখতে।

টুটুল বললে,—জানেন, আপনার সঙ্গে এমন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে খুব ভাল লাগল। আমি ঠিক পারি না মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে।

—না না, ওগুলো আমি জানি। আমাদের পাশের বাড়ি অরুণি বলে একটা ছেলে থাকে। কোন্ এক পাবলিসিটি ফার্মে কাজ করে। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন কী বলেছিল জানেন ? আপনাকে দেখে আমার বুক কাঁপে। আমি একেবারে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম।

টুটুলও উচু গলায় হেসে ওঠে। বলে,—আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমি ঠিক ঐ জিনিসটাই বলছিলাম। ঐসব বুক কাঁপা-টাপা। ওগুলো জানেন,—আমার একেবারে আসে না।

—না আসাই ভালো। এবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম। এবার উঠি।

—আবার আসবেন ?

—আপনি আসুন না ?

—কোথায় ? একটু আত্মসচেতন লাগে টুটুলকে।

—ভয় নেই, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যেতে বলব না। আসুন না আমাদের হাসপাতালে। পেছন দিকে অনেকটা মাঠ আছে। বসা যাবে।

—খাওয়াবেন না ?

লিলি হেসে উঠে বললে,—ও—হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! ক্যান্টিনে ফিশ ফ্রাই।

ওদিকে বুড়ীর সঙ্গে তার মায়ের ঝগড়া হয়ে গেল। স্বর্ণসুন্দরী মেয়েকে বললে,—তুই জেনেশুনে সর্বনাশ করছিস ?

—কী বলছো তুমি ? বুড়ীও সমান তালে বলে।

—সর্বনাশ ছাড়া কী ? শেষ পর্যন্ত টুটু'লর জন্যে একটা বালবিধবা ?

—লিলি খুব ভালো মেয়ে মা। টুটুলের পছন্দ হবে, আমি জানি।

—আর কোনো মেয়ে জুটল না ?

—তুমি এমন বলছো কেন মা ? মাত্র এক বছর তো বিয়ের জীবন ! এইটুকু মেনে নিতে পারছো না ?

—তুমি তোমার ননদ বলেই বলছো। আমাদের পরিবারের কথা তুমি ভাবনি, তোমার ছোট ভাইও ভাবে না।

বুড়ী সোজা উঠে দাঁড়ায়। সম্প্রতি গায়ে একটু মাংস লাগায় তাকে খুব লম্বা-চওড়া গম্ভীর মহিলার মতো লাগে। বরাবরের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,—ঠিক আছে, তোমার যখন এত আপত্তি আমি বারণ করে দেব। ওর আরও ভাল বর জুবে।

টুটুলের ঘরের সামনে এসে নাটকীয়ভাবে বুড়ী হাঁকে,—লিলি, চলে আয়।

টুটুল আর লিলি একসঙ্গেই অবাক হয়ে তাকায় বুড়ীর দিকে। তারপর লিলির মুখে ম্লান হাসি ফোটে। তার কা'ছ সমস্ত ব্যাপারটা যেন জলের মতো সোজা। কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। টুটুল পেছন থে'ক ডাক দেয়,—সামনের বুধবার বিকেলে আপনি খালি আছেন ?

লিলি একবার বুড়ীর দিকে একবার তার ভাইয়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে,—হ্যাঁ।

—আমি বুধবার যাব, টুটুল বললে।

বুধবার হাসপাতালে ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে টুটুল ভাবল বোধহয় তার ভুল হয়েছে। তিন-চারটে ছেলের সঙ্গে গোল হয়ে চায়ের টেবিলে আড্ডা দিচ্ছে লিলি। টুটুলের একটা আন্দাজ হয় তাকে দেখেছে লিলি। আর দেখামাত্র চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, পাশের ছেলেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। একেবারে অজানা এলাকায় পথ হারানোর অবস্থা টুটুলের। একবার মরিয়ার মতো কাশল। কাউন্টারে ঘিরে পাঞ্জাবিপরা মোটাসোটা তরুণটি তার দিকে চাইলে। ফিরে যাবে নাকি এ চিন্তাও টুটুলের মাথায় খেলে। তারপর কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে কোনার দিকে একটিমাত্র খালি চেয়ারে গিয়ে বসে। এবারেও টের পায় রোল্ডগোল্ডের গোল ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে ভাষাহীন লিলির চোখজোড়া তার দিক থেকে সরে আবার নিবদ্ধ হয় সামনের ছেলেটির দিকে। টুটুল আন্দাজ করে হয়তো বুড়ী তাকে না করে দিয়েছে তার মায়ের প্রতিকূলতার জন্যে। কথাটা সে এতক্ষণ প্রশ্রয় দেয়নি কারণ লিলির সঙ্গে যখন তার সোজাসুজি কথা হয়েছে সে আসছে তখন তার ওপর আর কোন কথা থাকে না। আর একবার লিলির চাহনি তার টেবিলের ওপর ঘুরে যায়। চায়ের কাপ শেষ না করেই টুটুল বেরিয়ে পড়ে।

সামনে টিনের ছাউনি আঁটা লম্বা করিডর পার হয়ে আসছে এমন সময় ডাক শুনল,—শুনুন।

মুখ ফেরাতেই দেখে লিলি দাঁড়িয়ে হাসছে। বেগুনি ছাপা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজের ওপর ঝুলন্ত স্টেথিসকোপে অন্যরকম লাগে লিলিকে।

—খুব চটেছেন তো ? চলুন, মাঠে গিয়ে বসি।

সন্ধ্যে নামছে। টুটুল চুপ করে বসে থাকে। এক-একবার তার মনে হয় লিলি বোধহয় একটু খেলতে চায়। বিবাহিত জীবনের জোয়াল এখনি কাঁধে নিতে চায় না।

—কী ? গোমড়া মুখ করে বসে আছেন কেন ?

—বাঃ, আপনি বেশ আসতে বলে আর চিনতে পারছেন না। আপনি বোধহয় জানেন না আমি খুব ভোঁতা লোক। আমি না-কে না-ই ভাবি, হ্যাঁকে হ্যাঁ-ই ভাবি।

—এর মাঝখানে কিছু হয় না ?

—টুটুল আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে,—আমার মতে না।

—আপনি আপনার বইয়ের তাকগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

—হয়তো তাই।

—আচ্ছা আপনি সত্যজিৎ সেনের উপন্যাস পড়েছেন ? বইটা নিয়ে ছেলেগুলো খুব মাতামাতি করছিল। দারুণ রিয়ালিজম না কি ?

—কী বই ?

— ঐ যে নতুন বেরিয়েছে। বাপী বলছিল ওটা আমাকে পড়াবেই। এই কন্টেম্পোরারি লাইফের চেহারাটা ভীষণ ধরেছে নাকি। আপনি নিশ্চয় পড়েছেন ?

·নাঃ, পড়িনি।

—এ সব বই বুঝি পড়তে ইচ্ছে করে না ?

টুটুল হেসে বলে, --আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

—উঃ আপনি একেবারে সেকেলে ! মেয়েরা শান্তি দেয়—কে বলেছে ? মেয়েরা কখনো শান্তি দেয় ন।—বরেনও তাই বলত।

— তার মানে ?

— না। কোন মানে নেই প্রিন্স। মেয়েরা কাজের দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। গেঁতো লোকদের ধাক্ক দেয়। তাই না ?

টুটুলের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—চারদিকে এত গোলমাল, এখন যদি মানুষ ঘর বাঁধে কিছুটা গোলমাল তার মধ্যেও থাকবে। তারপর হেসে উঠে বললে,—আমি মশাই শান্তি চাই না· একটু নড়েচড়ে থাকতে চাই।

টুটুল একমনে সিগারেট খায়। একবার খেয়াল হয় লিলির সামনের দিকের চুলটা পাতলা হয়ে এসেছে। লিলি বললে,—চলুন, ক্যান্টিনে যাই। আপনাকে ফিশ ফ্রাই খাওয়ানোর কথা ছিল।

—তার চেয়ে সামনের শনিবার চলুন চীনে খেয়ে আসি। শুক্রবার মাইনে পাচ্ছি।

লিলি স্টেথিস্কোপ দোলাতে দোলাতে বললে, বাঃ আপনি তো বেশ আপনার খোলস থেকে বেরিয়ে আসছেন ?

—তাই মনে হয় নাকি আপনার ?

—হ্যাঁ, বুড়ীদি যখন আপনার কথা বলল, তারপর আপনাকে দেখলাম, তখন আপনাকে একটা

ভয়-ভয় করতো। বড্ড গম্ভীর-সম্ভীর লোক আপনি। বড্ড রাশভারী। কেমন যেন মেশো-মশাই। আপনার সঙ্গে আমার ভাব জমবে না।

টুটুলও লিলির হাসিতে যোগ দেয়। খেলাচ্ছে লিলি, খেলাক। সে তো তুলোর মাথা কল নয়, পচবে না।

পরের শনিবার সন্ধ্যেবেলাও চীনে খেতে খেতে লিলি হড়বড়িয়ে কথা বলে। তার পক্ষে টুটুল যে কোনোদিন অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারে এরকম কোনো ইঙ্গিত থাকে না তার কথাবার্তায়। তার মামা, তার কাকা, তার সহপাঠী, পাড়ার তরুণ, বিশ্বশুদ্ধ লোকের ক্যারিকেচার করে লিলি। এক একবার টুটুলের কিঞ্চিৎ আপসোসই হয় তার সঙ্গিনীর এরকম নিপুণ হাল্কা ঠাট্টার মেজাজের দরুন। হয়ত সেও এই ঠাট্টার অংশ। কিন্তু লিলি তাকে টানে। টানে—তার অন্যতম কারণ বোধহয় তার অভিজ্ঞতাগুলো সে চমৎকার নাড়াচাড়া করে দেখতে পায় বলে।

সেদিন চীনে বাড়িতেই লিলি সত্যজিতের প্রসঙ্গ আবার তোলে। সত্যজিৎ সেনকে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ঘরোয়া সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সত্যজিৎ সেখানে র-লাইফের কথা বলেছে। সত্যজিৎ বলেছে, সে যেমন জীবন দেখে সেইরকম লেখে।

—আপনি অনিন্দ্যবাবু নিশ্চয় দেখেছেন সত্যজিৎ সেনকে। কালোর মধ্যে বেশ ব্রাইট চেহারা। দেখেননি ?

আড়ষ্ট টুটুল উত্তর দেয়,—না।

ছয়

একবার ভোরে ওষুধ দেবার পর সকাল ন'টায় ওষুধ, তারপর পথ্য। ভবনাথ মাস দুয়েক বিছানা নিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে জ্বর আসে। অক্ষিধে ও দুর্বলতার দুর্দান্ত অভিযান লাগাতার চলে। স্বর্ণসুন্দরী নিজের হাতে রাঁধেন, রুচি ফেরাবার ব্যর্থ প্রয়াসে মাঝে মাঝে কাঁদেন। বায়োপ্‌সি রিপোর্ট রুগীকে কিংবা স্বর্ণসুন্দরীকে জানানো হয়নি। এ রোগের অনিবর্তনীয় গতির প্রসঙ্গ টুটুলকে অনেকবার বলেছে অমিয়। কয়েকদিন আগে হঠাৎ টুটুলের হাতখানা টেনে নিয়ে হাতের পিঠের চামড়া একটু ঘসে অমিয় বলেছে, এই দেখুন, কতগুলো সেল মরে গেল এই মাত্র। আবার গজাতে শুরু করেছে। আবার যতগুলো দরকার ততগুলো তৈরী হয়ে থেমে যাবে। আপনার বাবার ক্ষেত্রে থামবে না। আমাদের টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সায়েন্সের এ এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। যত দিন না আমরা সেল ফর্মেশন কনট্রোল করতে পারছি কিংবা এই কনট্রোলিং মেকানিজম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করছি ততদিন এ রোগের চিকিৎসা নেই।

—তাহলে কেন অপারেশনের কথা তুলছেন ?

—তুলছি, কারণ আরও যদি এক বছর রাখা যায়। ইতিমধ্যে অন্য কমপ্লিকেশনও হতে পারে। অন্য রোগেও যেতে পারেন। তখন আমাদের কন্সোলেশান থাকবে যে, উই হ্যাভ ডান্ আওয়ার বিট।

অমিয়র দিক থেকে তৃতীয় অপারেশনের যুক্তি আছে। সে নিজে এক পয়সাও নেয় না। তার বাপের কতগুলো আশ্চর্য গুণ সেও পেয়েছে। কিন্তু এইভাবে শরীর কাটতে কাটতে অন্ধের মতো

এগোনোর যৌক্তিকতা প্রত্যেক প্রিয়জনের কাছেই অমানুষিক।

—মাঝে মাঝে আপনাদের মেডিকেল সায়েন্স বড্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট লাগে।

—আপনাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স লাগে না? আপনারা যখন একটা ছোট ফ্যাক্টরিতে লাগাতার ধর্মঘট লাগিয়ে সেটাকে ভুলে যেন তখন বিপ্লব ক্লাস স্ট্রাগল—এসব কথাবার্তা অ্যাবস্ট্রাক্ট লাগে না? উপায় কী? তাহলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

টুটুল মেনে নিলেও বছর দেড়েকের মাথায় তৃতীয়বার অপারেশনের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানান স্বর্ণসুন্দরী। চিঠি লিখে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ডেকে পাঠান।

ডাক্তার চ্যাটার্জিকে আরও তরুণ লাগে সেদিন সকালে। উৎসাহে টগবগ করেন। আর তাঁর শিশুসুলভ গভীর সারল্য মাখা চোখ দুটো তুলে সকলের কথা শোনেন। ভবনাথ তাঁর কৌতূহলী চোখ দুটো সেই সজীব চোখ জোড়ার ওপর রাখতেই চ্যাটার্জি বলেন,—আমি তো আপনাকে বললাম, আপনার কিছু হয় নি। এরকম কেস আমার ওখানে হামেশা আসছে। ..আর তাছাড়া আপনার সমস্ত কন্সটিটিউশান এখনও চমৎকার। পালস রেট আইডিয়াল। আপনি ভালো করে খান-দান, ছাতে গিয়ে ঘোরাফেরা করুন।

ভবনাথ ম্লানভাবে বলেন,—খেতে যে পারি না ডাক্তার।

—আমি ওষুধ দিচ্ছি। আর একটু চেষ্টা করে খান। আপনার কী খেতে ভাল লাগে বলুন না। এখন তো আম উঠেছে। আম খান। ল্যাংড়া আম।

বাইরের ঘরে এসে স্বর্ণসুন্দরী বললেন, আমিও ঘুমোতে পারছি না। গত এক মাস রাতে ঘুম নেই। বলুন না, কিছু খারাপ-টারাপ…।

—আপনাকে তো বললাম, একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না।

—আমি আর কাটাকাটির মধ্যে যাব না ভাবছি।

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ওসবের মধ্যে যাবেন না। ওরা গ্যারান্টি দিতে পারবে, কাটলে সারবে, আবার হবে না? তাহলে? হাত-পা বেঁধে জলে ডোবা কেন?

গত এক বছরেই মাথার অনেকখানি সাদা হয়ে গেছে স্বর্ণসুন্দরীর? মাঝে মাঝে তাঁরও অক্ষিধে জানান দেয়। বুড়ী এলে তাও সন্ধ্যের দিকে একটু খান। নইলে একা একা খেতে ভালো লাগে না।

পরদিন মদন আসে এক বোতল সাদা ওষুধ নিয়ে। মানিকতলার এক সাধুর ওষুধ। রোজ শয়ে শয়ে লোক যায় সেখানে। ডাক্তারে জবাব দেওয়া অসুখ সারানোর খ্যাতি তাঁর অসাধারণ। দেয়াল আলমারির কোনায় ওষুধটা রেখে বললে, টুটুলকে বলবার দরকার নেই। সকালে খালি পেটে এক চামচ খাইয়ে দেবেন। পনেরো দিনের ওষুধ।

ঠিক দু'দিন পর অমিয় আসে। ভবনাথকে সোজাসুজি বলে,—এটা একটা ছোট্ট স্লিট জ্যাঠামশাই। আমি নিজে করব। লোকাল অ্যানেসথেশিয়া দিয়েই হবে। আমি সব সরঞ্জাম নিয়ে আসব। আপনার কিছু ভাববার নেই।

তার প্রবল আত্মবিশ্বাস ভবনাথকে স্পর্শ করে। ঘুমের মধ্যে থেকে বলেন,—তাই হবে।

সামনের শনিবার অমিয় আসে। তার গাড়িতে অপারেশান টেবিল। টুটুল তাকে সাহায্য

করে। হাতে সাবান ঢালে, ছুরি-কাঁচি এগিয়ে দেয়। ছুরিটা বেশ লম্বাভাবেই চলে। তারপর একটা মাংসের দলা কুরে কুরে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে,—অপারেশন তো কমপ্লিট জ্যাঠামশাই, একেবারে কমপ্লিট। ব্যাণ্ডেজ করে টুটুলকে বলে তার মুখের মাস্কের দড়ি পেছন থেকে খুলতে। তারপর তার হাতের গ্লাভসের ওপর মাংসের দলাটা ব্যবচ্ছেদ করে টুটুলকে বলে,—দেখুন। টুটুল দেখে অনেকগুলো বড় বড় কালো চকচকে শর্ষের দানা।—স্কিন সেলস্, কতো বেড়ে গেছে দেখেছেন?

পাশের ঘরে এসে জিরোতে জিরোতে বলে,—আচ্ছা জ্যেঠিমা, এক হোমিওপ্যাথ বলছে না জ্যাঠামশাইয়ের কিছু হয় নি?

স্বর্ণসুন্দরী বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ান।

—তার ঠিকানাটা আপনার জানা আছে? আই শ্যাল সু হিম্ ইন কোর্ট।

টুটুল ভরাপালে এগিয়ে যেতে থাকে। ভবনাথের বদলে বাজারে যেতে হয়। তারপর কোনো-রকমে চা-পাউরুটি খেয়ে সে তার পড়ার ঘরে যায়। রোজ সকালের ঘণ্টা দেড়-দুই সে একটা অন্য জগতের বাসিন্দে। যে জগতে অনেক মুখ, অনেক রাস্তা, অনেক বাড়ি, শ্যামবাজারের গলি, রিফিউজি কলোনি, শেয়ালদা স্টেশনের ভিড়, আবার বোগেনভিলিয়া-শোভিত অ্যালসেশিয়ান-চৌৎকৃত নিরালা বালিগঞ্জ পাড়া। সেই কলকাতার দাঙ্গার শ্বাসরুদ্ধ রাতগুলো থেকে তার উপন্যাসের যাত্রা। আর সে যাদের যাদের সঙ্গে কথা বলেছে, যে যে রাস্তায় হেঁটেছে সেই প্রবল প্রত্যক্ষ ভিড় করে আসে রোজ সকালে। তার সঙ্গে কথা বলে আবার মিলিয়ে যায়। ভবনাথকে স্পঞ্জ করিয়ে খেয়ে-দেয়ে অফিস। টিফিনে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলোচনা, অফিস ফেরতা বাসের ফুটবোর্ডে ঝোলা ঘর্মাক্ত বিকেল ও সন্ধ্যে, তারপর ভবনাথের অসুস্থতা কেন্দ্র করে আত্মীয়-স্বজনের আগমন, পারিবারিক কনফারেন্স, মাঝে-সাঝে তপন কিংবা তার রাজনৈতিক জগতের দু-তিনজন সহকর্মী ও বন্ধুর আবির্ভাব। তারপর ঘুমের আগে আবার টুটুল তার ভোরবেলার জগৎকে ফিরে পাবার জন্যে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। রোজকার সমস্ত ক্লান্তি, কচকচি, কর্তব্য বা সব সময়ই গতকাল ও আজকের এবং আজ ও আগামীকালের পরম্পরা ছিন্ন করে তা জোর করে মন থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করে। শেষে এটা আপনা থেকেই আসে। আগামীকালের ভোরের ধ্যানে টুটুল আজকের দিন শেষ করে।

এই ভূতগ্রস্ত তন্ময়তায় টুটুল একবারও খেয়াল করে না তার বই প্রকাশের সম্ভাব্যতা। তার বইয়ের ক্রমশঃ বিস্তৃত আয়তন যে নবীন লেখকের পক্ষে প্রকাণ্ড বাধা এ সব চিন্তা একবার খেলেও না মাথায়। তার মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এক প্রবল আত্মশৃঙ্খলা, এক দৃঢ় রুটিনে দিনটাকে দাঁড় করানো যার ফলে সে সাহিত্যের আলোচনা আজকাল কারুর সঙ্গেই প্রায় করে না। এসব নিয়ে আলোচনা উঠলেই সেখান থেকে কেটে পড়তে চায় টুটুল। এক-একবার লিলির মুখখানা ভেসে ওঠে তার মনে। কিছু সজীব মুখস্থ না-করা কথাবার্তা শুনতে প্রাণ চায়। তখন টুটুল হাঁটে একলা একলা। কিন্তু কলকাতায় এত লোক এবং চেনা লোক এত বেরিয়ে যায় এবং এত কৈফিয়ত দিতে হয় অসময়ে একলা পথচলার জন্যে যে, মাঝেমাঝে বড্ড অসুবিধে লাগে।

ঠিক এই কারণে হঠাৎ এক রোববার সকালে সত্যজিতের আগমনে সে ফাঁপরে পড়ে।

তার কাগজের তাড়া দেরাজের মধ্যে ঠেলে দিতে না দিতেই সত্যজিৎ ঘরে ঢোকে। সে

যেন উড়ছে। টুটুলের দিকে চেয়ে বললে,—লিখছো? না? লেখো লেখো। লেখার মতো জিনিস নেই।

তারপর পা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞাসা করে,—আমার বইটা কেমন লাগল?

—ভালো না।

—আমি জানতাম। সত্যজিৎ সিগারেট ধরায়। টানতে টানতে বলে,—তুমি যে অনিন্দ্য-দা আমাকে শত্রুপক্ষের লোক ভাব, তা আমি আগেই জানতাম। একটু থেমে বললে,—অবশ্য তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

আমি জানতাম,—টুটুল মুখ তোলে।

টুটুল আড়ষ্টভাবে বসে থাকে। এবং এই আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য সে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নয়।

সত্যজিৎ আত্মগতভাবে বলে,—তোমরা ইন্টেলেক্চুয়াল। তোমরা কোনোদিন জীবনকে দেখো নি। সেই জন্তেই আমাদের লেখা তোমাদের কখনো ভাল লাগবে না, দুনিয়াশুদ্ধ লোক ভাল বললেও।

—দুনিয়াশুদ্ধ লোক ভালো বলছে?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্তে সত্যজিৎ তৈরী হয়ে এসেছে, বললে,—জানোই তো নিজের মুখে নিজের কথা বলতে খারাপ লাগে। আমার এ বইটা তো ফিল্ম হচ্ছে, জানো তো। কেন খবরের কাগজে লাস্ট শনিবার, দেখোনি? দুটো বইয়ের অ্যাডভ্যান্স রয়্যাল্টি বাড়ি বয়ে দিয়ে গেছে। এ সবের জন্ত বলছি না। অনেক পপুলার রাইটার আছে, তারাও এরকম টার্মস পায়। আমি বলছি অন্ত কারণে। আমার লেখাটা সীরিয়াস। সেইজন্তে ভেবেছিলাম, তোমাদের মতো লোক যারা ট্রুথকে ভয় পায় না, তারা অন্তত ...। আবার শুরু টুটুলের চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে যায় সত্যজিৎ।

—তোমার কেন ভাল লাগে নি অনিন্দ্য-দা তা তো বললে না।

—তুমি যে কারণে ভালো বলছো ঠিক সেই কারণে ভালো বলতে পারছি না।

—আমরা মুখ্যু মানুষ, একটু পরিষ্কার করে বলো।

—এটা কোনো মুখ্যু-পণ্ডিতের ব্যাপার না। তুমি বলছো তুমি যেমনটি দেখেছো তেমনটি লিখেছো, তাই না?

—একজ্যাক্টলি।

—আমি যেভাবে দেখি তাতে তেমনটি লিখলে হবে না। তেমনটি লিখলে সত্যের যে চেহারার কথা বলছো তা মার খাবে। এবার থেমে থেমে বলে,—হয়তো তুমি ঠিকই করেছো। ঐ পথেই হয় তো তুমি ঠিকই করেছো। ঐ পথেই হয়তো সাহিত্যের রাস্তা। কিন্তু, কিন্তু ও রাস্তা আমার নয়।

—তোমার কী রাস্তা? কৌতুহলহীন গলায় সত্যজিৎ প্রশ্ন করে।

—শুনতে একটু বোকা বোকা লাগবে হয়তো। আমার চারপাশের জগৎটাকে দেখবার পেছনে একটা স্বপ্ন আছে, একটা কবিতা আছে। সেটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত জগৎটা ভয়ানক ছোট্ট একপেশে হয়ে পড়ে। সেটা হয়ত বড়দার হয়, কিন্তু তা লক্ষ্যহীন।

—তুমি যে রূপকথার কথা বলছো, অনিন্দ্য-দা।

—তা যদি বলো তাই।

সত্যজিৎ উঠে পড়ে বললে, আমার কোন স্বপ্ন নেই, কবিতা নেই আমি রোম্যান্টিক নই, আমি রিয়ালিস্ট। যা দেখব তাই আমার কাছে ট্রুথ। আমার কাছে অন্য সত্য বলে কিছু নেই।

টুটুল বলল, বোসো, একটা কফি খাও।

সত্যজিৎ বসে পড়লে। কফি খেতে খেতে বললে,—তুমি কিছু লিখছো নাকি?

—চেষ্টা করছি।

—যদি বই ছাপতে চাও বলতে পারি। এস. এন. মুখার্জির সীনিয়ার পার্টনার মাধব ব্যানার্জি। দারুণ ইন্টেলিজেন্ট। ব্যবসা করতে জানে এরকম একটা লোক হয় না, এমন মাই ডীয়ার।

—বেশ তো, বলে দেখো।

গামা-র জন্মদিন। লক্ষ্ণৌ-চিকনের পাঞ্জাবি আর চোস্তপাজামা পরে বেলফুলের মালা গলায় পায়েসভরা রুপোর বাটি হাতে আসছিল দাদুর ঘরের দিকে। স্বর্ণসুন্দরীর চীৎকারে তার হাত থেকে বাটি পড়ে যায়। গামা গাঁ গাঁ করে কাঁদতে থাকে। বুড়ী ছুটে আসে। টুটুল দেরিতে অফিস যাবার তাল করছিল। তার মুখে-চোখে একটা চাপা আনন্দ। তার বছর দুয়েকের কাজ শেষ হতে চলেছে। ভবনাথের গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোয়। গত দুদিন থেকেই প্রায় নিঃসাড়। কাল রাত্রে এবং আজ সকালে অমিয় একটা ইঞ্জেকশনের ঝড় বইয়ে দেয় ভবনাথের শরীরে। শেষ-কালে আঙুল ক'টায় সূঁচ ফোটাতে থাকে শরীরের অন্য জায়গায় সাড়ের অভাবে।

—ছেড়ে দিন না, টুটুল বলেছিল।

—চেষ্টা করতেই হবে। লাস্ট মোমেণ্ট পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

—চালান। টুটুল ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলেছিল।

মাঝে মাঝে গলার আওয়াজটা থেমে যায়। মনে হয় সব শেষ। আবার শুরু হয়। টুটুল বাবার কালো স্বাস্থ্যবান হাতের মুঠোয় তার হাত রাখে। প্রচণ্ড সজীব লাগে ভবনাথের লম্বা আঙুলগুলো। টুটুলের চোখে ভাসছিল খাঁকি হাফপ্যাণ্ট পরা মফঃস্বলের কাছারিফেরতা ভবনাথ। তার খেয়াল নেই কখন ভবনাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদেন। বুড়ী পেছন থেকে ঠেলা দেয় তাইকে।

তাদেরও যে একটা পাড়া আছে, সেখানে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খবরাখবর রাখে, একথা টুটুলের আগে মনে হয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনট্রাল গভর্নমেন্টের কল্লুর দল এসে গেল। ফ্যাশনের জুলফি, ঘিয়ে টেরেলিনের শার্ট আর সানগ্লাস পরা ছোকরাটি এসে বললে,—টুটুল-দা, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। এখন ত ন'টা, আমরা একটায় বেরিয়ে যাব। আর দেরি করলে ছেলেদের পাব না।

রাস্তায় চাঁদিফাটানো রোদ্দুর, পিচ গলছে। খাট, মালা সাজানো—সমস্ত ব্যাপারেই কল্লুর

দল অগ্রগণ্য। পাঞ্জাবিটা খুলতে না পারায় ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে এক ছোকরা। বুড়ী একটা সিল্কের পাঞ্জাবি এগিয়ে দেয়। বাইরে বেরিয়ে প্রতাপ বলে ওঠে,—অসম্ভব। সে বুড়ীকে নিয়ে গাড়িতে পেছনে পেছনে আসে। ভবনাথের খুব বেশী বন্ধু ছিল না। পার্কের বুড়োদের মধ্যে মাত্র একজন এসেছিলেন। তিনি আবার হার্ট কেস। নীচ থেকে দু-চার কথা বলে চলে গেলেন।

শবযাত্রীদের পায়ে ফোস্কা পড়ে।—আপনি টুটুনদা এবার সরুন, রুনুর দলের একজন কাঁধ এগিয়ে দেয়।

এই দুপুরেও পাঁচটা চুল্লি জ্বলছে। একটা চুল্লির পাশে রঙীন বাচ্চাদের ছাতা, একটা বড় প্লাস্টিকের ডল। প্যান্ট আর চশমাপরা কমবয়সী বাপ আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এক সময় কতকগুলো প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী খুব চগবগে জামা পরে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঢোকে। সঙ্গে বোধহয় ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন। তারা মরা তাক করে ক্রমাগত ছবি তোলে। আর সঙ্গের বঙ্গসন্তানটি হিন্দু সৎকারপ্রণালী ব্যাখ্যা করে চলে। ওদিকে যাত্রীদের বিশ্রামের জায়গায় বেলা পড়তেই বেড়াতে আসেন আশেপাশের রিফিউজি এলাকা থেকে মাঝবয়সী গিন্নির দল। সামনে চুল্লিগুলোয় জ্বলন্ত মানুষের দিকে তাঁদের দৃষ্টিমাত্র নেই। তাঁরা বাটা বার করে পান খান। একটি ডাগর ফ্রকপরা মেয়ের চুল টেনে বাঁধতে থাকেন এক গিন্নি। আর বিয়ের গল্প করেন নিজেদের মধ্যে। কারুর বিয়ে হয়েছে বরিশালে, কারুর ফরিদপুরে—তাঁদের সেই বিভিন্ন জেলার আচারবিচার এখনও তাঁদের মন থেকে মোছেনি। একটি পা-কাটা ছেলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। সে ছোটো চাকা-লাগানো একটা পিঁড়ি চড়ে দু'হাত বৈঠার মতো বাইতে থাকে, ছাই আর জ্বলন্ত চিতার পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য সুন্দর দেখায় ভবনাথকে চিতার ওপর। তাঁর ত্বকের পুরনো আভা ফিরে এসেছে। মুন্সীগঞ্জে তোলা ফটোটার মতো অবিকল দেখায় তাঁকে। একটা খয়াটে পুরুত ধুতির ওপর রঙজ্বলা নীল বুশশার্ট পরে কী সব মন্ত্র পড়ে। অনেকগুলো নদীর নাম ভেসে আসে কানে। তার বাপের দিকে চেয়ে চেয়ে টুটুন ভাবে তার অতীতটাও সে আজ চিতায় চাপিয়ে দিল।

বিকেলের হাওয়া ছাড়ে। রুনু আগুনটা তদারক করে মদনের পাশে এসে বসে। পাশ থেকে গৃহস্থালির গল্প ভেসে আসে। মদন বললে,—আর কতক্ষণ চলবে?

—ফ্যাট থাকলে একটু দেরি হয়, চশমার কাঁচ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে রুনু বললে।

সাত

ভবনাথের মৃত্যুর মাস তিনেকের মধ্যেই প্রতাপের কোম্পানি সম্পূর্ণ কব্জায় এল দীননাথের। বোসবাবু খবর নিয়ে এলেন, জয়রাম বোর্ডের ডাইরেক্টর। খবরটা দিয়ে হাসি চেপে বললেন প্রতাপকে, —আপনি স্যার বাড়িতে একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন। ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল টার্নারের বোস সাহেবের। খুব কাজ দিয়েছে। টিকে গেছেন ভদ্রলোক।

প্রতাপ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকায় বোসবাবুর দিকে। বোসবাবু ভিজে ভিজে হাসেন।

—আমার চাকরি গেলে আপনারা খুশি হবেন?

বিশাল জিভ কাটলেন বোসবাবু।—কী যে বলেন স্যার। আপনাদের স্যার রাজায় রাজায় লড়াই। আমরা চুনোপুটি।

—জয়রামের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে নাকি? এইভাবে অধস্তন কর্মচারীর কাছে নিজের উদ্বেগ জানানোর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বলে ফেললেন।

বোসবাবু নিঃসঙ্কোচে তাঁর চকচকে বাটা থেকে পান বার করে মুখে পোরেন। অফিসে সবাই বলে কী জানেন,—জয়রামের সঙ্গে আমার খুব খাতির। আসলে লোকটা খারাপ নয় স্যার। সেল্‌ফমেড ম্যান।

প্রতাপ বিরক্ত হয়ে বললেন,—আপনি তো আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না, বড়বাবু।

— স্যার জয়রাম লোক ভালো, তবে কী জানেন—ওরা তো ব্যবসা করতে এসেছে। এখানে তো দানছত্র খুলতে আসেননি।

অবাক হয়ে প্রতাপ বললে,—তার মানে?

স্যার,— সাহেবরা একভাবে ব্যবসা করত, আর ইণ্ডিয়ানরা একভাবে ব্যবসা করে।

প্রতাপ উত্তেজিত হয়ে বললে,— মাড়োয়ারীরা কবে ব্যবসা করে? তারা তো ফাটকাবাজ, ব্রোকারি করে পয়সা লোটে।

—রিস্ক নিতে জানে স্যার। ব্যবসা মানেই রিস্ক। দীননাথের মতো ক'টা লোক আছে দেখান, এমন রিস্ক নিতে পারে। সাহেবরা যা চালাতে পারছে না, দীননাথ সেগুলোই কিনে নিচ্ছে।

—দু'দিন পরে ফুঁকে দিচ্ছে, প্রতাপ বেজারভাবে বললে।

—স্যার, নাথিং সাক্সিডস্ লাইক সাকসেস। দীননাথকে কে বাঁধতে পারে? দিল্লী পারে? এই তো কমিশন বসিয়েছিল, ঠিক কেটে বেরিয়ে এল।

প্রতাপ অসহায়ভাবে বললে,—আমি অতো বড় বড় কথা বুঝতে চাই না বোসবাবু। আমাদের অফিসের কী হবে বলুন।

—অতো ডিপ্রেস্‌ড হবেন না স্যার। জয়রাম আমায় বলেছে এখনই কিছু নাড়াঘাটা করবেন না, তবে দু-তিন মাস গেলে...

বোসবাবু চুপ করে থাকেন। তিনি যেন তাঁর বড় সাহেবের অসহায়তা উপভোগ করছেন।

—দু-তিন মাস গেলে তখন আপনাদের গায়ে হাত দেবে। তা স্যার, সাহেবদের আমলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তো অনেক জমেছে।

প্রতাপ আতঙ্কিতভাবে বললে,—আমাদের স্যাক্ করবে বলছেন?

—না, স্যাক্ করবে কেন? জয়রাম ঠিক ঐরকম লোক না, বাংলাদেশে তো ব্যবসা করতে হবে। ও কোম্পানির একটা ছোটো ফার্মে আপনাকে অ্যাকাউণ্টেণ্ট করে দেবে। মাইনে অবশ্য খুব বেশী দেবে না। হয়তো তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা দেবে। তা মন্দ কী! আর আপনি তো স্যার লাকি ম্যান। পার্কসার্কাসে প্যালেশিয়াল বিল্ডিং। তারপর প্রপার্টি ইন্‌হেরিট করছেন—বালিগঞ্জের বাড়ি। আপনাকে কে পায়!

—দীপেনরা কিছু বলবে না? এত বড় একটা ইনজাস্টিস হয়ে যাচ্ছে? পরিষ্কার বোঝা যায় প্রতাপের কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লুপ্ত।

—আপনি স্যার ইউনিয়নের মেম্বার? ওরা কেন আপনার জন্যে লড়বে? তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, যাতে পার্টিশনের ওপাশেও তাঁর আওয়াজ পৌঁছায়,—আপনি স্যার বেশ! গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন।

ক্ষোভে অপমানে প্রতাপের ফর্সা মুখখানা তার শার্টের কলারের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে। সেদিকে চেয়ে বোসবাবু বললেন,—আপনি স্যার অতো ভাবছেন কেন? বালিগঞ্জের বাড়িটা বেচে দিন না, খুব ভালো দাম পাবেন। জয়রাম ওদিকে আসতে চায়। অবশ্য বিবেকানন্দ রোডে ওর মস্ত বাড়ি। তবে একটু ফাঁকায় আসতে চায়।

প্রতাপ বিমর্ষভাবে বলে,—তিন ভাইয়ের বাড়ি।

—আমি তো স্যার সবই জানি। আপনার পরের ভাই তো খুব বিখ্যাত—অ্যামেরিকান এজেন্ট, আর ছোটোটা কমিউনিস্ট। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই।

প্রতাপ তার সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে,—এটা আমাদের ভেতরকার ব্যাপার বড়বাবু।

—তা তো নিশ্চয়, তা তো নিশ্চয়। তবে কি জানেন স্যার, বাপ মরলে আর ভাইয়ে ভাইয়ে কিছু থাকে না আজকাল। আপনার ইন্টারেস্টেই বললাম স্যার। আমার স্যার এক পয়সাও কমিশন নেই। ভালো দাম পেতেন, তাই বললাম।

ভবনাথের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি আসে তার মায়ের কাছে। চোঙা প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখেছে যে, সমস্ত পৃথিবী তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় ঠিকই কিন্তু তার মন পড়ে থাকে কলকাতার জন্যে—এই শহরের ভিড় ধোঁয়া আর চীৎকারের মাঝখানেই সে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু জয়রামের প্রস্তাবের পর প্রতাপের সঙ্গে তার কয়েকবার পত্রালাপ হয়, তাতে সে মা কে লেখে যে, মায়ের যে এখন অর্থের টান পড়ছে তার অনেকখানি সমাধান হয় যদি বাড়িটা বেচে দেয়, অবশ্য ভাল দাম পেলে। চিঠিটা পেয়ে স্বর্ণসুন্দরী হতভম্ব হয়ে যান এবং জোর দিয়ে লেখেন যে, অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় এ প্রস্তাবে তিনি রাজী হবেন না। চোঙা লেখে যে, মায়ের অমতে তারা কিছুই করবে না, তবে ডিসেম্বরে ব্যাংকক হয়ে সে কলকাতায় আসছে সাতদিনের জন্যে, একবার দিল্লীও যাবার সম্ভাবনা আছে, তখন দেখা যাবে।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বিকট সাজে সজ্জিতা এক মহিলাকে তাদের বাড়ির দরজায় দেখে অফিস-ফেরতা টুটুল প্রথমে হকচকিয়ে যায়। ক্রেপ বেনারসী, ডগডগে লিপস্টিক, ল্যাকারলালিত চুড়ো মাথায়, আর এত নীচু কাটের ব্লাউজ যেন স্তন দুটি এখনই দুটো ক্রিকেট বলের মতো ঠিকরে বেরিয়ে তার কপালে ঠকাস করে লাগবে। মহিলাটি মৃদু হেসে তার দিকে চেয়ে। আজই নেমেছে রীতা স্বামীর সঙ্গে সকালে। বিদেশী দূতাবাসের গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ককটেল পার্টির জন্যে। একটু পেছনেই চোঙা। ইভনিং ড্রেস, বো-টাই, চুলটা বেশ লালচে বানিয়ে ফেলেছে। সিঁড়ির দু'ধাপ

আগে থেকে লাফ মেরে নেমে টুটুলকে আলিঙ্গন করে চোড়া।

—আমি এতক্ষণ তোমাকেই খুঁজছিলাম টুটুল, ভ রীয়াল আইডিয়ালিস্ট, ভ মিনিংফুল ফেলিওর। রীতা, তোমাকে আমি সেদিন বলছিলাম না, টুটুলের অ্যাডমিরেবল গোঁ আছে।

—ছ'টা তো বাজল, এখনও গাড়ি পাঠাল না। ত্রিগন্‌কে না হয় আর একবার ফোন করো, রীতা ক্লান্ত গলায় বলে।

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট একখানা বিদেশী গাড়ি টুটুলদের বাড়ির দরজায় লাগে। ধবধবে সাদা পোশাক আর কালো টুপি আঁটা শোফার সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে ধরে। স্বামী-স্ত্রী লাফাতে লাফাতে গাড়িতে ঢুকে পড়ে।

আবার রোজ সন্ধ্যেবেলা সার সার গাড়ি দাঁড়ায় টুটুলদের বাড়ির সামনে। ভীষণ পরবাসী লাগে টুটুলের নিজেকে। স্বর্ণসুন্দরী কিন্তু প্রাণে বল পান। চোড়ার এই প্রকাণ্ড মর্যাদা তাঁদের গোটা পরিবারেরই মর্যাদা—এই রকম একটা ধারণা তাঁর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আরাম দেয়। সাদা চুল আর সাদা থানে আবার চরকির মতো কয়েকদিন ঘুরে বেড়ান স্বর্ণসুন্দরী। নানারকম শুকতো ঘন্ট রাঁধেন। ঠাকুরকে দিয়ে মুরগী, ভেটকি মাছের ফ্রাই, ইলিশ মাছের পাতুড়ি করান।

চোড়া খায় আর তারিফ করে,—এত জায়গায় ঘুরলাম মা, এরকম মাছ আর কোথাও নেই। স্বর্ণসুন্দরী ছলছল চোখে চেয়ে থাকেন। তাঁর বর্তমান অবস্থাটা মনে পড়ে যাওয়ায় কান্না ছাপিয়ে আসে।

—সবাই যাবে মা, আগে-পরে, ও ভেবে লাভ নেই। বাবা অবশ্য রিমার্কেবল। আমাদের টোকিও অফিসে এক মহিলার হয়েছিল ঐ রোগ। তিন মাস লাস্ট করেছিল। তুমি মা, বড়দার কথাটা একবার ভেবে দেখো। বড়দাও থাকছে না, আমিও থাকছি না।

—তুই যে বললি · চিঠিতে লিখলি···

—আমি মা আজ নিউ আলিপুরে একটা জমি কিনলাম। বেশ সস্তায় পেলাম। প্রায় দশ কাঠা জমি। সাউথ খোলা, কর্নার-ফেসিং প্লট। একটা মাথা গোঁজার সংস্থান করে রাখা ভালো, কী বলো ?

স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর এই জাদুকর পুত্রের দিকে চেয়ে থাকেন। তার বাপের কর্মক্ষমতার জন্যে তিনি যেমন মনে মনে সব সময় তারিফ করতেন, ক্রমশঃ যেন সেই স্থান নিতে চলেছে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

—দু বছরের মধ্যেই বাড়ি তুলে দেব। তুমি আমার কাছে থাকবে মা ?

—আর একটা মাছ নে, স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

যে ক'দিন চোড়া কলকাতায় থাকে সব সময় সে ব্যস্ত। শুধু বিদেশী দূতাবাস নয়, বাঙালী মহলেও প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যায় তাকে খাওয়ানোর জন্যে। উঠতি বাঙালী মধ্যবিত্তের এই নয়নের মণিকে কাছে পাওয়ার জন্যে আঁকপাঁক করে কিছু পরিবার। ঘন ঘন টেলিফোন আসে।

রীতার ক্লান্ত গলা শোনা যায়,—আজকে? আজকে আর হবে না। পরশু দুপুরটা খালি আছে। ওর আবার একটু অম্বল হয়েছে।

টুটুল চোরের মতো বাড়িতে ঢোকে, বেশীর ভাগ সময় বাইরেই কাটায়। চোঙা দিল্লী যাবার দু'দিন আগে সে ধরা পড়ে যায়। রীতাই তাকে আটকায়,—তুমি বড্ড অ্যাবনরম্যাল টুটুল। ইয়েস, আই মীন ইট।

চোঙা তার পোর্টেবল টাইপরাইটারে একটা চিঠি টাইপ করছিল, চোখ তুলে বললে,—তুমি ওকে বুঝবে না রীতা। টুটুলের মতে ওর অ্যাবনরম্যালিটিই নর্ম্যাল। আমরাই আসলে অ্যাবনর্ম্যাল। তাই না টুটুল?

টুটুল বললে,—কেন দু'দিনের জন্যে এসে ঝগড়া বাধাচ্ছো? আমাদের দু'জনের দু'রাস্তা, এটা মেনে নেওয়াই ভালো।

—দ্যাটস রাইট। কিন্তু তার মানে তো এ নয় কোনো কমিউনিকেশান থাকবে না। কমিউনিকেশানটা স্ন্যাপ করে কী লাভ?

—থেকেই বা কী লাভ? একটুক্ষণ চুপ করে বললে,—নিউ আলিপুরে বাড়ি তুলছো?

—ঐ একটা মাথা গুঁজবার জায়গা। বড়দা একটা প্রস্তাব করেছে মা-র কাছে। খুব আনরিজনেবল কথা নয়। আমরা তো দু'জনাই থাকব না। এত বড় বাড়ির কী দরকার? তুমি যদি রাজী হও তাহলে আর একটু সাউথের দিকে একটা ছোট বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। সামনে একটু জমিও আছে। তিন-চারটে নারকেলগাছ আছে। তোমার ভাল লাগবে।

টুটুল অন্যমনস্কভাবে বললে,—কোথায়?

—খুব কাছে তো আর ওরকম বাড়ি নেই। একটু দূরে হবে অবশ্য—যাদবপুরে। আমি যাইনি ওদিকে। বড়দা দেখে এসেছে। ইউনিভার্সিটির খুব কাছেই।

—মা রাজী হয়েছেন?

—মা? প্রথমটা হননি। স্যাচারালি। স্বামীর ভিটে ছাড়তে কার আর মন ওঠে? তবে এখন বুঝেছেন।...তাছাড়া বড়দাকে নিয়ে হয়েছে গণ্ডগোল। আমি বলেছিলাম আরও দু-তিন বছর সবুর করতে। কিন্তু বড়দা রাজী হচ্ছে না। ওর চাকরির অবস্থা জানো তো?

—কী?

—ও, তুমি কিছুই খবর রাখো না। অবশ্য তোমার পক্ষে আনইমপর্টেণ্ট। আই কোয়াইট অ্যাপ্রিশিয়েট। তবে বড়দার ব্যাপারটার একটা ওয়াইডার সিগনিফিকেন্স আছে তো।

—চাকরি গেছে?

—প্রায় সেই অবস্থা। দীননাথ সাড়ে তিনশো টাকার একটা পোস্ট অফার করেছে।

—বড়দা রাজী হয়েছে?

—দীননাথের একটা টাউট আছে। এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িটা কিনতে চায়। টার্মস মন্দ দিচ্ছে না।

—বড়দা রাজী হল? বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি টুটুলের।

চোঙা অসহিষ্ণুভাবে বললে, তাই তো বলছি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে বড়দার। ওটা অ্যাকসেপ্ট করার পর থেকেই মা বলছে খালি ঘ্যান ঘ্যান করে তাঁর কানের কাছে। বলছে, যদি বাড়ি না বিক্রি কর তাহলে ওর অংশের টাকা ওকে দিয়ে দাও। ভীষণ আর্থিক কষ্ট। দুই ছেলের দার্জিলিং-এ স্কুল ইত্যাদি।

টুটুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—মা যদি রাজী হন আমার কিছু বলার নেই।

—না না, তোমাকে কিছু ত্যাগ করতে হচ্ছে না। টাকাটা উইল বি ইকুয়ালি ডিভাইডেড। তারপর টুটুলের গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, অবশ্য ফ্র্যাঙ্কলি আমারও খুব ইচ্ছে ছিল না। বাবার যাবার পিঠেপিঠেই বলতে গেলে। কী করা যাবে! উই হ্যাভ্ টু মেক্ দ্য বেস্ট অব এ ব্যাড বারগেন।

আট

গত দু'বছরের কাজ ধীরে ধীরে শেষ হতে চলেছে এক অনিবর্তনীয় গতিতে। একদিকে তার প্রাত্যহিক তন্ময়তা ভাঙবার জন্যে যত ভেজাল জমে ততো সে ডুবে যেতে থাকে তার কাজে। মাঝে মাঝে পিঠ টান করে জিরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে মনে হয় কারুর সঙ্গে কথা বললে হয়ত ভালো লাগত। তার এই নিঃশব্দ প্রাত্যহিক অভিযানের কাহিনী কাউকে বলতে পারলে আরাম পেত। লিলির কথা কয়েকবার মনে ওঠে। লিলি হঠাৎ তার কাছে এসে আবার কোথায় তলিয়ে গেল। ভবনাথের মৃত্যুর পর একবার ভেবেছিল হয়ত আসবে কিন্তু একবারও পা মাড়ায়নি এদিকে। বুড়ীকে খুব সাবধানে প্রশ্নও করেছে। বুড়ী বলেছে ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে সে তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এ জবাবে খুশি হয়নি টুটুল। ফোন বাজলে মনে হয়েছে হয়ত লিলির ফোন। তারপর জোর করে এ সব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলেছে।—কিছু এসে যায় না' এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো মনে মনে আবৃত্তি করেছে।

এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে টুটুলের দিন-রাত্রি কাটে। এদিকে রাজনৈতিক জগতে প্রবল ঝড় ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে কাটাকাটি, রক্তক্ষয়, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মতো দাঁড়িয়ে যায়। বিরাট বাঙালী মধ্যবিত্তের এক বিশাল অংশ মদত দিতে থাকে এই নিম্নমধ্যবিত্তের উচ্চমধ্যবিত্ত হবার জয়যাত্রায়। ঘন ঘন ধর্মঘট চলে। ট্রাম-বাস-রেলের চাকা বন্ধ হয়। নিষ্প্রদীপ রাস্তায় টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটে, বোমার আওয়াজে কানে তালা লাগে। আর এই বিরাট প্রতিবাদের শরিক হয়েও টুটুলের মন খাঁ খাঁ করে। আওয়াজ যত জোরালো হয়, জমায়েত যত বাড়ে, ততো টুটুল ফিরে ফিরে তাকায় তাদের কলেজ জীবনের অব্যবহিত স্বপ্নের দিকে। তখনকার একটা-দুটো কিংবা আরও কয়েকটা গলায় স্বরে যে স্বপ্ন ভেসে আসত এখন হাজার হাজার গলাতেও তা আসে না। ভারতবর্ষ টলছে, একথা মনে আসে না বারবার সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্ত্বেও, এসেমব্লিতে তাদের দলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও। আর কয়েক বছর আগে যা মনে হত পলায়নী মনোবৃত্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা—এখন সেই আত্মকেন্দ্রিক তীর্থযাত্রা তার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কে

কী বলছে কিছু এসে যায় না। সে হবে তার কালের চারণ। সত্যজিতের চেয়েও এক গভীর অর্থে বর্তমানের অসংখ্য এলোমেলোমি এবং অসঙ্গতির মাঝখানে সঙ্গতি খুঁজতে হবে।

যেদিন তার লেখা শেষ হল সেদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটে। এক মোটকা অ 'ভালী ভদ্রলোক সোজা দোতলায় উঠে আসে, তারপর শোবার ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ঘরের আয়তন জানালা-কপাট, মেঝে পরীক্ষা করতে থাকে। বুড়ী বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে বেরোতে পারে না। লোকটির ভ্রুক্ষেপ নেই। একটা ছোট নোটবই বার করে বোধহয় ঘরের মাপজোপ লিখতে থাকে। টুটুল পাশে এসে দাঁড়ালে লিখতে লিখতে বলে,—এক মিনিট।

তারপর মুখ তুলে বলে,—আমি জয়রাম। আপনার দাদা হামার অফিসে কাজ করেন। আপনাদের বাড়িটা কিনব। নিজেই দেখতে এলাম।

—আপনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান, টুটুল চীৎকার করে উঠল।

—আপনার দাদার সঙ্গে কথা চলছে টার্মস নিয়ে। প্রতাপবাবু বললেন।

টুটুল হঠাৎ ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরে সামনের দিকে ধাক্কা দিলে,—বেরোন।

ভদ্রলোক টাল খেয়ে সামলে নেয়। তারপর দু-এক পা হেটে শার্টের কলারটা দু'বার ঝেড়ে বললে,—আপনারা স্যার লাল চোখই দেখাতে পারেন। আর কিছু না।..এসব করে কী লাভ স্যার, ক্রিমিনাল কেস হয়ে যাবে।

টুটুল চাপা রাগে বললে,—সে আমরা দেখব। বেরিয়ে যান। ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে আসে।

নিংড়ানো তোয়ালে হাতে বুড়ী দাঁড়িয়েছিল। জয়রাম নেমে যাবার পর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তারপর টুটুলকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তুই এখনও ঠেকাতে পারিস টুটুল। তুই না কর। টুটুল শ্রান্ত গলায় বললে,—সে হয় না রে।

পারিবারিক এই নাটকের দিন সাতেক পরেই একদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রীটে বাস থেকে নামে টুটুল। কাঁধে ঝোলানো বিরাট ভারী কাপড়ের থলিটা দোতলা থেকে নামতে এক তরুণের খোড়ায় আটকে যায়। তরুণটি বিদ্রূপ করে টুটুলকে,—বাজার করে ফিরলেন নাকি মশাই!

এক গা ঘেমে এস. এন. মুখার্জীর সিনিয়র পার্টনার মাধব ব্যানার্জীর শূন্য পার্টিশান ঘরে ঢুকে টুটুল মুখ পোঁছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ছোকরাটি টাইপ করছিল। টুটুলের প্রশ্নের জবাবে বলে,—আপনাকে আসতে বলেছিলেন?

—এই তো এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলাম। চলে আসতে বললেন।

—ও! বলে ছোকরাটি আবার টাইপ করতে থাকে।

—উনি কি আবার আসবেন?

—নাঃ!

টুটুল নিজের নামটা বলে মাধব ব্যানার্জীকে জানাতে বললে ছোকরাটি টাইপ করতে করতে যান্ত্রিকভাবে চেঁচিয়ে বলে,—বলব।

বাইরে রোদ্দুর এখনও পড়েনি। অনেক ছেলে-মেয়ে ঘুরছে। চায়ের দোকানে যাবার জন্তে

টুটুল পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। সামনেই লিলি। সঙ্গে লম্বা একহারা এক সুদর্শন তরুণ। তারা চীনেবাদাম খাচ্ছে। টুটুলকে দেখেই লিলি চেঁচিয়ে ওঠে,—এই যে অনিন্দ্যবাবু, কী খবর?

টুটুল বোকা-বোকা হাসে।—এই এসেছিলাম এক জায়গায়।

—আপনি হিরোশিমা মনামুর ছবিটা দেখেছেন? দেখেননি? দারুণ ছবি, না বাপী?

তারপর পাশের তরুণটিকে দেখিয়ে বলে,—বাপী মানে প্রবীর মিত্র। সব ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ান।

প্রবীর বললে,—বাঃ, বেশ বলছো।

লিলি বললে,—এ ভদ্রলোককে একটা টিকিট জোগাড় করে দাও না। তোমার হাতেই তো তোমাদের ফিল্ম সোসাইটি।

প্রবীর কিছু বলবার আগেই টুটুল বললে,—আমি বোধহয় যেতে পারব না।

লিলি বললে,—আমি জানতাম আপনি যাবেন না। এমনি বললাম। একটু চুপ করে থেকে টুটুলের মাথার দিকে তাকায় লিলি। নেড়া হবার পর খুদে খুদে চুলে মাথাটা ভরে যাওয়ায় অনেকটা আমেরিকান ক্রু-কাটের মতো লাগে টুটুলের চুলের ভাবখানা। তার ওপর হলদে বুশশার্ট-প্যান্টে তাকে অন্য রকম লাগে।

—আপনার চেহারাটা একেবারে পাল্টে ফেলেছেন অনিন্দ্যবাবু। আপনাকে দেখে আর মেসোমশাই বলে মনে হয় না।

—আসলে কিন্তু এখনও আমি মেসোমশাই আছি।

—ও বাবাঃ, আমার মেসোমশাইদের বড্ড ভয়। প্রবীর কিন্তু খুব ভালো, একদম মেসোমশাই না। যা বলি তাই করে।

প্রবীর হাসে। লিলির সমস্ত ব্যাপারে সে যেন অভ্যস্ত।

টুটুলের পিঠ ধরে যায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে।

—এত কী বইছেন?

— এই কাগজপত্তর।

—আমাদের পাড়ায় একটা পাগল আছে জানেন? রাজ্যের কাগজ রাস্তা থেকে কুড়োয় আর ঠিক আপনার মতো একটা কাপড়ের ঝোলায় করে নিয়ে ঘোরে।

টুটুল হেসে বলে,—আমারও ঠিক তাই অবস্থা। তারপর ব্যাগটা কাঁধফেরতা করে বললে প্রবীরের দিকে চেয়ে,—কোথাও বসবেন নাকি চা খেতে?

লিলি বললে,—আমরা সারা দুপুর আড্ডা দিয়েছি। সন্ধ্যেবেলা সিনেমা। তার আগে বাড়ি ফিরতে চাই। একটু সাজগোজ করতে হবে তো। আপনাদের মতো বুশশার্ট চাপিয়ে দিলে চলবে?

[ক্রমশঃ]

শামসুর রাহমানের কবিতা

অমলেন্দু বসু

মনে পড়ে আমিও একদা পড়েছি ঝাঁপিয়ে অন্তহীন
নীলিমায়, কতদিন মেঘের প্রাসাদে
কাটিয়েছি মায়াবী প্রহর
আমি আশ্চর্যের যুবরাজ।
'অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে' :: রৌদ্র করোটিতে :: *

শামসুর রাহমানের বয়স এখন পঞ্চাশ। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় প্রথা অনুসারে শুভেচ্ছা জানাই, তুমি শতায়ু হও, তোমার সৃষ্টিকর্ম অগ্রগতিশীল থাকুক অন্তত ততদিন যে কালদৈর্ঘ্যে মিকায়েল এন্‌জেলোর, ব্যর্নার্ড শ'র, টমাস হার্ডির, রবর্ট ফ্রস্ট্-এর সৃষ্টিময় জীবন বিধৃত ছিল। তবু যে-কবি অর্ধশতকী জীবৎকালে প্রায় দশখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে এখন একটা প্রশস্ত দিক-নিরূপণ হওয়া দরকার।

শামসুর রাহমানের কবিব্যক্তিত্বে আমি তিনটি ধারা দেখতে পাই। শামসুর বাঙালী কবি, শামসুর বাঙলা ভাষার কবি, শামসুর বাংলাদেশের কবি। এই ত্রিধারার কোনো ধারাই অন্য দুইয়ের চেয়ে মহত্তর অথবা দীনতর নয়, কোনো ধারাকে বাদ দিয়ে অন্য দুই ধারা সক্রিয় নয়। খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের পরিভাষায় বলতে পারি এরা এক ট্রিনিটি, অথবা অবনীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি, তিনে এক, একে তিন। এক বটে, তবুও তিন, এবং কাব্যপাঠক তাঁর দ্রুত বিশ্লেষণের সময়েও এই তিনকে আলাদা আলাদা করে দেখবেন না।

শামসুর বাঙালী কবি। 'বাঙালী' শব্দটির মহাপণ্ডিতী ডেফিনিশন্ দেওয়া হয়তো সম্ভব, ঐতিহাসিক অথবা নৃতাত্ত্বিক অথবা দার্শনিক ডেফিনিশন্, কিন্তু কোনো পাণ্ডিত্যেই বাঙালী চেতনার সত্যতর মূর্তি প্রতিভাত হবে না জীবনানন্দের অবিস্মরণীয় সনেটে যে-মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়ে, যে-জীবনানন্দের সুর আবেগ ও বাক্‌বিধির হয়তো অবচেতন উত্তরসাধক (আমার বিবেচনায়) কবি শামসুর রাহমান।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;

* গ্রন্থের শিরোনামা বোঝাবার জন্য দুপাশে দুটি দুটি কোলন-চিহ্ন প্রযুক্ত হয়েছে।

সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর ;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

(:: রূপসী বাংলা ::)

জীবনানন্দর বাংলা আবালবৃদ্ধবনিতা যাবতীয় বাঙালীর বাংলা। কোনো বিমূর্ত তাত্ত্বিক ভাবনা নয়, যে-ভাবনা মাথার টুপির মতো খুশিমতো খুলে রাখা যায় পরা যায়। এ-বাংলা সদাপ্রত্যক্ষ বাংলা; শ্বাসেপ্রশ্বাসে সব কয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে-বাংলার সত্তা অনুভব করি, যে-স্বদেশসত্তা প্রতি বাঙালীর মানবিক সত্তায় অস্থিতে মজ্জায় মিশে আছে। এই স্বদেশসত্তা শামসুরের কবিতায়ও ধ্বনিত অনুরণিত হয়েছে।

এ-ও তো বাংলাই এক, তোমার ধ্যানের বাংলাদেশ
হোক বা না হোক ; আজো এখানে এ-বাটে দৈনন্দিন
চলে আনাগোনা। নানা পথিকের, মাঠে বীজ বোনে
ধান কাটে কর্মিষ্ঠ কৃষক আর মাঝি টানে দাঁড়।
অবশ্য নিয়ম মনমরা রাখালের দল ভাঙা
বাঁশি ফেলে, দিগন্তের হাহারব থেকে খুব দূরে
সহসা শহরে ছোটে কারখানার ভেঁপুর মায়ায়।
...   .
বাংলার আকাশ তুমি, তুমি বনরাজি সমুদ্রের
নির্জন সৈকতে তুমি অন্তহীন, তুমি বাউলের
বিজন গৈরিক পথ, গৃহস্থের মুখর প্রাঙ্গণ,
আমাদের ষড়ঋতু তুমি, তুমি বাংলার প্রান্তর।
কী পুণ্য স্তব্ধতা তুমি মানবিক, তুমি রাগমালা ;
তুমি তীর ছেড়ে দূরে যাওয়া, তুমিই প্রত্যাবর্তন।

('এ-তো বাংলাই এক', :: এক ধরণের অহংকার ::)

আর যদিও সোনার বাংলার বিগুণে অনেকের মতো জীবনানন্দের চিত্ত নিষ্পিষ্ট ও ব্যক্তিক জীবন বিদীর্ণ হয়েছিল, তাঁরও সেই অভিজ্ঞতা হয়নি যা শামসুর রাহমানের হয়েছে, চোখের সামনে নিরন্তর দেখতে পাওয়া বর্বর-ধর্ষিতা আমাদের রূপসী বাংলা মায়ের শান্ত আনন।

তুমি কি প্রান্তর ধু-ধু অথবা কাজল দিঘি শুধু ?
কিংবা বনরাজিনীলা ? না কি প্রেতভূমি ? তুমি ধান
ভানো, গাও গান ঘুমপাড়ানিয়া নিঝুম রাত্তিরে,
প্রত্যহ ভাসাও ঘড়া, এলেবেলে গল্প করো ঘাটে,
কখনো বানাও পিঠা, কখনো বা কঙ্কালপ্রতিম
অভুক্ত সন্তান নিয়ে তোমার দুঃখের বেলা যায়।

তোমার শরীর দেখি ছিঁড়ে খায় শকুন শেয়াল,
তোমার উদাস বুকে পদধ্বনি শোকমিছিলের।
কখনো তোমার খাঁ-খাঁ বিবস্ত্র শরীর ঢেকে দেয়
পতাকা ব্যানারে ওরা লজ্জাতুর তোমার সন্তান।
মারীতে মরোনি তুমি, ম্যাক্সিম গোর্কির জননীর
মতো তুমি সংগ্রাম ও শান্তি করো হৃদয়ে ধারণ।

('হে বঙ্গ', :: দুঃসময়ের মুখোমুখি ::)

শামসুর রাহমানের বাঙালীত্ব খাঁটি বাঙালীত্বের ধারায় জটিল এবং বহু অনুভূতিবিজড়িত। নিতান্তই সরলরেখ ভালোবাসা বা উচ্ছ্বাস বা গর্ব নয়। উপরে উদ্ধৃত 'এ-তো বাংলাই এক' কবিতাটির ছত্র কয়টিতে দেখতে পাই কবিচিত্তে দেশচিন্তা বিভিন্ন বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত হয়েছে। তাঁর দেশ কখনো গেরুয়া-পরা বাউলের পথ, কখনো গৃহস্থের মুখর প্রাঙ্গণ (কল্পনা করতে পারি সে-মুখরিত প্রাঙ্গণে অনেক ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছে, চেঁচামেচি করছে), এই দেশ আবার কখনো (হয়তো উষার প্রথম আলোয় অথবা গোধূলির অন্তে) স্তব্ধতায় পুণ্যময়। সেই স্বদেশ কখনো তীর ছেড়ে দূরে যাওয়া, কখনো প্রত্যাবর্তন। দেশপ্রেম যে-কোনো সাহিত্যেরই সুপরিচিত অন্যতম বিষয়বস্তু, কিন্তু শামসুরের বাঙালীত্ব-চেতনা অসামান্য রকমে সেন্‌সিটিভ, যেন বিচিত্রবীণার প্রতিটি তার উন্মুখ হয়ে আছে মৃদুতম স্পর্শের জন্য। বাঙালীর এই অনুপম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শরীরী আত্মজাতিচেতনা অধিকাংশ বিদেশীরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, এমন কি বিদেশী-মনোভাবসম্পন্ন বাঙালীর (যেমন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর) দৃষ্টিও এড়িয়ে যায়। শামসুর রাহমানের বাঙালীত্ব খাঁটি দেশাত্মবোধ থেকে উৎসারিত।

শামসুর বাঙালী, বাঙলাভাষী। একটি হলে অন্যটিও যে হবেই এমন কোনো অবশ্যম্ভাবিতা নেই। বাঙালী অথচ বাঙলাভাষী নয়, অন্য ভাষাভাষী, এ-অবস্থার দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়। তাছাড়া জন্মসূত্রে বাংলাভাষী হলেই তো হয় না, সেই ভাষা, তার ঐতিহ্য, তার পূর্বতন এবং আধুনিক প্রয়োগ ও ঐশ্বর্যসম্ভাবনা সম্বন্ধেও সচেতন থাকা দরকারী। যিনি আজ বাংলা ভাষায় কবি হয়েছেন, বা হচ্ছেন তিনি তো একক নন, তিনি এক মহিমান্বিত জনসঙ্ঘের শরিক। পঞ্চাশের দশকের আর পাঁচজন কবির মতো শামসুর রাহমানও তাঁর ভাষার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর কাব্যে 'রবীন্দ্রনাথ' একটি

বহু-উচ্চারিত নাম, কিন্তু তাছাড়াও অনেক আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির নাম লেখা হয়েছে তাঁর কোনো কোনো কবিতায় : নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। যখন শামসুর লেখেন

সন্ধ্যা-নদীর আঁকাবাঁকা জলে
মেঠো চাঁদ লিখে
রেখে যায় কোনো গভীর পাঁচালি ('রূপালি স্নান')
তরুণ কমলালেবু চেয়ে আছে দূরের আকাশে,
চিকণ সোনালী কলি ম্রিয়মাণ শঙ্খশাদা হাতে ('তার শয্যার পাশে')
হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয় সত্তার গভীরে ('জর্নাল, শ্রাবণ')
এ যুগের আঁখি রুখবে কি দিয়ে বলো ?
লুকাও বরং অতীতের কোনো গড়ে।
বল্লম আর সাধের শিরস্ত্রাণ
শোভা পাক আজ ঘুমন্ত যাদুঘরে। ('কোনো অশ্বারোহীকে')

তখন মনে হয়, এই ছত্রগুলি যথাক্রমে জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যলোকের অধিবাসী হতে পারত। কিন্তু শামসুর রাহমান পুনঃপুনঃ এবং সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকেই। প্রথম দিককার একটি কবিতায় তিনি বলছেন অনাবিল বিনম্র স্বরে, খানিকটা যেন দিনেশ দাশের সুর :

অবসন্ন চেতনায় গোধূলিতে শুনি
সান্ত্বনার ভাষা, এখনো রবীন্দ্রনাথ,
সে তোমারি দান।

আমাকে দিয়েছো ভাষা, তার ধ্বনি, প্রতীকী হিল্লোল
অস্তিত্বের তটে আনে কতো
ঐশ্বর্যের তরী—পালতোলা তরঙ্গের স্মৃতিস্নাত
দীপ্ত জলযান।
... ...
তুমি নও সীমিত শুধুই কোনো পঁচিশে বৈশাখে।
তোমার নামের ঢেউ একটি দিনের
সংকীর্ণ পরিধি ছিঁড়ে পড়েছে ছড়িয়ে
রূপনারানের কূলে, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে
অনন্তের শুভ্রতায় : তুমি নও সীমিত শুধুই
পঁচিশে বৈশাখে।

('সূর্যাবর্ত' :: রৌদ্রকরোটিতে ::)

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে, কিছুকাল পরে, বাংলা কাব্যের যে হাল হয়েছিল, শামসুরের কবিত্বের উৎসাহী অভিলাষ তাতে সন্তোষ পায়নি। :: রৌদ্রকরোটিতে :: গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি বলছেন,

লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন,
বিশেষতঃ তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা
ললিতলাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে—

সেই আকালের হাওয়ায় আজ 'চারিদিকে পোড়োজমি' আর 'ফণিমনসার ফুল' (এ প্রসঙ্গে এলিয়টের বাক্প্রতিমা ক্যাক্টাস নির্ঘাত এসে পড়ছেই), এবং তিরিশের কবিদের এক বিষণ্ণ প্রতিকৃতি নিশ্চল হয়ে আছে :

সুধীন্দ্র জীবনানন্দ নেই, বুদ্ধদেব অনুবাদে
খোঁজেন নিভৃতি আর অতীতের মৃত পদধ্বনি
সমর-সুভাষ আজ।

এই ম্রিয়মাণ পরিবেশে কবির সামনে নিয়ত উদ্ভাসিত থাকছে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ চির-অমলিন শক্তির ভাণ্ডার, সেই রবীন্দ্রনাথ :

প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।

রবীন্দ্রনাথ যে কনিষ্ঠ কবিদের (সে-কনিষ্ঠতা আজো চলছে এবং চলবে মনে হয় আরো অনেক দশক অবধি) সৃজনী উদ্যমের সর্বকল্যাণকারী অনবশেষ উৎস, এ কথার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর গভীর উল্লেখের সঙ্গে তুলনীয় শামসুরের রসায়িত উচ্চারণ।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরেকটি কবিতা, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রতি' (:: এক ধরণের অহঙ্কার ::), কবিতাটি বুদ্ধদেবের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত যাবতীয় গদ্যপদ্য রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমার ধারণা।

শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায়
আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম।
অফলা সময় আসে সকলেরই মাঝে মাঝে, তাই
থাকি অপেক্ষায় সর্বক্ষণ। যতই যাই না কেন দূরে
অচেনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে আমার জলযান,
হাতে রাখি আপনার কম্পাসের কাঁটা; ঝড়ে চার্ট
কখন গিয়েছে উড়ে, চুলে চোখে-মুখে রুক্ষ নুণ
অস্পষ্ট দিগন্তে দেখি বৌদ্ধ মুখ। আপনার ঋণ
যেন জন্মদাগ, কিছুতেই মুছবে না কোনদিন।

কয়েকটি জড়ানো বাক্প্রতিমার সাহায্যে কবি মূল্যবান কথা বলেছেন, বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টান্তে কনিষ্ঠ কবি কী লিখতে পারেন (কেননা বাক্শিল্প তো অনবসর ক্লান্তিহীন সাধনা, নির্মম আত্মশুদ্ধি!)— কবি হচ্ছেন শব্দপ্রাণ, কবি হচ্ছেন পরিশ্রমী, শিল্পের যে তরণীতে ভেসেছেন কবি, সে তরণী যখন

ঝড়ঝাপটায় কেঁপে ওঠে, কনিষ্ঠ কবির চোখের সামনে ভাসে বৌদ্ধ মুখ। বুদ্ধদেবের ছাপ জন্মদাগের তুল্য। সেই প্রভাব আজ অদৃশ্য হয়েছে।

স্মৃতির মতন এক অনুপম স্বপ্নিল বারান্দা
থাকে পড়ে অন্তরালে অন্তহীন, কবি নেই তার।

নিজ ভাষার কবিদের স্মরণ করার সঙ্গে শামসুর অন্য ভাষার কবি ও মনীষীদেরও স্মরণ করেন। যদি স্মরণ করেন নজরুল ইসলামকে (কোন্ বাঙালী কবিই করেন না), স্মরণ করেন তুলসীদাসের দোঁহা : 'বরনি ন জাই অনীতি ঘোর নিশাচর জো করহিঁ'—নিশাচরগণ যে দুর্নীতিময় কার্য করেছে তা বর্ণনা করা যায় না। যদি সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা ভাবেন, সেই সঙ্গে ভাবেন অডেন, রিল্‌কে, বোদলেয়ারের কথা, ভাবেন কোয়াসিমোদো চাইকোভসকির কথা, দান্তে ও শেক্‌স্‌পিয়রের কথা (বিয়াত্রিচেকে দেখতে পান, দেখতে পান এল্‌সিনোর দুর্গ, ওফেলিয়াকে, জনতা-নিহত কবি সিনাকে), পাস্‌টেরনাক ও লোরকার কথা, কিয়েৰ্কেগার্দ ও বারট্রাণ্ড রাসেল-এর কথা, ভ্যান গ' ব্রাক্ পিকাসো মাতিস্ শাগাল-এর কথা, বুদ্ধ ও মার্কস্-এর কথা। শামসুর রাহমানের বহুব্যাপ্ত মানসিক ও শৈল্পিক সংবেদনায় ঘরের ও বাহিরের বহু চিন্তা ও প্রভাব বিধৃত হয়েছে যেমন বিধৃত হয়েছে শতলক্ষ নৈসর্গিক ও সামাজিক তথ্য ও দৃশ্য।

তিন

কবি, শিল্পী, চিন্তাবিদদের স্মরণ করার সঙ্গে শামসুর রাহমান স্মরণ করেন লোকনেতাদেরকেও। যেমন স্মরণ করেন মহান নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংকে, তেমনি অতীব সমীচীন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফজলুল হক সাহেবের স্মৃতিতে।

তাঁর রোদ্দুরেই বাঁচা।
তাই বছরের পর বছর সে-রৌদ্রের হল্‌কায়
কাটান প্রহর আর খরবেগে যেখানে ছলকায়
জীবনের দুই পাড়, সেখানে দাঁড়ান অবিচল;
হেলে চাষীদের প্রাণে নামে তাঁর মানবিক ঢল।
দারুণ খরায় পোড়া স্বদেশকে নিত্য দেয় ছায়া,
কী বিপুল ছায়া, এই বাংলাদেশজোড়া তাঁরই কায়া। (:: নিরালোকে দিব্যরথ ::)

একটি অতি সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মহাপণ্ডিত শহীদুল্লা সাহেবের উদ্দেশ্যে। তাঁকে আবাহন করেছেন 'হে বিদ্যা, হে প্রজ্ঞা' বলে :

সেই কবেকার অপরূপ শৈশবকে কোন্ জাদুবলে চির
প্রতিবেশী করে রেখেছিলেন মায়াবী কুঠুরিতে,
ভেবেছি বিস্ময়ে কতদিন। অন্বেষণে
আলোকিত শতমুখি একটি বৃক্ষের কাছে চেয়েছেন পৌঁছতে সর্বদা।

(:: নিজ বাসভূমে :: ২৯ পৃঃ)

শামসুর জানেন মহৎ জ্ঞানের উৎসেও থাকে মায়াবী অভিজ্ঞতার সমাহার। জীবনের এই মায়াময় অভিসার উল্লিখিত হয়েছে আরেকটি যে কবিতায় তার নায়ক কবিয়াল রমেশ শীল :

কঙ্কবাক প্রধান যাত্রার তুমি রাজপুত্র, নিঃশঙ্ক, সুকান্ত,
সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা সত্যকে
অক্লেশে জাগাতে চাও, অভিশপ্ত রাজ্যের উদ্ধারে
কোষমুক্ত করো তরবারি। তুমি পাষাণপুরীর
প্রতিটি মূর্তির স্তব্ধতায় চেয়েছিলে ছিটোতে রুপালী জল।

(:: নিজ বাসভূমে :: ৩৪ পৃঃ)

যে অন্তঃশক্তিতে শামসুর রাহমান সু-উচ্চ সারির কবি তার নিঃশঙ্ক প্রমাণ তাঁর সৃজনী প্রতিভায়, যে প্রতিভায় সাধারণ বিষয়টিও অসাধারণ হয়ে যায়, পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে যেমন তেমনি কবিয়ালের কবি-গানে তিনি অন্তরতম এবং সত্যদৃঢ় মায়ার সত্তা দেখতে পান, খুঁজে পান the light that never was on land or sea। মূলত, শামসুর রাহমান মানুষের কবি, মানুষের মায়াময়তার, মানুষের মহানুভবতার কবি, যে মায়া এবং মহানুভবতা বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনার তুল্য, যে বন্দী কৃমি-ঘন পঙ্কের সাগরে ডুবে থেকেও অসীমের নীলিমারে জড়াতে চেয়েছে। পঙ্কের সাগর শামসুর রাহমান প্রচুর দেখেছেন কিন্তু তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অসংখ্য ব্যাদিত হিংস্র করাল অমানবিকতার মধ্যেও মানুষের সদর্থক গুণ দেখতে পাবার। এই ক্ষমতার জন্যই শামসুরের নিজের ভাষায় আমি তাঁকে আশ্চর্যের যুবরাজ বলতে চাই।

আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতা কি শামসুর পেয়েছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে? একটি কবিতা আছে :: নিজ বাসভূমে :: গ্রন্থে, 'কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে?' শিরোনামায়। আমার সুদীর্ঘ কাব্যপাঠে এমন কবিতা বেশি পড়িনি বলে সবটাই তুলে ধরছি :

কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে
এখনো আমার মনে? দেখেছি তো গাছে
সোনালি বুকের পাখি, পুকুরের জলে
শাদা হাঁস। দেখেছি পার্কের ঝলমলে
রোদ্দুরে শিশুর ছুটোছুটি কিম্বা কোনো
যুগলের বসে থাকা আঁধারে কখনো।

দেশে কি বিদেশে ঢের প্রাকৃতিক শোভা
বুলিয়েছে প্রীত আভা মনে, কখনো বা
চিত্রকরদের সৃষ্টির সান্নিধ্যে খুব
হয়েছি সমৃদ্ধ আর নিঃসঙ্গতায় ডুব
দিয়ে করি প্রশ্ন : এখনো আমার কাছে
কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে?

যেদিন গেলেন পিতা, দেখলাম মাকে—
জননী আমার নির্দ্বিধায় শান্ত তাঁকে
নিলেন প্রবল টেনে বুকে, রাখলেন
মুখে মুখ ; যেন প্রিয় বলে ডাকবেন
বাসরের স্বরে। এখনো আমার কাছে
সেই দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে।

তাঁর নয়খানা কাব্যগ্রন্থে শামসুর যে কতবার তাঁর পিতামাতার উল্লেখ করেছেন তার পুরো হিসাব রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু যদিও তাঁদেরকে আমি দেখিনি, এই কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠের পূর্বে তাঁদের কথা জানতাম না, এখন মনে হয় কিছু সসঙ্কোচ দূরত্ব থেকে আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি কবির পিতামহ-পিতামহীকে, মাতামহ-মাতামহীকে (যে মাতামহী যাদব চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে 'হিসেব টিসেব শেখেন নি কো')। দেখতে পাচ্ছি সেই ছেলেকে যাকে বুকে নিবিড় জড়িয়ে ধরে, তার পিতা বলে, "তুই তো আমার সেই প্রতিশ্রুত দেশ", যে-ছেলে, হায়, "আজো পারে না বলতে কোনো কথা/কিছুতেই ; শব্দাবলি পাখির ছানার মতো শুধু,/ক্ষীণ ডানা ঝাপটায়…" আর দেখতে পাই বারে বারে সেই নারীকে, অথবা তাঁর দেহ ও মনের একটা কাঠামো-রেখাকে, যাঁকে কবি 'নিরুপমা' বলে সম্বোধন করেছেন বার বার।

চার

আশ্চর্যের যুবরাজ কিন্তু চলাফেরা করেন প্রত্যক্ষ জগতে, যেমন করে জীবনানন্দ-সৃষ্ট ইয়াসিন-হানিফ-মকবুল-গগন-বিপিন-শশী যারা গ্যালিফ স্ট্রীটের—এণ্টালির বাসিন্দা। শামসুরের কবিতায়ও বাচ্চু চলে যাবে শরৎ চক্কোত্তি রোডে, ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীতে (যে-পাড়ায় আমারও স্কুলজীবন কেটেছিল); আরেকজন যাবে পুরানো ঢাকা শহরের নেড়ি গলি ছেড়ে আজিমপুরায় ; রাস্তার বাতি-অলা ; জনৈক সহিসের ছেলে ; তিনটি বালক শীতের ভোরে জড়োসড়ো হয়ে কারু দোকান ঘেঁষে দাঁড়ায় ; শচীন শাঁখারি, রাজমিস্ত্রী আবেদালি, লক্ষ্মীবাজারের সুহাসিনী দেবী ; গলির সেই বুড়োটা যে তালিমারা কোট গায়ে বিড়ি টানে ; কিছু রকবাজ সন্ত ; চায়ের দোকানে ঘেঁষাঘেঁষি-করে-বসা তিনজন বুড়ো ; খদ্দর-পরা, চোখে পুরু চশমা, মাথায় পাখির বাসা সমেত জনৈক কবি, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ জগৎ। এবং এই বাস্তব জগতের বাংলা ভাষায়ও আশ্চর্য বাস্তব কথ্য চরিত্র। একটি দ্রুত অসম্যক অনুসন্ধানে কয়েকটি শব্দে আমি আকৃষ্ট হয়েছি শামসুরের কবিতায়—

হমড়ি খেয়ে, ঘুপচি, পিরান, হুজ্জত, ঠাঠা; হাড্ডিসার, ছিরি, বিচ্ছিরি, বুড়ো হাবড়া, হাবিজাবি, খেলুড়ে, ধলা, গুলতাপ্পি, ফাত্রা, ছিত্তিছান, আখিবিখি, আয়েন্দা, ইতলবিতল, ইকচিবিকচি, বেহদা, শিবন্তী, বেলুমার, শাবাজ, মিসমার, এলাহি, আজাড়া, (আজাইড়া), আইমুলা, অপরাবি, আউগারি।

এ সবের কিছু শব্দ হয়তো পূর্ববঙ্গবাসীর অজানা নয়, কিন্তু একটি কবিতায় কিছু শব্দ আছে আমার বা অভিধানের অপরিচিত—

চালনিমা, 'তেমরা গকুলে আছো'; গংগিমার কাছে; আউলা ঝাউলা; গিয়োবাজ; চাচরা; অতিল; চাইলগ্না; গিচমু; খিরকা-পরা; গাহাক (গ্রাহক?); খাউয়া বাউয়া; গোপাট; করুণ কাহাতে বিদ্ধ কাটৃটি মারি; খিস্তির মস্তিত মাতি; চাত্রি; চাপ্পান।

(:: নিরালোতে দিব্যরথ :: 'আমি হই বর্তমান')

নিজকে প্রশ্ন করি এই সব শব্দপ্রয়োগে কি শামসুর সেই ভাষাপ্রদেশ সৃষ্টিতে নিরত হয়েছিলেন যে-ভাষার স্রষ্টা লিউইস্ ক্যারল্ নামকরণ করেছিলেন Jabberwocky, যে-ভাষায় রচনার কিছু মক্শো করেছিলেন সুকুমার রায়চৌধুরী এবং পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং?

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe

শামসুরের শব্দচেতনা খুবই কালসম্মত। আমার একটি প্রবন্ধে—'চল্লিশের দশকের কবিতা'—আমি বলেছিলাম যে সূক্ষ্ম শিহরণশীল শব্দচেতনা এই কবিতার মহৎ শিল্পলক্ষণ। শামসুরের সমবয়সী অরুণ ভট্টাচার্য লিখছেন:

কিছু কিছু শব্দ হাসতে জানে, জানায়
কিছু কিছু শব্দ কাঁদতে জানে, কাঁদায়
কিছু কিছু শব্দ অলীক ভালোবাসায়
হঠাৎ জেগে ওঠে।

শব্দ, ভাষা নেহাতই ভাবমাধ্যম নয়, নেহাত একটা সরণি নয় যে-সরণি বেয়ে লেখক তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিগুলিকে ভ্রমণে পাঠাবেন। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ-পূর্ব সত্তায় ও বাঙ্ময় রূপের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান, যে-প্রভেদের দরুন আধুনিক লজিক্যাল পজিটিভিস্ট্ চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়েছে :: দ্য মীনিং অব্ মীনিং :: শীর্ষক গ্রন্থ। যে-ভাষাকে ভেবেছিলাম বাহন মাত্র, আজ দেখছি সেই বাহন এক অননুমিতপূর্ব স্বকীয় সত্তা ও রূপ নিয়ে আমার সামনে দণ্ডায়মান। ভাষার, শব্দের, এই স্বকীয় রূপ সম্বন্ধে শামসুর রাহমানের চেতনা কতটা বেদনাবিধুর তার পূর্ণ দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' (:: নিজ বাসভূমে ::) কবিতাটিতে। অবিস্মরণীয় কবিতা। কোনো বাঙলাভাষী এই কবিতায় সাড়া না দিয়ে পারেন না। কবি বলছেন, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়। (এখানেও শামসুরের জড়ানো বাক্‌প্রতিমা লক্ষ্য করার বিষয়।) বাঙলা বর্ণমালা তো নিষ্প্রাণ রেখা নয়, জীবন্ত (যেমন অরুণ ভট্টাচার্য বলেছেন) ও জাগ্রত, যেন কবির আজীবন সঙ্গিনী। 'আজন্ম আমার সাথী তুমি, / আমার স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পলে পলে।' শামসুর যেমন বলছেন (কিন্তু ইতিপূর্বে তো আর কেউ বলেন নি! কেউ কি এমনধারা ভেবেছেন?), তিনি শুনেছেন মদনমোহন তর্কলঙ্কারের ধীরোদাত্ত ডাক, তিনি "হাসিখুশি"র খেয়া বেয়ে পৌঁছে গেছেন রত্নদ্বীপে।

যুদ্ধের আগুনে,
মারীর তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে,
বারবনিতার
নূপুরনিক্কণে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে,
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজ্যের এলো-
ধাবাড়ি চীৎকারে
সৃষ্টির ফালগুনে
হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে। (:: নিজ বাসভূমে ::)

সেই বর্ণমালাকে উপড়ে নেওয়ার প্রচণ্ড বীভৎস চেষ্টা হয়েছিল ১৯৫২ সনে,—'তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?'—সে-দুঃখ কোটি কোটি বাঙালাভাষীর, সে-দুঃখের প্রকাশ হয়েছে শামসুরের কবিতায় :

এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস !
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা')

পাঁচ

একাধারে জননী জায়া কন্যা এই বর্ণমালার নিয়ত প্রসাধক শামসুর রাহমান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেও :: প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে :: শব্দচেতনা পুনরাবৃত্ত :

শব্দের মোহন সুরে ঘর ছেড়ে নির্দয় সূর্যের
তৃণহীন প্রান্তরে হারাই পথ (৫২ পৃঃ)

শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আমি কবিতার অবিশ্রান্ত শরীর (৫৪ পৃঃ)

শব্দের প্রাসাদ (৫৭ পৃঃ)

এই অবিশ্রান্ত শরীরের একপলকী আভাস পাই এসব ছত্রে যার সব কয়টি তুলছি :: এক ধরনের অহংকার :: থেকে :

শ্রাবন চলে গেলে কৃষক কুড়িয়ে নেয় শস্যকণা তার (২১ পৃঃ)

আমার রৌদ্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় এক অবাধ প্রান্তর (২১ পৃঃ)

স্বপ্নের ঝালর নিয়ে চোখে হু হু শূন্যতায় শুনি আর কারো পদধ্বনি (২৭ পৃঃ)

কোনো তরুণীর বুকে ভালোবাসা
একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া হয়ে মদির উঠুক জলে (৪১ পৃঃ)

নক্ষত্রগোষ্ঠীর
আতশি মায়ায় মরীচিকা ডেকে যায় বারংবার (৪২ পৃঃ)

জ্যোৎস্নামাখা উর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি (৫৫ পৃঃ)

শামসুর রাহমানের শব্দপ্রসাধনের অনেক রীতির মধ্যে দুটি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি। এই কাব্যে শব্দের, ছত্রের পুনরাবৃত্তি একটা নিজস্ব সুর যোগ করেছে ছন্দভিত্তিক সুরের সঙ্গে। :: নিজ বাসভূমে :: গ্রন্থের 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে দেখি কিছু ছত্রাবলী :

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।

এ যেন একটা তিব্বতী মন্দিরের গম্ভীর ঘণ্টা পুনরাবৃত্ত ধ্বনিতে কবিতাটির মূল ভাবনা আমাদের বোধির পরতে পরতে মিশিয়ে দিল। নিছক পদ্যের ছন্দ একটা আভ্যন্তরীণ ভাবছন্দের সূক্ষ্ম সত্তায় উত্তোলিত হল। এমনই আঙ্গিক পরিণতগুণসম্পন্ন কাব্যগ্রন্থ কয়টিতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাদের দুটির উল্লেখ করছি, দুটিই :: দুঃসময়ে মুখোমুখি :: গ্রন্থ থেকে নেওয়া। একটিতে শুনতে পাই ভ্রমরের গুঞ্জন :

ঘুম
যেন মা দিলেন ডাক আদুরে মাদুরে,
ঘুম, পিতা দিলেন বুলিয়ে মাথা অলীক আঙুলে।
ঘুম, কারো সুরভিত কালো চুলে চোখ মুখ একান্ত ডোবানো,
ঘুম, গাঢ় গোধূলির ঝিরঝিরে হ্রদ,
-ঘুম,

জলজ উদ্ভিদ যেন, ভুল অনন্তের ধু ধু দিকে ভাসমান। (২৭ পৃঃ)

কবিতাটির শেষার্ধে 'ঘুম' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ 'অনিদ্রা' প্রযুক্ত হয়েছে বার বার। 'ম্যাজিক' শীর্ষক কবিতায় পাই কয়েকটি ছত্র :

কাঁদবো,
কাঁদাবার লোক থাকবে বিপুল বেরাদরিতে।
হাসবো,
হাসাবার লোক থাকবে বিপুল বেরাদরিতে।

... ...

থেমে যাবে, থেমে যাবে, থেমে যাবে সব ম্যাজিক। (৩৩-৩৫ পৃঃ)

এমনধারা পুনরাবৃত্তি এই গ্রন্থের আরো একটি কবিতায়, 'সাঁকো', যেখানে শিরোনামাধৃত শব্দটি যেন কোনো চাঁদমারিতে নিক্ষিপ্ত শব্দের গোলার পরম্পরা। শামসুর রহমানের এই আঙ্গিক—শব্দের পুনরাবৃত্তি— সাবেকি লোকসঙ্গীতের, এমনকি বৈষ্ণবপদাবলীর অতীব সফিসটিকেটেড ধুয়া নয়, একে বলতে পারি আধুনিক শিল্পের এমন এক প্রয়াস যাতে কাব্যস্রোতের উপরিতলে যে ছন্দের চাল, তারই একটা সূক্ষ্ম গূঢ় সমর্থন সৃষ্টি হয়, যেন ফৈয়াজ খাঁ গেয়ে চলেছেন, আর তানপুরায় সে-গানের সুর হয়েছে বিধৃত, মিশ্রিত, উদ্বাহিত।

এই পুনরাবৃত্তি-আঙ্গিকের সঙ্গে লক্ষ্য করি আরেকটি আঙ্গিক যাকে বলতে পারি নাট্যায়ন, dramatisation, আত্মভাবনাকে অনাত্মভাবনার রূপদান। এই আঙ্গিক আধুনিক বাঙলা কাব্যে আদৌ বিরল নয়, জীবনানন্দে আছে, বুদ্ধদেবে আছে, সমর সেনে আছে, অন্যত্রও আছে। শামসুরের নাট্যায়নরীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের (::বিধ্বস্ত নীলিমা ; নিরালোকে দিব্যরথে ; নিজ বাসভূমে::) দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে। কবিতার শিরোনামা 'কয়েকটি স্বর'। আমাদের বয়স্ক পাঠক স্মরণ করবেন জীবনানন্দর 'বিভিন্ন কোরাস্' ::সাতটি তারার তিমির::। শামসুরের কবিতাটির শুরুতে জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিকের উক্তি ; তারপরে একটা কোরাস্, যেন ইয়ুঙ্-কথিত অবচেতনের কতিপয় চিন্তা সহসা অশরীরী প্রেতশরীর লাভ করে এক নঙর্থক ভাবনা প্রকাশ করল ; তারপরে সেই করোটি যার দিকে তাকিয়ে এ যুগের দার্শনিক হ্যামলেট প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় অস্থের হস্তিদর্শনন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই শুকনো খুলিটা স্বগতোক্তি করতে লাগল। সর্বশেষে আবার কোরাস। এবার স্পষ্ট নয় এই কোরাসের শিল্পী কারা। আমার অনুমান, কবি স্বয়ং। কবি নিজেকে মিলিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে, খুলির সঙ্গে, প্রত্যয়-অপ্রত্যয়ের সঙ্গে, মিলিয়ে একটা সব-ছাওয়া বৈফল্যের পাড়ে উত্তরণ করেছেন।

শেষ দিককার কাব্যে নাট্যায়ন ঘুরে ফিরে আসে, কখনো গভীর ভাবে, কখনো আলগোছে, কখনো মিশ্র জটিলতায়, কখনো সহজ সারল্যে, কিন্তু কবিভাবনা প্রায়ই নাট্যায়িত। :: দুঃসময়ে মুখোমুখি:: বইখানার কয়েকটি কবিতা-ই লক্ষ্য করুন : 'আক্রান্ত হয়ে', 'এক মহিলার ভাবনা', 'ম্যাজিক', 'স্কুটার ড্রাইভার', 'কী করে লুকোবে ?' দ্বিতীয় কবিতাটি একটি ড্রামাটিক লিরিক, ঠিক মনলগ নয়, এর কোনো শ্রোতা নেই, উক্তিটি স্বগতোক্তি। একটি চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে আমাদের

সামনে, মহিলার চরিত্র ; যে মহিলার একমাত্র মেয়ে করছে স্বামীর ঘর, যাঁর নিজের স্বামী পরলোকগত —"হাড় তার/এখন মাটির নিচে ভয়ানক ধবধবে হয়ে গেছে বুঝি"—এবং স্বামীর চিন্তায় মহিলার এক অনবদ্য চিন্তা এলো মনে : "হায় যদি পারতাম হতে/লালবাহী ভেলার বেহুলা !"

মধ্যবয়সে পৌঁছে কবি এখন আধুনিক জীবনের কয়েকটি দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় পৌঁছেছেন, সেসব সমস্যার উদ্ভাস এসব কবিতায় : ইওরোপীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এগ্‌জিস্‌টেন্‌শিয়ল ভাবনা, মানুষের সত্তা, এগ্‌জিস্‌টেন্‌স্‌-বনাম-এসেন্‌স্‌—ব্যক্তির নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন, নিঃসঙ্গতা তথা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা। এবং এই সমস্তের মূলে স্থিত এক প্রশ্ন, মানুষের আইডেন্‌টিটির প্রশ্ন।—এসব প্রশ্নের ও চিন্তার এক আভাস পাওয়া যায় ভ্রমরগুঞ্জনের তুল্য পুনরাবৃত্ত ছত্রে বা শব্দে, আরেক আভাস পাওয়া যায় নাট্যায়নে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রকাশ পাই শেষদিককার কবিতার পরে কবিতায়।

ছয়

শামসুরের এই ভাবনাগুলি প্রণিধান করতে হলে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের ত্রিধারায় তৃতীয় ধারা সম্বন্ধে ভাবতে হবে—শামসুর বাংলাদেশী কবি। এই তথ্যটির সঙ্গে জড়িত আছে কতকগুলি রাজনৈতিক তথ্য তত্ত্ব, প্রত্যয়, অপ্রত্যয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে আছে, কিছু ঘটনা : মাতৃ-ভাষার জন্য বাংলাদেশীর অতুলন সংগ্রাম, নির্যাতন দেহপাত ; বাংলাদেশীর রাজনৈতিক (তথা আর্থিক এবং অন্যান্য বিষয়ক) স্বকীয়তা লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রামের নানান অধ্যায় , ১৯৭১ সালের অমানুষিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-অর্জন।

বাংলাদেশে শান্তি ও স্বস্তির অধ্যায় আজো আসেনি।

পূর্ব-পাকিস্তানি পরিস্থিতিতে যে অস্বাভাবিকতা সমাজের ও ব্যক্তিজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, তার একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়েছিল ব্যক্তিসত্তার ও লোকসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াসে। শামসুর প্রথমাবধিই এ বিষয়ে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। এই চেতনা তাঁর বাক্‌প্রতিমায় বারংবার আভাসিত হয়েছে। তাঁর পুনরাবৃত্ত প্রতিমা হচ্ছে করোটি, খুপরি, বিকট পাখির লৌহচঞ্চু, নির্জন দুর্গ, আততায়ী, কঙ্কাল, ঘাতক, ফণিমনসা এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়—যীশু। আমি গোড়ায় বুঝতে পারিনি যীশু কেন ? এখন মনে হয় Sermon on the Mount-এর যীশু নয়, ইনি হচ্ছেন অবনতশির, রক্তাপ্লুত-দেহ, কাঠেরসঙ্গে পেরেক দিয়ে সাঁটা দুই প্রসারিত হাত, crucifixion-এর যীশু, নির্যাতিত মানব, আবহমানকালের নির্যাতিত মানবসত্তার প্রতীক। এই প্রতীক শামসুর রাহমানের কবিচিত্তে দোলা দিয়েছে, এবং যদিও পরিণত কাব্যে যীশু এসেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না, হায়, তখন তো যীশুর প্রয়োজন ছিল না, তখন তো যীশু আর প্রতীক নেই, যীশু হয়ে গিয়েছিলেন norm, অসংখ্য বাংলাদেশী নাগরিকই তখন যীশু, তখন তো যাবতীয় বাংলাদেশীর মতোই শামসুরও দেখেছেন কত শতসহস্র ইন্‌ডিজেনাস্‌ যীশু !—স্ত্রী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ সতেজ তরুণ, সকলেই এই নির্যাতনা-নরকে ছিন্নভিন্ন। শামসুরের প্রথম দু-তিনখানা বইয়ে প্রচুর ব্যঙ্গ, শ্লেষ আছে, সমাজের অসত্য ও গ্লানির বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত করছেন, কিন্তু এই ব্যঙ্গ (আমার বিবেচনায়) তখনো তাঁর কবি-প্রতিভার ও কবিকৃতির অন্তরতম গভীর থেকে উৎসারিত হয়নি।

একথা তো জানি এই শতকের প্রায় শুরু থেকেই যে প্রতীকী কাব্যে ব্যঙ্গ একটি বহুজনসম্মত আঙ্গিক বলে বিচারিত হয়েছে। বস্তুত শামস্থরকে বেশিদূরে যেতে হয়নি (যদিও তিনি পাশ্চাত্য কাব্যশিল্পদর্শন সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল), বাংলাভাষাতেই বিষ্ণু দে, সমর সেন, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ে তিনি শ্লেষতীক্ষ্ণ কাব্যের স্মরণীয় নিদর্শন পেয়েছেন।

লুপ্তি ঘনায় সব দিগন্ত জুড়ে,
পাঁজর-খাঁচায় পিশাচের তাল শুনি।
কার নিঃশ্বাসে ফুলেরা ভস্মীভূত ?
নিরুপায় শুধু ধ্বংসের কাল গুনি।

এযুগের আঁধি রুখবে কি দিয়ে বলো ?
লুকাও বরং অতীতের কোনো গড়ে।
বল্লম আর সাধের শিরস্ত্রাণ
শোভা থাক আজ ঘুমন্ত যাতুঘরে॥

(:: বিধ্বস্ত নীলিমা :: ১৭ পৃঃ)

এই ছত্রগুলি বিষ্ণু দে-র অথবা স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা হতে পারত। ছন্দে, ভাবনায়, বাক্‌ভঙ্গিতে এর অনন্যতা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই শামস্থরের চিত্তে (আমি তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা জানিনে, আমি বলছি তাঁর সার্থক কবিজীবনের কথা) এসে গেছে নতুন অভিজ্ঞা, সে-অভিজ্ঞা না এলেই আমি মানুষ হিসেবে সুখী হতাম কেননা সে এক মর্মন্তুদ প্রায় অবমানুষিক অভিজ্ঞার প্রদেশে পড়ে গেলেন শত শত স্বদেশবাসীর সঙ্গে শামস্থর রাহমানও। উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থটির প্রারম্ভে একটি কবিতা আছে :

জোহরাকে

ভীষণ অস্থির আমি, সম্প্রতি ক্ষমায় অপারগ।
সদর রাস্তাকে ভয়, ঘোরালো সিঁড়িকে ভয়—কী যে এই রোগ।
...　　...　　...
শিউরোনো অন্ধকারে ভীতি
ওৎ পেতে থাকে, যেন জলন্ত চোখের পশু, পাই না প্রতীতি
কিছুতেই : চতুষ্পার্শে সব কিছু যাচ্ছে ধ্বসে। "এখন এখানে
পাতি পাতি কী খুঁজছো শামস্থর রাহমান ?"—বলে' কেউ বিনষ্ট বাগানে
চলে যায়। প্রাণপণে ডাকি, নিরুত্তর সে উধাও।
জনহীনতায় শুধু নিজেরই ভয়ার্তস্বর বাজে, "সাড়া দাও।"

এ হচ্ছে আধুনিক সাহিত্যের (মানে গত একশো বৎসরের বিশ্বসাহিত্যের) এক পুনরাবৃত্ত প্রতীক-প্রতিমা, ভূগর্ভস্থ তমসাচ্ছন্ন, বহুবঙ্কিম বিবর। ডস্টয়েভ্‌স্কির বিবর থেকে শুরু হয়ে এই বিবর-প্রতিমা আধুনিক জীবনের নিরন্তর শঙ্কাবেষ্টিত উৎকণ্ঠা-নিস্পেষিত মানবাত্মার প্রতীক। কাফ্‌কার জগৎ,

গ্রেহাম গ্রীনের ও হেন্‌রি গ্রীনের জগৎ, জাঁ মালকেইয়ের, জর্জ অরোয়েলের জগৎ।

At my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear,
A rat crept softly through the vegetation
Dragging its slimy belly on the bank

(T.S. Eliot, 'The Fire Sermon')

এই অবপ্রাকৃত বিভীষিকা শামসুর রাহমানকে (এবং যে কোনো সদন্তঃকরণসম্পন্ন বাঙলাদেশীকে) তাড়না করেছে বৎসরের পরে বৎসর। এমন বিভীষিকায় জীবনানন্দ আচ্ছন্ন হননি অথবা এপারের কোনো চল্লিশের দশকের কবি হননি কেন না কণ্ঠে তাঁদের যে পারিপার্শ্বিকের মালা, সে-মালাই স্বতন্ত্র বস্তু। শুধু শামসুর রাহমান নয়, বিগত পঁচিশ বছরের, বিশেষত বিগত দশ-পনেরো বছরের যে কোনো সৎ ও মেধাবী বাঙলাদেশী কবির প্রেরণামূলে এমন কিছু প্রভাব কাজ করছে যা নিছক তাঁদের বাঙালীত্ব এবং বাঙলাভাষিত্ব দিয়েই নিরূপিত হয় না, তাঁদের বাঙলাদেশী অভিজ্ঞতাও এই নিরূপণের শামিল হবে। সেই অভিজ্ঞতার এক অংশে আছে এই নিরবিচ্ছিন্ন বিভীষিকা: সংশয়, উৎকণ্ঠা, সন্দেহ, শঙ্কা—

রেখেছি কাকতাড়ুয়া দিকে দিকে মনের জমিনে,
তবুও ভয়ের প্রেত যাচ্ছে না আমাকে ছেড়ে। রোজ
বেলাশেষে ক্লান্ত লাগে, ক্লান্ত লাগে, ক্লান্ত লাগে ; ভয়,
হিস্‌ হিস্‌ ভয়
দারুণ হাইড্রা ভয় এই
কণ্টকিত সত্তা জুড়ে রয় সারাক্ষণ।

(:: ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা :: 'ভীত চিহ্নগুলি')

এই বিভীষিকা নিছক মনোবিকলন নয়। যে সব বাঙলাদেশী এই সদা-উচ্চকিত শঙ্কায় বিকলচিত্ত হয়েছেন তাঁরা আদৌ কোনো বিকারগ্রস্ত নন, তাঁদের শঙ্কা অতীব বাস্তব, প্রত্যক্ষ। এই পরিস্থিতিতে শামসুর রাহমান একটি কবিতা লিখেছিলেন যার তুলনা আমি স্বদেশে বা বিদেশে পাই না, পাই না কেননা এই কবিতার বাস্তব পরিবেশটি সম্পূর্ণ তুলনাহীন।

আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্তগোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,

আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু সেই সব পশুদের।

আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খান দজ্জালদের।
... ...
অভিশাপ দিচ্ছি এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে, বিশ্রামের
কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে
দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা প্রেতায়িত
সেই সব মুখের ওপর
দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট।
অভিশাপ দিচ্ছি।
অভিশাপ দিচ্ছি,
অভিশাপ দিচ্ছি··· ('অভিশাপ দিচ্ছি')

সুঠাম বাক্‌সৌন্দর্য নেই এ কবিতায়, আছে তার চেয়েও চিরস্থায়ী গুণ—অতল তীক্ষ্ণ বিমথিত আবেগ। সেই বিমথিত বিধ্বস্ত আবেগের আরো একটি নিদর্শন দেখুন :

কী আমরা হারিয়েছিলাম সেই সন্ত্রস্ত বেলায়
নিজ বাসভূমে ?
কী আমরা হারিয়েছিলাম ?
নৌকোর গলুইয়ের শান্তি, দোয়েলের সুরেলা দুলুনি,
ফসলের মাঠের সম্ভ্রম,
শহরে পথের পবিত্রতা,
আর গাঙচিলের সৌন্দর্য
আর অভিসারের প্রহর,
কবিতার রাত,
দিগন্ত-ছোপানো
গোধূলির রঙ
—সব কিছু হারিয়েছিলাম। ('রক্তসেচ')

হারিয়েছিলেন সব কিছু, এবং হারানোর নিষ্পিষ্ট বেদনায় শামসুর রাহমান তাঁর বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে বেরিয়ে পড়লেন প্রশস্ত মহৎ সামাজিক ব্যক্তিত্বে। ইওরোপীয় চিন্তায় এগ্‌জিসটেন্‌স-এর যে মাহাত্ম্য কল্পিত হয়েছে তারও উর্ধ্বে বিদ্যমান এক এসেন্‌স্। এই এসেন্‌স্ সম্মুখ

ধর্মীয় সত্তায় যদি প্রত্যয় না-ও রাখি, মানবিক সত্তায় প্রত্যয় রাখতেই হবে, নতুবা কেবল দেহধর্মের ভঙ্গুরতায় আমরা বিকৃত হয়ে পড়ব। মানুষকে উপরে উঠতেই হবে, মানবাত্মার উর্ধ্বতন সঙ্গীত গাইতেই হবে, গাইতে হবে—যেমন, শামসুর গেয়েছেন—গলুইয়ের শান্তি, ফসলের সম্ভ্রম, গাঙচিলের সৌন্দর্য, গোধূলির রং। এই গান যিনি গেয়েছেন তিনি আর বিবরাশ্রিত বিভীষিকা-ক্লিষ্ট নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন সত্তার অধিকারী নন। 'আজ সবার রঙে রং মেলাতে হবে'। এই মেশানোর ফলে সত্তা একক থাকে না, হয়ে যায় বহুব্যাপক। যে-কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে তার ছত্রগুলিতে আরো এগিয়ে যাই :

টিক্কার ইউনিফর্মে শিশুর মগজ,
যুবকের পাঁজরের গুঁড়ো,
নিয়াজীর টুপিতে রক্তের প্রস্রবণ,
ফরমান আলীর টাইয়ের নটে ঝুলন্ত তরুণী…
তুমি কি তাদের
কখনো করবে ক্ষমা ?—সেদিন সমস্ত গাছপালা,
এই প্রশ্ন দিয়েছিলো ছুঁড়ে চরাচরে।

এই প্রশ্ন তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রশ্ন' শীর্ষক কবিতায় :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

এহেন প্রশ্ন তোলা হয় মানবতার, মানবজাতির প্রসঙ্গে, একক মানুষের প্রসঙ্গে নয়। নিঃসঙ্গতা থেকে সর্বসঙ্গী মানবতার বোধে যখন শামসুর উত্তীর্ণ (উত্তীর্ণ শব্দটিতে উর্ধ্বগতির ইঙ্গিত আছে) হলেন, তখন এক আশ্চর্য নাট্যান্বিত স্বরূপের জবানিতে বললেন :

ভদ্র মহোদয়গণ, এই যে আমাকে দেখছেন
পরনে পাঞ্জাবি, চুল মসৃণ ওলটানো, এই আমার মধ্যেই
ছিলো বিস্ফোরণ,
আমার মধ্যেই
ট্যাংকের ঘর্ঘর,
জননীর আর্তনাদ, পিতার স্তম্ভিত শোক, বিধবার ধুধু
দৃষ্টি আর কর্দমাক্ত বুট, সৈনিকের কাটা হাত,
ভাঙা ব্রিজ, মুক্তিবাহিনীর জয়োল্লাস,
আমার মধ্যেই ছিলো সব।

আমার মধ্যেই ছিলো সব। শামসুর রাহমান এখন আর বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নেই, এখন তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন, অথবা নিজের মধ্যে সংহত প্রতীকিত করেছেন সমগ্র বাঙলাদেশের দুঃস্বপ্নময়ী রজনীর অগ্নিপরীক্ষা। বড়োই মর্মান্তিক এই পরীক্ষা, এই স্বাধীনতা-অর্জন ; কিন্তু তবুও স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা মুছে ফেলে ব্যাপক নরক।
যেখানে পা রাখি আজ সেখানেই মেলা
মুখর প্রাণের এই দীর্ণ বাংলাদেশ। ('এই মেলা')

সাত

কোনো শিল্পই, কোনো শিল্পীই পুঞ্জীভূত নেতিবাদে আবদ্ধ থাকতে পারে না। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' কিন্তু তার ওপারও আছে, এবং মানব অবশ্যই সেই ওপারের পানে তাকাবে। শামসুরের এই অস্মিতাজ্ঞান তাঁর কাব্যের প্রথম থেকেই। যদিও বলছেন, 'প্রতীতি আসেনি আজো' (:: বিধ্বস্ত নীলিমা :: ৩১); আবার বলছেন, 'আবার আমার আত্মা নতুন জন্মের প্রতিভায়/হ'তে পারে নিবিড় বাগান' (:: রৌদ্রকরোটিতে :: ৫৪), বলছেন, 'এ আগুন আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু/কী করে জানি না' (:: এক ধরনের অহংকার :: ৬৭), এবং যদিও জেনেছেন যে মানবেতিহাসে আবার এসেছে মুষলপর্ব, যদিও কোথাও দেখা যাচ্ছে না মহাভারতে-কথিত দুর্গম পথের যাত্রী সেই একা কুকুরের ছায়া, তথাপি সংশয় আর নিশ্চয়তার, বিচ্ছিন্নতার ও সর্বজনীনতার, ভীতির ও সাহসের, অপ্রেমের ও প্রেমের দীর্ঘ দোলাচলের পরে নিজ দেশের বন্ধুর ইতিহাস থেকে শামসুর রাহমান জেনেছেন যে কথা তাঁর পূর্বসূরী বলেছিলেন :

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়। (জীবনানন্দ, 'সময়ের কাছে')

ছিনতাই

আবু রুশদ্

শুক্রবার বিকেলের এলিফ্যাণ্ট রোড। চলমান পথিকের সংখ্যা কম তবে মোটরগাড়ির বেহায়া বিজ্ঞাপন নূতন-বিজ্ঞানের প্রকোপ প্রকট করে তুলেছে। ক্রীম রঙের ২০০ মার্সিডিজ-এ উৎকট হলুদ রঙের পর্দা ভেতরের আব্রু রক্ষা করবার জন্ম যেন কোন অনাচার-ক্লিষ্ট মনের উদ্ভাবন। সত্ত আমদানি করা এক চকোলেট রঙের টয়োটায় রেডিওর অস্তিত্ব বাইরে লতার মতো হেলানো নূতন কালো এরিয়ালে অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট।

চালক, দেখা যায়, বেশির ভাগই নবীন যুবা। তবে কোন্ বেকুবে বলবে বাঙালী তরুণের নম্রতা বা সৌজন্ম তাদের চেহারায় বা দৃষ্টিতে। পরিপুষ্ট মুখে এক বেলুচী কাঠিন্য; হিপি জুলপি ও আকস্মিক ভল্লুক-গুম্ফে এক আন্তর্জাতিক চমক ও আরণ্যক সংকল্প তাদের সহজেই দৃষ্টি-গ্রাহ্য করে তুলেছে।

বিপণির নামকরণে কিন্তু বাঙালী উচ্ছ্বাস। যদিও বিদেশী সওদা তাদের মালিকের সমকালীন বৈষয়িক ধূর্ততার নমুনা। কী চান আপনি, বলেন? মুদ্রাবান হলে প্রায় সব-কিছুই পাবেন। 'বুটিক'-এর শার্ট, অভিজাত টাই, ইয়ার্ডলি সাবান, রেভলনের লিপস্টিক, নিখুঁত এক আধুনিক ডিজাইনের আরামকেদারা, টেলিভিশন, ক্যামেরা, রেকর্ড প্লেয়ার, থ্রি ইন ওয়ান, জর্জেট শিফন মাদ্রাজী শাড়ি।

আর আপনার সচ্ছল সংসারে যদি কঠিন অসুখে পড়ে কেউ রুচিবিকৃতির পরিচয় দিয়ে থাকেন, ঘাবড়াবেন না। দুর্লভতম ওষুধটাও পেয়ে যাবেন। সব দোকানে নয়। দু-একজন কেমিস্টের নাক এখনও একটু উঁচু রয়ে গেছে। তারা দামের ব্যাপারে বেশি এদিক ওদিক করতে পারে না। তবে বাঘাটে কেমিস্টও পাবেন যিনি সে-ওষুধটা সহাস্যে আপনাকে দেবেন যদি আপনি হাসিখুশি ধরনের দাম দিতে রাজী হন আর কথা বেশি না বলেন।

মাঝখানের ও আশেপাশের বস্তিগুলোই বিপাক বাধায়। বদ্ধ নর্দমায় কীট-কলোনির মতো তারা কিলবিল করে। কোনই সুঠাম ভাব নেই বা আলাদা এক আকৃতি। ইত্যাদি ও প্রভৃতির মতো চুলকানি ও পাঁচড়া ও উকুন ও ন্যাকাটি পেটের ঝোলায় তারা নামহারা। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'ও তারা বোধ হয় চোখ তুলে কখনও দেখে না।

পি. জি. হাসপাতালের দালানে নূতন বিপণি-বিতান পটুভাবে পট বদলায়। ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল-এ কোন বিদেশী আগন্তুকের কক্ষে কিছু আমোদিত প্রহর কাটিয়ে অষ্টাদশী রাহেলা বা সালেহা বা জমিলা বিলাসী পণ্যের দিকে নূতন সম্ভাবনায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেউ বা সাহস করে ভিতরে ঢুকে দু-একটা পছন্দসই সওদার দাম করে—গ্রামীণ কলহাস্য ও বিদেশী আগন্তুক-অভিনন্দিত পাছার দোলানি বাইরের পথচারীকে উপহার দিয়ে।

তবে কেন্দ্রীয় এক ঘটনার মতো পথের বাঁকটা প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পরে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। শাহবাগ অ্যাভিনিউর মাঝখানের ফোয়ারাটা বিকল হয়ে পড়েছে।

ভরাপানি যা আছে তা সন্ধ্যায় বিজলীবাতির বিচ্ছুরিতে খোলতাই হবে, তবে বিকেলের রোদে একটু গন্ত-গন্ত ভাব। অধিকাংশ যানবাহন কোনও কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোমহর্ষক দ্রুততার চলন অব্যাহত রেখেছে, তবে ডানদিকের একশ গজ জুড়ে মোটরগাড়ি বাস বেবী ট্যাক্সি রিকশা এক অস্বাভাবিক ব্যাসের সৃষ্টি করেছে। তাদের আরোহী ও চালক প্রত্যেকের মুখে আশু এক কর্মতৎপরতার কঠিন সংকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে জটলা করে পথচারীরা এসে জড়ো হয়ে সে ব্যাসের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলছে ও আসন্ন নাটকের পটভূমি তৈরি করছে।

—না! এর একটা বিহিত করতেই হবে, এটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। পুরু কালো ফ্রেমের চশমা পরা মাস্টারি চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক চোখের ঈষৎ-রক্ত তারাকে রাগের দ্যোতনায় নেকড়ে-কুটিল করে বলে।

সর্দির তাড়নায় নাক থেকে অবিরত পড়া নোনতা পানিকে কিছুটা জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে কিছুটা হাত দিয়ে মুছে এক মিশকালো রিক্শা-চালক অনির্দেশ্য এক লোকের দিকে অব্যবহৃত বাঁ হাতটা বাড়িয়ে কী এক কল্পিত তামাসায় হাসতে থাকে আর হেঁক হেঁক করে হেসে শিক্ষিত বাঙলায় বলে: ধর শালাদের ধর, পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে দে, শালারা হাইজ্যাক করার তালে আছো, হারামির পোলা।

ততক্ষণ বেশ প্রশংসনীয় তৎপরতা ও নিপুণ পন্থায় ছিনতাইয়ের কাজটা সম্পন্ন হচ্ছিলো। এক ছোট্ট ছাইরঙের ফিয়াট থেকে নেমে তিনজন তরুণ মিলিটারি ধরনে গুরুত্বপূর্ণ কোণগুলো দখল করে এক ল্যাণ্ডরোভারকে থামায়। তারপর দরজাটা অনুশীলিত দ্রুততার সঙ্গে খুলে ড্রাইভারকে মস্ত এক হ্যাচকা টানে নামিয়ে পাশের আরোহীর হাত থেকে মাঝারি ধরনের এক স্যুটকেশ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে পেছনের আরোহীর কাছ থেকে আচানক বাধা পায়। পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রিয়া সম্পাদনায় আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি এমন এক বাধা পাওয়ায় তরুণটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায়, যেন দৈনন্দিন এক অনুত্তেজিত কাজ করছে, স্টেনগান উঠিয়ে পেছনের আরোহীকে তাৎক্ষণিক পটুতায় গুলি-বিদ্ধ করে স্যুটকেশটা পেশাগত স্বাচ্ছন্দ্যে ছিনিয়ে নেয়: তার লোম-ধনী হাতটা স্যুটকেশবহনকারী জিন্দা আরোহীর হাতে লাগলে হস্তা কাপুরুষ নাগরিক খরগোশের মতো কাঁপতে থাকে। তিন মিনিটে নিজেদের কাজ সেরে তিনজনই চারপাশে জমা পথচারীদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ফিয়াটে চড়ে ঢাকা ক্লাবের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে সবেগে ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের দিকে ধাওয়া করে, কিন্তু হঠাৎ একটা টায়ার ফেটে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গাড়ি ফেলে রেখে দুজন রমনা পার্কের দিকে আর একজন সোহরওয়ার্দি উদ্যানের দিকে দৌড় দেয়।

এদিকে ল্যাণ্ডরোভারের পেছনের সীট নিহত আরোহীর রক্তে কালচে লাল হয়ে ওঠে আর ড্রাইভার ও তার পাশে-বসা আরোহী কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কৌতূহলী ও ক্ষিপ্ত জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

কে একজন জিজ্ঞেস করে,—স্যুটকেশে ছিলো কী সাহেব?

—টাকা। ড্রাইভারের পাশে-বসা আরোহীটা ঘোলা চোখে বিশেষ কারুর দিকে না চেয়েই বলে।

—টাকা নয়ত কি মার্বেল ছিনতাই করতে এসেছিলো? টাকা ছিলো কত?

—তিন লাখ।

—কী মজা, শালা আমি পেয়ে গেলে ধানমণ্ডিতে একটা বাড়ি কিনে ফেলতাম। তারপর আমার ঠাট দেখে কে!

কোন এক কোনা থেকে ছুঁড়ে মারা এই বিদগ্ধ মন্তব্যে সমবেত জনতার মধ্যে আমোদের এক সাময়িক হিল্লোল খেলে যায়।

দূর থেকে একজন চিৎকার করে বলে: সুটকেশ হাতে ছোকরাটাকে দেখতে পাচ্ছি। রেস কোর্সের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি চললাম শালাকে ধরতে। আপনারাও আসুন।

আর নিমেষে ওলটপালট কাণ্ড। জনতার প্রায় সকলে লোকটার দিকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়। শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না, চলন্ত এক মোটর প্রচণ্ড আকস্মিকতায় ব্রেক কষে বিকট এক শব্দ করে থেমে পড়ে, ঠেলাঠেলিতে কয়েকজন রাস্তা থেকে ছিটকিয়ে ফুটপাথে নিক্ষিপ্ত হয়। হাঁচিতে গর্জনে হাসিতে ও তড়িৎ বেগে নিজেদের সম্মিলিত বাড়ন্ত রাগকে এক মানবীয় মুখোশ পরতে দেয়।

—কোথায়, কোথায় লোকটা?

—ওই যে। হাতে সুটকেশ দেখছেন না।

—সুটকেশ দেখছি, তবে লোকটার তাড়া আছে বলে মনে হয় না। স্থির গতিতে চলেছে।

—হারামজাদার হাতে স্টেনগান আছে, তাই অত সাহস। ওরই স্টেনগান দিয়ে এবার ওকে মারবো। এবার দেখি তুমি কোথাও পালাও।

বর্ণালী সব হাওয়াই শার্ট আলোতে চমকায়। মাথার চুল ঝুলপি গোঁফ, পায়ের বিবিধ আকৃতি, দৌড়বার বিভিন্ন ধরন, পায়জামা প্যান্ট ও লুঙ্গীর উঠতি-পড়তি হাঁপানি ও হিক্কা-বিকেলের বিশেষ নম্রতায় ও স্মিত প্রাঙ্গণের বিস্তারে তামাটে শালগাছের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ও সামনের মন্দিরের চূড়ার আশ্বাসে সহসা এক কেন্দ্রীয় অর্থে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

জনতা সামনের দিকে প্রচণ্ডভাবে-উত্থিত এক সামুদ্রিক ঢেউ-এর মত এগুতে থাকে। তার বিস্তারিত ও বলবান বাহুতে যেই আটকা পড়ুক না কেন ভয়াল ক্ষিপ্রতায় সে অমোঘভাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—ধর শালাকে ধর, এবার দৌড়াতে আরম্ভ করেছে। দেখি কত দৌড়াতে পারে।

হঠাৎ তাকে কেন্দ্র করে নিত্য-বাড়ন্ত এক জনতার মারমুখী অভিযান দেখে যুবকটা একেবারে হকচকিয়ে যায় আর নিজের স্বাভাবিকত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে উন্মাদের মত দৌড়াতে থাকে। আচানক ভয়ে তার নাড়ী পর্যন্ত ক্রিয়ারহিত হয়ে যায়, সম্বিত তো সন্ত্রাস্তভাবে আলাদা।

কিসের জন্ত জনতা তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে খেঁচিয়ে মারমুখী হিংস্রতায় এগিয়ে আসছে। সে করলো কী! তার ঘর্মা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। তার মাছুম চোখ অব্যক্ত এক আশঙ্কার ভরে গিয়ে তাকে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্বহীন এক ত্রাসে রূপান্তরিত করে। তার বুকের লৌহ-পিঞ্জরে তার তড়পড়ানো হৃদয় কিছুটা স্বস্তি পাবার জন্ত কেমন আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

তাকে কি ঠাহর করেছে জনতা? চোর, পকেটমার। তাকে মারবার জন্য ছিঁড়বার জন্য ক্ষিপ্ত জনতা হাজারে হাজারে তার পেছনে ধাওয়া করা আরম্ভ করে দিলো কিসের প্ররোচনায়? যুবকের স্বাভাবিক চিন্তা-ক্ষমতার কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। পা-টা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আসতে চায়। আক্রমণের কারণ একেবারে জানা না থাকায় বোধহীন আতঙ্কে যুবকের উচ্চকিত চেতনা ভরে যায়।

—আপনারা সকলে আমাকে তাড়া করছেন কেন? আমি তো কিছু করি নাই। জাগ্রত আশায় মন্ত্রণায় যুবক জনতার ন্যায়বোধের কাছে আবেদন করা মনস্থ করে।

—কিছু করে নাই! কিছু করে নাই! শুধু একটা লোককে খুন করেছে আর স্যুটকেশে তিন লাখ টাকা নিয়ে পালাচ্ছে।

—স্বাধীনতা পেয়েছো বলে শালা লোক খুন করবে, বাহনচোদ টাকা ছিনতাই করবে। তোমাকে মেরে একদম গুড়গুড়িয়ে দিবো না।

—অনেক সয়েছি, আর না। কেউ যখন কিছু করবে না, আমরাই এর বিহিত করবো।

বাড়ন্ত রোষের তাড়নায় জনতা দ্রুততর গতিতে ধেয়ে যুবককে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো যদি মাঝখানে জনতার একাগ্রতায় আকস্মিক এক ছেদ না পড়তো।

রমনাপার্কের কাছ থেকে কোলাহল ও গুঞ্জন এই পর্যন্ত ভেসে আসে আর তামাটে শালগাছ হঠাৎ আগুনের হলকায় সাময়িক এক রোশনাই ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য আগুনের তাপে কিছুটা জ্বলতে থাকে।

দূর থেকেও জনতা দেখতে পায় পরিত্যক্ত মোটরগাড়িটা আশেপাশে আগুনের লেবাশ পরে মাঝখানে একেবারে পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। সে দৃশ্যই জনতার একাংশের কাছে বেশী নয়নাভিরাম মনে হয়। হল্লা করতে করতে তারা সে-দিকে ছুট দেয়। কিন্তু জনতার সামনের সারি নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় না। কলগুঞ্জনে ও পরিত্যক্ত মোটরটাকে আগুনে পুড়তে দেখে তারাও অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য পেছন ঘুরে চেয়েছিলো তবে মানুষ-শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরায়। সেই অবসরে যুবকটা প্রায় পাঁচ শ গজ দূরত্বের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধান রচনা করতে পেরেছিলো। তা দেখে ধাবমান জনতা আরও দৃঢ়সঙ্কল্প ও ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকের দিকে বিপুল বিক্রম ও বেগে এগুতে থাকে।

জনতার আকস্মিক নীরবতা ও পাগলা ঢেউ-এর মত উল্লসিত অগ্রগতি যুবককে আবার নূতন করে তার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সন্ত্রাসের সঙ্গে সচেতন করে তুলে। তার মাথার চুল বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে তার ধাবমান ও ত্রাস-পিষ্ট শরীরের স্পন্দিত নীড় হয়ে; তার ছানাবড়া চোখ দুটা আসমানের অঙ্গনের দিকে চেয়ে খামাখাই কার যেন করুণা ভিক্ষা করছে।

আর ঠিক সে সময় ঘুঘু দেয় এক ডাক। বড় উদাস মধুর। ভেতরের কোন খবর যেন দিতে চায় অতীতের অনেক বিচ্যুতির ডাকহরকরা হয়ে।

যুবক তখন নিশ্চিত বোঝে তার আর পরিত্রাণ নেই। উন্মত্ত বক্তৃতায় মরণ-ছোবল মারবার জন্য ভুল নিশানার দিকে তারা ধাওয়া করেছে, এই যুক্তির কথা বলে জনতাকে এখন নিরস্ত্র করা

যাবে না। পুরো দম দেওয়া এক যন্ত্রের মত ছাড়া পেয়ে তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মত কোন মাষ্টারী হাত কোথাও দেখা যায় না।

তবু যুবক একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। উচ্চলম্ফনে অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব দেখিয়ে যুবক বেড়াটা এক ফুট ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যায়। বাঙলা একাডেমি এখন প্রায় মুখোমুখি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশেই শিল্প ও চারুকলার মহাবিদ্যালয় তার অস্তিত্বকে মৃদুভাবে জাহির করছে। সেখানেই সে যাচ্ছিলো নাসিমার সদ্য-সমাপ্ত প্রতিকৃতি নিয়ে। লম্বা বাদামী রঙের প্লাষ্টিকের ব্রিফ কেসটা এখনও হাতে রয়ে গেছে। সেটা পালাবার এক অতিরিক্ত কারণ। প্রতিকৃতিটা যেমন করেই হোক একবার নাসিমাকে দেখাতে হবে। একই মহাবিদ্যালয়ে নীচু ক্লাসে পড়া এই মেয়েটিকে যুবকটি কোন গণিতের ধারায় না গিয়েই হৃদয়মন দিয়ে বসে আছে। বড় জনপ্রিয় নাসিমা। প্রায় সব ছাত্র আর দু-একজন মাস্টারও তার পেছনে হরদম ধাওয়া করছে। কিন্তু গত সপ্তাহে নাসিমা যুবকের হাতে এক গোলাপফুল উপহার দিয়েছিলো। আজকে তার প্রতিকৃতি নাসিমাকে দিয়ে চমকে দিবে বলে যুবকের বড় সাধ ছিলো।

নাসিমা বলেছিলো প্রায় প্রতি ভোরে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ধানমণ্ডি লেকের দিকে বেড়াতে যায়। তাই একদিন ভোরের আজানের পর পরই তাদের টিনের বাসা থেকে বেরিয়ে যুবকটি ধানমণ্ডি লেকের দিকে পুরো পথ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হেঁটে এসেছিলো।

দেখাও হয়েছিলো। নাসিমার বান্ধবীটি সুলোচনা বটে তবে কালচে পাড়ের হালকা পীতরঙের এক শাড়িতে নাসিমাকে জবর দেখাচ্ছিলো। ভোরের হাওয়া তখন আবার একটু ইয়ারকি দেওয়া আরম্ভ করেছে। আর এক কোকিল মুখ খুলবার পরে অন্য এক বেল্লিক কোকিল তার সঙ্গে তাল রেখে ভোরের বাড়তি-আলোর আসমানকে অঢেল সুধায় ভরে দিয়েছিলো। আর সম্রাট-সূর্য পুরন্ত লালিমায় আসমানের এক কোণকে একেবারে বশ করে ফেলেছিলো।

নীরব ছোবলানিতে দলিত মর্দিত হয়ে জনতা অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে। শরীর আর যুত পায়না, পা আর উঠতে চায় না। শুধু নাসিমার পরিপুষ্ট স্তন চোখের সামনে পরিষ্কার রেখায় ভেসে ওঠে। যেন তাতে সমস্ত পিপাসার সমাধান, মোক্ষম এক শান্তি।

পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। চালককে ভদ্র ও সদাশয় মনে হয়। মরীয়া হয়ে তার সামনে শেষ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে যুবকটি গাড়িটাকে থামায়। চালককে আশু আবেদনের সমস্ত আর্তি দিয়ে বলে : আমাকে একটু উঠতে দেন, নইলে ও লোকরা আমাকে খামাখাই মেরে ফেলবে। বিশ্বাস করুন, আমার কোনই দোষ নেই। আমাকে না বাঁচালে আমার মা-বাপ বড় কষ্ট পাবে।

হুঙ্কার দিয়ে জনতা ছুটে আসছে।

চালকের পাশে বসা তরুণী সহোদরার মমতায় বলে,—নাও না তুলে, দোষ যদি কিছু করে থাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হবে।

—পাগল হয়েছো! তাহলে ওরা আমাদেরকেও পিটিয়ে শেষ করে দিবে।

যুবকটি গাড়িটা দ্রুত চলে যেতে দেখে আর এই প্রথমবারের মত পিঠে কার যেন স্পর্শ লাগে। তার পরেই জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে।

যখন তার শরীরের উপর দিয়ে এক এক করে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটে যায় তখন যুবকটি চরম বোধনের অপ্রাসঙ্গিকতায় ভাবে...

ব্রিফ কেসটা ছিঁড়ে তচনচ হয়ে গেছে, যুবকের মগজের কিছুটা কিন্তু নাসিমার ভুড়মুড়ানো প্রতিকৃতির সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব পেয়েছে।

—এ যে দেখছি মেয়ের এক ছবি, টাকা কই? জনতার একজনের আর্ত জিজ্ঞাসা। আর একজন অনেকটা অনিশ্চিত ধরনে মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে: শালা কারে পাকড়াও করলাম কে জানে। শালার বিচিটা যখন ছিঁড়ে দিচ্ছিলাম বাবু বলে কি: ছেড়ে দাও ভাই, বড় ব্যথা লাগে। আরে আমি শালা ওর ভাই হলে তার ওই জিনিসটা ছিঁড়তে যাই নাকি? বেটা অগারাম কোথাকার!

রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আঁকবার প্রবণতা মানুষের সহজাত না হলে প্রাক্‌সভ্য মানুষের গুহার গায়ে, অথবা অক্ষরপরিচয়ের পূর্বেই শিশুর আঁকবার চেষ্টাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অথচ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে শিশুদের যে ব্যাপক শিক্ষার আয়োজন ছিল তাতে, আশ্চর্যের কথা, চিত্রাঙ্কন ছিল উপেক্ষিত। "ছেলেবেলা"য় রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি আছে, 'আমার বিদ্যা ছেলেবেলা থেকেই শব্দের মাধ্যমে হয়েছে, রেখাঙ্কনে নয়।' চিত্রবিদ্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের প্রমাণ পাই ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে। উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ মনের কন্দরে সুপ্তাবস্থায় ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকাশ উক্ত পত্রে, 'আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বলতে হয় তবে এটি স্বীকার করতে হয় যে ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধদৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুর্ভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' ("ছিন্নপত্র")

উদ্ধৃতিতে যে অনুশীলনের কথা আছে নিঃসন্দেহে সেটা প্রযোজ্য। বোধ হয় এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি শৈশবে অশিক্ষিত হস্তে চিত্রাঙ্কনে রত না হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই জ্ঞানটুকুই অর্জিত হয়ে যায় যে চিত্রবিদ্যা সকলের জন্য নয়। সময়ে রঙিন খড়ি, রঙিন পেন্সিল, রঙের বাক্সকে বিদায় দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সৃজনপ্রবণতা এর বিপরীতমুখী এবং এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। তুলি টেনে তিনি হয়রান হননি, অবচেতনে সঞ্চিত ইচ্ছা জীবনের শেষ পর্বে অতুল সমারোহে সেই প্রবণতা বিকশিত হয়েছে। কোনোকালে মুকুলিতবয়সী না থেকেই তাঁর চিত্র পূর্ণ প্রস্ফুটিত। চিত্রকলার ইতিহাসে অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয় যেখানে সুপ্ত প্রতিভার প্রথম বিকাশ পরিণত বয়সে হয়েছে। কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে (ভিঞ্চি, গ্যয়টে, ব্লেক ব্যতিক্রম) অন্যতর সৃজনপ্রতিভা ছিল না। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং সুরসৃষ্টিতে এমনভাবে বিভোর ছিলেন যে চিত্রবিদ্যার প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ প্রকাশিত হতে পারে নি। চিত্রবিদ্যার প্রতি যৌবনকালের লুব্ধদৃষ্টি একান্ত সঙ্গোপনে সচেতন মনের অজ্ঞাতসারেই লালিত হয়েছিল। শিল্পসান্নিধ্যের জন্য তাঁর পরিবারের বাইরে যাবার প্রয়োজন ছিল না। পরিবারের অথবা বাইরের কোনো শিল্পী তাঁকে উৎসাহিত অথবা দীক্ষিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যপ্রতিভা এবং সংগীতপ্রতিভাই হয়তো সেই উৎসাহে বাধা দিয়েছে। যেভাবে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে লিখতে উৎসাহিত করে বলেছিলেন যে রেখে দেবার জন্য তো তিনিই আছেন, তেমন সাহস কোনো শিল্পীর পক্ষে কবিকে জানানোই দুঃসাহসিক কাজ হত। কবির সৃজনপ্রতিভা অন্যদের পক্ষে অন্তরঙ্গ হবার পক্ষে ছিল অন্তরায়।

যদি গগনেন্দ্রনাথ, এবং ধরা যাক অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে চিত্রবিদ্যার প্রাথমিক পর্বে সাহায্য করতে অগ্রসর হতেন তাহলেও সেই সাহায্য তিনি গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ হতেন কিনা বলা যায় না।

চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ একবার নন্দলাল বসুকে হাতপায়ের কমনীয় স্কেচ এঁকে দিতে বলেছিলেন কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি ; কারণ, নিজস্ব পথ পরিত্যাগ করে অন্যপথে চলা অসম্ভব ছিল। যাঁর সাহিত্যকৃতিতে লাবণ্য ও কমনীয়তার ঐশ্বর্য অফুরন্ত, তাঁর চিত্রসৃষ্টিতে সেগুলিই অবর্তমান।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ক্রমাগত বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন। প্রকাশের এমন সম্পূর্ণতা দুর্লভ। বহুবার তিনি বলেছেন যে প্রকাশের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের মুক্তি। সুতরাং চিত্রকর হিসাবে নিজেকে নতুন করে প্রকাশ করেই তিনি মুক্তিপথে অগ্রসর হয়েছেন। চিত্রবিদ্যা তাঁর শেষবয়সে অর্জিত এবং পরিহাস করে একে বলতেন তাঁর তৃতীয় পক্ষ। বিপুল পরিমাণে ও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে সত্তর বৎসর বয়সেও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অপ্রতিহতগতি, যদিও সুরসৃষ্টিতে তখন ভাঁটার টান। চিত্রসৃষ্টি অনেকটা সুরসৃষ্টির স্থান নিয়েছিল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের এই যে তৃতীয় পক্ষ, তার প্রতি সাধারণ বাঙালীর ততটা মমত্ব বা আত্মীয়তা নেই। কারণ অবোধগম্য নয়। নূতনের প্রতি আকর্ষণ শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো দেশেই এবং কোনো কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা অভিনন্দিত হয় না। কমই থাকে যতদিন না রসজ্ঞ সমালোচক নবীন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সাধারণকে দেখিয়ে দেন এবং দেখতে দেখতে দর্শকচক্ষু অভ্যস্ত না হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের এবং রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধিতেও সময় লেগেছে। পড়তে পড়তেই পাঠক তৈরী হয়, শুনতে শুনতে শ্রোতা এবং দেখতে দেখতে দর্শক। যথেষ্ট সংখ্যক চিত্রানুরাগী না হওয়ার প্রধান কারণ অধিকতর সংখ্যায় ছবি না দেখা। সাধারণ বাঙালীর ছবি দেখার অভ্যাস তত জাগ্রত নয়। ছবি দেখতে হলে শারীরিক স্থানান্তরণের প্রয়োজন, সাহিত্য উপভোগ ঘরে বসেই করা যায়। একটা বই হাজার হাজার কপি ছাপা হয়, হাজার হাজার লোক পড়তে পারে। একটা ছবি হাজার লোকের দৃষ্টিগোচর করাতে হাজার লোককে চিত্রশালায় নিয়ে যেতে হয়, না হলে তার সুদৃশ্য প্রতিলিপি পত্রিকায় প্রকাশিত করতে হয় যা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে প্রদর্শনীতে দর্শকসমাগম এখনও অপ্রচুর, যদিও সংখ্যা বর্ধমান। অর্থাৎ, দেখতে দেখতেই দর্শক হচ্ছে। ছবি দেখার অভ্যাস যথেষ্ট অনুশীলিত নয় বলে প্রায়ই দেখা যায় কোনো বাড়ির ড্রইংরুমে টাঙানো ছবি আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, উৎসুক্য জাগায় না, প্রশ্ন ওঠায় না। শিল্পকর্মটি যেন ফুলদানি ও ভস্মাধারের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রচিত্রের দর্শকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে আরও অনধিক, সুতরাং দর্শকচক্ষুও বিদগ্ধ নয়। দর্শক-সংখ্যার স্বল্পতাহেতু রুচিমান দর্শকের সংখ্যা যে স্বল্পতর হবে এবং বিচারবোধসম্পন্ন দর্শক হবে মুষ্টিমেয় সেটা সহজেই অনুমেয়। সাধারণভাবে চিত্রশিল্পের প্রতি বাঙালীর অনাত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি সচেতন ছিলেন যে তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টা প্রথাগত পথ ধরে চলে নি। প্রথাগত বিশ্বাসের বিরোধী মন তাঁর ছিল বলে কয়েকটি কবিতায় তিনি নিজেকে ব্রাত্য বলেছেন। সাধারণ বাঙালীর চক্ষে তাঁর চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য ধরা না পড়তে পারে এমন সন্দেহ তাঁর মনে ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের বেলায় ছিলেন স্পর্শকাতর এবং অন্যের বেলায় অপরিসীম সহবেদনশীল। সত্তর বৎসর বয়সে যখন তিনি সাহিত্যপ্রতিভার স্বীকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত তখন সম্ভাব্য অবহেলা তাঁর পক্ষে অবশ্যই মর্মান্তিক হত। সেই শঙ্কাহেতু চিত্ররূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ দেশে নয়, প্যারিসে। বোধ হয়

শঙ্কা অহেতুক ছিল না, এখনও চিত্রকর হিসাবে স্বদেশে তিনি যথেষ্ট পরিচিত নন। রবীন্দ্রনাথের ছবি—মাত্র এইটুকু জেনে নিয়েই সাধারণ বাঙালীর কৌতূহল স্তিমিত। প্যারিসের ১৯৩০ সালের প্রদর্শনীর পর খুশী মনেই তিনি লিখেছিলেন, 'ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেছে। কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি।'

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকরা জ্ঞাত আছেন যে শব্দচয়নে ও তাদের সংস্থাপনে তিনি কী পরিমাণে বিচারশীল ছিলেন। লেখার উপর কাটাকুটি চলতই, ছাপাখানায় লেখা যাবার পরও পরিবর্তন করতেন। কিছু কিছু নিদর্শন তাঁর গ্রন্থে আছে। উদাহরণস্বরূপ 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতার উল্লেখ করা যায়। অগোছালতার প্রতি সহজাত বিরূপতাহেতু সেইসব কলমের আঁচড় নানাভাবেই আকার নিত। সেই আঁচড়ের টানে কখনও বা যেন এক অপরিচিত জীবের মুখ, কখনও বা কোনও না-দেখা ফুল, কখনও বা বাঁকাচোরা অসম্ভবপ্রায় মুখের আদল ফুটে উঠত। প্রাথমিক রূপায়নের ইঙ্গিত তাঁকে প্রথম যৌবনের লুব্ধদৃষ্টিজনিত সৃষ্টির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। তারই ফলশ্রুতি সত্তর বৎসর বয়সে চিত্রশিল্পীর আত্মপ্রকাশ। তখনও চিত্রে রঙ অনুপস্থিত, লেখার কালিই মাধ্যম আর কলমের অগ্রভাগ হাতিয়ার। রঙের ব্যবহার ১৯৩০ সালে। কলমের আঁচড়ে যে অ-ভূতপূর্ব প্রাণীর আভাস মেলে সে সম্বন্ধে পূর্বেই তিনি লিখেছেন: 'প্রাণিবৃত্তান্তে যা হয়তো অশ্রদ্ধেয় চিত্রকলায় তাই সত্য। অর্থাৎ, ছবির প্রাণী আপন সত্যতা আপনার মধ্যেই নিয়ে আসে।' (রূপশিল্প, "সাহিত্যের পথে")

রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই রবীন্দ্রচিত্রের অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টাতেই এই প্রবন্ধ। ছবি সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি দিকের প্রতি অবহিত হতে হবে। প্রথম, তাঁর নন্দনতত্ত্ব, যা প্রধানতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও শিল্পক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; দ্বিতীয়, চিত্রসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যার অধিকাংশই সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে মিশে আছে; তৃতীয়, তাঁর ছবির প্রকৃতি ও বর্ণন। শিল্পের আলোচনায় তৃতীয় দিকের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি বাধা আসে, কারণ ছবিগুলিকে নজির হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় না। তবে যেহেতু সেইসব ছবির প্রতিলিপি অনেকেই দেখেছেন সেজন্য আলোচনার সময় সেগুলির কথা স্মরণ করলে অথবা কোনও প্রতিলিপি সামনে রাখলে বক্তব্য অবোধ্য না হতেও পারে।

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের জন্য আলাদা ব্যাখ্যা দরকার হবে না যদি কয়েকটা উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করা যায়। সেই উদ্ধৃতিতেই বক্তব্য স্বতঃপ্রকাশিত।

(১) আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে। (আমি, "শ্যামলী")

(২) ঐ চাঁদ, ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়। (সাত সংখ্যক কবিতা; "পত্রপুট")

(৩) দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে। (দ্বৈত, "শ্যামলী")

(৪) সমস্তই সুন্দর এই জন্যই সমস্তই আমার আনন্দের সামগ্রী। ("সাহিত্য")

(৫) জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ ভাবে সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য। ("সাহিত্য")

(৬) কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কেবল সুন্দর-নামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দেয়, তাহার এই অন্যায় বদনাম কেমন করিয়া ঘুচানো যাইবে সেই কথাই ভাবিতেছি। ("সাহিত্য")

(৭) সমস্ত রসসৃষ্টির আদর্শ যে তার নিজেরই মধ্যে তার বাইরে নয়, এ কথাটা অন্ততঃ চিত্রকলায় সাধারণ লোক মানতে চায় না। (রূপশিল্প, "সাহিত্যের পথে")

য়ুরোপীয় পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন এই বলে যে মানবচেতনার বহির্ভূত কোনো সৌন্দর্য কোথাও আরোপিত হতে পারে না। যে নন্দনতত্ত্বের সাহায্যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি পাঠকের অধিগম্য হয় সেই তত্ত্বই দর্শককে তাঁর চিত্রসৃষ্টির রসগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে চিত্রসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মিশে আছে। সেগুলিকে আলাদা করে উপস্থাপিত করলে উদ্ধৃতিগুলি রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনাকে স্পষ্ট করতে সহায়ক হবে। জীবনস্মৃতির প্রারম্ভেই ছবির প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের আভাস মেলে, বিশেষতঃ যেখানে তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে।' অবচেতনে যা থাকে তা যে একাধিক সৃজনকর্মে প্রকাশ পায় তারই দৃষ্টান্ত তো রবীন্দ্রনাথের ছবি। তাঁর উক্তি, 'এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে এবং মন দিয়া চোখের দেখাকে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ("জীবনস্মৃতি")

ঐ যে 'মন দিয়া চোখের দেখাকে পাইবার ইচ্ছা'র কথা বলেছেন ওটাই হল তাঁর নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা। এই নন্দনতত্ত্বের পূর্ণপরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে গেছেন এই ব্যাখ্যায়, 'আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি।···গোলাপফুল আমার কাছে তার ছন্দে রূপে সহজেই সত্তা-রহস্যের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি তাকে তাই বলি ; বলি 'তুমি আছ'। ("পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী")

রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুভূতিই যখন প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য তখন সৌন্দর্যের আবাস যে মানবমনে তাঁর সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ঐ তত্ত্বের মূল্যায়ন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের সাহায্যেই তাঁর শিল্পের অন্তরস্থ রসের সন্ধান।

আলোচনার দ্বিতীয় স্তরে ছবি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে সমস্ত ভাবনাকে বিধৃত করেছেন তার সন্ধান করা যেতে পারে। পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশেষভাবে চিত্রের ব্যাখ্যা হেতু সেই সব প্রবন্ধ রচিত হয় নি, প্রাসঙ্গিক ভাবেই ছবির কথা এসে গেছে।

'মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তাহলেই বলতে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীন ভাবে দেখি তাকে পুরো দেখিনে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকেও না; যাকে দেখার জন্য দেখি তাকেই দেখতে পাই।' ("পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী") 'অর্থকে খুঁজতে হয় ভাষায়, ছবিতে খুঁজি ছবিকেই।' (রূপশিল্প, "সাহিত্যের পথে")

উপরের উদ্ধৃতি দুটির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধে অনুভূতির স্থান সম্বন্ধে উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন, যা দেখতে হবে, এবং দৃশ্য বলেই যার মূল্য তখন সেই দেখাটার প্রকারভেদ হবে কী ধরনে। 'ছবি পাশ কাটিয়ে যেতে নিষেধ করে।... আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক, টেকনিক, তার কথা বলতে পারিনে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তাহলে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখো, দেখো, দেখো'। ঘুরে ফিরে সেই মনের ব্যাপারেই এসে পড়ছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে, 'কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য।' ("পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী")

দেখতে গিয়ে দর্শক বুঝতে পারছেন যে পরিণত শিল্পী এমন ভাবে দেখাতে চাইছেন আমাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে যার সাদৃশ্য হয় একেবারেই অনুপস্থিত নয় তার উপস্থিতি ন্যূনতম। প্রথাগত চিন্তা ঘা খায়। এমন কেন হয়? এমন ভাবে দেখাতে কেনই বা হবে? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ছবিতে অনেক জিনিস বাদ পড়ে; অনেক বড়ো ছোটো হয়ে যায়, অনেক ছোটো বড়ো হয়ে ওঠে। তবু ম্যাপের চেয়ে তাকে সত্য মনে হয়, তাকে দেখামাত্রই এক মুহূর্তে তাকে চিনতে পারি।' ("সাহিত্য")

অপরিচয়ের জন্য চোখের যে দারিদ্র্য তা ছবির মধ্যে প্রকৃতির সাদৃশ্য খোঁজে, সেই দরিদ্র দৃষ্টি ছবিতে রসের সন্ধান করে না। এর ফলে ছবির দৃশ্যতা তার কাছে অ-দৃষ্টই থেকে যায়। 'সকল উদ্ভাবনার মূলে কল্পনাবৃত্তি। সেই কল্পনার মধ্যে এই প্রেরণা রয়ে গেছে যে মানুষ নকল করবে না, রচনা করবে।...যে সকল কারিগর প্রকৃতির নকল করে তারা চুরি করে প্রকৃতির কাছ থেকে। এই চৌর্যনৈপুণ্য দেখেই যারা বাহবা দেয় তারা মানবশিল্পের মর্যাদা বোঝে না।' (রূপশিল্প, "সাহিত্য")

শিল্পীর দায় শিল্পকে দর্শকের কাছে জানানো। কিভাবে জানাবে তার ইঙ্গিত পাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে। 'ভেদেই রূপের সৃষ্টি।...তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে, এক-এর সীমা হইতে আর-এর সীমায় পার্থক্যে।...সীমা কহিলে সুন্দর হয় না। এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতে সীমার সার্থকতা নাই—ছবিতে এই কথাটা জানাইতে হইবে।' ("সাহিত্যের পথে") বলা বাহুল্য, এই জানাবার প্রতিভা সুলভ নয়, সাধারণ শিল্পীর ও প্রতিভাবান শিল্পীর পার্থক্য জানাবার শক্তির ভেদাভেদে। প্রতিভাবান শিল্পী আমাদের চিত্তে সেই অনুভূতি জাগাতে পারে যার বিষয় রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, যা ব্যক্তির চিত্তে গভীর আনন্দের সাড়া তোলে। এই অনুভূতি ও আনন্দ সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে যার অর্থ খোঁজার জন্য ভাবা অপ্রয়োজনীয়।

অন্যত্র সীমা ও অসীমতার হিসাব ছবি, গান, ও কবিতার পারস্পরিক তুলনা করে বুঝিয়েছেন। 'ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি, অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অরূপরাজ্যের কলা গান।

কবিতা উভচর। ছবির মধ্যেও চলে গানের মধ্যেও ওড়ে।' ("জাপান যাত্রী")। এখানে ছবিকে পরিমিত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সীমার মধ্যে থেকেই নিজেকে সার্থক হতে হবে, গানের মত বিশুদ্ধশিল্পের স্বাধীনতা যে তার নেই, রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনা সেই কথা বলছে।

রবীন্দ্রচিত্রের যা নন্দনতত্ত্ব তার মূলকথা তাঁর উদ্ধৃতিতেই ধরা পড়েছে। সেই তত্ত্ব সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত এই উক্তিতে, 'সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর একটা ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের একটা ভিতরের। দুটোই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিলে চলিবে না।'

রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁর নন্দনতত্ত্বের ও চিত্রে তার প্রয়োগের সমর্থন পাবার পর তাঁর চিত্রমনের উৎস, অঙ্কনপদ্ধতি, চিত্রের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবার সময় এসেছে। কোনও একটি সুপরিচিত পথ অথবা পদ্ধতি তাঁর গতিশীল সৃজনক্ষমতাকে স্থবিরত্ব দিতে পারেনি। 'এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।' ("আত্ম-পরিচয়")। অন্যত্র, 'প্রকাশের ইচ্ছাই আমার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা।' ("প্রান্তিনী")। কিন্তু কবির এবং চিত্রীর প্রকাশের রীতি ভিন্ন, সৌন্দর্যবোধ এক হওয়া সত্ত্বেও। এ বিষয়ে তাঁর আত্মবিশ্লেষণ স্মর্তব্য। 'কবিতার বিষয়টা অস্পষ্ট ভাবে ও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক উল্টো প্রণালী। একটা রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টিতে বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তাহলে গোড়াতেই সঙ্কল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত, তাতেও আনন্দ আছে কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে যেন আরও বেশি নেশা।' ("পথে ও পথের প্রান্তে")। 'কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো, রঙ বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এই জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালী বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এই জন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি।...আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটাই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।' ("পথে ও পথের প্রান্তে")। 'যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা।... আজকাল [১৩৩৫] আমার রেখায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করেছেন—আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে যে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্ট-তাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি—মন বলে ওঠে নিশ্চিত দেখতে পেলুম—তা সে যাই দেখি না কেন, এই একটুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ,

একজন বুড়ি যাই হোক। ("পথে ও পথের প্রান্তে")।

প্রথাগত ড্রয়িংশিক্ষা ছিল না বলে নিজের চলার পথ নিজেই কেটেছেন, সে পথ একান্তই নিজস্ব। অন্য কারও পক্ষে সে পথে অনুগমন করা অসম্ভব। অনুগামী হবার আকাঙ্ক্ষাও জাগবে না। কবিতাসৃষ্টি প্রচলিত ভাষা, ব্যাকরণ ও প্রকরণ অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে বলে এবং ভাষা ব্যাকরণ ও প্রকরণের জ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি বলে একাধিক রাবীন্দ্রিক কবির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি কিন্তু রাবীন্দ্রিক চিত্রী একজনও নেই। হবেও না। সচেতন ভাবে তিনি নিজেই জানতেন না তাঁর হাতিয়ার তাঁকে কোন্ পথে ঠেলবে। এখানেও নিরুদ্দেশ যাত্রা। উপরি-উক্ত উক্তিই এই মতের সমর্থক। এই জন্যই তাঁর অন্য স্বীকৃতি, 'আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব।' এই জন্য প্রায়শই তাঁর ছবি অনামী। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের শেষজীবনে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা ছবি চেয়েছিলেন। ক্ষোভের সঙ্গে কবি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর হাত ছবি আঁকার আদেশ মেনে চলে না। কখন যে হাতের ছবি আঁকবার মর্জি হবে তা তিনি নিজেই জানেন না। সচেতন মন তাঁকে ফরমায়েসে দুই-তিন দিনে নাটক রচনা করতে সাহায্য করেছে, সে নাটকের সার্থকতা অবিসংবাদিত। সচেতন মন আজ্ঞাবাহী, অবচেতন মন স্বরাট। আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রের উৎস হল তাঁর অবচেতন মন। মধ্যবয়সে যখন শিল্পীরূপে পরিচিত হবার কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায় নি, সেই সময় য়ুরোপীয় এক শিল্পীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি ছবি আঁকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কবির সন্দেহ ছিল সন্ধানীদৃষ্টি যথেষ্ট নয় বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। সেই শিল্পী অভয় দিয়ে বলেছিলেন 'ও ভয়টা কিছু নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে করেই কিছু নামিয়ে রাখতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক বেশি দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।' এই সার্থক করে দেখতে পেরেছিলেন বলেই নন্দলালের ছাগলের স্কেচ অত শক্তিশালী এবং ঐ দেখবার শক্তির স্তুতিতে পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

ওগো চিত্রী এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে।

(ছবি আঁকিয়ে, "ছড়ার ছবি")

প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্কন যখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠল তখনও তিনি চোখে দেখে ছবি আঁকেন নি, মাথা নিচু করে হাতের আদেশ পালন করে গেছেন, যে হাত তাঁর অবচেতন মনের বাষ্পে চলেছে। তাই তো তাঁর ছবি প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রতিধ্বনিত করে না, আমাদের পরিচিত জাগতিক বস্তুর সাক্ষাৎ মেলে কম। যদিও বা ফুলের আভাস পাই তবুও সে যেন ফুল হতে হতে ফুল হয়ে উঠল না। কিংবা, যদিই বা দীর্ঘ বৃন্তসমেত একটা ফুল দেখলাম ছবির পাতায় সে ফুলের সাক্ষাৎ কোনও বাগানে মিলবে না। অন্যপক্ষে সারমেয় বলে মনে হচ্ছে এমন এক প্রাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি বলে সন্দেহ জাগতে শুরু হয়, সন্দেহের অপসরণ হয় স্মরণ করে ঘরের অথবা বনের কোনও

সায়মেয়েরই অমন দাঁত হয় না। ছবিতে দেখি রমণী রূপবতী নয়, রহস্যময়ী, যার মুখের আধখানা ঢাকা কিংবা উক্ত মুখের উপর ওড়না টেনে পথ চলতে গাছের সামনে গাছেরই মত স্থির।

অপরদিকে আবার খবর পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ধরনের ছবি দেখে মুগ্ধ, যেমন একটি জাপানী ছবি যার প্রশংসায় তিনি লিখেছেন, 'সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় জাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবেমাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহুভঙ্গীর মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত। সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে ধরে প্রার্থনা করছে।' রবীন্দ্রনাথের চিত্র কিন্তু কদাচই আলোকময়, অধিকাংশ গাছের রঙ পর্যন্ত হয় কালো নয় গাঢ় বাদামী। তাঁর আঁকা ছবি না জাপানী ছবির মত সরল না বিবরণ-ধর্মী। অথচ তাঁর ছবিতে দৃশ্যতা বর্তমান এবং চিত্রের পটভূমিতেই তার চরিত্র সুপ্রকাশিত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কবিতাকে কাটাকুটি করতে গিয়ে যে সব রূপ দৃশ্য হত তাতেই চিত্রশিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। সেখানে রেখারই প্রাধান্য, তাঁর ছবিতে রঙের প্রলেপ পড়েছে পরে। কালির দুটি রেখার মাঝে শাদা কাগজের জায়গা মিলে এক আলোছায়ার সৃষ্টি হল, যেন মনের কন্দরের দুটি বিপরীত ভাব। শুধু বিপরীতপ্রবণ বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না, বলতে হয় অবচেতন ও সচেতন মনের সহাবস্থান। শাদা-কালো অথবা আলোছায়া দিয়ে গড়া নকশামাত্র নয়, আরও গভীরের ব্যঞ্জনা আনে, যেন অতল জলের আহ্বান।

কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশি করেছেন। কিন্তু, চিত্রী হিসাবে তিনি স্বয়ম্ভু, দেশের বা বিদেশের কোনও শিল্পীর কাছে পাঠ নেননি। য়ুরোপীয় চিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আকস্মিক, পূর্বপরিচয়জনিত নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনীষীদের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সমতা দেখা গেছে। চিত্রে সাদৃশ্যের পরিচয় পেয়েই য়ুরোপীয় চিত্ররসজ্ঞরা আশ্চর্য হয়েছেন যে যার সন্ধান তাঁরা করে চলেছেন সেই রহস্যে কবি হয়ে কী করে তিনি দৃশ্যতা আনলেন। য়ুরোপের শিল্পীরা মূর্তশিল্পের সাধনান্তে বিমূর্ত শিল্পকে ধরতে পারলেন, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বিমূর্তশিল্পে পৌঁছলেন, মূর্তশিল্পের সোপান বেয়ে নয়। এমন কি, বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মূর্তশিল্পের দৃষ্টান্তের চেয়ে বিমূর্তশিল্পের সংখ্যাই অধিক। বিমূর্তশিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা তাঁর সাহিত্যরচনার মধ্যেই বিধৃত। 'বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালই লাগে।' (রূপশিল্প, "সাহিত্যের পথে") "রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে" (পুনশ্চ, "চিররূপের বাণী")। বিমূর্ত চিত্রের প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত উক্ত পংক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে; তাঁর ভাললাগার সঙ্গে বাঙালী দর্শকের ভাল লাগার অমিলের আশঙ্কাতেই প্যারিসে প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

বিমূর্তশিল্পচরিত্র আধুনিক চিত্র ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অথচ আধুনিকতা যে অন্যপক্ষে সরলতার সঙ্গে আত্মীয়বন্ধনে বাঁধা, ফলে অনেক সময় আদিমগুণান্বিত বলে মনে করা হয় সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তন উল্লেখ্য। 'আধুনিক কলারসিক বলছেন আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত পটুত্ব বিরল রেখায় যে রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবাস্তব ভার পীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই।' ("পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী") এখানে সৃষ্টির সহজতার ব্যাপারকে সচেতন

ভাবে সমর্থন করছেন যার প্রকাশ কিন্তু আদৌ সহজ নয়। যেমন 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' তেমনই সহজ অর্থাৎ, সরল ছবিও আঁকা সহজে যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছবিও সরল নয়, রেখা ও রঙের মাধ্যমে রূপের প্রকাশ রীতিমত জটিল। সচেতন ভাবে যার স্তুতি করলেন, চিত্রে তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরতে পারলেন না।

চিত্রে রঙ ব্যবহার করেন পরে, ১৯৩০ সালে। রঙের ব্যবহারেও তিনি প্রথাগত তুলি, জলরঙ অথবা তেলরঙ বর্জন করে গেলেন। রেখার জন্য তাঁর হাতিয়ার ছিল কলম আর রঙ ছিল একাধিক রঙের কালি, দুটোই অতি সুপরিচিত। রঙিন পেন্সিলও ব্যবহার করেছেন। লেখক হিসাবে তাঁর হাতিয়ার আদেশ মেনে চলত কিন্তু চিত্রী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা যে হাতিয়ার তাঁর আদেশ মানে না। কলমের এই দ্বৈত চরিত্রের বিষয় পরে উল্লিখিত হবে। রঙের জন্য যা কিছু হাতের কাছে পেতেন। সবুজ পাতা অথবা ফুলের পাপড়ি, সবই সরাসরি কাগজে ঘষতেন। বাল্যে তাঁর খেয়াল হয়েছিল রঙিন ফুলের রস টিপে বার করে নিবের ডগায় লাগিয়ে রঙিন অক্ষরে কবিতা লিখবেন। সেই রঙিন ফুলের পাপড়ি কাগজে ঘষে কাগজকে রঙিন করতে পেরেছিলেন। রঙের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও চিত্রে তিনি রেখাকে রঙের উপরে স্থান দিয়েছেন। 'রঙ জিনিসটা মধ্যস্থ, দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার আর্টই থাকে না।' পুনশ্চ, 'রঙ আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে, কিন্তু কেবল বর্ণদ্বারা ছবি হইতে পারে না।' (শিল্পরূপ, "সাহিত্যের পথে") আধুনিকতম চিত্রে কিন্তু রেখার দ্বার সীমা সৃষ্টি না করেই পাশাপাশি বিপরীত প্রকৃতির রঙের ব্যবহার যথেষ্ট দেখা যায়। এই ধরনের চিত্রে রসসৃষ্টির চেয়ে আবেগসৃষ্টিরই প্রাধান্য।

রং শুধুই মাধ্যম নয়, সেটা যে রূপকে প্রকাশিত হতে সহায়ক হতে পারে সে কথাও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা স্বীকৃত। 'অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত, তার পরেই অন্ধকার।' ("জাপান যাত্রী") তাঁর সচেতন মনের প্রিয় রঙ ছিল, হালকা নীল। রানী চন্দ জানিয়েছেন যে কবি খুবই দুঃখিত হতেন যখন তাঁর দেখা নীল রঙ অন্য কেউ দেখতে পেতেন না। ছবিতে নানা গাঢ় রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু নীল রঙের, বিশেষতঃ হাল্কা নীল রঙের, ব্যবহার কম। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর চিত্রের চরিত্র উন্মোচনে সাহায্য করবে। রঙকে যে তিনি রেখার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। রঙের ঘটা যা আধুনিক চিত্রে প্রচুর এবং ভারতীয়, জাপানী বা চৈনিক চিত্রে অপেক্ষাকৃত কম, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত হল, '...যে ব্যক্তি সমঝদার ছবিতে সে একটা রঙচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারিপাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রঙচঙে চোখ ধরা পড়ে কিন্তু সামঞ্জস্যের সুবিধা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীর ভাবে দেখিতে হয়, এই জন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।' ("সাহিত্য") যদিও এখানে ছবির perspective এবং composition-এর উল্লেখ আছে যে প্রকরণ চিত্রীকে অধিগত করতেই হয়,

রসোপলব্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা হল, রবীন্দ্রনাথের মতে মন। তাঁর নন্দনতত্ত্ব পুনরায় ব্যাখ্যাত হল।

রবীন্দ্রনাথ সার্থক ছবির মধ্যে এমন কিছু অনির্বচনীয়তার সন্ধান করেন যা প্রকৃতিতে অবর্তমান। নিজেও চিত্রের মাধ্যমে দর্শককে এক অনাস্বাদিত রহস্যের আভাস দেন। এমন এক নারীমূর্তির দর্শন মেলে যার দাঁড়াবার ভঙ্গী কোনো মানবীর চেয়ে পাখির সঙ্গেই বেশি। রঙিন ফুলকে কমনীয় ফুল বলে চেনা গেলেও সেটা একটা বড় গাছের কাণ্ডের গায়ে এমন ভাবে আটকানো দেখি যা প্রকৃতিতে পাওয়া যাবে না। না পাবার কারণ তাঁর ছবির উদ্ভব নিজের খেয়ালে, অনির্দেশ্য তাগিদে এবং হয়তো বা অবরুদ্ধ মানসিক বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। প্রচলিত শিল্পপ্রথা, প্রতিষ্ঠিত মত অথবা বিশ্বাসকে আঘাত হানবার জন্য শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ নয়। নূতন পথ দেখাতে নয়, নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করাতেই তাঁর ছবির সার্থকতা। শিল্পসৃষ্টির এই উৎসের এবং প্রকরণের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সহধর্মিতা খুঁজতে গেলে ভুল হবে। কবিতা আরম্ভ করার পূর্বে একটা মোটামুটি ধারণা যে তাঁর মনে ভাসে সে কথার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর ছবি সম্বন্ধে সব চিন্তাই থাকে মনের গভীরে ডুবে। আঁচড় টানা দিয়ে সেই চিন্তা ক্রমশঃ উপরের দিকে ভেসে উঠতে উঠতে ছবি সম্পূর্ণ হবার পর সেটা সম্পূর্ণ ভেসে ওঠে। এর অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত। যে কথা কিছুতেই সচেতন মন তাঁকে সাহিত্যসৃষ্টির মারফৎ প্রকাশিত হতে দেয় না সেই কথা প্রকাশিত হয় ছবিতে। অনন্তের রঙ যদি কালো, গহনতার রঙও স্বচ্ছ ও উদ্ভাসিত নয়, আর তাঁর ছবি গহন মনের কাহিনী বলে ছবির রঙও অনুজ্জ্বল। আজীবন সাধনার ধন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি, এর প্রকৃতি ও চরিত্র ক্রম-বিকশিত এবং লক্ষিত হয়েছে। যা তাঁর সচেতন মনের প্রকাশ তা দৃঢ়, সংযত, পরিশীলিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিটোল, লাবণ্যময় ও সুপরিণত। সাহিত্যের প্রত্যয় ও প্রকাশ সুস্থির এবং সুস্থিত। চিত্রে সেই প্রকাশ নিটোল, লাবণ্যময় ও সুপরিণত নয় কারণ সেই প্রকাশ নিজস্ব বেগেই গতিময়, চিন্তার দ্বারা পরিশীলিত নয়।

প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ সে ইচ্ছাকে সকলের, এবং বহুলাংশে নিজেরও অজ্ঞাতে পালন করেছেন। এটা তাই সহজেই অনুমেয় যে সব চিন্তা কোনো দিন সাহিত্যে প্রকাশ হবার নয় সেই ভাবনাই তাঁকে আঁচড় কাটিয়েছে, গাছের পাতা ও ফুলের পাপড়িকে ঘষিয়েছে রূপায়নের জন্য। খেয়ালকে অগ্রসর হতে দিয়ে সচেতন প্রত্যয়কে কিছুটা সরিয়ে রেখেছেন। যে আলোকময়তা তাঁকে দর্শক হিসাবে আকর্ষণ করেছে তাঁর সৃষ্ট চিত্রে সেই আলোকময়তা অনুপস্থিত। সমালোচকরূপে যেখানে তিনি সরল সৃষ্টিকেই সার্থক সৃষ্টি বলেছেন সেই সরলতা তাঁর অধিকাংশ চিত্রেই অনুপস্থিত। যে সমস্ত রঙ তাঁর প্রিয় বলে জানা গেছে নিজের সৃষ্টিতে তা অল্পই প্রয়োগ করেছেন। যে হালকা নীল রঙ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় তার ব্যবহারই সবচেয়ে কম। ব্যবহৃত রঙের অধিকাংশই অনুজ্জ্বল বাদামী, ধূসর অথবা কালো যাদের কোনোটাই প্রফুল্লতার দ্যোতক নয়। ফরমায়েসেও তিনি অনেক সার্থক সৃষ্টি করেছেন কিন্তু চিত্র-সৃষ্টি কারো আদেশ মানে নি, নিজেরও নয়। কেদারনাথকে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বিমুখ করেছেন বাধ্য হয়ে যার জন্য তিনি নিজেই ক্ষুব্ধ। তাঁর সাহিত্যকর্ম ছিল পারম্পর্যশীল, যেখানে চিন্তা ও রচনার ছিল সহাবস্থান। দ্রুতগতিতে রচিত রচনাও পরিবর্ধিত হতে হতে চলত, ছাপাখানায় যাবার পরেও পরিবর্তন করা চলত। চিত্রসৃষ্টির রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অঙ্কিত

চিত্রে চিন্তার প্রবেশ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। চিত্র শেষ হয়েছে মনে হলেও ছবির শেষ হত, পরিবর্তন করতে আর উৎসাহ থাকত না। ঐভাবে দ্রুতবেগে আঁকলে মনের আগল আলগা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্য মনে আঁকিবুকি কাটলে অথবা লিখতে থাকলে অবচেতন মন ধরা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রের উৎস অবচেতন মন। সেই জন্য দেখি যা সচেতনভাবে সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি প্রকাশ করতে চান নি অথবা পারেন নি, অমনস্ক হয়ে রেখা ও রঙের সাহায্যে তাকেই চিত্রে প্রকাশিত করেছেন। এটা আদৌ সুরুচি-কুরুচির দ্বন্দ্ব নয়, ভাল-মন্দের প্রশ্ন নয়, শিল্পসৃষ্টির পক্ষে গৌরব-অগৌরবের কথা নয়। একটা কিছু হয়ে উঠল, যা বিশেষ, যা ব্যক্তিবিশেষের কাছে ধরা পড়ল সেটাই হল যথেষ্ট।

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিঃশ্বাস

. সে আমার অন্ধ অভিলাষ। (কালো ঘোড়া, "বিচিত্রিতা")

মানুষ রবীন্দ্রনাথেরও যে অবচেতনা আছে এবং সেটা যে থাকতে পারেই তারই স্পষ্ট স্বীকৃতিতেই উপরের দুটি লাইন। যে অন্ধ অভিলাষকে তিনি সাহিত্যকর্মে চিরকাল বাইরে রেখেছেন চিত্রকর্মে তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি, এবং পারেন নি বলেই তাঁর চিত্রে অনুজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য। তাঁর চিত্রে অর্থের সন্ধান, নীতির সমর্থন এবং প্রথাগত বিশ্লেষণ অবান্তর। যা হয়ে উঠল সেই হয়ে ওঠাটাও যদি দর্শকের চোখে ধরা না পড়ে তাহলেও রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব দিয়েই তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চিত্রকর্ম বিচার্য। প্রথা যখন গৃহীত হয় নি তখন প্রথাগত বিচারও অপ্রযোজ্য। বক্র চোখের কৌতুকপূর্ণ চাহনি, আবছা আলো ও রঙের মধ্যে গাছের, যেন চেনাচেনা মনে হয় এ হেন পশুপাখির, ঘোমটা-টানা মেয়ের অথবা পথচলতি নারীর রূপায়ন দর্শককে রহস্যের সন্ধান দেয়। সকলেই যে সব সৃষ্টিরই দ্বারা আকৃষ্ট হবে তা নয়। দেখার চোখ তৈরী হলেই হল। এখানে খানিকটা অনির্বচনীয়তা না থেকেই পারে না। দৃষ্টিশক্তিকে ধারালো করতেই দর্শকের সার্থকতা তথা মুক্তি। শিল্পের উৎসের সন্ধান অপ্রয়োজনীয় নয়, সেটা রসগ্রহণে সহায়ক হতে পারে। জিজ্ঞাসু মনই পথের ও রসের সন্ধান পায়।

চিত্রাঙ্কন যখন আয়ত্ত হল অর্থাৎ শিল্পীরূপে উত্তরণের সময়ে যখন তিনি নিঃসন্দেহ হলেন তখন তাঁর চিত্রের সত্যকেও কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত করতে পারলেন। "শেষ সপ্তকে"র ষোলো সংখ্যক কবিতাই এর প্রমাণ।

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগলভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।

কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন ;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,

এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।

আমার তুলি আছে মুক্ত।

যে শিল্পী জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিন হাজারের বেশি ছবি এঁকেছেন তাঁর সৃষ্টির তাগিদ ও শক্তি তর্কাতীত। প্রাথমিক বক্তব্য অনুসারে দেখতে দেখতেই দর্শক হতে হলে অনেক বেশি করে রবীন্দ্র-নাথের ছবি দেখার অভ্যাস করলে তাঁর ছবির দৃশ্যতা ধরা পড়বে। আলোচনার জন্য যা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে বলা হল তা অবশ্যই অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে শিল্পী পরিচিত জগৎকে দৃশ্য করতে উৎসুক নন, অপরিচিত জগতের সন্ধান দিতে ইচ্ছুক।

সমালোচনা

Calcutta. Photographs *by* Raghubir Singh. Text *by* Joseph Lelyveld. The perennial Press. Hong Kong. U.S. $ 19.50.

"গঙ্গা"র পর "ক্যালকাটা" রঘুবীর সিং-এর দ্বিতীয় ফোটোগ্রাফের বই। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে "গঙ্গা" যেমন প্রায় সকলেরই মনোহরণ করেছিল, "ক্যালকাটা"র পক্ষে তা সম্ভব হবে না। এর জন্য দায়ী রঘুবীর সিং নন, দায়ী কলকাতা। কলকাতা সম্বন্ধে যা কিছু বলা যায় বা কিছু করা যায় তা বিতর্কমূলক হতে বাধ্য। বিশেষতঃ যখন মাত্র ৭৭টা রঙিন ছবি দিয়ে এই বিশাল, বহুরূপী ও অসীম জটিল শহরের চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

"ক্যালকাটা"তে যে সমস্ত ছবি রয়েছে তার কিছু কিছু ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় পিটার হোয়াইট-এর একটি লেখার সঙ্গে ছাপা হয়। "ক্যালকাটা"য় জোসেফ ললিভেল্ড-এর লেখা একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। যখন কয়েক বছর আগে ললিভেল্ড নিউইয়র্ক টাইমস-এর দিল্লীর সংবাদদাতা ছিলেন তখন এবং তারপরও তিনি কয়েকবার কলকাতায় এসেছেন। কলকাতার ওপরে এই লেখায় ললিভেল্ড এই শহরের বিরাট, বহুবিধ ও অবর্ণনীয় নাগরিক সমস্যাগুলি ছাড়াও বাঙালীদের মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখে অবাক হয়ে গেছেন যে যখন কলকাতার নাগরিক জীবন দ্রুতবেগে ও চূড়ান্তভাবে নানাদিক দিয়ে ভেঙে পড়ছে তখন চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী বাঙালীরা সেদিকে দৃকপাত না করে পৃথিবীর যত রকম সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে যখন আঁদ্রে মালরো প্যারিসের সিনামাটেকের স্রষ্টা ও কর্মকর্তা আঁরি লাঙ্লোয়াকে তাড়াবার চেষ্টা করেন তখন তার প্রতিবাদে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় মিছিল বার করে প্রতিবাদ জানান। এই ধরনের ব্যাপার তার মতে পৃথিবী অন্য কোন মহানগরীতে সম্ভবপর নয়; এর মধ্যে তিনি একটা মহত্বও দেখেছেন। ললিভেল্ডের লেখায় কলকাতার নাগরিক জীবনের ও বাঙালীদের সম্বন্ধে যে সমালোচনা আছে তা পড়লে কিছু কিছু উগ্র দেশপ্রেমিক অসন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক স্বীকার করবেন যে তাঁর সমালোচনা রূঢ় হলেও ন্যায্য এবং এও স্বীকার করবেন যে কলকাতার প্রতি ললিভেল্ডের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ আছে।

এইবার ছবিগুলির কথায় আসা যাক। "ক্যালকাটা" খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে রঘুবীর সিং মাসের পর মাস ধরে ছবিগুলি তুলেছেন। ঋতুপরিবর্তনের ছাপ ছবিগুলিতে স্পষ্ট। আমরা গ্রীষ্মের চেহারার আভাস পাই যখন দেখি একজন আপিস-বাবু টাই বাঁচিয়ে ডাবের জল খাচ্ছেন। বর্ষার কলকাতার রূপ ফুটে উঠেছে জলপ্লাবিত রাস্তায়। নির্জন এক গলিতে রিকশা ছেড়ে রিকশাওয়ালা একটা দোকানের ছতরির তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিটির মুড জাপানী পেন্টিং-এর মতন। শহরে শরতের আগমন জানতে পারি দুর্গাপূজার ছবিতে। আর শীতের অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ

আমেজ ফুটে উঠেছে রেস-কোর্স ও পোলো খেলার ছবিগুলিতে।

কলকাতার যে চেহারাটা রঘুবীর সিং দেখেছেন এবং যা তিনি ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা হল প্রচণ্ড জন-সমাকীর্ণ, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, জঞ্জালময়, শ্রীহীন মহানগরী যেখানে মানুষ শত বাধাবিপত্তির মধ্যে বেঁচে রয়েছে। বইটির প্রথম ছবিতে দেখি বিকেলের শেষ আলোয় হ্যারিসন রোড। ট্রাম, বাস ও মোটর গাড়িতে সমস্ত রাস্তা জোড়া, আর জনস্রোত। বইয়ের শেষ ছবিতে দেখা যায় ঈদের প্রার্থনারত মানুষের সমুদ্র, মাঝখানে মনুমেণ্ট। আর একটি অবিশ্বাস্য ছবি ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমানের ময়দান মিটিং। এই ছবিটির ভিড় দেখলে তানজানিয়ার মানিয়ারা হ্রদের লালমাথা ফ্লেমিঙ্গোদের কথা মনে পড়ে। যেদিকেই তাকানো যায় ভিড় আর ভিড়। ট্রামে ভিড় বাসে ভিড়, ভিড় ফুটবল খেলায়, ভিড় বাজারে। ময়দানে কুস্তি দেখার জন্য একটি স্ট্যাচুর ওপরে চড়া লোকদের ছবি দিয়ে রঘুবীর সিং এই ভিড়ের ভাবটা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

কলকাতার দারিদ্র্য রঘুবীর সিং তুলে ধরেছেন বস্তির এবং বিশেষ করে রাস্তার ছবিতে। পৃথিবীর যে কোন নগরীতে রাস্তা লোক ও যানবাহন চলাচলের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় লোকে সংসার করে। রঘুবীর সিং দেখিয়েছেন লোকে কেমন করে রাস্তায় জীবনযাপন করছে। মেয়েরা রাস্তায় গুল তৈরি করছে, রাস্তার কলতলায় জল নিচ্ছে, ফুটপাথে রান্না করছে। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় গল্প করছে, জঞ্জালের মধ্যে খেলছে। রাত্রিতে লোকে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, এই কলকাতা শহরে জীবনের নাটক রাস্তার উপরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কলকাতাবাসীদের রাজনীতিপ্রবণতা রঘুবীর সিং তির্যকভাবে দেখিয়েছেন। যেমন বেলে-ঘাটায় মৃত কমরেডের শবাধার বহন করে চলেছে যুবকের দল। যেমন দেওয়ালের গায়ে অজস্র স্লোগান ও অজস্র ছেঁড়া পোস্টারের মনতাজ। জ্যোতিবোসকে দেখিয়েছেন পেছনে লেনিনের ও রেড আর্মির ছবিওলা বিরাট পোস্টার ও সামনে লাল সালুর ফ্রেমে-আঁটা বক্তৃতামঞ্চে। এ ছবিতে কেবল তাঁর মাথা দেখা যাচ্ছে। এটি একটি অসাধারণ ছবি।

এই সব নিয়ে কলকাতার প্রবহমান জীবনের চেহারা রঘুবীর সিং দেখিয়েছেন। রিকশা ও ঠেলাওয়ালারা ভার বহন করে চলেছেন। ডকে ও চটকলে শ্রমিকরা খাটছেন। পশ্চিমা শ্রমিকরা কলকাতায় কিছুকাল কাজ করে দল বেঁধে দেশে ফেরার জন্য শেয়ালদা অভিমুখে চলেছেন। রাস্তার ধারের দোকানীরা কারবার করছেন। বাজারে ব্যাপারীদের ঝগড়া হচ্ছে। শেয়ার মার্কেটের দালাল কেনা-বেচা নিয়ে ব্যস্ত। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফাইলের পাহাড়। বিয়ে হচ্ছে। এয়োস্ত্রিরা অষ্টমীর দিনে মা দুর্গার পায়ে সিঁদুর দিয়ে নিজেরা সিঁদুর বিনিময় করছেন। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের নিয়মিত ভিড় লেগে রয়েছে। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম তুলছেন। থিয়েটারের সাজঘরে অভিনেতা তৈরী হয়ে নিচ্ছেন। পটুয়া শিল্পী মা কালীর মূর্তিতে রঙ চড়াচ্ছেন। শিল্পী নীরদ মজুমদার নিজের আঁকা ছবির তলায় বসে পাইপ খেতে খেতে বেড়ালকে আদর করছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কফি হাউসে আর ফুটপাথে আড্ডা দিচ্ছে।

রঘুবীর সিং আজ সারা পৃথিবীতে একজন অসাধারণ ফোটোগ্রাফার বলে স্বীকৃতি লাভ

করেছেন। তাঁর দেখবার চোখ, তাঁর টেকনিক ও রঙের ওপর তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতার ফলে এই বইয়ের অধিকাংশ ফোটোগ্রাফই অনবদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফোটোগ্রাফের আসল চেহারা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। তবুও দু-চারটি ছবির বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন একটি ছবিতে দেখা যায় রাস্তার ধারে জঞ্জাল, সেই জঞ্জালের পাশে ফুটপাথে ছেলেরা বসে আছে, বস্তির লোকেরা রদ্দি মাল বেচছে আর পেছনে দেয়ালের গায়ে দশভুজার ছবি। সৌন্দর্য ও বীভৎসতার সমন্বয়ে এটি অবিস্মরণীয়। মার্বেল প্যালেসে গ্রীক প্রতিমূর্তির তলায় মা কালীর সামনে চারজন মহিলা দাঁড়িয়ে থাকা ছবিতে কলকাতার বাবু কালচারের শেষ রেশটুকু ধরা পড়েছে। তেমনিই আর-একটি ছবিতে যখন দেখি ভাঙা-থামওয়ালা বাড়ির নোংরা উঠোনে নগ্ন ইতালীয়ান মূর্তির চারপাশে গরু বাছুর দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন বুঝতে পারি যে এ হল বনেদী বাবুদের জীবনের ধ্বংসাবশেষ। আর-একটি অতুলনীয় ছবিতে দেখা যায় শীর্ণজীর্ণ দেহ নিয়ে মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তার পায়ের কাছে ফুটপাথে ঘুমন্ত সন্তান আর পেছনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির সাইনবোর্ডে লেখা ক্লিন্ ওয়ালস্ মেক্ এ ক্লিনার সিটি। এই বিদ্রূপকে আরও একটু শাণিত করার জন্য রঘুবীর সিং এই ছবির প্রায় পাশাপাশি একটি হোর্ডিং-এর ছবি দেখিয়েছেন। হোর্ডিং-এ দুর্গার মুখের ছবির পাশে লেখা আছে: লেট ক্যালকাটা বি দি প্রাইড অফ হেভেন সাম্ ডে—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রঘুবীর সিং-এর "ক্যালকাটা" দেখে কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে এতে কলকাতার যে চেহারা প্রকাশ পেয়েছে তা রূঢ়, কর্কশ, কুশ্রী। কথাটা বোধহয় রঘুবীর সিং নিজেও অস্বীকার করবেন না। তিনি হয়ত এও বলতে পারেন যে এই হল কলকাতার আসল রূপ। কলকাতাকে ভালবাসতে হলে এই সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে, রোমান্টিসিজম্-এর পলস্তারা চাপানোর দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৫৯ সালে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার রবার্ট ফ্র্যাঙ্ক "দি অ্যামেরিকানস্" বলে একটি ছবির বই প্রকাশ করেন। সেই বইয়ে হ্যামবারগার জয়েণ্টস্, মোটরগাড়ি দুর্ঘটনা, ইউ-রিন্যাল্স্, মোটেল এবং মিডল অ্যামেরিকার লোকজনের ছবিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এইগুলি দিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মোটরগাড়ি-উপাসক অ্যামেরিকানদের নিঃসঙ্গ, নিরানন্দময় জীবনের কুশ্রী চেহারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক প্রথমে এই বই অ্যামেরিকায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করে অপারগ হয়েছিলেন। শেষে বইটি প্যারিসে ছাপা হয়। এতদিন বাদে সেই বই আবার মার্কিন দেশে ছেপে বেরিয়েছে এবং এখানকার চিন্তাশীল পাঠকরা ও শিল্পীরা ফ্র্যাঙ্কের অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছেন। ফ্র্যাঙ্ক-এর মতে অ্যামেরিকার আসল চেহারাটা এতই শ্রীহীন যে সেখানে সুন্দর ছবি তোলা সম্ভব নয়। আমি যতদূর জানি রঘুবীর সিংও এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন। তিনি বলেন কলকাতার জীবনে দুঃখ এত গভীর, দারিদ্র্য ও কুশ্রীতা এত সর্বব্যাপী যে সেই কলকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করে দেখানো অসম্ভব। কলকাতার জোর অন্য জায়গায়। সেটা হল কলকাতার মানসিকতা। লাপিয়েরের মতে কলকাতা শহরের জীবনের বীভৎসতা দেখলে মানুষের শরীর ও মন প্রচণ্ড আঘাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। অথচ এ সব সত্ত্বেও তাঁর মতে কলকাতাই ভারতের একমাত্র শহর যাকে কসমপোলিটান সিটি বলা যেতে পারে। এর কারণ কলকাতার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক,

শিল্পী ইত্যাদিরা যাঁরা সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে সংস্কৃতিকে তাঁদের সৃজনী ক্ষমতা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে রঘুবীর সিং-এর বইয়ে একটা বড় ফাঁক থেকে গেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক জীবনের আরও ছবি থাকলে কলকাতার চেহারাটা আরও একটু পূর্ণাঙ্গ হত।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও রঘুবীর সিং-এর "ক্যালকাটা" এক অসাধারণ বই যা একাধারে কলকাতার প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

Hayavadana. *By* Girish Karnad. (Translated *by* the author) Oxford University Press. Bombay. Rs. 7.50.

কর্ণাটক নব নাট্য আন্দোলনে গিরীশ-কর্নাদের হয়বদন এক প্রতিনিধিত্বমূলক নাটক তো বটেই। গিরীশ তাঁর নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের এক বাস্তব সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অগ্রণী ; যে নাটক একই সঙ্গে পাঠক ও দর্শকের তৃপ্তির কারণ তাই গভীর অর্থে গ্রাহ্য। এ নিরিখে একালের অনেক নামজাদা নাটকও মার খায়। আনন্দের কথা, গিরীশ একদিকে যেমন নাটক সাজাবার ব্যাপারে যত্ন নিয়েছেন তেমনি মনোযোগ দিয়েছেন ভাষার প্রতি।

দেহ ও মনের বিবাদ এক আবহমানকালের বিষয়। কথাসরিৎসাগরের গল্প থেকে টমাস মান তা আহরণ করে তাঁর "মস্তক বিনিময়" গ্রন্থে দেহ ও মনের নিরর্থক দ্বন্দ্বের অবসানে প্রয়াসী হয়েছেন। মানের এই উপাখ্যানেরই এক নবরূপ গিরীশের নাটক। দেবদত্ত ও কপিলার আবাল্য মৈত্রী খণ্ডিত হল পদ্মিনী-দেবদত্তের বিবাহে—সেই পুরনো ত্রিভুজে। দুই বন্ধুর আত্মহনন এবং ক্রমিক কায়দায় কালীমন্দিরে বিহ্বলা পদ্মিনীর কম্পিত হাতে দুই মাথা দুই বিপরীত দেহে স্থাপন এবং তাদের জীবনলাভ থেকে নাটকের দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব। পদ্মিনী চায় কপিলার পেশীস্বচ্ছল দেহ এবং মনীষী দেবদত্তের মাথা—যাকে বলা যায় পূর্ণ পুরুষ। বিবাদ বাড়ে মাথা ও দেহের দ্বন্দ্বে ; শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে দ্বিতীয়বার মৃত্যুতে এবং প্রকৃতপক্ষে দুজনেরই স্ত্রী পদ্মিনীর সহমরণে মূল নাটকের শেষ। এরই সঙ্গে ঘোড়ামুখো মানুষের আওতার প্লট—যে পূর্ণ মানুষ হতে গিয়ে পূর্ণ ঘোড়ায় পরিণত।

মুখোস, পুতুল, কথাকলি নৃত্যের পর্দা সবই ব্যবহার করেন গিরীশ নাটক আরও জোরালো করে তুলবার জন্যে। প্রথম দিকে গদ্যের কোনো কোনো অংশে ভাষা বেশ আড়ষ্ট, দেবদত্ত ও পদ্মিনীর দাম্পত্য টেন্‌শান আরও জোরালো তুর্কির আঁচড়ে ফোটানো প্রয়োজন ছিল, তবে মস্তক-বিনিময়ের পর থেকে ভাষা আরও সাবলীল—বিশেষ করে কবিতার কোরাস অংশে। ইংরাজী অনুবাদও এক্ষেত্রে আধুনিক মানসিকতা বহন করে।

Bhagavata. You cannot engrave on water

nor wound it with a knife,
which is why
the river
has no fear
of memories

Female Chorus. The river only feels the
pull of the waterfall.
she giggles and tickles the rushes
on the banks, then turns
a top of dry leaves
in the navel of the whirlpool, weaves
a water-snake in the net of silver strands
in the green depths, frightens the frog
on the rug of moss, sticks and bamboo leaves,
sings, tosses, leaps and
sweeps on in a rush—

Bhagavata. Which the scarecrow on the bank
has a face fading
on its mudpot head
and a body torn
with memories.

অসীম রায়

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রথম খণ্ড—ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। নতুন পরিবেশ প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য সতেরো টাকা।

বছর পঁচিশ আগে, "মার্কসবাদী" পত্রিকায়, পাঁচটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই পাঁচটি প্রবন্ধ, এবং ১৯৬১তে "রবীন্দ্র-বীক্ষা"য় প্রকাশিত ভবানী সেন রচিত একটি প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ আলোচ্য পুস্তকটি। তৎসহ আছে, গত পঞ্চাশ বছরের বাঙলাদেশে সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে মার্কসীয় আলোচনায় একটি দীর্ঘ ইতিহাস। আমাদের দেশে, মার্কসীয় সাহিত্য-বিচার কোন্ পর্যায়ে আছে এবং ছিল, তা বুঝবার পক্ষে গ্রন্থটি খুবই উপযোগী। বর্তমান আলোচনায়, আমরা এই ছয়টি

প্রবন্ধের মূল কথা কী, সেটা দেখে নিয়ে এই প্রসঙ্গে দুটি-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করব।

'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধে ধীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন বলেছেন,

(১) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি হলো শ্রেণীসংগ্রামের অভিব্যক্তি। কোনো শিল্পী এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন না-ও পারেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি শ্রেণীসংগ্রামের কোনো না কোনো পক্ষের অস্ত্র হতে বাধ্য। শ্রেণীনিরপেক্ষ কোনো শিল্পী নেই।

(খ) বাস্তবের বিরোধাত্মক ও আকস্মিকতাপূর্ণ ক্রমবিকাশের সূত্রেই ভাবসম্পদের উৎপত্তি। আবার চিন্তাজগৎ বাস্তবের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(গ) ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজকে চিরস্থায়ী মনে করে এবং ধনিকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে যুগ-নিরপেক্ষ এবং শ্রেণী-নিরপেক্ষ মনে করে। শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি বা প্রলেটারিয়ান আর্ট হলো শ্রেণীসমাজ ধ্বংস করার অন্যতম অস্ত্র।

(ঘ) রবীন্দ্রযুগ উদীয়মান ধনিকসভ্যতার যুগ থেকে আরম্ভ করে ধনিকসভ্যতার অন্তিমযুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতর তাই আছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দৈন্যের সমালোচনা।

(ঙ) "শেষের কবিতা"র মূল কথা হলো সমাজের বাস্তব ব্যবধান নরনারীর স্বাভাবিক মিলনের পথে ব্যবধান রচনা করেছে। তাই ব্যক্তি নিজেকে সার্থক করেছে অতীন্দ্রিয় জগতে। রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করেও, শেষ করেছেন ধনিকসভ্যতার আত্মরক্ষা দিয়ে। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে ব্যক্তিত্ববাদ প্রভুত্ববাদী সমাজকে অগ্রাহ্য করেছে, কিন্তু শেষ হয়েছে ভাববাদে। "গোরা"তেও ব্যক্তিত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যক্তিত্ববাদ প্রচার রবীন্দ্রনাথের প্রধান সৃষ্টি, এই ব্যক্তিত্ববাদের জয়ঘোষণাই ধনিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার ভাবযন্ত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতিকে যেভাবে আঘাত করেছেন, তা শ্রমিকের নিকটও একটি অমূল্য সম্পদ।

(চ) রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যিকেরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতিকে আঘাত করেননি, যদিও ব্যক্তিত্ববাদ প্রচার করেছেন। বনফুল, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে—এঁরা সবাই এই দলের। এঁরা বাস্তবের নিরপেক্ষ সংবাদদাতা নন, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি; অতীতের মৃত্যু, বর্তমানের প্রলয়, অনাগতের ভবিষ্যতের সূচনা—কোনটিই এঁরা করেননি, বরং নৈরাশ্যবাদের প্রচার করে, ধনিকশ্রেণীর সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং পরে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্ববাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু প্রাচীন সংস্কারও ভেঙেছেন। ধনিকশ্রেণীর যখন নাভিশ্বাস ওঠে, তখন কোনো রকম আত্মসমালোচনাও বরদাস্ত হয় না, সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও তখন থেমে যায়। সজনীকান্ত-বনফুল-সুবোধ ঘোষ এইজাতীয় লেখক, সংস্কারও ভাঙেননি, ব্যক্তিত্ববাদও প্রচার করেছেন।

'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' প্রবন্ধে ঊর্মিলা গুহ নামে প্রদ্যোৎ গুহ বলেছেন :

(ক) মার্কসবাদ বড়জোর শিল্পসাহিত্যের উৎসের সন্ধান দিতে পারে, তার বেশি নয়—এই কথা অত্যন্ত অসত্য। বিষয়বস্তুকে অপ্রধান করে আঙ্গিকের উপর জোর দিয়ে শিল্পের বিচার করা অমার্কসীয়। আঙ্গিককে যুগ-নিরপেক্ষ বা শ্রেণীনিরপেক্ষ ভাবাও অমার্কসীয়।

(খ) মার্কসীয় সমালোচনার মূলসূত্র হচ্ছে : প্রতিনিধিমূলক চরিত্রকে প্রতিনিধিমূলক

পারিপার্শ্বিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে কিনা বিচার করা। অচিন্ত্য-তারাশঙ্করের চাষীচরিত্রগুলো প্রতিনিধিমূলক নয়। কারণ এরা নিষ্ক্রিয় এবং স্বাবলম্বী হতে অক্ষম। সেইহেতু অচিন্ত্য-তারাশঙ্কর অবাস্তব।

(গ) শিল্পকর্ম বিচার করতে হবে তার নিজের নিয়মে, সাহিত্যবিচারে সাহিত্যবস্তুই প্রধান বিবেচ্য, লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনীতি বা পারিপার্শ্বিকতা বিচারের প্রয়োজনীয়তা নেই—এইসব তত্ত্ব অসত্য। সাহিত্যের ইতিহাসও, সাহিত্যের বিচারও সমাজনিরপেক্ষ নয়।

'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধে প্রকাশ রায় নামে ভবানী সেন বলেছেন :

কেউ কেউ বলেছেন, বিবেকানন্দ একজন প্রগতিশীল মনীষী, তবে তাঁর গণতান্ত্রিকতা এবং স্বাদেশিকতা প্রকাশ পেয়েছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কিন্তু বলিষ্ঠ রাস্তা, ধর্মের ভাষায়।

এই ধারণা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা। বিবেকানন্দের ধর্ম শাসকশ্রেণীর সহায় হয়েছিল। তা ছাড়া বিবেকানন্দের ইতিহাসবোধ ভ্রান্ত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতবাসী মরতে বসেছিল, এই ধারণা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ইত্যাদি। ভারতীয়রা নির্বিচারে শুধু মারই খায় নি, পাল্টা মার দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এটা ভুলে গিয়ে বিবেকানন্দ ত্যাগ, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে নৈরাশ্যের জন্ম দিয়েছেন।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সকলেই ভারতের অধ্যাত্মবাদকে, ত্যাগধর্মকে শ্রেয় বলে প্রচার করে, নৈরাশ্যের জন্ম দিয়ে, বুর্জোয়াদের সহায়তা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জলন্ত ঘৃণা যাঁর রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠেনি, তাঁর রচনাই প্রতিক্রিয়াশীল।

দীনবন্ধু, নজরুল, সুকান্ত এই নিরিখে প্রগতিশীল।

এ সমাজ অসুন্দর তা সত্য, কিন্তু যেহেতু সমাজ অপরিবর্তনীয় সুতরাং এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে যাও, ভগবানে আত্মসমর্পণ করো, জনতা যাতে পরিবর্তনপ্রয়াসী না হয়, সে জন্য জনতাকে অতীত-অভিমুখী করো, বুর্জোয়া চক্রান্তেই এই জাতীয় দর্শনের উৎপত্তি হয়।

ওই একই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র গুপ্ত নামে ভবানী সেন বলছেন :

প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি গণ-বিদ্রোহে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথে নয়।

কেউ কেউ আপত্তি করেছেন এই তত্ত্ব গ্রহণ করতে। তাঁদের ধারণায় ওয়াহাবি, সিপাহী ইত্যাদি বিদ্রোহের আকৃতি ব্রিটিশবিরোধী হলেও প্রকৃতি প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা এই বিদ্রোহীরা ফিউডাল নেতৃত্বে আস্থাশীল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ আকৃতিতে প্রতিক্রিয়াশীল (ধর্মে আস্থাশীল বলে) হলেও প্রকৃতিতে প্রগতিশীল, কেননা ব্রিটিশবিরোধী।

এঁরা ইতিহাস বোঝেন না। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ফিউডাল প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ছিল না। ভারতীয় প্রগতির প্রধান শত্রু তখন ছিল ব্রিটিশ শাসন এবং তার স্তম্ভ ছিল ফিউডাল রাজন্যবর্গ। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল কৃষকদের হাতে, বাহাদুর শাহের হাতে নয়।

প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন কেবল দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেননা তাঁদের সাহিত্যে ফুটে ওঠে ইংরেজবিদ্বেষ। মাইকেল প্রগতিশীল ছিলেন, কেননা ব্রিটিশ শাসনের

ভণ্ড জমিদারদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন তাঁর প্রহসনে।

ভারতচন্দ্র ও আলাওল প্রগতিসাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁদের রচনায় কৃষকেরা স্থান পেয়েছিল, হিন্দুমুসলমান-মৈত্রী সমাদর পেয়েছিল, পুরুষরমণীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ইংরেজ শাসন এই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নষ্ট করে দেয়। তার বদলে জাগিয়ে তোলে বঙ্কিমী ঐতিহ্য, মুসলমানবিদ্বেষ, অধ্যাত্মবাদ, হিন্দু গোঁড়ামি, অভিজাতশ্রেণীর প্রতি মোহ ইত্যাদি।

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ফিউডাল শ্রেণীর প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াশ্রেণীর। রবীন্দ্রদর্শনের সারমর্ম উপনিষদের মায়াবাদ, যা বুর্জোয়া অস্ত্র। তিনি হিন্দুমুসলমান-মৈত্রীতে বিশ্বাস করেন না; কৃষকের শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, গণসংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। অবশ্য শেষজীবনে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে আস্থা হারিয়েছিলেন, কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শেষজীবন দিয়ে বিচার করা যায় না। তিনিই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে আপোস করে নিতে বলেছিলেন।

রামমোহনও প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। মার্কস বলেছেন, ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ধনতান্ত্রিক প্রগতিশীলতার উৎস খুলে যায়। মার্কস কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রগতিশীল এ কথা বলেন নি, বরং ব্রিটিশ বিদ্রোহই সবচাইতে বড়ো প্রগতিশীলতা—এই কথা বলেছেন।

উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিমসাহিত্যের ভূমিকায় নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই সামন্ত নবাব ও ব্রিটিশ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম আরম্ভ হয়—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের ইংরেজ-সমর্থন চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা। আনন্দমঠ এর পরিচয়। দেবী চৌধুরাণী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিকৃত রূপ। বঙ্কিমের গীতা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধতা করেছে। কোথাও কোথাও বঙ্কিম কৃষকের দুঃখে অশ্রুপাত করেছেন, কিন্তু কৃষক-জমিদারদের দ্বন্দ্বে তাঁর সহানুভূতি মুখ্যত জমিদারদের প্রতি। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীলতা এতই প্রকট যে এ বিষয়ে বেশি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' প্রবন্ধে ভবানী সেন বলেছেন : বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও পতন—এই দুইটি যুগের সমষ্টি হলো রবীন্দ্রযুগ। তিনি ছিলেন মহান শিল্পী, যুগের সমগ্র সত্তা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। সামন্তবাদের অবসান, ধনিক সভ্যতার উত্থান, সাম্রাজ্যবাদের পতন, সবই তাঁর সৃষ্টিতে বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন ভাববাদী। কিন্তু তাঁর ভাববাদ বাস্তববিমুখী নয়, আদর্শবাদ-অভিমুখী। ভাববাদ সত্যের বিরোধী, অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ সত্যের বিরোধী নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ মহান শিল্পী।

প্রবন্ধগুলোর এই মোটামুটি পরিচয় থেকে কয়েকটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল বিষয় নিয়ে বাঙালী তাত্ত্বিকেরা কোনো আলোচনাতেই যান নি, ধরেই নিয়েছেন মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন। মার্কস এঙ্গেলস সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ যে আলোচনা

করেন নি, সে বিষয়ে আমাদের পণ্ডিতেরা বেশি চিন্তিত নন। তাঁদের একমাত্র চিন্তা, কোন্ সাহিত্যিক প্রগতিশীল কোন্ সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়াশীল—এই ছাপটি দেওয়া বিষয়ে। কিন্তু প্রগতিশীল সাহিত্যিকের মাপদণ্ড কী এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় নানা সমস্যার উদয় হয়। এর চরম উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীলতা নির্ণয়ে সংশয়। ভবানী সেন, যিনি নাকি খুবই বড়ো তাত্ত্বিক, তাঁর প্রবন্ধত্রয় একসঙ্গে পড়লে হাসি খুব পায় না, কষ্টই হয়। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ, কারণ তিনি মহান শিল্পী। যদিও এঁরই বিবেচনা, সাহিত্যিকমাত্রেই শ্রেণী-সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত শ্রেণী নিয়ে লিখেছেন, কৃষকদের নিয়ে লেখেন নি, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর অন্যায় বলে না-ও মনে হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তো এস্কিমোদের নিয়েও লেখেন নি, সেটা কি খুবই দোষের! রবীন্দ্রনাথের রচনা চাষীদের জন্য নয়, মজুরদের জন্য নয়, এটাও খুব দোষাবহ বলে মনে হয় না। কোনো সাহিত্যিক কী নিয়ে লেখেন নি, সেটা খোঁজার আগে দেখা দরকার যেটা নিয়ে লিখেছেন সেটা সত্যভাবে লিখেছেন কি না। এটা বুঝতে না পারলে সাহিত্যবিচার না হয়ে মূর্খতার পরিচয় হয়ে ওঠে। যেমন একটি উদাহরণ, ভবানী সেনের "শেষের কবিতা"র আলোচনা। তাঁর ধারণায় অমিত-লাবণ্যের বিবাহ ঘটল না শ্রেণীবৈষম্যের জন্য। এটা তিনি ভুলে গেছেন, অমিত-লাবণ্য দুজনে একই শ্রেণীর মানুষ। এই ধরনের অবিরাম ভ্রান্তির পরিচয় আমাদের মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচকদের লেখায় পাওয়া যায়; তার মূল কারণ, এঁরা মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলো সম্পর্কেই অবহিত নন। মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল সমস্যা হলো এই প্রশ্নগুলো: শিল্প শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমন্বয় হতে পারে কি পারে না? আঙ্গিক কি শ্রেণীদ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়? অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সাহিত্যিক কাঠামোর সম্পর্ক কতটা প্রত্যক্ষ? একজন সাহিত্যিকের শ্রেণীনির্ণয় কীভাবে সম্ভব, যখন তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন? টলস্টয়-বালজাক সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্য প্রশ্নটিকে সহজ না করে আরো জটিল করে তুলেছে। এই প্রশ্নের সমাধান না করে সাহিত্যবিচার করতে গেলে, তা আর সাহিত্যবিচার থাকে না, তা হয়ে ওঠে সাহিত্যিকদের জাত তুলে গালাগাল। এতে সমালোচকের গাত্রদাহের প্রশমন হতে পারে, পাঠকের কোনো সুরাহা হয় না।

'মার্কসবাদীরা' মনে করেন নৈরাশ্যবাদ একটি বুর্জোয়া চক্রান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে যেমন, তেমনই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এই নৈরাশ্যের জন্ম দিয়ে চরম অপরাধ করেছেন। মার্কসবাদীদের দাবি—কৃষক, সাধারণ মানুষ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, এটা দেখালে সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়। দেখাতে হবে, সাধারণ মানুষ মারও দেয়। ভবিষ্যতের কথা বলতে হবে, যেহেতু সমাজতন্ত্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অনাগত স্বপ্নের কথা না বলা পর্যন্ত সামাজিক বাস্তবতার সৃষ্টি হবে না। দাবিটি বিচিত্র। যে দেশে যে যুগে সংস্কৃতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক অগ্রগতির কোনো চিহ্নই স্পষ্ট নয়, সেখানে ধ্বংসের ছবি আঁকাই মনে হবে বাস্তবমুখী। যদি নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই ধ্বংসের স্পষ্ট ছবিই হয়তো সাহায্য করবে নতুন সৃষ্টিকে। তার বদলে অলীক স্বপ্নের কথা বলা অর্বাচীনতা। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সত্য ঘটনা, কিন্তু যে সাহিত্যিক এই বিদ্রোহের অংশী জনগণকে নিয়ে লিখছেন না যাঁর লক্ষ্য

ও বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক জনতা, সেই জনতার উপর এই বিদ্রোহের প্রভাব না-ও পড়তে পারে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অবলম্বন করে "দেবী চৌধুরাণী" লেখা অসততা, "দেবী চৌধুরাণী" উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও নয়, কিন্তু যেহেতু সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে অতএব 'শেষের কবিতা' অবাস্তর, এ-কথা বলা বাতুলতা। সাহিত্য বৃহৎ জগতের অংশমাত্র, সাহিত্য ও জগৎ সমার্থক নয়, এই সরল কথাটি 'মার্কস-বাদী'রা মনে রাখেন নি। তা ছাড়া, সমষ্টির সমস্যা ও ব্যক্তির সমস্যা সবসময় একই স্তরের না-ও হতে পারে। যে সাহিত্যিক ব্যক্তির সমস্যা নিয়ে লিখছেন, এবং যে ব্যক্তির সমস্যা শ্রেণীনিরপেক্ষ (যথা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা), সেই সাহিত্যিকের লেখায় বুর্জোয়া, সামন্ত বা সমাজতান্ত্রিক সমস্যার সন্ধান ফলপ্রদ হবে না।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী চৌধুরানী। রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা ১২। মূল্য ষোল টাকা।

"জীবনের ঝরাপাতা" শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী। তবে পূর্ণ আত্মজীবনী নয়, এতে লেখিকা তাঁর প্রাক্-বিবাহ জীবনের কথাই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিবাহোত্তর জীবনের কথাও লিপিবদ্ধ করে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু তার অবসর পাননি, সে-কাজ সম্পাদন করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। সরলা দেবীর জন্ম ১৮৭২ সালে আর তাঁর বিবাহ হয় ১৯০৫ সালে। এর অন্তর্বর্তী তেত্রিশ বৎসর কালের কথা এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

আত্মজীবনী মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা হলেও এই বইটি ঠিক সেই গোত্রের নয়। এর বিশিষ্টতা এইখানে যে, এ একাধারে সরলা দেবীর ব্যক্তিজীবনের কথা এবং তাকে অবলম্বন করে বাংলার একটা গোটা যুগের বিশেষ পারিবারিক ধাঁচধরন, সামাজিক আচার-প্রথা, নাগরিক অভিজাত ও উচ্চকিত সমাজের লোকেদের মানসিকতা, স্ত্রীশিক্ষা, এমনকি রাজনৈতিক আলোড়ন-বিলোড়নেরও কথা। আমরা যেন এই বইয়ে সরলা দেবীর আত্মকথায় উনিশ শতকের শেষ সিকি-পাদ এবং বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছরের কলকাতা শহরের একটা জীবন্ত আলেখ্য প্রত্যক্ষ করতে পারছি। অবশ্য এ কলকাতা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-শ্রমিক-অধ্যুষিত কলকাতা নয়, এ কলকাতা আভিজাত্যের বাতাবরণ-ঘেরা, কিন্তু সচ্ছলতার বর্মে সুরক্ষিত। সেই আভিজাত্যেরও কেন্দ্রমণি আবার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার, যে-পরিবারের দৌহিত্র বংশে সরলা দেবীর জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী শুধু আত্মীয়তা-সূত্রেই বিশিষ্টা ছিলেন না, তিনি নানাদিক দিয়ে আপনাকে স্বকীয়তামণ্ডিত করে উত্তরকালে স্বীয় অধিকারে বাংলার নারীকুলের অবিসংবাদিত নেত্রী-পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী হলেও এই বিশিষ্টা মহিলা কিন্তু অসামান্য প্রতিভাধর মাতুলের ছায়ায় নিজেকে বর্ধিত করেননি বা তাঁর জীবন-বৃত্তের ছাঁচ নিজ জীবনে অনুকরণ করতে যান নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগিনেয়ীর

ইচ্ছার গতি স্পষ্টতঃই মামার আদর্শের প্রতিকূলে বাঁক নিয়েছে। সরলা দেবীর স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতাকে চিহ্নিত করে এরূপ বহু ঘটনার বিবরণে "জীবনের ঝরাপাতা" পূর্ণ। বইখানির ইতিহাসগত মূল্য তো আছেই, উচ্চ সমাজের একটি শিক্ষিতা নারীর সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছায় আপন ব্যক্তিত্ব সংগঠনের কাহিনীরূপেও বইখানির মূল্যবত্তা অসীম।

সরলা দেবীর স্বাতন্ত্র্যমুখী মনোভাবের কথা বলেছি। বইয়ের গোড়াতেই তার একটি নজিরের দেখা পাই। ঠাকুরবাড়ির ধারা ছিল, ওই পরিবারের মায়েরা সন্তানদের নিজেদের কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেন না, বিলিতি কেতামাফিক দাসীদের হাতে এ ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিজেরা সন্তান থেকে দূরে আলাদা জগতে বাস করতেন। খুব সম্ভব জননীর আপন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা এবং সকল সময়ের জন্ম স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত থাকার অভিপ্রায় এই অস্বাভাবিক অভ্যাসের মূলে সক্রিয় ছিল। সরলা দেবীর ভাগ্যেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি পুরাপুরি ধাত্রীস্তন্যপালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন এবং শৈশবে মায়ের স্নেহ এতটুকুও পাননি। এমনকি মা তাঁকে ভুলেও একদিন গা-বুলিয়ে আদর করেননি। প্রকৃতপক্ষে, মা আর মেয়ে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন মহলে বাস করতেন। ঠাকুরবাড়িতে এমন অদ্ভুত প্রথা কী করে বেড়ে উঠেছিল তাই ভেবে এক-এক সময় আমাদের অবাক্ লাগে। লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে এই প্রথার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নিজের 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' প্রতিপালিত হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি এই প্রথার সমালোচনা করেন নি। কিন্তু সরলা দেবী মায়ের বিরুদ্ধে এই বাবদে বরাবর ক্ষোভ পোষণ করেছেন এবং আত্মকথায় তাকে প্রকাশ্যে অভিব্যক্তি দিয়েছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় সাংস্কৃতিক চর্চায় রুচির কৌলীন্য বিষয়ে অভিনবত্বের পথপ্রদর্শনে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার অসাধারণ গৌরবের অধিকারী হলেও, সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে যে, ওই পরিবারের কোন কোন আচার ও অভ্যাস কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। সরলা দেবী অপ্রতিবাদে এ সব প্রথা মেনে নেননি, নালিশের আকারে সেগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ অন্তরে পুষে রেখেছেন, উত্তরজীবনে তাদের বাধা দিয়েছেন।

মনে হয়, পিতৃদেবের কাছ থেকেই কন্যা এই স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা উত্তরাধিকারস্বরূপ পেয়েছিলেন। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল ঠাকুর পরিবারে বিবাহকালে মহর্ষিদেবের প্রবর্তিত দুটি রীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন: ১। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ২। ঘরজামাই থাকা। বিবাহের পর জানকীনাথ প্রথমে সিমলাপাড়ায়, পরে কাশিয়াবাগানে আলাদা সংসার প্রতিষ্ঠা করেন, কেবল তাঁর বিলাত প্রবাসকালে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে জোড়াসাঁকোর পিতৃগৃহে এসে বাস করেন। এই সময়ের ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সরলাদেবীর রচনায় ছবির মত প্রকাশ পেয়েছে। বইটির এই অংশ মূল্যবান এই কারণে যে, সরলাদেবীর লেখায় একটা সমালোচনার সুর আছে, যা অন্যত্র দুর্লভ।

সমালোচনার নজিরের উল্লেখ আগেই করেছি, আরও নজির আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠাকুর পরিবারের ১১ই মাঘের উৎসবকে পারিবারিক উৎসবের আনন্দ থেকে বিচ্যুত করে তাকে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানিক উৎসবের রূপ দেওয়ার ভাগিনেয়ী মামার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যুক্তির বিচারে এ অভিযোগ হয়ত ধোপে টিকবে না কিন্তু বহির্জগতের

সংস্পর্শবর্জিত গৃহবদ্ধ প্রায়-অসূর্যম্পশ্যা ঠাকুরবাড়ির ললনাকুলের সম্মিলিত ক্ষোভ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশের পথ খুঁজেছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কবিকথিত 'নারীর আপন ভাগ্য আপনি জয় করবার' আকুতিতে বইটির পৃষ্ঠাগুলি ঠাসা। উত্তর জীবনে সরলাদেবী কর্তৃক শৌর্য-বীর্যের সংস্কারের উজ্জীবক 'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তন, বঙ্গভঙ্গের সূচনায় 'রাখীবন্ধন' প্রথার অবতারণা, আরও পরে জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা শাখা রূপে 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল'-এর প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষার উপায় হিসাবে 'ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন' স্থাপনা, বিবাহোত্তরকালে দেশের বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সংযোগ প্রভৃতি বিচিত্র কর্মোদ্যোগের মধ্যে এই অসামান্যা নারীর আত্মপ্রকাশের আবেগ ও সংগঠন-নৈপুণ্য যুগপৎ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। উল্লিখিত কর্মোদ্যমগুলির কোনটারই ছাঁচ ঠিক পুরোপুরি ঠাকুরবাড়ির ধাঁচের নয়, বিশেষ, 'বীরাষ্টমী' আর বিপ্লবী ভূমিকা তো একেবারেই নয়।

শুধু বীরত্বের উদ্বোধনায় আর নারীপ্রগতির আন্দোলনের সংবর্ধনায়ই সরলাদেবীর কর্মশক্তি নিঃশেষ হয়নি, জীবনের সুকুমার, সুন্দর কয়েকটি দিকের লালনেও তিনি তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। উদাহরণতঃ, সাহিত্যে ও সংগীতে তাঁর মূল্যবান অবদানের উল্লেখ করতে হয়। তিনি একাধিক গ্রন্থের প্রণেত্রী ছিলেন এবং দুই পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পত্রিকা "ভারতী"র সম্পাদনা করেন। প্রথমে দিদি হিরণ্ময়ীদেবীর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৩০২-০৪ এই তিন বছর, পরে আর-একবার সম্পাদনায় ১৩৩১ ৩৩ কিঞ্চিদধিক আড়াই বছর। ছাত্রী অবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হয়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই চর্চা অব্যাহত থাকে। বইখানিতে লেখিকা বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর সাহিত্যিক কর্মপ্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ, কোন একটি সাহিত্যিক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে সাহিত্যের তুলনায় সংগীতে তাঁর প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তিমন্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গানের সুরচয়নে সরলাদেবীর এক স্বভাব-দক্ষতা ছিল। কেমন করে নতুন নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার গানের সুর কুড়িয়ে তিনি তাঁর গানের ভাণ্ডার পুষ্ট করতেন তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন বইয়ে। মহীশূরে শিক্ষিকার কর্মরত থাকাকালে সেখানে যে-সব মহীশূরী সুর শুনেছিলেন, কলকাতায় ফিরে সেগুলি মামাকে শোনান—তার থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত মহীশূরী-সুরাশ্রিত গানগুলি রচনা করেন। ভারতীয় রাগসংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, লৌকিক ভজন ও গীত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর ও ধারার গানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তবে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কোরাস গানেই বোধহয় তাঁর সংগীতশক্তি সবচেয়ে অবলীলায়িত হয়ে উঠেছে। তাঁর দুটি কোরাস 'অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী গাও আজি হিন্দুস্থান' ও 'নমো ভারতজননী' আজও ব্যাপকভাবে গীত ও প্রচারিত। 'বন্দেমাতরম' গানের শেষ স্তবকগুলির সুর তাঁরই দেওয়া— ১৯০৫ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি এই সুরে বন্দেমাতরম্ গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন। তাঁর নিজের রচিত গানগুলি রক্ষিত আছে "শতগান" ও "গীতি-ত্রিংশতি" নামক পুস্তকদ্বয়ে।

বইখানি পড়তে পড়তে পুরনো দিনের কলকাতার আবহে স্বতঃই মন চলে যায়। শুধু পুরাতন আবহই নয়, ঠাকুরবাড়ি-সুলভ পুরাতন কথ্যরীতির স্বাদও এই বইয়ের পাঠের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। কয়েকটি শব্দের নমুনা দিই—জিদ্দি, ক্রোধালু, উবরো-খুবরো (এবরো-খেবরো অর্থে), অন্ধকার, বাবামহাশয়, বাড়িভিতর, মজাড়ে লোক, হলচল (হুলুস্থুলু অর্থে), ছাড়ান, পরিক্ষীণ, ঠেলা দেওয়া, উচ্চারণে আড় থেকে যাওয়া, ইত্যাদি। এই চালের কথ্যভঙ্গী এখন আর বিশেষ শুনতে পাওয়া যায় না।

বইয়ের পরিশিষ্টে পরলোকগত যোগেশচন্দ্র বাগল সংকলিত বইয়ে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও স্থানের বিস্তৃত পরিচায়িকা গ্রন্থের এক অনবদ্য সম্পদ। তার উপরেও একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এই নতুন সংস্করণে সংযোজনা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আলোচনা আরও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

নারায়ণ চৌধুরী

The Practice of Management. *By* Peter F. Drucker. Mercury. New York.

Managing for Results. *By* Peter F. Drucker. Heinemann. London.

The Effective Executive. *By* Peter F. Drucker. Heinemann, London.

"পরিচালনার উদাহরণ" (*The Practice of Management*) বেশ বড় বই। সামান্য একটু ভূমিকার পরে বইখানির পাঁচটা ভাগ।

প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য ব্যবসা বলতে কী বোঝায় তা দেখা। ব্যবসা মানে লাভজনক ব্যবহার, একথা পিটার ড্রুকারের পছন্দ নয়। লাভ বাড়ানো, এই উদ্দেশ্য আধুনিক বড় বড় কারবারে প্রধান কথা নয়। লাভ হল কি হল না তার গুরুত্ব আছে, কিন্তু ব্যবসায় প্রধান কথা খরিদ্দার সংগ্রহ। এই খরিদ্দার সংগ্রহের দুটি দিক আছে—চাহিদার সৃষ্টি এবং নূতনত্বের চর্চা। চাহিদার সৃষ্টিই ব্যবসার প্রকৃত উদ্দেশ্য, উৎপন্নের চাহিদাই হোক বা সেবারই হোক। যার চাহিদা অর্থাৎ বাজার নেই তা ব্যবসা নয়। বিক্রি করাই প্রধান কাজ, উৎপাদন তার অধীন কথা। লোকে কিসের জন্যে পয়সা খরচ করতে রাজী আছে, তা জানতে হবে। খরিদ্দার সংগ্রহ শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতেরও বস্তু, নিত্যনূতন না হলে চলে না। Annual customer survey ও market standing সম্বন্ধে পিটার ড্রুকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। এরপর উৎপাদনের তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা আছে, প্রত্যেকটির জন্যে পরিচালন ভিন্ন। Mass production একান্ত নয়, তিনটির মধ্যে একটি।

দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য অধস্তন পরিচালকদের চালানো নিয়ে আলোচনা। অধস্তন পরিচালক না বলে অধস্তন কর্মসংবাহক বলা যায়। ইংরেজী management কথাটা সুদূরপ্রসারী। কর্তৃপক্ষও এর মধ্যে পড়ে, আবার ফোরম্যানও শ্রমিকদের চোখে এর মধ্যে পড়ে। সমগ্রতার দায়িত্ব যার সেই পরিচালক। সমগ্রতার দায়িত্ব বড় কারবারে বহুলোকের। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে হয় সর্বদাই। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখলে চলে না, অথচ বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যার ভরপুর।

Management by objectives বলতে পিটার ড্রুকার যা বোঝেন তার মূল কথা—অধস্তন অথচ সমগ্রতার দায়িত্ব আছে এমন লোককে আত্মপরিচালনা করতে শেখানো। নিজেই নিজের কাজের সাফল্য যাতে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা যায়। একটা উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানিতে ভ্রাম্যমাণ হিসাবপরীক্ষক আছে, প্রত্যেক ইউনিট বছরে একবার করে পরীক্ষা করে দেখে। রিপোর্টটা যায় সেই ইউনিট ম্যানেজারের কাছেই, উপরে নয়। এধরনের আত্মপরিচালনার উপর পিটার ড্রুকার বিশেষ জোর দিয়েছেন, বিভিন্ন দিক অনেকভাবে দেখিয়েছেন। এছাড়া কিছু মন্তব্য আছে executive team সম্বন্ধে।

তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু পরিচালনার বিন্যাস। বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কারবার ছোট, মাঝারি, বড় এবং অতি বড—এই চার রকম হয়। প্রত্যেকটি পরিচালন-বিন্যাস চার রকম, পরিচালনার সমস্যাগুলি আলাদা।

চতুর্থ ভাগের বিষয়বস্তু শ্রমিক পরিচালনা করা। পিটার ড্রুকার personnel administration theory এবং human relation theory-র বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করছেন। তারপর টেইলরের (*Scientific Management*) সম্বন্ধেও কিছু কথা বলছেন, assembly line ছাড়াও ভালোভাবে কাজ আদায় করা চলে, তাই বলছেন। এরপর ফোরম্যান প্রথার বিরুদ্ধে কিছু কথা আছে, পিটার ড্রুকার ফোরম্যান প্রথা উঠিয়ে দিতে চান।

পঞ্চম ভাগের বক্তব্য বেশী নয়। কী করে আন্দাজ ছেড়ে জ্ঞানে পৌছনো যায়, কর্মভার সরলীকৃত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।

"সফল পরিচালনা" (*Managing for Results*) বইখানির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ, একই কারবার বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করছে, এরকম পরিস্থিতিতে সেই বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলনা সম্ভব কোন্‌টার বিক্রি কত, কোন্‌টাতে খরচ কত, তার থেকে হিসেব করা যায় কোন্‌টাতে লাভ কত। এর জন্যে সামান্য কিছু অঙ্ক লাগে, তা পিটার ড্রুকার দেখিয়ে দিয়েছেন। খরচা কী করে ঠিক করতে হয় সে সম্বন্ধে কিছু কথা আছে। এই বিশ্লেষণ পূর্ণ হলে কথা ওঠে যে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি ভালো চলছে না সেগুলি নিয়ে কী করা যায়, তারও বিস্তৃত বিচার সম্ভব।

"সার্থক প্রশাসক" (*The Effective Executive*) বইখানির বক্তব্য হল সার্থক হওয়া অভ্যাসের কথা। ব্যক্তিত্ব বড় নয়। ঠিক ঠিক অভ্যাস করতে শেখা যায়। সাধারণত যা দেখা যায় তা বদভ্যাসপূর্ণ। কয়েকটি বিশেষ অভ্যাস খুঁটিনাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

কার সময় কিভাবে কিসে খরচ হচ্ছে তার সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। আগে প্ল্যানিং না করে সময় বাস্তবিক কিসে যাচ্ছে তা দেখা। এরপর সময় বাঁচানোর চেষ্টা। তারপর সময়কে বৃহত্তর খণ্ডে যোগ করা।

কার কাজটা বাস্তবিক কী সে সম্বন্ধে ঠিকমতো প্রশ্ন উত্থাপন অভ্যাসসাপেক্ষ। বহুলোকের অভ্যস্ত চিন্তাধারা যেরকম তা দেখে বদভ্যাস বলতে হয়।

মানুষের মধ্যে বিশেষ বল ও বিশেষ দুর্বলতা দুইই থাকে। কার বল কিসে তার উপর ভিত্তি

করে সংগঠন গড়তে হয়। দুর্বলতা দূর করা বা তার প্রতিকার ঠিক করা ছোট কথা। আর কারও দুর্বলতা দিয়ে তাকে ধরে রাখা ভুল কথা। কাজটা ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা তাও দেখা কর্তব্য। যে কাজটা কোনো একজনের পক্ষে করা অসম্ভব এবং কাজটা পারলেন না এটা দোষের কথা নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান কুশলী হবে, এরকম আশা করা ঠিক নয়। এছাড়া সকলের অভ্যাস একরকম নয়, কার অভ্যাস কী তার বিশেষত্ব বুঝতে হবে। মানুষকে বদলানো প্রশাসকের কাজ নয়, মানুষের মধ্যে যেটুকু ভালো আছে তার সুষ্ঠু সংগঠনই তার কাজ।

একসঙ্গে একটার বেশী কাজ করতে চেষ্টা করাটা সাধারণ বদভ্যাস। এর বিভিন্ন দিক আছে। তা দেখা প্রয়োজন। প্রশাসকের অতীত জানা প্রয়োজন। কোন্ কাজ আগে কোন্ কাজ পরে, তার বিচার দরকার।

সিদ্ধান্তের সংখ্যা বেশী হয় না, অতি তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজনও তাই বেশী নয়। কোন্‌টা মূলগত এবং কোন্‌টা ব্যতিক্রম তার বিচার চাই। কোন্‌টা নিছক উপসর্গ তা দেখতে হয়। অনন্যতা কমই মেলে।

নির্ভুল সিদ্ধান্ত কিভাবে গড়ে ওঠে তা বোঝা দরকার। তথ্য কী তা সাধারণত আলোচনার প্রথমদিকে স্পষ্ট থাকে না। প্রথমদিকে থাকে মতামত। মতামতের বিভিন্নতা প্রয়োজন, তার মধ্য দিয়েই সত্যকে ধরতে হয়। মাপজোক একরকম হয় না, তার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

পিটার ড্রুকারের রচনায় যা আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে তাঁর যৌক্তিকতা। যৌক্তিকতা বলতে বুঝছি যুক্তির প্রয়োগ, যোগ্যতার নিরলস পরীক্ষা, কী উপযুক্ত কী উপযুক্ত নয় তার সুস্পষ্ট ধারণা।

কিন্তু যত চটকই থাক না কেন, এ যৌক্তিকতা অলীক। সাধারণ কর্মক্ষেত্রে বহুজনকে সন্তুষ্ট করে চলতে হয়। মনিব আছেন, সরকার আছেন, শ্রমিকপক্ষ আছে, কেরানীপক্ষ আছে, খরিদ্দারপক্ষ আছে। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ রয়েছে, যোগ্যতা, উপযোগ, যুক্তি, যৌক্তিকতার সবরকম পরিস্ফুটন প্রত্যেকে নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা বিচার করছে। এমন কোনো যৌক্তিকতা নেই যা এদের বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। যুক্তি বলে মানলে তো যুক্তি।

পক্ষনির্ভর নয় এমন যৌক্তিকতা যে ভ্রান্তিময় বস্তু, একটা তুলনা দিলে তা পরিষ্কার হবে। কোনো কারণে যদি দেহরক্ষী রাখা প্রয়োজন হয় তো আমরা জানতে চাইব যে তার মাথা ঠাণ্ডা কিনা। উত্তেজনা বা ভয়ের বশে শত্রুমিত্রজ্ঞান থাকে না, দিকবিদিক-বিচার হারিয়ে যায়, সে লোক আর যাই হোক উপযুক্ত দেহরক্ষী নয়। তার অস্ত্রচালনে কুশলতা দেখলেই চলে না।

আরো কথা হচ্ছে যে, মনিবপক্ষই বলুন খরিদ্দারপক্ষই বলুন কেউ একটামাত্র জিনিস চান না। লাভ চাই, কখনোসখনো আবার নাটকও চাই। পিটার ড্রুকার নাটক পছন্দ করেন না, কর্মক্ষেত্রে তাকে অসার্থকতার কারণ বলে ধরেছেন। কিন্তু মনিব যা চাইবেন তাঁকে তা দিতে হবে তো? যৌক্তিকতা মনিবের ইচ্ছা, তথা শ্রমিকপক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন পক্ষের ইচ্ছা ব্যতীত কিছু নয়। সেই বিভিন্ন ইচ্ছাকে পরস্পরের সঙ্গে মেলানো কঠিন ব্যাপার, অধ্যয়নসাপেক্ষ, যিনি পারেন তাঁকে আমরা কর্মে সার্থক বলব। যুক্তি বলতে বোঝায় বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে যোগ, কোনো একটি ইচ্ছাকে একমাত্র ধরে নিয়ে তার একরোখা বিকাশ নয়। তেমন একরোখা বিকাশে যা হয় তা অনির্ভরযোগ্য।

পিটার ড্রুকারের রচনার মূল্য শেষ পর্যন্ত তাই তার কাহিনীবৈচিত্র্যে। অমুকের কী হয়েছিল, তমুকের বেলা কিসে কাজ হল, এমনি বিচিত্র কাহিনী। এধরনের ছোট বড় বহু ঘটনা আছে বই তিনখানিতে। তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিয়েও এধরনের কাহিনী জানতে পাওয়া ভালোই বলতে হবে।

পুণ্যশ্লোক রায়

ভারত ও জার্মানরা—ওয়ালটার লাইফার। অনুবাদ: ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মতো ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য যদিও ডয়্‌টশীয় বা জার্মান জাতির কস্মিনকালেও ঘটেনি, তবুও ফ্রীডরিশ মাক্স মুল্যরের নাম আজও ভারতবিদ্যাচর্চায় অনভিজ্ঞ এদেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। আর জার্মানির অধিবাসী মাত্রকেই আজও আমরা সংস্কৃতজ্ঞ ঠাওরাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে ডয়্‌টশীয় মনীষার প্রবল প্রয়াসেই বিশ্বের বিদ্বৎসমাজ সর্বপ্রথম সচেতন হলেন, ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুধাবিচিত্র বিষয়ের যথাযথ আবিষ্করণ শুধুমাত্র স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত; কিংবা কিছু সংখ্যক ভাষাতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদের পক্ষেও এমন গুরুভার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব।

আঠার শতকের শেষার্ধ থেকেই কার্যতঃ ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক সজ্জিৎসা ডয়্‌ট্‌শীয় বিদ্বৎসমাজে সঞ্চারিত হয়। ইওহান্ রাইন্‌হোল্ট ফর্‌স্ট্যরের সুযোগ্য সন্তান ইওহান্ গেঅর্গ আডাম্ ফর্‌স্ট্যর্ (যিনি তরুণ বয়সে তাঁর পিতার সঙ্গে একত্রে ক্যাপ্টিন্ জেম্‌জ্ কুকের দ্বিতীয় সামুদ্রিক অভিযানে [১৭৭২-১৭৭৫] অংশগ্রহণ করেন) ছিলেন জাত পর্যটক; মানবযাত্রার বহু জটিল, সর্পিল পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার ও চিন্তনের অনেক খোরাক তাঁর গ্রন্থাদিতে মেলে। বস্তুতঃ তাঁর স্বদেশবাসীকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন "শকুন্তলা"-র ভাষান্তরে। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসুক হন এবং ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে স্বদেশে ফেরার সময় কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"-এর উইলিয়ম্ জোন্‌জ্-কৃত অনুবাদ *Sacontala or The Fatal Ring* (১৭৮৯) তিনি সঙ্গে আনেন। আর অচিরেই তিনি উক্ত ইংরেজী তরজমা থেকে গের্মনীয় বা জর্মান ভাষান্তরকর্মে নিরত হন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মে তিন শ ছেষট্টি পৃষ্ঠার সুদৃশ্য মুদ্রিত অনুবাদকর্মটি ফর্‌স্ট্যরের হাতে এসে পৌঁছয় এবং সেই দিনই তিনি তা ইওহান্ গট্‌ফ্রীট্ হ্যর্‌ড্যর্, ইওহান্ ভোল্‌ফ্‌গাঙ্ ফন্ গোয়েটে, তাঁর শ্বশুর ক্রিস্‌টিআন্ গট্‌লোব্ হাইনে ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে উপহারস্বরূপ পাঠালেন। উল্লিখিত বিশেষ দিনটিতে জর্মান সাহিত্যে বাস্তবিকই বসন্তের আগমন ঘটল। সমগ্র জর্মানি প্রাচীন ভারতীয় কবিকল্পনায় হল বিমুগ্ধ। বৈপ্লবিক পরিব্রাজক ভূগোল ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব করায়ত্ত করার পর আর এক বিস্ময়কর অজানালোকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন তাঁরই ভাবাভাষী পাঠকের সামনে।

অধ্যাপক হাইনে তাঁর জামাতার অনুবাদকর্ম তথা "শকুন্তলা" সম্পর্কে সমালোচনা লিখলেন

Goettingische Anzeigen von gelehrten Sachen (২৩ জুলাই ১৭৯১) পত্রিকায়। উল্লেখ্য যে ইওহান্ ক্রিস্টফ্ ফ্রীড্রিশ্ ফন্ শিলারের "শকুন্তলা"-র প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছিল ইতিপূর্বেই ; কেননা তাঁর সম্পাদিত *Thalia* (গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা ১৭৯০)-তে ফর্স্টার-কৃত অনুবাদের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে এক পত্রে (১৭ ডিসেম্বর ১৭৯৫) তিনি ভিল্হেল্ম্ ফন্ হুম্বোল্ট্‌কে লেখেন, সমগ্র প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যে "শকুন্তলা"-র তুলনীয় 'নারীত্ব ও প্রেমের এমন সুন্দর কাব্যধর্মী চিত্র' আদৌ মেলে না।

উনিশ শতকের শুরুতে আলিগ্জ্যাণ্ডার হ্যামিল্টন্ নামীয় এক ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজ কর্মচারী ফ্রান্সের পথে স্বদেশে ফিরছিলেন (১৮০২)। তাঁর পারিতে অবস্থানকালে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই সূত্রে তাঁকে বেশ কিছুকাল সংস্কৃতির পীঠস্থানে অতিবাহিত করতে হয়। এই সময় ফ্রীডরিশ ফন্ শ্লেগেল্ সংস্কৃতশিক্ষার্থে পারিতে আসেন। হ্যামিল্টনের কাছে দু'বছর তিনি সংস্কৃতচর্চা করেন এবং বিব্লিওতেক্ নাশিওনালে রক্ষিত দু'শ সংস্কৃত পুঁথি পড়ে ফেললেন। এই অধ্যয়নের ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে হাইডেল্বের্গ থেকে প্রকাশিত তাঁর *Ueber die Sprache und Weisheit der Inder* (ভারতীয় ভাষা ও প্রজ্ঞা প্রসঙ্গ) অনেক সংস্কৃতপ্রেমিক গবেষককে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা আউগুস্ট্ ভিল্হেল্ম্ ফন্ শ্লেগেল্ যিনি শেক্স্পিয়র অনুবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত, উক্ত গ্রন্থ পাঠে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশে মনস্থ করলেন। ইতিপূর্বে অবশ্য তিনি ফর্স্টার্ অনূদিত "শকুন্তলা" সম্পর্কে *ZAGS* (৩০ এপ্রিল ১৭৯১) পত্রিকায় বেনামে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। যদিও যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তখন পারি যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। নাপোলেওঁ বোনাপার্তের নির্বাসনের পর অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হল বটে ; কিন্তু তিনি পারিতে এসে দেখলেন হ্যামিল্টন্ সাহেব স্বদেশে ফিরে গেছেন। যাই হোক শেজির তত্ত্বাবধানে তিনি কিছুকাল সংস্কৃত অনুশীলন করেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবিদ্যা বিভাগ খোলা হলে ডয়্‌ট্শ্লাণ্ট বা জর্মানির প্রথম ভারততত্ত্ববিৎ উক্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করলেন এবং আমরণ (১৮৪৫) ওই মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিমধ্যে এক পঁচিশ বছরের যুবক ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাকর্ম *Ueber das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichang mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache* (গ্রীক্, লাটিন, পারসীক ও গের্মনীয় ভাষার তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃত ধাতুরূপ প্রসঙ্গ) প্রকাশ করেছেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ব্যের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবিদ্যা বিষয়ক অধ্যাপকের আসন প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্রান্ট্স্ বোপ্ তা লাভ করেন প্রুসিআর সংস্কৃতিবিভাগের মন্ত্রী বিখ্যাত ভাষাবিৎ, পণ্ডিত ও দার্শনিক হুম্বোল্টের আনুকূল্যে। অতঃপর ডয়্‌ট্শ্লাণ্ট বা জর্মানির অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত তথা ভারতবিদ্যার বিভাগস্থাপনার কাজ সমানে অব্যাহত থাকে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে পিটার্ ফন্ বোহ্লেন্ (১৭৯৬-১৮৪০) কোয়েনিগ্স্বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচিত হন যাঁর অনূদিত "ঋতুসংহার" আজও বিদ্বৎসমাজে প্রশংসিত।

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত

ভারতবর্ষ ও ডয়্‌ট্‌শ্‌লান্ট্‌, বা জর্মানি। বিগত পাঁচ শ (?) বছরের যোগাযোগে যে জর্মানির ভারতীয়ত্বে দীক্ষা বা যে ভারতবর্ষের জীবন জর্মানির সাহায্যে প্রাণিত তার সামগ্রিক মূল্যায়ন আয়াস সাধ্য কর্ম। কারণ সামান্ত আর্থনীতিক আনুকূল্যে জর্মান মানস যেমন ভারতীয় সামাজিক জীবনে কোনও প্রভাবের স্থায়িত্ব দাবি করতে পারে না, তেমনি রাজনৈতিক আদানপ্রদানে কখনও দৃঢ়তর হয় না সাংস্কৃতিক সামীপ্য। বিষয়টির গুরুত্বে তাই আমাদের পক্ষে বেশ কিছুকাল পিছিয়ে যাওয়া অনিবার্য এবং ঘটনাবলীর বিন্যাসের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয় অভীপ্সাকে ; যে অভীপ্সায় একজন মাক্স মূল্যর ভারতপথিক কিংবা একজন গোয়েটের দিব্যদর্শন।

কিন্তু এবম্প্রকার আলোচনার সমস্যা দ্বিবিধ ; প্রথমতঃ, ঘটনার প্রেক্ষাপটের অন্বেষণ এবং দ্বিতীয়তঃ, সাময়িকতা পেরিয়ে চিরন্তনতার সামীপ্যসাধন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জর্মান সাহিত্যে ভারতীয় চরিত্রের যে চিত্র আছে ভাল্‌টর্‌ লাইফর্‌ তাকেই মুখ্য ঠাওরেছেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এসব কি নেহাতই সাময়িক ঘটনাবলী নয় ; অন্ততঃ একথা তো নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কোনও চরিত্রের ভারতীয়ত্বে দীক্ষালাভ ঘটেনি। তাহলে সম্পর্কের চেহারাটা কী? "শকুন্তলা"-র রসভোগে যে জর্মান রসিক, তিনিও কি ভারতীয় দর্শনের অন্তরঙ্গ হতে পারেন একজন বিদেশী হিসেবে, অথবা বৌদ্ধধর্মে যে জর্মনির যোগাযোগ, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে কোন্‌ বৌদ্ধধর্মকে স্বকীয় বলে গ্রহণ করবে ! এমনতর বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত পাঠক লাইফর সাহেবের গ্রন্থে খুঁজে ফিরবেন এই আত্ম-নিবেদনের আত্মাবিষ্কার ; আর তাঁর পক্ষে শেষাবধি হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাবে। কিংবা তাঁকে ঘটনার পুনর্বিন্যাসে নিজেকেই নিয়োজিত করতে হবে—দার্শনিকতায় উত্তরণের তাগিদে।

নিতান্ত যে বাস্তব ঘটনা, যেমন ভারত-জার্মানির আর্থনীতিক সম্পর্ক, তাও এখানে তেমন স্পষ্টতর নয়। এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক কি কেবলই দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ ? আর্থনীতিক দিক থেকে দেখলেও এর সংখ্যাতত্ত্ব অসম্পূর্ণ এবং কোনও স্বচ্ছ চেহারা পাওয়ার বিড়ম্বনায় পাঠকের প্রায়শঃ দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

তৎসত্ত্বেও লাইফর্‌ সাহেবকে তারিফ জানাই ; অন্ততঃ তাঁর পরিকল্পনার দিক থেকে। কারণ ভারত-জার্মানি সৌহৃদ্য একান্তই কাম্য এবং তা সম্ভবপর অতীতের সম্পর্কের শক্ত কাঠামোর ওপরেই।

আলোচ্য অনুবাদকর্মের নামকরণে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি ; যদিচ গের্মনীয় ভাষায় লেখা মূলগ্রন্থ : *Indien und die Deutschen* (১৯৬৯) এবং তার ইংরেজী সংস্করণের নাম রাখা হয়েছিল *India and the Germans* (১৯৭১)। "ভারত ও জার্মানরা" স্বচ্ছন্দ নয়, প্রায় un-Bengali বলা চলে ; 'জার্মানরা'-র পরিবর্তে প্রচলিত বাংলায় 'জার্মানি' লিখলে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কি অচিরাৎ 'ত্রাদুত্তোরে ত্রাদিতোরে' (অনুবাদকমাত্রেই বিশ্বাসহন্তা) গোষ্ঠীভুক্ত হতেন ? সর্বোপরি *India and the Germans* গ্রন্থ থেকে এই বাংলা ভাষান্তরের ঘোষণাপত্র সত্ত্বেও কতিপয় মূল্যবান্‌ অংশের অন্তর্ধান রহস্যময় ! উপর্যুক্ত গ্রন্থের নির্দেশাদিরূপে উল্লেখিত সমগ্র অংশ তথা ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রমাণপঞ্জী (bibliography) এবং চোদ্দ পৃষ্ঠার নির্দেশিকা (register of names) বেমালুম বর্জন কি যুক্তিযুক্ত ? পক্ষান্তরে ভবানীবাবুর ভাষান্তর প্রশংসনীয়ই বলা যায় ; যদিচ এশীয় ও য়ুরোপীয় শব্দাবলী এবং নামের প্রতিবর্ণীকরণ খুব সন্তোষজনক নয়। পরবর্তী সংস্করণে লেনটাম

(Centum), হেথাইট (Hittite-এর পরিবর্তে অনবধানতাবশতঃ ইংরেজী গ্রন্থেও Hethite মুদ্রিত), পারগেটোরিও (Purgatorio), "কমেডিয়া ডিভাইনা" (Divina Commedia-র পরিবর্তে এক্ষেত্রেও ইংরেজী পুস্তকে অনবধানতাহেতু Commedia Divina মুদ্রিত), স্প্যানিয়ার্ডরা (Spaniards), মারকেটর (Mercator), স্থউল্‌ৎস (Schulze), হেরোদৎ (প্রচলিত Herodotus-এর পরিবর্তে ইংরেজী গ্রন্থেও Herodot ছাপা হয়েছে), জোহান উইলহেলম হেলফার (Johann Wilhelm Helfer), ক্যামোস (o-এর মাথায় বিশেষক চিহ্ন ব্যতিরেকেই ইংরেজী পুস্তকে Camoes মুদ্রিত), 'সিথিয়া ডাইমিরাইস' (Scythia Dymirice), ওয়ালটার বালথাসার রেইনহার্ড (Walter Balthasar Rainhard), গীইগার (Geiger), সথরোডার (Schroeder), ব্রোলোট ব্রেসট (Bertold Brecht), রিচার্ড পিসথেল (Richard Pischel), সইথেরবাটসকী (Stcherbatsky), সুত্তনিপট (Suttanipata, ইংরেজী গ্রন্থেও অবশ্য সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য এশীয় ভাষার শব্দাবলীতে বিশেষক চিহ্নাদি ব্যবহৃত হয়নি), 'দীঘা নিকয়' (Digha-Nikaya) উইনডিসথ্ (Windisch), পাহলভী (Pahlevi) প্রভৃতির পরিবর্তে যথাক্রমে কেন্তুম্, হিত্তী, পুর্‌গাতোরিও, "দিভিনা কোম্মেদিআ," স্পেনীয়রা বা এস্‌পানীয়রা, মের্‌কাতোর, শুল্‌ট্‌সে, হেরোদোতস্, ইওহান্ ভিল্‌হেল্‌ম্ হেল্‌ফর্, কামোইশ্, 'স্কিথিআ দিমিরিকে', ভাল্‌টর্ বাল্টাজার রাইনহার্ট, গাইগর্, শ্রেডর্, বের্‌টোল্ট্ ব্রেশ্‌ট্, রিখার্ট পিশেল্, শ্চের্বাৎস্কি, 'সুত্তনিপাত', 'দীঘনিকায়,' ভিণ্ডিশ্ ও পহ্লবী লিখনই যৌক্তিক।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের কবিতা—আবদুল মান্নান সৈয়দ। নলেজ হোম। ঢাকা, ৫। মূল্য বারো টাকা।

বেঁচে থাকতে জীবনানন্দের কবিতার বই বেরিয়েছিল সাকুল্যে পাঁচখানি এবং মোট কবিতার সংখ্যা ছিল ১৪৪টি। কবির মৃত্যুর পর আরও দুখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়, যাদের কবিতার সংখ্যা পুরো ১০০টি। জীবদ্দশায় প্রকাশিত হলেও কবির "শ্রেষ্ঠ কবিতা"কে এই হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে; যেহেতু সেটি মূলতঃ একটি সংকলন, যার বেশির ভাগ কবিতাই আসলে অন্যান্য কবিতার বই থেকে বেছে নেওয়া। কিন্তু কিছু কিছু নতুন কবিতাও এতে থেকে গেছে যা আগের কবিতার বইগুলিতে ছিল না। এই সব নতুন কবিতার সংখ্যা সবশুদ্ধ ১৮টি। এদের মধ্যে ১৪টি গ্রন্থে অপ্রকাশিত অথচ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, আর বাকি ৪টি কবিতা আগে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র অগ্রন্থিত কবিতাবলীসমেত গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় মোটমাট ২৬২টি। এই ২৬২টি কবিতাই কি কবি সারা জীবনে লিখেছিলেন? অবশ্যই না। এর কিছুটা হদিশ মেলে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত কবিতাগুলির দিকে তাকালে। এতে করেও তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সঠিক সংখ্যা জানা কি সম্ভব?

"জীবনানন্দ দাশের কবিতা" সংকলন-গ্রন্থটির সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দের খবর, এ-পর্যন্ত

পাওয়া গ্রন্থস্থ ও অগ্রন্থস্থ কবিতা নিয়ে জীবনানন্দের কবিতা-সংখ্যা প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি। অনুমানের উপর নির্ভর করেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটু শ্রম স্বীকার করলে সংখ্যা বোধ করি আরও বাড়ানো যায়।

"ব্রহ্মবাদী", যে পত্রটি কবির পিতা সত্যানন্দ একদা সম্পাদনা করতেন, তার ১৩২৬-এর বৈশাখ-সংখ্যায় কবির 'বর্ষ-আবাহন' নামে একটি কবিতা বেরোয় যার শেষে নামহীন শুধু 'শ্রী'—শোভা পায়। ঐ বছরের শেষ-সংখ্যা চৈত্রে যখন লেখকদের বার্ষিক সূচি দেওয়া হয় তখন দেখা যায়—কবি আর কেউ নন, শ্রীজীবনানন্দ দাশ বি.এ.।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে "ঝরা পালক" পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর পদবীর শেষাংশ 'গুপ্ত' বর্জন করে 'দাশ' রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এ-সংকলনেও ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে (দ্র. পৃষ্ঠা ১০) কিন্তু এই পদবীসংক্ষেপের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। জীবনানন্দের কৌলিক পদবী ছিল দাসগুপ্ত। জীবনানন্দের ঠাকুরদাদা সর্বানন্দই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে কৌলিক পদবীর শেষাংশটুকু বর্জন করেন। পিতা সত্যানন্দ, মাতা কুসুমকুমারী এবং জীবনানন্দও গোড়াতে দাস লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু পরিণত জীবনানন্দের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, যদি জাতিভেদই না মানা হয় তবে নামের সঙ্গে গুপ্ত যুক্ত থাকলেই বা ক্ষতি কী? ইতিমধ্যে দেশবন্ধুর আহ্বানে 'দাস' তার স-এর দাসত্ব ছেড়ে দাশে রূপান্তরিত। এর পরের ইতিহাসটুকু এ-সংকলনেও বলা হয়েছে।

জীবনানন্দ দাস বি.এ.-র লেখা 'বর্ষ-আবাহন' কবিতাই কিন্তু এ পর্যন্ত কবির মুদ্রিত কবিতাবলীর মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম কবিতা। এটি অবশ্যই এ সংকলনে স্থান পেতে পারে।

"প্রগতি"-র ১৩৩৪-এর মাঘ-সংখ্যায় কবির 'পরবাসী' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয় যার উল্লেখ ঐ বছরের বার্ষিক সূচিতে (১৩৩৪ চৈত্র) আছে। মাঘের এই সংখ্যাটি কি কোথাও পাওয়া যেতে পারে না? পেলে হয়তো আর একটি অগ্রন্থস্থ কবিতার সন্ধান পাওয়া যেত। "প্রগতি"রই ১৩৩৬-এর ভাদ্র-সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব জীবনানন্দের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করেন (তুমি এই রাতের বাতাস...) সেই উদ্ধৃতির সূত্র ধরে মূল কবিতাটি আবিষ্কার করা কিন্তু আজও সম্ভব হয়নি।

কবির মৃত্যুর পর "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র নতুন সংস্করণে আরও ১৫টি অগ্রন্থস্থ কবিতার সংযোজন হয়। তথাপি ঐ সময়ের বেশ কিছু কবিতাই যে "প্রগতি", "ধূপছায়া", "কল্লোল"-এর পাতায় ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তা কবির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকেই টের পাওয়া যায়। "বিজলী", "বঙ্গবাণী"তেও তাঁর অনেক কবিতা এইভাবে চাপা পড়ে আছে। শুনেছি "একক"-এ জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতা বেরিয়েছিল যা অদ্যাবধি গ্রন্থস্থ হয়নি, বেরিয়েছিল "ছন্দে"ও। যুগান্তরের পূজা-সংখ্যাগুলিতে তাঁর যেসব কবিতা বেরুতো তা-ও কি সব গ্রন্থস্থ হয়েছে? "নিরুক্ত"-"পূর্বাশা"রও অনুরূপভাবে কিছু কিছু কবিতা রয়ে গেছে। অবিলম্বে যদি এইসব কবিতা সংগ্রহের কাজ শুরু না হয় তবে সময়ই পরে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বাঙলা দেশে থেকে আবদুল মান্নান সৈয়দ যে এই শুভ কাজটিতে হাত দিয়েছেন সেজন্য আমাদের সকলেরই অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য।

"জীবনানন্দ দাশের কবিতা" এই সংকলন-গ্রন্থটিতে নিশ্চয় কেউ কবির কবিতা-সমগ্র কিংবা নির্বাচিত কবিতা-গ্রন্থ বলে মনে করবেন না। এটি কবির অগ্রন্থস্থ মাত্র ৬৫টি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলিও মোটেই নির্বাচিত নয়, বরং যথেচ্ছভাবেই সংগৃহীত। যদি কেবল অগ্রন্থস্থ কবিতার

সংকলন প্রকাশ করাই সম্পাদকের অভিপ্রায় ছিল তবে একটু নজর দিলে প্রকাশযোগ্য কবিতার সংখ্যা আরও কিছু বাড়ানো কি সম্ভব ছিল না? এই ধরনের কাজ এর আগে যা সামান্য হয়েছে সেগুলি যাচাই করে নেওয়াও উচিত ছিল।

সম্পাদক গ্রন্থটির গোড়ায় উপযুক্ত ভূমিকা, শেষে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার সূচী এবং প্রতিটি কবিতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে গ্রন্থটি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেছেন। এই সংকলনের আর-একটি মূল্যবান সম্পদ 'কবিতার বিভিন্ন লেখন' অংশে জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতার আদি পাঠ। এই অংশটির দিকে একটু অনুধাবন করলেই আমরা চিনে নিতে পারি জীবনানন্দের কবিতার রহস্যময় চাবিকাঠি। অনায়াসেই বুঝে যাই তাঁর কবিতার আপাত ঢিলেঢালা রূপ আদপেই সহজাত নয়, নিরন্তর পরিমার্জনার ফল। আর একটি বিষয়ও চোখে না পড়ে যায় না। এটি হল কবির দ্বিত্বযুক্ত বানানে পক্ষপাত। 'দুর্দিন' কবিতার যে হস্তলিপি গ্রন্থটিতে মুদ্রিত আছে (দ্র. ১১৭ পৃষ্ঠা) তাতে দেখা যায় কবি 'দুর্দ্দিন' লেখেন, লেখেন 'সূর্য্য'। অথচ গ্রন্থাকারে তাঁর কবিতায় দেখা যায় আধুনিক বানান।

সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই দুটি বিশেষ ধরনের কবিতা নির্বাচনের জন্য। একটির নাম 'কনভেনশন'। কাব্যনাটক সম্পর্কে কবি অন্তত দুবার দুটি নিবন্ধে ভেবেছেন, কিন্তু সেই ভাবনার ফল প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে নি তাঁর কাব্যকৃতিতে। 'কনভেনশন' কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে আমাদের নতুন করে ভাবাবে। অন্য কবিতাটির নাম 'অলকা'। এটি আসলে 'মেঘদূতম্'-এর উত্তরমেঘের কিছু স্তবকের অনুবাদ। অনুবাদক জীবনানন্দকে এখানে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের থেকে নাম না বলে দিলে চিনে নিতে বেশ কষ্ট হয়। তথাপি অনুবাদকর্ম হিসেবে কবিতাটি স্মরণীয়।

"ঝরাপালক" পর্যায়ের অনেক কবিতাই এ-সংকলনে রয়ে গেছে যাতে কম-বেশি মোহিতলাল, নজরুল প্রমুখও উপস্থিত। এ-সব কাঁচা কবিতা এখন আর জীবনানন্দের কবিতা বলেই চেনা যায় না। এদের সংকলনভুক্ত করার তাৎপর্য বোধহয় এই যে, এই সব কবিতা পড়লে বোঝা যায় কবি জীবনানন্দ হঠাৎ আসেন নি, এসেছেন বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ধরেই। আর, অপর কবিরা প্রায় সকলেই যখন রবীন্দ্রনাথের প্রভায় আলোকিত তখন ক্রমে কীভাবে অদ্ভুত এক আঁধারময় পৃথিবীর দিকে তিনি একা একা হাঁটতে হাঁটতে চলে যান।

আসলে এই ক্রমোত্তরণের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় বলেই "জীবনানন্দ দাশের কবিতা"কে খুব প্রিয় সামগ্রী বলে মনে হয়। নির্বাচন বা পরিমার্জনের মধ্যে বোধ হয় অগোচরেই এক ধরনের পোশাকী ব্যাপার থেকে যায়। আর কোন একটি কবিতার বই যদিবা দৈবাৎ অমার্জিত অবস্থায় বেরোয়-ও, তাতে থাকে কবির একটা বিশেষ সময়ের মনের ছবি। গোটা জীবনানন্দকে আদুল গায়ে দেখতে হলে "জীবনানন্দ দাশের কবিতা-"র কাছে আসতেই হবে। আবদুল মান্নান সৈয়দ এর আগেই 'শুদ্ধতম কবি' প্রণয়ন করে জীবনানন্দ-চর্চায় তাঁর যে শ্রমনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন নিঃসন্দেহে "জীবনানন্দ দাশের কবিতা"-য় তা অটুট আছে।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী—পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী। কলিকাতা ১৬। মূল্য চোদ্দ টাকা।

সাহিত্যের গবেষণা বলতে এক সময় আমরা বুঝতাম সাহিত্যের মৌলিক পর্যালোচনা, বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুর বিশ্লেষণ। গবেষণার পরিসীমা ও দায়িত্ব তখন লেখক এবং তাঁর রচনার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমায়িত থাকতো। সেটা ছিল সাহিত্যের ভিতরকার ব্যাপার। এবং তা ছিল মূলত তত্ত্বগত বা ভাবগত। তারপর, এই সীমানা পার হয়ে আমাদের দৃষ্টি গেল তথ্যের জগতে, সাহিত্যকে দেখতে চাইলাম আর-এক ভূখণ্ড থেকে। তখন থেকেই গবেষণা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল। এই সূত্রেই এল সাহিত্যের ইতিহাসগত বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক, তথ্যনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রতি আগ্রহ। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার চেয়ে গবেষকরা মনোযোগী হতে চাইলেন সাহিত্যের তথ্যগত বিষয়ের দিকে, সন-তারিখের বেড়া-দেওয়া রচনার কালানুক্রমিক আলোচনার দিকে। আগেকার ধারণা বদলে যেতেই দেখা গেল—পণ্ডিতেরা রচনার সন-তারিখ নিয়ে তর্ক করতে শুরু করেছেন, কোনমতেই এ ব্যাপারকে তুচ্ছ মনে করছেন না, বরং সাহিত্য-চর্যার ক্ষেত্রে যে তার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে—এমন একটা বোধ তাঁদের মধ্যে দেখা গেল। বস্তুত, সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী এই জাতীয় গবেষণার ফল।

একদিক থেকে একাজ মূল্যবান, দুরূহও বটে। মূল্যবান, কেননা, তত্ত্বের জগতে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে, তথ্যের জগতে তা থাকে না, সেখানে নির্ভর করতে হয় সেইসব প্রামাণ্য উপাদানের উপর যাতে গবেষকের নিজের কোন হাত থাকে না। ফলে, যেকোন তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সাহিত্যের একটা অজানা জগতের সন্ধান দিয়ে থাকে। দুরূহ, কারণ, এইসব তথ্যের অন্বেষণ একনিষ্ঠ অনুশীলনের ব্যাপার। এবং একাজ আরামপ্রদও নয়। অনেক বিস্মৃত তথ্য, যা আমরা ভুলে যেতেও পারি, তা তুলে ধরতে হয় নতুন করে, তুলে ধরে পারম্পর্যসূত্রে সাজিয়ে নিতে হয়। সাহিত্য-চর্যার এই দিকটি অনায়াসসাধ্য বিষয় নয়।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই জাতীয় গবেষণার ভাণ্ডার রীতিমতো সমৃদ্ধ। সৌভাগ্যবশত, সংখ্যায় বেশী না হলেও, বাংলা সাহিত্যেও এই জাতীয় গবেষণার কিছু ফসল আমরা পেয়েছি। এবং এ বিষয়ে পুলিনবিহারী সেনের "রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী" একটি চিহ্নিত গ্রন্থ। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘদিনের, তার ইতিহাস তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, যেমন রবীন্দ্রজীবন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে কতো অন্তরঙ্গ, সংশ্লিষ্ট তথ্যের সঙ্গে তিনি যে কী গভীরভাবে অবহিত, গ্রন্থটি তার পরিচয় বহন করেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে সেকালে একালে যতো গবেষণা হয়েছে, এই গ্রন্থ তার মধ্যে স্বতন্ত্র। এবং এর পিছনে গবেষণার সেই দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে—যার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে।

রবীন্দ্ররচনার তথ্যভিত্তিক ও কালানুক্রমিক আলোচনার সূত্রপাত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের "রবীন্দ্রপরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধমালায়। অতঃপর, এডওয়ার্ড টম্‌সন্, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস প্রমুখ গবেষক এ বিষয়ে অগ্রণী হন। লেখক তাঁর গ্রন্থের নিবেদন-এ এর উল্লেখ করেছেন, স্বীকৃতিও জানিয়েছেন। কানাই সামন্তও দীর্ঘকাল ধরে এ বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। সঞ্চয়িতা ও গীতবিতান-এর গ্রন্থপরিচয় অংশে তাঁর কিছু পরিচয় আছে,

তাঁর অন্যান্য মৌলিক লেখার মধ্যেও। তথ্যভিত্তিক এইসব আলোচনার মূল্য অপরিসীম। কেন না, এর ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসের নানাদিক উদ্‌ঘাটিত হতে দেখি। তবু, একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, মূলত পৃথক পৃথক আলোচনার বিষয় হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে এইসব তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বভাবতই, রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক তথ্যগত এইসব উপাদানকে একত্র ক'রে সুপরিকল্পিত উপায়ে একটি ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

"রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীগ্রন্থে" "কবি-কাহিনী" থেকে শুরু ক'রে "রাজা ও রানী" পর্যন্ত মোট ২৫টি গ্রন্থের এবং সময়ের দিক থেকে ৫ নভেম্বর ১৮৭৮ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনার এগারো বছরের একটি ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জী হিসেবে এই গ্রন্থে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখি। রবীন্দ্ররচনার প্রকাশকাল, মুদ্রণ, সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর আলোচনার সঙ্গে লেখক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং রচনাগুলির প্রামাণ্য অথচ বিস্মৃতপ্রায় অনেক অভিমত উদ্ধার করেছেন। বস্তুত, এখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববর্তী রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে পার্থক্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের কালানুক্রমিক ঐতিহাসিক আলোচনা সত্ত্বেও এই গ্রন্থ নিছক সন-তারিখের মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি, তার চৌহদ্দির ভিতরে প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য উল্লিখিত যার গবেষণাগত মূল্য অনেক। এই কারণেই, তথ্যভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সমধর্মী গ্রন্থগুলির তুলনায় এই গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়। বস্তুত, এই গ্রন্থে লেখক এমন এক পথনির্দেশ করেছেন—যে পথে ভবিষ্যতে আরো অনেকেই এগিয়ে যেতে পারবেন।

তবু, প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যায়; এই গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারতো আর-একটি বিষয় যোগ করে। টমাস ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থপঞ্জীতে আলোচ্য কবির গ্রন্থগুলির বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশকালের কথা, সেই সঙ্গে, যেখানে সম্ভব, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদেরও উল্লেখ করেছেন। তথ্যের বিচারে এই দুটি প্রসঙ্গই তাৎপর্যপূর্ণ এবং যেমন টমাস ওয়াইজের লেখায় দেখেছি, বোধ হয় গ্রন্থপঞ্জীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা জানি শ্রী সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রবীন্দ্রগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের বইগুলি আছে। রবীন্দ্ররচনার পাঠভেদমূলক গবেষণার ব্যাপারে রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের কথাও আমরা জানি। পরবর্তী গ্রন্থে লেখক এই দুটি দিকে মনোনিবেশ ক'রে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীকে সমৃদ্ধতর করে তুলবেন এমন একটা প্রত্যাশা আমাদের রয়ে গেল।

প্রণয়কুমার কুণ্ডু
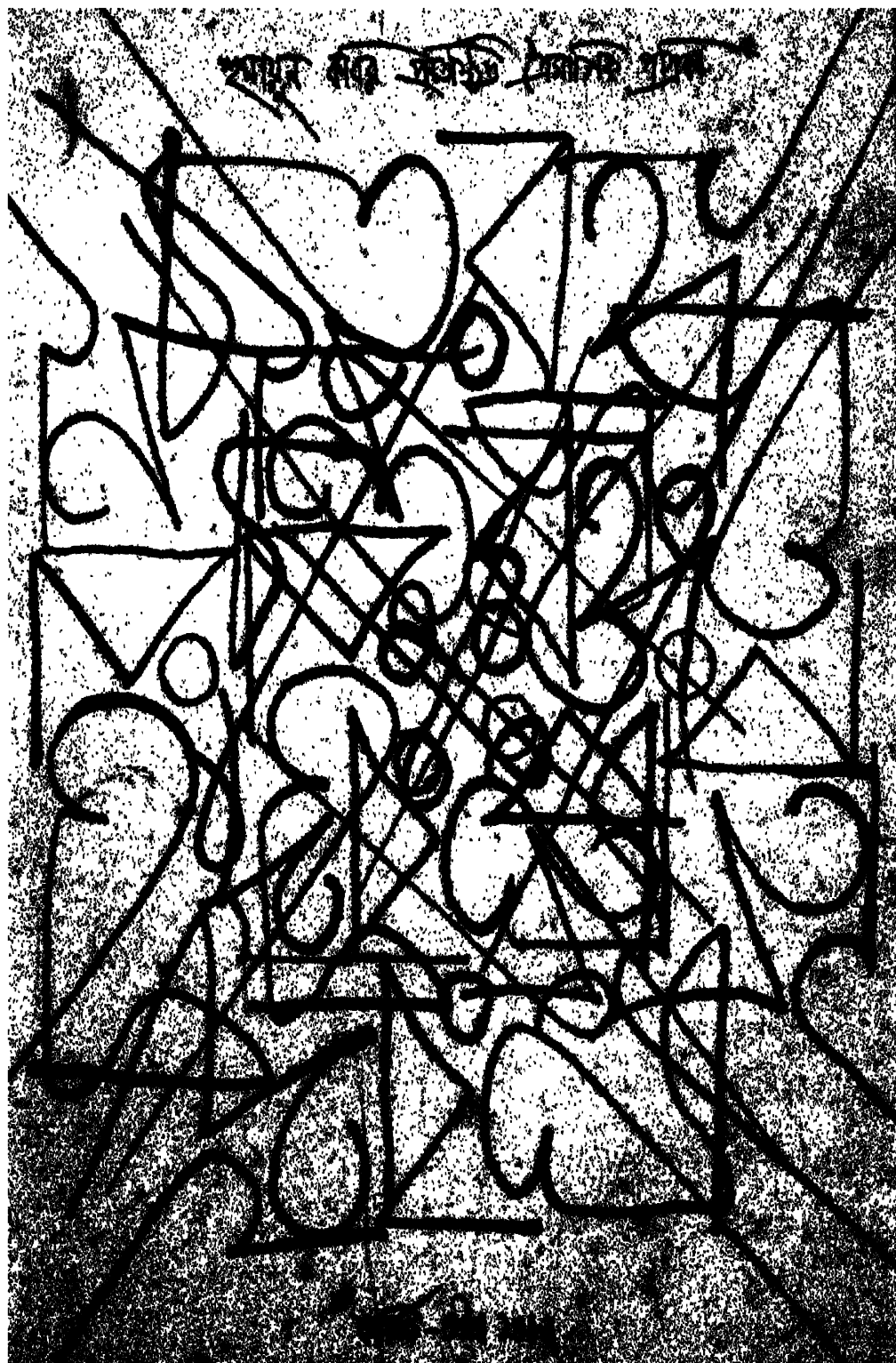
সমস্যা ?

সমস্যা হয়ত অনেক.

অথ।

পশ্চিমবঙ্গে ৪·৯৫ কোটি জনসংখ্যার জন্যে
দরকার ৮১·৩৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। স্বাভাবিক অপচয় ও
বীজের প্রয়োজন ধরে নিয়ে আমাদের দরকার মোট ৯০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য।

কিন্তু

স্বয়ম্ভরতার দুর্গ আর দূর নয়, দুর্গম নয়।
উৎপাদনের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছোতেই হবে।

হ্যাঁ,

স্বয়ম্ভরতার জয়যাত্রায় আমরা নির্ভীক অতন্দ্র
পদাতিক। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমাদের উৎপাদন
লক্ষ্য ৯০·৫০ লক্ষ টন।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের জয়যাত্রা
(লক্ষ টনের হিসেবে)

১৯৪৭-৪৮ :	৩৯·৩৩
১৯৫৫-৫৬ :	৪৭·২২
১৯৬৫-৬৬ :	৫৪·৪৮
১৯৭২-৭৩ :	৬৭·৭২
১৯৭৩-৭৪ :	৬৮·৮৬
১৯৭৪-৭৫ :	৭৮·৬২
১৯৭৫-৭৬ :	৯০·৫০

(লক্ষ্যসীমা)

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক

ঠিক যে তেলটি আমি চাই।
রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে
সবসময়ই আমাকে কাজে
বেরোতে হয়—কিন্ত
চুল আমার এলোমেলো হলে
চলে না—আর তাই
আমার পছন্দ মৃদুসুবাসিত
কেয়ো-কার্পিন
কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয় না।
A HAIR OIL OF
DISTINCTION
দে'জ
মেডিক্যালের
তৈরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা
ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
২। প্রকাশের সময় : প্রতি তিন মাসে
৩। মুদ্রাকর : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৪। প্রকাশক : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৫। সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা ৩

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী এন. রহমান, ৮এ শামসুল হুদা রোড, কলিকাতা ১৭; এ. রহমান, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩; শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩।

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আতাউর রহমান
তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ প্রকাশক।

Only Chloride could beat Chloride's 'long-life' record!

Chloride India's advanced technology presents

Exide supreme

Tomorrow's battery here today!

Exide 'Supreme' is the end result of years of intensive research and development. Its unique high-grade polypropylene container and special power-packed construction makes Exide 'Supreme' the sturdiest, most advanced battery for your car. Proof of its superiority is the instant acceptance in sophisticated international markets. And Exide 'Supreme' is manufactured by Chloride India—so it's got to be the best!

Exide Supreme has already been accepted as original equipment fitment in Ambassador, Premier and Standard cars. Also being used by the State Transport undertakings.

This battery is available for replacement in Ambassador, Premier and Standard cars.

A CHLORIDE PRODUCT
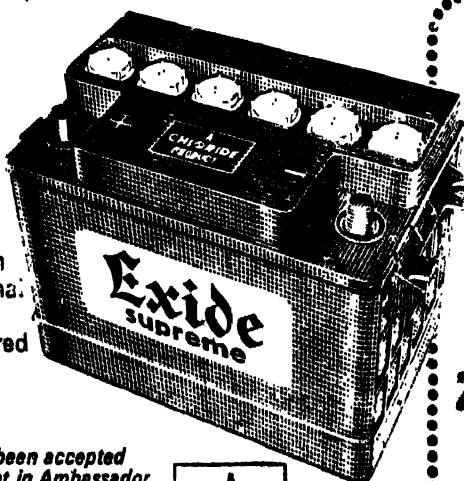
—and here's why:

1. LONGER LIFE because of improved plate and battery design.
2. MORE POWER because it has special through-partition inter-cell connectors and shorter plate pitch resulting in instant starting even in extreme weather conditions.
3. PEAK EFFICIENCY because special lid construction minimises surface leakage and terminal corrosion.

CIC-42/RI

দেশ এগিয়ে চলেছে

আমাদের ক্ষেত-খামারের জন্য আরও বেশি জল

আমরা মোট জলসেচনের ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এখন 2.18 কোটি হেক্টার জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। এই ক্ষমতা পঁচিশ বছর আগে যা ছিল, এটি তার দ্বিগুণেরও বেশি।

শিগগিরই আরও 50 লক্ষ হেক্টার জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা কায়েম করা হবে!

দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম—আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে

গ্রীষ্মকালে শীতল আরাম

পিণ্টু ১৪
সাইজ ২-৬, ৭-১০

ক্লাসমেট ৪৮
সাইজ ২-৫

সাইজ ৫-১০

রাখি ৬২
সাইজ ২-৭

সানওয়ে ৬০
সাইজ ৫-১০

ক্যোভাদিস ১২
সাইজ ৫-১০
Bata

বর্ষ ৩৭ কার্তিক-পৌষ ১৩৮২

সূচিপত্র

নারায়ণ চৌধুরী । শরৎচন্দ্রের ভাষাশিল্প ১৮৭
দিনেশচন্দ্র রায় । বিভাবরী ১৯৮
শামসুর রাহমান । যে কোন দোকানে ২১০
শঙ্খ ঘোষ । সেদিন অনন্ত মধ্যরাত ২১২
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত । একটা সকাল ২১৩
জাহিদ হায়দার । অথচ আমাকে টানে ২১৪
লোকনাথ ভট্টাচার্য । তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত ২১৫
অমিয়ভূষণ মজুমদার । অন্ধকার ২২৮
অন্নদাশংকর রায় । সংস্কৃতি ও শিক্ষা ২৫০
অসীম রায় । আবহমানকাল ২৫৮
সমালোচনা । কমলেশ চক্রবর্তী, হিতেশরঞ্জন সান্যাল,
নির্মল ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ২৭৬

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৭ কার্তিক-পৌষ ১৩৮২

শরৎচন্দ্রের ভাষাশিল্প

নারায়ণ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের ভাষাশিল্প সম্পর্কে প্রথমেই যে-কথাটা মনে হয় তা হলো, তিনি মূলতঃ বাংলার গ্রামজীবনের রূপকার হলেও তাঁর ভাষার ডৌলটি কিন্তু পুরোপুরি নাগরিকতায় ভরা। তিনি গ্রামের চিত্র এঁকেছেন শহরের ভাষায়—এ ভাষায় পড়তে পড়তে একজন সচেতন শিল্পীর বৈদগ্ধ্য, সযত্ন অনুশীলন, বাক্যবিন্যাসে ও শব্দব্যবহারে সূক্ষ্মগ্রহণবর্জননির্বাচনক্ষম মননের ছাপ অতি স্পষ্ট। আমরা যাকে শিল্পের দরবারী বা ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কার বলি, যার উদ্ভব নাগরিক আবহাওয়ায়, পরিপুষ্টিও নগরসভ্যতার আওতায়, সেই সংস্কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গীর ভিতর অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। শরৎচন্দ্রকে স্টাইলের জাদুকর বলা হয়। তাঁর এই জাদুকরী শক্তির মূল রহস্যটা নিহিত আছে তাঁর শিল্পসৃষ্টির এই অদ্ভুত দ্বৈধতার মধ্যে যে, তাঁর উপন্যাস ও ছোট-গল্পের বিষয়বস্তু হলো গ্রামজীবনের চিত্র ও চরিত্র অথচ যে-ভাষায় তিনি এই গ্রামীণ চিত্র-চরিত্রের রূপদান করেছেন তার ভিতর গ্রামীণতার ছিটেফোঁটা প্রভাবও নেই; সেটা আগাগোড়াই নাগরিক কর্ষণার দ্বারা সুমার্জিত।

লেখকের ভাষার প্রতি পদক্ষেপে সযত্ন মনোযোগের প্রমাণ বিদ্যমান : অসাবধানে তিনি এক পাও এগোন না। বাক্যের গঠনেই যে শুধু এই যত্নের পরিচয় মেলে তা নয়, প্রত্যেকটি শব্দের ব্যবহারেও তাঁর অভিনিবেশ সমান ক্রিয়াশীল। গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়টা হলো আধেয়, সেই বিষয়কে যে-ভাষার সাহায্যে রূপ দেওয়া হয় সেটা হলো আধার। এই আধারের নির্মিতিতে শরৎচন্দ্রের বিদগ্ধশিল্পিজনসুলভ নাগরিক নৈপুণ্য তাঁর তাবৎ শিল্পকর্মকে, গ্রামভিত্তিক শিল্পকর্মগুলিকে বিশেষ করে, এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

আমাদের দেশে গ্রামীণ শিল্পচর্চার সঙ্গে অশিক্ষিতপটুত্বের ধারণার যেন একটা নিকট-সম্বন্ধ আছে। বিশেষত, লোকশিল্পের বেলায় এ ধারণাটা আরও বেশী বলবৎ। এদেশের লোকশিল্পী বা লোককবি বা লোকসঙ্গীতকার প্রায়ই দৈবানুগ্রহসেবিত মানুষ—তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার ধার না ধারলেও চলে, তাঁদের নিজ নিজ শিল্পবস্তুর সৃষ্টিতে প্রেরণার দ্বারা সঞ্চালিত হওয়াটাই যথেষ্ট।

শুধু তাই নয়, এসব ক্ষেত্রে লেখাপড়া জানা থাকাটাকে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর একটা অগুণ মনে করাটাই রেওয়াজ। যে-লোকশিল্প যত বেশী স্বতঃস্ফূর্ত তত তার আদর ও কদর। শিক্ষাদীক্ষা এখানে স্বতঃস্ফূর্তির বাধকের পর্যায়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্র অবশ্য লোকশিল্পের চর্চা করতেন না, লোকযানীও তিনি নন; কিন্তু একথা তো ঠিক যে তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে গ্রামকেই প্রধানতঃ চিত্রিত করেছেন। বিশেষ, তাঁর প্রথম দিককার তাবৎ গল্পোপন্যাস গ্রামজীবনের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু যেটা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করবার তা হলো এই যে, তিনি তাঁর এই গ্রামচিত্রণের প্রণালী ও প্রকরণে অশিক্ষিতপটুত্ব কিংবা দৈবপ্রেরণার ধারণাকে এতটুকু প্রশ্রয় দেননি। প্রথম থেকেই তিনি একজন সচেতন ভাষাবিন্যাস-কুশলী শিল্পী, নাগরিক মেজাজের শিল্পী। গ্রামের কথা তিনি শহরের ভাষায় লেখেন। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি গ্রামে বাড়ি বানান ঠিকই কিন্তু সেই গ্রামের বাড়ি কুঁড়েঘর নয়, ইমারৎ; ইমারতের প্ল্যানটিও শহুরে।

এই ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাঁর পরবর্তী-কালীন লেখক তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে তাঁর তেমন মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই গ্রামজীবনকে যথাক্রমে তাঁদের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন, কিন্তু তাঁদের দুজনারই ভাষাশিল্পের ছাঁচ প্রবলভাবে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সংস্কারকে মনে করিয়ে দেয়। অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, মননশীলতা, কবিপ্রাণতা, সুকর্ষিত ও সুপরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গী, শব্দসমৃদ্ধি ও ভাষার সযত্ন প্রয়োগ তাঁদের দুইয়ের স্টাইলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তাঁদের একান্তভাবে নাগরিক ধারার শিল্পীরূপে চিহ্নিত করেছে। পক্ষান্তরে, তারাশঙ্কর-বিভূতি-ভূষণ-মানিক—উত্তরসূরী এই ত্রয়ী প্রভূতশক্তিশালী ঔপন্যাসিক হলেও তাঁদের রচনার ভাষাবিন্যাসে ও শব্দব্যবহারে তাদৃশ যত্নশীল মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে তাঁরা যেন তাঁদের অজ্ঞাতসারেই কতক পরিমাণে স্বভাবকুশলতা ও স্বতঃস্ফূর্তির ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছেন। কাহিনীচয়নে ও কাহিনীর পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং চরিত্রগুলির বিকাশসাধনে তাঁরা যতটা যত্ন ও অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন, ভাষার পরিশীলনে বোধহয় তাঁদের ততটা মনোযোগপরায়ণ হওয়ার অবসর ঘটে ওঠেনি।

ভাষার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য। শুধু তাই নয় শরৎচন্দ্র তাঁদের প্রদর্শিত পথে কথাসাহিত্যের অনুষঙ্গ ভাষাশিল্পের চর্চাকে যেন আরও বেশ কিছুদূর টেনে নিয়ে গেছেন। তিনি এ ব্যাপারে আরও বেশী মনোযোগী হয়েছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের কবিপ্রাণতা ও সূক্ষ্মসংবেদনশীলতার সঙ্গে অবশ্য শরৎচন্দ্র তুলনীয় নন, তবে যেহেতু শরৎচন্দ্র খুবই জীবনঘনিষ্ঠ লেখক এবং বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তববাদী ধারার একজন পথিকৃৎ, সেই কারণে তাঁর রচনার শিল্প-সিদ্ধির জন্যই ভাষাবিষয়ে তাঁকে সবিশেষ প্রযত্নশীল হতে হয়েছে। ওই যে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন ভাষণে তাঁর আত্মকথামূলক স্মৃতিচারণাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষার কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন—তিনি একাধিকবার বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তিনি কমপক্ষে দুশো বার পড়েছেন—তার থেকে এই তথ্যেরই প্রমাণ হয় যে, তিনি তাঁর ভাষাপ্রকরণে সাফল্যের জন্যই বারবার তাঁর পূর্বসূরী দুই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের ভাষাভঙ্গী গভীর মনোযোগে অনুধাবন করেছেন। শরৎচন্দ্রের ভাবের জগৎ পূর্বসূরিদ্বয়ের ভাবের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের পরিমাণ সামান্যই। তিনি নির্যাতিত-

শোষিত স্তরের মানুষদের দুঃখবেদনাপূর্ণ জীবনের শিল্পী এবং তাঁর শিল্প তাঁর সমসাময়িক কালের প্রশ্ন ও সমস্যাদির চেতনায় বিশেষভাবে বিধৃত। সমাজ-বাস্তবতা তাঁর রচনার একটি মূল উপজীব্য। ভাবের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বঙ্কিম-রবীন্দ্ররচনার দ্বারা যত-না প্রভাবিত হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধির দ্বারা। কিন্তু ভাষার ব্যাপারে একথা বলা যায় না। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁদের দুইয়ের ভাষা তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে বিচার করেছেন এবং ওই বিচারক্রিয়ার মন্থন থেকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ধরনের স্বকীয় একটি ভাষারীতি উদ্ভাবন করে নিয়েছেন। প্রতিভাশালী লেখকরা এইভাবেই ঐতিহ্যের ফল আত্মসাৎ করে আপনাদের ভাষার ভাণ্ডার পুষ্ট করেন এবং নিজ রচনায় তার শ্রেষ্ঠ সুফল প্রয়োগ করে থাকেন। এবং ঠিক এই গুণেই বোধ হয় শরৎচন্দ্র এমন অপ্রতিরোধ্যরূপে বাঙালীর চিত্তজয়ী লেখক হয়েছেন, এই সমাজের শিক্ষিত-আধাশিক্ষিত গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী-সরলপ্রাণ সকল স্তরের পাঠক-পাঠিকার মনোহরণ করেছেন। শরৎ-শিল্পের অপূর্ব মনোহারিতার রহস্যের অন্য একাধিক হেতু নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ভাষা যে অন্যতম প্রধান হেতু সে বিষয়ে বারেকের জন্যও বুঝি সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। তাঁর জীবননিষ্ঠ, বাস্তবসম্পৃক্ত সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন তাঁর ভাষা। এই ভাষার ছত্রে ছত্রে তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্যাস অনুস্যূত। স্টাইল যদি ব্যক্তিত্বেরই প্রক্ষেপ হয়ে থাকে তাহলে শরৎচন্দ্রের স্টাইলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যেরকমভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এমন বুঝি আর কোন লেখকের বেলায় দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের যে-কোন লেখা পড়লেই তাঁর ভাষার আদলের ভিতর শরৎচন্দ্র মানুষটিকে যেন ঠিক-ঠিক অনুভব করা যায়। নীচে বা উপরে নামস্বাক্ষর না থাকলেও অক্লেশে বলে দেওয়া যায় এ লেখা শরৎচন্দ্রের না হয়েই যায় না। এমনকি তাঁর প্রবন্ধ, অভিভাষণ, চিঠিপত্রের ভাষা থেকেও তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

একেই বলে লেখকের ব্যক্তিত্বের দ্বারা তাঁর স্টাইল জারিত হওয়া, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য স্টাইলে সংক্রমিত হওয়া। স্টাইল তো শুধুই ভাষার বহিরঙ্গ পরিচ্ছদমাত্র নয়, তা গোটা মানুষটির আত্মার সৌগন্ধ্যে অনুলিপ্ত। এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের রচনারীতির ভিতর তাঁর আত্মা যেমন-ভাবে ধরা পড়েছে এমন বোধ করি বাংলার আর কারও রচনায় নয়।

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গী খুব সরল, সহজ। শুধু যে লিখিত আলোচনাতেই এই ধারণার প্রকাশ দেখতে পাই তা নয়, বক্তৃতামঞ্চেও একাধিক বক্তার মুখে এই ভাবের কথা শুনেছি। মোটেই সত্যি নয় ধারণাটা। শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গীর সামগ্রিক ফলশ্রুতি সহজতার ইঙ্গিত করে, অর্থের স্পষ্টতাকে প্রকাশ করে; কিন্তু তাঁর বাক্যগঠনের প্রক্রিয়া একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ছত্রে ছত্রে শিল্পনৈপুণ্যের ছাপ। শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পোপন্যাসের ভাষানির্মিতির ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তি বা প্রেরণার উপর মোটেই নির্ভরশীল ছিলেন না; তিনি অনুশীলনে বিশ্বাস করতেন আর সেই অনুশীলন আর প্রযত্নের আদর্শই বরাবর তাঁকে চালিত করেছে এ ব্যাপারে। সব জড়িয়ে তাঁর ভাষার এফেক্ট পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই সরল-সুবোধ্য বলে মনে হবে কিন্তু যে-লেখক এই ভাষার সৃষ্টি করেছেন তিনি কিন্তু অসীম যত্নে সচেতন বিচারশক্তি প্রয়োগ করে একটির পর একটি শব্দ গেঁথে তাঁর মোহময় ভাষা তৈরী করে তুলেছেন। ভাস্কর যেমন অনেক দিনের পরিশ্রমে একটি একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস করে অপূর্ব দেহশ্রীমণ্ডিত মূর্তি উৎকীর্ণ করেন, শরৎচন্দ্রের ভাষাগঠনের রীতিও ছিল অনেকটা সেই রকমের। তাঁর রচিত বাক্যের একটি সামান্য শব্দও অযত্নে বসানো নয়, অমনোযোগে প্রযুক্ত নয়। অন্যমনস্কতার ঘোরে

তিনি কিছুই রচনা করেন না, তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের পিছনে সজাগ মন কাজ করছে। শুধু নিপুণ যত্নে শব্দ ব্যবহার করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন না, পাঠকমনের উপর সেই শব্দের সম্ভাবিত ধ্বনিগত প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা-ও তিনি যাচিয়ে দেখেন, বাজিয়ে দেখেন। তিনি সর্বদাই শিথিল বর্জনের পক্ষপাতী। বাক্যের গঠনে অন্বয়ের হেরফের করে, অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া অব্যয় ইত্যাদির অবস্থানের প্রয়োজনানুযায়ী অগ্রপশ্চাৎ বিধান করে, তিনি বাক্যের গঠনে আনেন সৌষম্য, ছন্দ, কান্তি। ভাষার সাদামাঠা বিবৃতিতে তিনি সন্তুষ্ট নন, তিনি ভাষার লাবণ্যের শিল্পী।

অর্থাৎ অনুশীলন- ও বৈদগ্ধ্য-কর্ষিত ভাষাই শরৎচন্দ্রের কাছে আদর্শ ভাষা। আর যেখানেই অনুশীলন সেখানেই সাধনার প্রয়োজন, ক্লেশস্বীকার অবধারিত। পরিশ্রম বিনা সাধনা হয় না। শরৎচন্দ্র তপস্যার রীতিতে সাহিত্যসাধনা করার প্রয়োজন মানতেন। গল্প বানাবার তাগিদে বিনা প্রস্তুতিতে লিখতে বসা কিংবা দৈবপ্রেরণার উপর ভর করে খস্ খস্ করে দ্রুত কলম চালিয়ে যাহোক একটা গল্পের অবয়ব গড়ে তোলা—এ ধাত তাঁর ছিল না। লিখতে বসলে বেশ আটঘাট বেঁধেই লিখতে বসতেন, তপস্বীর মতো আসন পরিগ্রহ করে একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজে নামার মত করে লেখার কাজে নামতেন। যেন আত্মপ্রকাশের শিল্পের সঙ্গে পাঞ্জা কষবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন, লেখনীধারণকালে এই ভাব তাঁর মুখেচোখে ব্যঞ্জিত হতো।

শুধু শরৎচন্দ্র কেন, সকল সীরিয়্যাস ভাষাশিল্পীরই লেখবার সময় এমনি মনোভাব হয়। লেখার কাজটা তাঁর কাছে মুক্তির উপায়ও বটে আবার যন্ত্রণাকর ব্যায়ামবিশেষও বটে। যন্ত্রণার ধারণাটা আসে শ্রমের ক্লেশস্বীকারের অনিবার্যতার বোধ থেকে। আত্মপ্রকাশের শিল্প সবটাই ফুল-বিছানো পথ নয়, তাতে কাঁটাও ছড়ানো থাকে অনেক। আর এই কণ্টকের চেতনাটাই অতি বড় সীরিয়্যাস লেখককেও কখনও-কখনও শ্রমভীরু করে তোলে, বোধকরি খতিয়ে দেখলে, সীরিয়্যাস লেখকদের মধ্যেই এই ধরনের শ্রমকাতরতা বেশী চোখে পড়ে। লেখা তো নয় যেন একটা কঠিন পরীক্ষা, তাকে এড়াতে পারলে বাঁচা যায়—এইজাতীয় ভাবের দ্বারা কবলিত হননি এমন লেখক খুব অল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে।

শরৎচন্দ্রের অনুষঙ্গে একথাটা কেন বলছি তার একটা বিশেষ অর্থ আছে। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের আদলের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁরা কমবেশী সকলেই জানেন যে, শরৎচন্দ্র সহজে লেখার টেবিলে বসতে চাইতেন না। বাইরের অনুরোধ-উপরোধের চাপ এবং ভিতরের দুর্নিবার তাগিদ—এই দুই একবিন্দুতে মিলিত হলে তবেই তিনি লেখায় আত্মনিযুক্ত হবার ক্লেশ স্বীকার করতেন। লেখায় প্রবৃত্ত হবার আগে আড়মোড়া ভাঙতেই তাঁর অনেক সময় চলে যেত। না-লেখার অজুহাত সৃষ্টি করাতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

তার মানে কি এই যে, শরৎচন্দ্র কুঁড়ে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? আলসেমি তাঁতে স্বভাবগত ছিল? তা যদি হয় তো জীবনে এত এত বই তিনি লিখে যেতে পারলেন কী করে? ব্যাপারটা কিন্তু অত সরল নয়। আসলে শরৎচন্দ্র ছিলেন ষোল-আনা সাধক-শিল্পী। যখন শিল্পসাধনায় বসতেন, তখন তপস্বীর মনোভাব নিয়ে সে-কাজে বসতেন। রচনাকার্যে পরিপূর্ণ শ্রম বিনিয়োগ করতেন। ভাষার সৌষ্ঠব বিধানে তাঁর যত্নের অন্ত ছিল না। যে পর্যন্ত না ভাষাদেহ নিখুঁত হয়েছে বলে তাঁর মনে হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রসাধনকলায় তিনি ক্ষান্তি দিতেন না। তার মানে এই যে সাহিত্য-চর্চায় তিনি নিজের উপরে প্রচণ্ড পরিশ্রমের ভর সওয়াতেন—কষ্টসহিষ্ণুতার চরমে যেতেন।

২

সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরুর কাল থেকেই শরৎচন্দ্র ভাষাবিষয়ে যত্নপরায়ণ। "কাশীনাথ" উপন্যাসের প্রথম খসড়াটা চোদ্দ বছর বয়সের লেখা। জন্মগ্রাম দেবানন্দপুরে থেকে স্কুলে পাঠাভ্যাস-কালে তিনি এটি রচনা করেন। পরে ভাগলপুরে বাসকালীন এটিকে পুনর্মার্জিত করেন। কাহিনীতে বয়সোচিত কাঁচা হাতের ছাপ আছে কিন্তু বয়সের অনুপাতে ভাষা অবিশ্বাস্য রকমের পরিণত। একটি উদ্ধৃতি দিই। উদাসীন স্বামী কাশীনাথের অমনোযোগে ব্যথিতা স্ত্রী কমলার বর্ণনা :

> এ-সব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকামাত্র। স্বামি-প্রীতি, স্বামি-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল--বাধা পড়িয়াছে; আবার স্বামী কর্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যে-সব সোনার দাগ বুকের মাঝে ঈষৎ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য এখনও ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—অযত্নে অসাবধানে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ভগ্ন অট্টালিকার দুই-একখানা ইট, দুই-এক-টুকরা কাঠ পাথর বুকের মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—কখনও-কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে-সকল একত্র করিয়া আবার জোড়া দিয়া অট্টালিকা গাঁথিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, প্রমোদকানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে আসিয়াছিল, স্বপ্নশেষে চলিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন ফিরিয়া দেখিবারও তাহার আর সাধ নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

চোদ্দ বছর বয়সের একটি বালকের পক্ষে এরূপ পরিণত বাঁধুনির বাক্যসমষ্টি রচনা করা প্রতিভার প্রভাবেই শুধু সম্ভব। চোদ্দ বছর তো দূরের কথা, তার তিনগুণ বয়সের কোন লেখকের পক্ষেও এমন বাচ্যার্থ-অতিক্রমকারী ব্যঙ্গার্থপ্রধান ভাষাভঙ্গীর নির্মাণক্ষমতা বিরল-দৃষ্ট বললেও চলে। স্বামীর ঔদাসীন্যের কঠিন পাষাণে প্রতিহত হয়ে কমলার উদ্গত ভালবাসা মরে যেতে বসেছে—এই ভাবটিকেই এখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন তরুণ লেখক শরৎচন্দ্র। ভগ্ন অট্টালিকাকে এখানে উপমার আধারস্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র সচরাচর উপমা-অলংকার ব্যবহার করতেন না, উপমাবহুল রচনারীতির প্রতি তাঁর বরং অনীহাই ছিল, উত্তর-জীবনের রচনায় কদাচ তিনি উপমা-উৎপ্রেক্ষার শরণ নিয়েছেন—কিন্তু নিলে কত ফলপ্রদভাবে নিতে পারতেন এই রচনাংশটি তার প্রমাণ। ম্রিয়মাণ প্রেমকে ভগ্ন অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করার পরিকল্পনাটিও অভিনব।

দেবানন্দপুরে বসে লেখা 'বিচার' আর একটি প্রথম বয়সের লেখা গল্প। এটি ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যা "যমুনা"য় প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি ১৩৮২ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়ায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গল্পটি এখনও কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি, খুব সম্ভব প্রথম বয়সের রচনার প্রতি গ্রন্থকার মাত্রেরই যে-অবহেলা থাকে তার দরুন এটি গ্রন্থে সংবদ্ধ হবার সুযোগবঞ্চিত থেকেছে। কিন্তু নিতান্ত কাঁচা বয়সের লেখা হলেও কি প্লট পরিকল্পনায় কি ভাষার বাঁধুনিতে আশ্চর্য নিটোল একটি গল্প। ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা শোনাই। গল্পটির শুরু হয়েছে এইভাবে :

> রাঠোর রাজকুমারী যমুনাবাঈ ছেলেবেলায় তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়া বলিত, 'বাবা,

তুমি সিংহাসনে বসিয়া বিচার কর না কেন?' অজয় সিংহ কন্যার শির চুম্বন করিয়া বলিতেন, 'মা, তোমার বুড়ো বাবার বড় ভুল হয়, তাই সে আর বিচার করে না—সিংহাসনে বসিয়া শুধু ক্ষমা করিতে ভালবাসে। তুমি যখন ঐ স্বর্ণ সিংহাসনে বসিবে, তখন কি করিবে, যমুনা?'

যমুনা বলিত, 'আমি নিজে বিচার করিব। অপক্ষপাত বিচার করিয়া যে দোষী তাহাকে নিশ্চয় শাস্তি দিব। দোষ করিলে আমি কাহাকেও ক্ষমা করিব না।'

বৃদ্ধ রাজা হাসিতেন, বলিতেন, 'মা, ক্ষমা কেহ করে না—ক্ষমা হৃদয় হইতে আপনি বাহির হইয়া দোষীর দোষটুকুকে এমন স্নেহের সহিত কোলে লইয়া বসে যে রাজাও সে মুখ দেখিয়া নিজের চোখের জল সামলাইতে পারে না। ক্ষমা আপনি ক্ষমা করে।......'

রচনায় মুন্সিয়ানার ছাপ প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্য অবধি পরিস্ফুট। আরম্ভ-ভঙ্গিটির শিল্পকৌশল লক্ষণীয়। তার উপর তৃতীয় অনুচ্ছেদের সংলাপে ক্ষমার 'দোষীর দোষটুকুকে স্নেহের সহিত কোলে লইয়া বসা'র কল্পনাটি তো একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রীয় লেখক-ব্যক্তিত্বে পূর্ণ। এমন দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় প্রায়ই দেখা যায়। প্রাথমিক দৃষ্টান্তের নজির রূপেই শুধু এখানে এই উদ্ধৃতির অবতারণা।

"দত্তা" উপন্যাসের আরম্ভাংশ এইরূপ :

সেকালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টারবাবু বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দেশ করিতেন, তাহারা তিনখানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত।

আপাত-দৃষ্টিতে সরল অর্থের একটি বাক্য, কিন্তু এর ভিতর শিল্পের অতি সূক্ষ্ম কৌশল নিহিত আছে। এই শিল্পচাতুর্যের মূলে আছে ন্যূনতম শব্দসংখ্যার প্রয়োগ, সংক্ষিপ্ততা, অনেকগুলি বাক্যকে একটি জটিল বন্ধের বাক্যের মধ্যে পুরে প্রকাশের সংহতিবিধান এবং অর্থব্যাপ্তি। একটি মাত্র বাক্যে কতগুলি সংবাদ এখানে পরিবেশন করা হয়েছে একবার দেখা যাক। প্রথমতঃ, একালের হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নয়, সেকালের হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল। দ্বিতীয়ত, স্কুলের হেডমাস্টারবাবু তিনটি ছেলেকে বিদ্যালয়ের রত্ন বলে চিহ্নিত করতেন। তৃতীয়ত, তিনটি ছেলে তিনটি ভিন্ন গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে রোজ স্কুলে পড়তে আসত। চতুর্থত, তাদের প্রত্যেকেরই গ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল এক ক্রোশ। সবশেষে, বাক্যটির অন্তে এই ব্যঞ্জনা যে, এই তিনটি ছেলেই বর্তমান উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাতের সঙ্গে জড়িত এবং তারাই এর ঘটনাবলীর 'পেস-সেটার'।

পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, এই বাক্যগঠনে শিল্পীর সচেতন মন কাজ করেছে এবং শব্দব্যবহারের যাথাযথ্য এবং ব্যয়স্বল্পতা ওই সচেতন মনন-ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ছিল। একটিমাত্র বাক্যের অবয়বে যে-তথ্যগুলি এখানে লেখক পাঠকের গোচর করেছেন, মামুলী কোন লেখক হলে তাদের পরিজ্ঞাত করাবার জন্য কোন্‌না চার-পাঁচটি বাক্যের বিস্তারের আশ্রয় নিতেন। শরৎচন্দ্র গ্রামের কথা লিখলে কী হবে, রূপ ও আঙ্গিকসচেতন নাগরিক শিল্পীর মেজাজ তাঁকে বরাবর গ্রাম্যতা থেকে রক্ষা করেছে, রক্ষা করেছে অশিক্ষিতপটুত্বের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে। 'সফিস্টিকেশন' তাঁর ভাষার ছত্রে ছত্রে পরিদৃশ্যমান। সফিস্টিকেশন কথাটার মধ্যে কৃত্রিমতার দ্যোতনা আছে। এটা শরৎচন্দ্রের বেলায়ও কৃত্রিমতামণ্ডিত হতে পারতো যদি তাঁর শৈল্পিক মনোগঠনে আবেগের কমতি থাকতো। কিন্তু সকলেই জানেন যে, শরৎচন্দ্র ছিলেন অতিশয় ভাবাবেগসমৃদ্ধ লেখক। বরং এক-এক সময় আবেগের আতিশয্য তাঁর মাত্রাসাম্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে, তিনি মেলোড্রামাটিক

হয়ে পড়েছেন। রক্ষা এই যে, তাঁর হাতে এই ভাষার আয়ুধটি ছিল। এই ভাষা তাঁকে ভাবাবেগে অতিরেকী হতে দেয়নি, বরং স্বভাব-সংযমের দ্বারা তাঁকে আবৃত করে রেখেছে। তা বর্মের ন্যায় তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তির উপদ্রব থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর আঁটোসাঁটো সংযত ভাষা যদি তাঁর হাতে রক্ষাকবচ হয়ে না থাকতো তো তাঁর পক্ষে বর্ণনায়, বিবৃতিতে ও সংলাপে বেচাল হয়ে পড়া কিছু অসম্ভব ছিল না। এককথায়, শরৎচন্দ্রের ভাষা প্রায়শঃ শরৎচন্দ্রের ভাবের স্বেচ্ছাচারের প্রতিষেধক-রূপে তাঁর আত্মরক্ষার উপায় হয়েছে।

একটা জিনিস এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিৎ। শরৎচন্দ্রের ভাষা খুবই সাংগীতিকগুণসম্পন্ন, মিউজিক্যাল। ছন্দোময় তাঁর বাক্যরীতি। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের ছকের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, তিনি বেশ ভাল গান গাইতে পারতেন। প্রথম জীবনে বছর পাঁচেক একটানা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের চর্চা করেছেন, শেষের দিকে কীর্তন গাইতেন। এই সাংগীতিক গুণ তাঁর ভাষার দেহেও বর্তিয়েছিল। বাক্যের মাঝে মাঝে যতিস্থাপনে এবং ছন্দের দোলায় সেটা ধরা পড়তো। শব্দগুলি সাজাবার কায়দার মধ্যেও ছিল সংগীতের ধ্বনিময়তা। 'মহেশ' গল্পের আরম্ভটির কথাই ধরা যাক। 'গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট—' গ্রাম আর জমিদারের এই পর পর সহাবস্থানের চিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা তিনি অতি সুকৌশলে বাক্যটির ভিতর একটি ছন্দের দোলা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। কিংবা "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম বাক্যটির উপর একবার চোখ বুলনো যাক : 'আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।' অথবা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রথম বাক্যবন্ধের গড়ন : 'পশ্চিমের একটা বড় সহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল।' প্রথম বয়সের (১৮৯৮) লেখা "শুভদা" উপন্যাসের আরম্ভটি এইরূপ : 'গঙ্গায় আগ্রীবনিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে, বলিলেন, 'কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।' আবার একেবারে শেষ বয়সের (১৯৩৪) লেখা "শ্রীকান্ত" ৪র্থ পর্ব উপন্যাসের প্রারম্ভিক তিন-চারটি বাক্য এইরূপ : 'এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম।'

সর্বত্র আরম্ভের বাক্যবন্ধগুলির ভিতর একটা ছন্দের দোলা, ধ্বনির শ্রুতিগম্যতা। সকলের কানে এই ছন্দ বাজবে কিনা জানি না তবে অভিজ্ঞ কানের কাছে না বেজেই পারে না। সংগীতবেত্তা সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ জ্যাঁ-জ্যাক রুশো সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, রুশো তাঁর রচনার প্রতিটি বাক্য রচনাদেহে গ্রথিত করবার আগে প্রথমে উচ্চারণ করে পড়তেন। তাঁর কান অনুমোদন করলে তবে সেটিকে মুদ্রিত রচনার জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিতে স্থান দিতেন। শরৎচন্দ্র রুশোর মত এইভাবে বাক্য উচ্চারণ করে পড়তেন কিনা জানা নেই, তবে মনে মনে তিনি যে বাক্যের ধ্বনিগত সম্ভাব্যতা বাজিয়ে দেখতেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। উদ্ধৃত বাক্যগুলির গঠন বিচার করলেই তাদের ওই শ্রুতিবৈশিষ্ট্যের দিকটা টের পাওয়া যাবে বলে মনে করি। শরৎচন্দ্র শব্দ মেপে মেপে বসাতেন শুধু নয়, শব্দের ধ্বনি মনে মনে কান পেতেও শুনতেন। তিনি কবিপ্রাণ লেখক ছিলেন না, মূলতঃ ছিলেন মানবতন্ত্রী লেখক। তৎসত্ত্বেও তাঁর সাংগীতিক অভিজ্ঞতা তাঁর ভাষায় কাব্যভাবের সঞ্চার করেছিল।

কাহিনীর প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদগুলির দ্বারা অনেক সময় গোটা কাহিনীর রূপরেখাটি নিরূপিত হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের মুখবন্ধ থেকে একথার প্রমাণ দেওয়া চলে, তবে প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে দুটি উপন্যাসের উদাহরণ এখানে দেব। একটি প্রথম বয়সের লেখা উপন্যাস, অন্যটি পরিণত জীবনের।

"বড়দিদি" (রচনা আনুমানিক ১৮৯৮, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১৩) উপন্যাসের প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদ :

> এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন—সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।
>
> গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল ও সলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাঠি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে—এই ক্ষুদ্র কাঠিটির তখন বড় প্রয়োজন—উস্কাইয়া দিতে হয়, এটি না হইলে তৈল এবং সলিতা সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

এই থেকেই উপন্যাসের মূল চরিত্র সুরেন্দ্রনাথের পরনির্ভরতার ভাবটি মুদ্রিত হয়ে গেল এবং গল্পের কাহিনী কোন্ পথ ধরে চলবে তার একটা আভাস পাওয়া গেল। কাজেই খুব ভেবেচিন্তে সচেতনভাবেই গল্পের এই আরম্ভাংশটি রচনা করা হয়েছে।

অন্যপক্ষে উত্তরকালীন উপন্যাস "জাগরণ" (অসমাপ্ত, রচনাকাল ১৩৩০ বঙ্গাব্দ), এর প্রারম্ভিক অংশটি এইরূপ :

> ব্যারিস্টার মিস্টার আর. এম. রে ব্রাহ্ম ছিলেন না, গোঁড়া হিন্দু তো ছিলেনই না, হয়ত বা আঠারো-আনা 'বিলাত-ফেরতের জাতি' নাও হইবেন, তবে এ-কথা সত্য যে, তাঁহার পিতা মাতা যখন আরাধ্য দেব-দেবী স্মরণ করিয়া সপ্তপুরুষের অক্ষয় স্বর্গকামনায় একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীরাধামাধব রায় রাখিয়াছিলেন, তখন অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাঁহারা কল্পনা করেন নাই যে, এই ছেলে একদিন আর. এম. রে হইয়া উঠিবে, কিংবা তাহার খাদ্য অপেক্ষা অখাদ্যে এবং পরিধেয় বস্ত্র অপেক্ষা অপরিধেয় বস্ত্রেই আসক্তি দুর্মদ হইয়া দাঁড়াইবে। যাই হউক, সেই পিতা-মাতারা আজ যখন জীবিত নাই এবং পরলোকে বসিয়া পুত্রের জন্য তাঁহারা মাথা খুঁড়িতেছেন কিংবা চুল ছিঁড়িতেছেন অনুমান করা কঠিন, তখন এই দিকটা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার যেদিকটায় মতদ্বৈধের আশঙ্কা নাই, সেই দিকটাই বলি।

ভাবাভঙ্গীর মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ঝিলিক চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু রে সাহেবের যেদিকটা বিলাতিয়ানায় আচ্ছন্ন নয়, সেদিকটা কিন্তু বিদ্রূপ বা কৌতুক উদ্রেক করবার মতো দিক নয়। আলোচ্য উপন্যাসে সেই দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে আর এ সম্বন্ধেই 'মতদ্বৈধের আশঙ্কা'-বিহীনতার ইঙ্গিত করা হয়েছে। "জাগরণ" উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার ধারা অনুধাবন করলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শরৎচন্দ্র প্রকৃতি-বর্ণনা কিংবা নারীর রূপবর্ণনায় কোন সময়েই উচ্ছ্বসিত হননি। প্রকৃতিবর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের কবি-লেখনীর সহজাত আনন্দ-তন্ময়তা অথবা নারীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যপ্রীতির উদ্বেলতা—এর কোনটাই শরৎচন্দ্রের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেনি। তিনি মানবকেন্দ্রিক লেখক, মানুষের অন্তর্জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতেই সমধিক উৎসাহ

বোধ করতেন। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত তাঁর কথাসাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য ছিল। 'রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা, আমার বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশি নজর দিই না। আসল বস্তু, তার সত্তা বা মন যাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা।' এছাড়া "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের আরম্ভ-কালেও তিনি লিখেছেন :

> তাছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্প-টুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু এই বিবৃতিকে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার আবশ্যকতা নেই। "শ্রীকান্তে"র জবানিতে এ লেখকের বিনয়ের একটা ভঙ্গী হওয়াই সম্ভব—আত্ম-অবনয়নের ভনিতা। একথা অবশ্য সত্য যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণনায় আপ্লুত হননি, তবে চেষ্টা করলে তিনিও যে এক্ষেত্রে গভীর রূপসচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন তার প্রমাণ তাঁর ওই "শ্রীকান্ত" উপন্যাসগুলির মধ্যেই রয়েছে। দৃষ্টান্ত "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের গঙ্গানদীতে মাছ চুরির কালে গঙ্গা-প্রকৃতির বর্ণনা, দ্বিপ্রহর নিশীথের শ্মশান-বর্ণনা : শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের শ্রীকান্তের রেঙ্গুনে যাত্রাকালে জাহাজে ঝড়ের বর্ণনা; ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট অংশগুলির সব কয়টির উদ্ধৃতি এখানে উৎকলন করা সম্ভব নয়, তবে একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দিচ্ছি—গঙ্গানদীতে অন্ধকার নিশীথিনীর রূপ বর্ণনা। তার থেকেই বুঝতে পারা যাবে শরৎচন্দ্র প্রকৃতি-বর্ণনায় আপাত-অনীহা দেখালেও এবং কোন কোন জায়গায় পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনায় কবিদের আত্যন্তিক উচ্ছ্বাসকে ব্যঙ্গ করলেও ("শ্রীকান্ত" চতুর্থ পর্ব দ্রষ্টব্য) প্রয়োজনবোধে প্রকৃতি-বর্ণনায় তিনি কতখানি দুর্ধর্ষ হতে পারেন :

> কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণে ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উন্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র-গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সে অপরিমেয় গভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালী-মূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে;

কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

এই বর্ণনার কি কোন তুলনা আছে? এ কি ঠিক 'জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না'-র মতো বোধ হচ্ছে? লেখকেরা বিনয়-নম্রতায় কখনও-কখনও বৈষ্ণব ভক্তদেরও ছাড়িয়ে যান--এ তারই নমুনা।

আর নারীর রূপ? সেও কি শরৎচন্দ্রের হাতে পরিস্ফুটিত হয়নি? এক্ষেত্রে অবশ্য তিলোত্তমা-মৃণালিনী-কপালকুণ্ডলা-কুন্দনন্দিনী-রোহিণীর দেহসৌন্দর্যবর্ণনায় উচ্ছ্বসিতলেখনী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আর কোন লেখকের কোন তুলনাই হয় না, তাহলেও শরৎচন্দ্রও প্রয়োজনবোধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারারক্ষা করতে পারেন না এমন নয়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র কথার বিস্তার-বাহুল্যের পক্ষপাতী নন, তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী পরিমিত বাক্যপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী এবং দু-চারটি আঁচড়েই কাজ সারেন। বর্ণনার ফেনিলতার পরিবর্তে তিনি বর্ণনার তির্যক্ রেখার উপর দিয়ে চলতে ভালবাসেন।

"চরিত্রহীন" উপন্যাসের কিরণময়ীর রূপবর্ণনা :

উপেন্দ্র দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্ন-রচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তার একটিমাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেন্দ্রর গা ঠেলিয়া দিল।

ভাষার কী অসামান্য সংযম। এই সংযম একদিনে আয়ত্ত হয়নি, এর পিছনে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ইতিহাস সুযুপ্ত রয়েছে—সযত্ন আর ক্লেশসহনক্ষম অনুশীলন।

৩

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম, শব্দসম্পদ যে কত সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকোনো থাক্, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।' কিন্তু এই বিবৃতিকে সত্য বলে গ্রহণ করবার হেতু নেই। বিনয়-ভাষণের এ একটা ভঙ্গী মাত্র, যার ইঙ্গিত আমি পূর্বেই দিয়েছি। আর যদি তর্কের খাতিরে এই বিবৃতিকে সত্য বলে ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও কিছু এসে-যায় না। কেননা লেখকের ভাষাশক্তি তাঁর ব্যবহৃত শব্দসংখ্যার কমবেশীর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শব্দ সাজাবার কায়দার উপর। যত সামান্য পরিমাণ শব্দ নিয়েই তিনি তাঁর রচনার-প্রাকার দাঁড় করান না কেন, দেখতে হবে শব্দগুলিকে তিনি কীভাবে প্রয়োগ করেছেন, শব্দের অন্বয়ে তিনি ছন্দ রক্ষা করেছেন কিনা, দ্বিত্ব তথা বাহুল্যভাষিতা এড়িয়ে চলেছেন কিনা, প্রযুক্ত শব্দসম্ভারের মধ্যে তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্যাস সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন কিনা, সর্বোপরি এইসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পরও তাঁর বাক্যাবলীর অর্থ অভীপ্সিত সারল্য ও সহজতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে শরৎচন্দ্রকে শব্দের জাদুকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শব্দের ম্যাজিক অপ্রতিরোধ্য, সংক্রামক। ওই শব্দপ্রয়োগের রীতি অনুধাবন করলে বোঝা যায় পিছনে বহু-অধীত একটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ কাজ করছে। যুক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক সাহিত্য পড়ার ফলেই শুধু এ-জাতীয় শব্দসংস্কার তথা ভাষাভঙ্গীর জন্ম হওয়া সম্ভব।

একটা কথা সকলেরই এ প্রসঙ্গে মনে রাখলে ভাল হয় যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে বাইরে একজন কম-লেখাপড়া-জানা 'দাঠাকুর'গোছের মানুষের ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মপরিচয় দিতে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর অধ্যয়নশীলতা ও বৈদগ্ধ্যকে আড়াল করে গ্রামঘরের সাধারণ একজন ন্যালাখ্যাপা মানুষরূপে পরিচয় দিতে চাইতেন। শিল্পীদের নানা রকমের খেয়াল থাকে, এও এক ধরনের খেয়াল। স্বীয় প্রকৃত সত্তাকে গোপন করে বাইরে আলাভোলা বৈরাগী সেজে থাকার মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে নিষ্কলুষ কৌতুক করার যে-একটা প্রবণতা দেশী-বিদেশী বহু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়, সেই প্রবণতা শরৎচন্দ্রেরও শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অন্যতর গোত্রলক্ষণ ছিল। তিনি সাধারণকে 'ভাঁড়িয়ে' 'মজা' পেতেন। আর এই দুর্মর রঙ্গবোধেরই প্রকাশ তাঁর বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য লোকচক্ষুর অগোচর রাখার চেষ্টার মধ্যে।

নয়তো বাস্তবত তিনি ছিলেন ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বই পড়তে তিনি স্বভাবের স্ফূর্তি অনুভব করতেন। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসারের তিনি একজন সাতিশয় ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত বই তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন। নৃবিজ্ঞানেও যে তাঁর কত পড়াশুনো ছিল তা অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখিত "নারীর মূল্য"র পাতা খুললেই বুঝতে পারা যাবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গ্রন্থ পড়ে অভিভূত হয়ে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে একবার সখেদে লিখেছিলেন যে, ইউরোপে জন্মালে তিনি একজন সমাজতাত্ত্বিক লেখক হতে পারতেন, এই পোড়া দেশের জল-হাওয়ার দোষে তিনি কিনা হয়েছেন একজন জনমনোরঞ্জক গল্পলেখক!

এই থেকেই মানুষটির ধাত বোঝা যায়। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের আয়োজিত আলাপ-সভায় শরৎচন্দ্র নিজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়িতে যে বই আছে তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই।......আমার ভাষাটা বোধহয় সায়েন্সের বই পড়ার দরুন ঐ-রকম হয়ে থাকবে।

লেখকের এই আপন স্বীকারোক্তি থেকেই তাঁর ভাষা-বৈশিষ্ট্যের রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজেই তিনি বলছেন তাঁর ভাষার মেজাজটা বিজ্ঞানের—সায়েন্সের। সায়েন্সের ভাষার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ—যাথাযথ্য, মিতব্যয়ী শব্দব্যবহার, দ্বিত্ব বা বাহুল্য উক্তি পরিহার, উদ্দিষ্ট বক্তব্যের আয়তনের মধ্যেই শুধু রচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা, বাড়তি বক্তব্যের মধ্যে না যাওয়া, আলঙ্কারিক রীতি (যমক, অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, ইত্যাদি) যথাসম্ভব বর্জন, সর্বোপরি অর্থের স্পষ্টতা ও সুবোধ্যতা।

এই সব কয়টি মানদণ্ডের পরীক্ষাতেই শরৎচন্দ্রের ভাষারীতি কমবেশী উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যদিও তাঁর রচিত সাহিত্য কথাসাহিত্য, তাহলেও সেই কথাসাহিত্য বৈজ্ঞানিক রচনার লক্ষণাক্রান্ত বলাই যুক্তিযুক্ত। এই কথাটি মনে রাখলে শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃতি উপলব্ধির কাজ সহজতর হতে পারে।

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

দীপু আর দেবু ব্রিজ পেরিয়ে একটা ঢালু জায়গা দিয়ে নেমে ছোট কিন্তু পিচবাঁধানো রাস্তাতে পড়ল। ব্রিজের ওপর অনেক ছেলের ভিড়, ওদের একটা দলের সংগে বেণু আটকে গেল। দীপু আর দেবু ঢালু বেয়ে নেমে সেই ছোট্ট রাস্তায় সিগারেট ধরাল। রাস্তাটা নির্জন। কিছু অবসরপ্রাপ্ত বড় বড় অফিসারের বাড়ি ফাঁকা-ফাঁকা বাগানওয়ালা। এই সব বাড়ির ছেলেরা ক্লাশ এইটে উঠলেই মোটা কাঁচের চশমা পরে। ক্লাশ টেনে ওঠবার পর ছেলেগুলোর উরু মোটা এবং লোমে ভর্তি হয়ে যায়, তবু ওরা সাদা হাফপ্যান্ট পরে, আর প্যান্টের মধ্যে শার্ট গুঁজে দেয়, চকচকে নতুন সাইকেল চালায়। মেয়েরা দার্জিলিঙে পড়ে। ছুটিতে এসে বাড়িতেও স্কার্ট পরে। নিচু রাস্তা থেকে বড়পুলে রেলিং-এ বসা ছেলেদের ভিড়। দেবু আর দীপু তালুর আড়াল দিয়ে সিগারেট খেতে লাগল। তালুর আড়াল দেবার কারণ, এই সময়ে নজরুল ইসলামের মতো দেখতে বাবরিচুলওয়ালা এক ভদ্রলোক, অন্য একজন লাল-টকটকে-মুখওয়ালা এবং বেঁটে, মাঝখানে-সিঁথি-কাটা আর-একজন ভদ্রলোক—এই তিনজন এই পথেই বাড়ি ফিরবে। তিনজন লোকই মুখচেনা, চেনা মুখই সম্মান দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট। বেণু শালা থার্ড ইয়ারের সনৎদের দলের সংগে কী এত লদকালদকি করছে? দেবু সিগারেটটা ঠোঁটের কাছে নামিয়ে নিয়ে কথাটা বললো, দীপু তার কোন জবাব দিল না, কারণ দীপু জানে দেবু তাকে এই প্রশ্ন করেনি। দীপু একটা লম্বা টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো,—আসলে সনৎ এবার প্রোভাইসে দাঁড়াবে, সেই জন্যই প্রতি ইয়ারে একজন করে ওর সাপোর্টার চায়। সনতের সেন্স অব অরগানাইজেশান খুব স্ট্রং।

—রাখ্ তোর অরগানাইজেশান। অন্তত বিশটে বাড়িতে আজ চাঁদা আদায় না করলে পুজো কী করে হবে। পুজোর আর মাত্র দশদিন বাকি, দেবু ঝামটা মারে। এমন সময় দীপু দেখতে পেল ছড়িহাতে, মাঝখানে সিঁথি-কাটা, বাবরিচুলওয়ালা অবিকল নজরুল, লাল টকটকে মুখ তার পাশে, আর পাটকরা সিঁথি বেঁটে বাবু বেশ হনহনিয়ে চলে গেল। একটা চানাচুরওয়ালা বড়পুলে বেচাকেনা করে তার পশরা মাথায় নিয়ে ঢালু বেয়ে নেমে আসছে। মাঝখানে একটা কুপি জ্বলছে। ঢালু দিয়ে নামবার সময় অন্ধকারে চানাচুরওয়ালা অদৃশ্য হয়ে গেল, শুধু কুপিটার জ্বলন্ত সলতে চোখে পড়ল। ঠিক তখনই পুলিশ লাইনে বিউগিল বাজল।

—দেখ্ দীপু, বেণু শালা যাঁহাতক এখানে আসবে অমনি ওর পোঁদে দুই লাথ মারবো।

বেণু একটু পরে ঢালু দিয়ে রাস্তাতে নামল। দেবু ওকে দূর থেকে দেখেই চিৎকার আরম্ভ করে। বেণু একটুও ঘাবড়ায় না,—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? এদিকে প্রোভাইসে দাঁড়ানোর তাল করছিস, ওদিকে লোকজনের সংগে কথা বলবি না, তোকে কে ভোট দেবে?

—তোর কি এখন ক্যানভাসিং-এর সময়? পুজোর চাঁদা না তুললে সরস্বতী পুজো কি বাকি করে হবে? তুই তো আবার বাকিমাস্টার। দেবু হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল, ওর গলাতে তখনও রাগ।

দীপু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার কথা বলল,—বেণু, সত্যি তোর জন্য সাতরাজ্য ঘুরে যেতে হবে। থানার পাশ দিয়ে গেলে ডলিদের বাসাতে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত।

—তুই আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস। তুই জানিস থানার পাশে গোপালের দোকানে আমার একটু উইকনেস আছে, বেণু একটু লজ্জা-লজ্জা করে কথাগুলো বলল। দীপু ভাবল কথাটা না তুললেই হত। দাঁড়াস সাপের শরীরের মতো কুচকুচে কালো একটু আঁকাবাঁকা ঠাণ্ডা অন্ধকার। রাস্তা একসময়ে একটা লাইট পোস্টের কাছাকাছি। দারুণ শীত, ঘন কুয়াশাতে রাস্তাঘাট একাকার, আলোর চারপাশটাও কুয়াশাতে ভরা। তীব্র বিজলি আলোতে বিশ্লিষ্ট জলকণাগুলো ধুলোর মতো লাগছে। ডানে বাঁয়ে সামনে সমস্ত বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ। শুধুমাত্র একটা বাড়ির দোতলাতে ভারি পর্দা সত্ত্বেও আলো জ্বলছে। দেবু এবং বেণু লাইটপোস্ট পেরিয়ে গেল। দেবু খুব লম্বা, বেণুর উচ্চতা মাঝারি ধরনের। দেবুর পাট-পাট ব্যাক-ব্রাশ-করা চুলে আলো পিছলে পড়ছে। দেবুর গায়ের আলোয়ান এবং মুখের ডানপাশটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেবুর চোখটা একটু কটা। নাক মুখ ভারি। একটা ম্যাজেন্টা রঙের আলোয়ান গায়ে বেণুকে একটু বয়স্ক মনে হয়। কোঁকড়ান চুলগুলো, মুখটা দাড়ি-গোঁফে ভর্তি। আলো পেরোবার পর শুধু তাদের দৈর্ঘ্য ছাড়া দেবু এবং বেণু অন্ধকারে লীন হয়ে গেল। আবার গলা শোনা গেল —গোপালের দোকানে তোর কত বাকি? —আড়াই টাকা, বেণু জবাব দিল। আগামীকাল সরস্বতী পুজোর নাম করে বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করব। তোর বাকি কালই শোধ করব। দেবু সহজ গলাতে কথাগুলো বলল। দীপু ততক্ষণে ওদের বরাবর হয়েছে। তিনজনই পাশাপাশি চলছে। দীপু বলল,—আমি নানা সোর্স থেকে গোটা সাতেক টাকা পেতে পারি।—সেই টাকা দিয়ে আমরা মাংস পরোটা খাব, দেবু হেসে বলল। বেণু কোন কথা বলল না। দীপু এবং দেবু তাকে এই আলোচনার মধ্যে আনল না।

বড় রাস্তাতে অনেক আলো। কিন্তু ধরাধরা নদীর দিক থেকে ধোঁয়া আর কুয়াশা বেনোজলের মতো সবকিছু ডুবিয়ে দিয়েছে। বড় রাস্তার ওপারে ডলিদের বাড়ির সামনের দিকটা ভীষণ অন্ধকার। রাস্তা থেকে ডলিদের বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত জায়গাটা একটু ঢালু। সেই ঢালু জায়গাটা সিঁড়ি-বরাবর করার জন্য একটা মস্ত চওড়া লোহার চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে। সেই লোহার চাদরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় রেলপুলের ওপর দিয়ে গাড়ি যাবার শব্দ উঠল। বেণু কড়া নাড়ল। কড়া নাড়ার শব্দে ভেতরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। বেড়ালের ডাক কানে এল। চেয়ার সরানোর শব্দ হল। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়েও বোঝা গেল লণ্ঠনটা সারা ঘরময় ছোটাছুটি করছে। তিনজনের বুকই ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে দরজা খুলবে! কিন্তু দরজা খোলার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, অথচ অন্ধকারে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আবার কড়া নাড়তে তিনজনেরই ভয় করতে লাগল। দীপু জানে, মেয়েদের বাড়িতে এলে তিন ধরনের লোক প্রথমে দরজা খোলে। প্রথম ছোট ছেলেমেয়েরা দরজা খুলেই বাড়ির লোককে ডাকতে যায়। কিন্তু দরজা খুলেই, চিনুক বা না চিনুক, একটু ফিক করে হাসবেই। দ্বিতীয় কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে দাড়িগোঁফওয়ালা যুবাপুরুষ অথবা সিঁদুরপরা মহিলা। দরজা খুলে যুবাপুরুষরা হাসে না কিন্তু কথা বলতে একটু তোতলায় এবং ওদের ঠোঁটের দিকে তাকালে রক্তশূন্য মনে হয়। মিনিটখানেকের ক্রাইসিসের পর ভদ্রলোক দরজা ছেড়ে ভেতরে যান এবং মেয়েটিকে ডেকে দেন। কিন্তু পেছন ফিরলেই দেখা যাবে ভদ্রলোকের পরনে লুঙ্গি এবং ধুতির সঙ্গে পরার শার্ট। কিন্তু বিবাহিতা মহিলারা কোনদিন ঘাবড়ান না। দরজা খুলেই একটু মিচকি হেসে বলবেন,—ডেকে দিচ্ছি, বসুন। সাধারণত এইসব মহিলাদের হাতভর্তি চুড়ি থাকে, নতুন লাল শাঁখা থাকে এবং পেছন ফিরলে হাঁটবার সময় নিতম্বটা দোলে। শেষ শ্রেণীতে গোঁফওয়ালা অথবা পরিষ্কার কামানো বয়স্ক ভদ্রলোক কিংবা শাড়িপরা সাদামাটা মহিলা। ভদ্র-

লোকেরা ধুতি গেঞ্জি পরেন, কারও কারও খড়ম অথবা বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে। গম্ভীর মুখে দরজা খুলে ভদ্রলোক বলবেন,—ভেতরে এসে বসো, ওকে ডেকে দিচ্ছি। কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক সাধারণত অদৃশ্য হবেন। ভদ্রমহিলাদের আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : একদল আগন্তুকের দিকে না তাকিয়েই মেয়েকে ডাকতে যাবেন, আবার অন্য দল তারিয়ে তারিয়ে অতিথিদের দেখে তারপর মেয়েকে ডাকতে যাবেন। কিন্তু এই দুই দলের মহিলারাই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁদের কব্জি ভীষণ শীর্ণ লাগে দেখতে। বেণু বলে, অশোকবনে সীতার শীর্ণতা। দীপু ভাবতে শুরু করলো যে ডলিদের বাড়িতে কে আজ দরজা খুলবে। প্রথম যে দরজা খোলে সে সব সময়েই একটু বিস্ময়ের বস্তু হয়। একবার বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়ে দীপু সন্ধ্যাবেলা দেখলো ডাক্তারবাবুর বাইরের ঘর অন্ধকার—ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন, ডাক্তারবাবু—, সে কতকাল আগের কথা, দীপু তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। অন্ধকারে একা-একা দাঁড়িয়ে থেকেই দীপু একটা দ্রুত পায়ের শব্দ ভেতর দিক থেকে আসছে শুনতে পেল। তারপর হঠাৎ সুইচের শব্দ হল, একঘর আলোর মধ্যে ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ের মুখোমুখি হল দীপু। মেয়েটা আবার একটু মিষ্টি লক্ষ্মীট্যারা। এর পর থেকেই যে কোন বন্ধ দরজা খোলার সময়ে দীপুর একটু কেমন আশা হয়।—বেণু, তুই আবার কড়া নাড়, বাড়ির কেউ বোধ হয় এখনও বুঝতে পারেনি আমরা এসেছি, দেবু বেণুকে ঠ্যালা দেয়। বেণু কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু না থেমে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়তে থাকে। ঘরের ভেতরে আবার লণ্ঠনের ছোটাছুটি শুরু হল। গম্ভীর কণ্ঠে একটা আওয়াজ কানে এলো,—কে? কে, তা কে বলবে? যদি বলা যায়, আমরা কলেজ থেকে আসছি, তবে বাক্যটা লম্বা এবং কেমন যেন অর্থহীন শোনাবে, বেণু দীপু দেবু—একইরকম বোকা-বোকা। সুতরাং তিনজন যুবক চুপ করে রইল। অন্ধকার, মাঘ মাসের শীত, কুয়াশা ইরেজারের মতো ঘষে ঘষে সবকিছু মুছে দিচ্ছে। এমনি রাতে বন্ধ কোন দরজার বাইরে চুপ করে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। কারণ দরজার বাইরের পরিস্থিতিতে তীব্র একটা সংকট ওদের তিনজনকে ন যযৌ ন তস্থৌ করে রেখেছে। অবিমিশ্র ঠাণ্ডাতে অন্ধকারে কুয়াশাতে ওদের যা কিছু ছিল সব দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। এমনি পরিবেশে রুদ্ধদ্বারের এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনজন নিজের নিজের পরিচয় দিতে অপারগ। কিন্তু দীপু দেবু বেণু তিনজনই বুঝল যে ঘরের ভেতরের আলোর সেই ভুতুড়ে ছোটাছুটি শেষ হয়েছে, আলোটা একটা নির্দিষ্ট গতিপথে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দরজা খুলল। কে যেন লণ্ঠন উঁচু করে ধরল। ওরা তিনজন প্রায় একসঙ্গে বলল,—কলেজ থেকে এসেছি। আগে কে কথা বলবে তা রিহার্সাল দেওয়া হয়নি। তিনটি কণ্ঠস্বরই দুর্বল শোনাল।—আরে তোমরা! ভেতরে এসো। ডলির গলা শুনে ওরা তিনজনই আশ্বস্ত হল। অচেনা প্লাটফর্মে চেনা কারও আসবার কথা থাকলে চলন্ত ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে মুখটাকে খুঁজে পেলে মৌলিক একটা সমস্যা সমাধানের নিশ্চিন্ততা আসে, ডলির গলা শুনে ওরা সেইরকম নিরাপদ বোধ করলো।

বাইরের তুলনায় ঘরের মধ্যে বেশ গরম। একপাশে একখানা তক্তপোশ, পরিষ্কার একটা বিছানার চাদর পাট-করে পাতা। সবুজ সুতোতে সূঁচের কাজ-করা বালিশের ওয়াড়। তিনখানা বেতের চেয়ার এবং লণ্ঠন। ডলি খুব খুশি-খুশি।—কী খাবে বলো, এই যে আমার মা।

—তোমরা গল্প কর বাবা, থাক্ থাক্, হয়েছে, প্রণাম করতে হবে না।

দীপু ভাবল, যে সময়েই মেয়েদের বাড়িতে যাও ওদের মোটামুটি সাজগোজ অবস্থায় পাবে। ডলির পরনে একটা ডোরাকাটা শাড়ি, দু-কানে দুটো গোল রিং। ডলির গায়ের রং না-ফরসা

না-কালো। চোখ দুটো বেশ বড়, দৃষ্টি গভীর। নাকের ডান পাশে একটা তিল আছে। ডলির গায়ে একটা লাল চাদর। ডলি হাসলে, ছোট দুটো গজদাঁতে হাসিটা সুন্দর লাগল। মনে হল, হাসিটা হাতপাখার বাতাস। হাসিটা দেখে ভীষণ আরাম লাগে।

—দুশো টাকা আর চাঁদার রসিদের কাউন্টারফয়েল তোমার কাছে রাখো। মোট বোধ হয় হাজার দুয়েক টাকা জমা রইল। কথা শেষ করে দেবু টাকা এবং রসিদগুলো ডলির হাতে দিল।

—মেয়েদের ব্যাপারটা আগামীকাল শেষ করতে হবে। উত্তর দিকে আমাদের কলেজের প্রায় দুশো মেয়ে একই কলোনিতে এন ব্লকে থাকে। আগামীকাল ওদিকটাতে তুমি তোমার দল নিয়ে কালেকশানটা শেষ কর। বেণু চায়ে চুমুক দেবার আগে কথা শেষ করল। দীপু আরো একটা মিষ্টি মুখে চালান দিল। দীপু দেখল যে দেবু চায়ে চুমুক দিয়ে গেলবার আগে চোখ বুজলো।

—তোমরা কেউ সঙ্গে না গেলে আমি এক-একা যেতে পারব না, ডলির কথাতে আহ্লাদী ভাবটা এতটা চাপা যে শুনতে ভালো লাগে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। দীপু তোমার সঙ্গে যাবে। দেবুর আর আমার দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। বেণু প্লেট থেকে খাবার জিনিস একটু বেশি করে নিল। দেবু ব্যাপারটা আগেই বুঝতে পেরেছে, সেইজন্য দেবু শুধুমাত্র চা খাচ্ছে, খাবার খাওয়া অনেকক্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে। দীপুর বেণুর জন্য ভীষণ দুঃখ হল। বেণুর কথা শেষ হবার পর ডলি কোন জবাব দিল না, ব্যবস্থাটা মেনে নিল এটা বোঝা গেল। তারপর নিজের বাঁ হাতের চুড়িখানা নিয়ে খেলা করতে করতে দীপুর দিকে তাকাল। দীপু প্রাণপণে মনে মনে চাইল যে ডলি আর একবার হাসুক। গজদাঁতে ডলির হাসিটা দেখতে দীপুর ভীষণ ভাল লাগে।

ডলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেণু বাড়ি চলে গেল, দেবু নাইটশো সিনেমার টিকিট কাটতে আলাদা হল, দীপু একা-একা বাড়ির পথ ধরল। কুয়াশাতে অন্ধকার পথে একচিলতে আলোর মতো ডলির গজদাঁতের হাসি।

সোজা রাস্তাতে থানার দিক থেকে মোড় নিতেই দীপু শুনল একটি নারীকণ্ঠ তাকে ডাকছে। দীপু পেছন ফিরে অন্ধকারের দিকে তাকাল, এগিয়ে গেল। দীপু দেখল জ্যোৎস্নাদি ডাকছে সারদা মোক্তারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্না নাগ স্থানীয় একটা নার্সারি স্কুলে পড়ান। দীপুদের থেকে অনেক সিনিয়ার। ভদ্রমহিলার বুক দুটো এত উঁচু যে দেবু একদিন বলেছিল যে বিজ্ঞানের নিয়মে দূরের জাহাজের মাস্তুল আর জ্যোৎস্না নাগের বক্ষযুগল সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। জ্যোৎস্নাদির মুখটা বেশ মাংসল। গালের দিকটা এবং নাকের নিচটা একটু লালচে ধরনের। বেণু বলে জ্যোৎস্নাদি হস্তিনীজাতীয়া রমণী।

—দেখো দীপু, ইস্কুলের একটা ফাংশনে ভীষণ দেরি হয়ে গেল। একা পড়ে গেছি, চলো তোমার সঙ্গেই যাই। থানা পেরিয়ে ওরা একটা সোজা গলির রাস্তা ধরলো। হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকেই জ্যোৎস্নাদি বললেন—দীপু, তোমার আলোয়ানটা আমাকে দাও তো। দীপু প্রথমে বুঝতেই পারল না ব্যাপার কী। শুধু শার্টের ওপর একটা হাফ সোয়েটার গায়ে। তবু কাঁপতে কাঁপতে আলোয়ানটা দীপু খুলে দিল, জ্যোৎস্নাদি আরামসে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

মা শয্যাশায়ী। কী একটা অ্যালার্জিক ঘায়ে মায়ের পায়ের গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। তার সঙ্গে জ্বর। বুকের ধড়ফড়ানি মায়ের আগাগোড়াই আছে। বাড়ির ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা ঠিক ধরতে

পারছেন না। মা রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। দীপু বাড়ি ফিরেই দেখল তাদের বাড়িওয়ালার বিধবা স্ত্রী এবং বৌদি এসে হাজির। বাবা অভ্যর্থনা করে দুই ভদ্রমহিলাকে মায়ের শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। দীপু বাবার কৌশলটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। ভদ্রমহিলারা মায়ের অবস্থা দেখে একেবারে থ। বাকি ভাড়ার কথাটা আর তুলতে পারল না। চা জলখাবার খাইয়ে রিকশা ডেকে দীপু দুই ভদ্র-মহিলাকে রিকশাতে উঠিয়ে দিতে এগিয়ে গেল। বিধবা ভদ্রমহিলা দীপুকে বললেন,—বাবা, তোমার বাবাকে বল যে বাড়িভাড়াটা অনেকদিন পাই না। তোমাদেরও বিপদ বুঝছি, তবু আমাদেরও বাড়ি-ভাড়াটা না পেলে চলছে না। তোমরা বরং বাড়িটা ছেড়েই দাও। রিকশাটা এগিয়ে গেল, দীপু একা-একা সেই ভীষণ শীতে অন্ধকারে এবং কুয়াশাতে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়িভর্তি মানুষ। তিন বোন একঘরে জোরে জোরে পড়ছে। বাইরের ঘরে একখানা বড় টেবিলের চারপাশে দুই ভাই তপু আর চিতু পড়াশোনা করছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে। বাবা দু-তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মা রোগশয্যা থেকে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে নির্দেশ দেন। বাড়িতে দুজন কাজের লোক এবং রান্নার লোক রয়েছে। ওপর থেকে সব ঠিক আছে কিন্তু তলা থেকে আস্তে আস্তে ইঁটগুলো সরে যাচ্ছে। দীপু কুয়োপাড়ে গিয়ে হাতমুখ ধুল। এত ঠাণ্ডাতে কুয়োর জল খুব ঠাণ্ডা নয়, বরং একটু বা গরম। মাইকে কে যেন কী বলছে রাস্তাতে। নিশ্চয়ই মাইকটা চলন্ত রিকশার সঙ্গে বাঁধা। মাইকে প্রচারিত কথাগুলো একটা দীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয়ে শীতের কুয়াশাতে ফিরে-ফিরে আসছে, কিন্তু পুরো বোঝা যাচ্ছে না। দীপু কুয়োপাড় থেকে আসতে আসতে ভাবতে লাগল নিশ্চয়ই মাইকের ঘোষণাটা অন্ধকারের হাঁড়ির মধ্যে সাপুড়ের সাপের মতো ঢুকে যাচ্ছে, তারপর কুয়াশার কবর। হাতমুখ মুছে দীপু মাঝের ঘরে ঢুকলো। মা-বাবার বিছানা ঘরের এককোণে। ঘরটা বড়। সুতরাং অনেকটা জায়গা একেবারে ফাঁকা। বারান্দাতে এত শীতের রাতে খেতে বসা যায় না।

গরম-গরম মুগের ডাল, বড় বড় বেগুনভাজা, ধোঁয়া-ওঠা ভাত,—ঘি-ঘি গন্ধ। মাছ নেই বলে দীপু খুঁতখুঁত করল। মা বলল,—আজ বাজারে একেবারেই মাছ পায়নি নোল্তা। আজ কষ্ট করে খাও। মা বিছানাতে বালিশ ঠেস দিয়ে বসে দীপুর খাওয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মা ছোট্টখাট্ট মানুষ। পায়ের ঘা দীপু বার বার দেখে, তাই বুঝতে পারে মায়ের পায়ের পাতা কত গোলাপী, সুন্দর। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ঐরকম পায়ের ছাপ ফেলেই ফুটফুটে জোছনাতে মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে আসেন। মায়ের মাথাভরা চুল, ছোট্ট কপাল, প্রতিমার মত মুখ আর মায়ের গা দিয়ে পুরো মা-মা গন্ধ। বালিশে ঠেস দিয়ে বসে-থাকা মাকে দেখে বিকেলবেলার শীতকালের নদীর কথা মনে আসছে। মা বাঁচবে তো? খেতে খেতে মা কালীকে মনে মনে ভাবতে লাগল। নীলচে আলোর বলয়ের মধ্যে মা কালীর মুখটা এক মিনিটের জন্য ভেসে উঠল। মা কালীর মুখখানা দেখবার পর এক সেকেন্ডের জন্য দীপুর সমস্ত স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে গেল। দীপু ভাতের গ্রাস চিবানো বন্ধ করল। তারপর আবার খেতে শুরু করল। এ যেন এক মিনিটের জন্য বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আবার ধুম বিষ্টি ঝেঁপে এল।

দীপু "তিথিডোর" নিয়ে শুতে গেল। নোল্তা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে 'জজ সাহেবের নাতনী' সিনেমার গান গায়। নোল্তা বাড়ির চাকর ঠিক নয়, সে প্রায় বাড়ির ছেলে। একসময়ে চোখ ঘুমে ভেঙে এল, লণ্ঠন নিভিয়ে দিল দীপু, শুধুমাত্র ডলির ছোট্ট গজদাঁতে লেগে থাকা মিষ্টি হাসিকে

সম্বল করে চোখ বুজলো। দীপুর চোখের সামনে একটা বিরাট আকাশ, তাতে তারা এবং অগণিত তারা জ্বল জ্বল করল, রোগা মায়ের মুখ, ডলি হাসছে!

দেবু আস্তে কড়া নাড়ল। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে আলোয়ান দিয়ে কান মাথা জড়িয়ে নিয়েছে। তাদের সদর দরজার বাঁপাশে বিরাট কদমগাছটা আগাগোড়া কুয়াশাতে ঢাকা। কুয়াশা মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভবে ঝুলে অছে। নিস্তব্ধ জনশূন্য রাস্তাতে দু-একটি রিকশা শেষ সওয়ার নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। দু-একটি রাস্তার কুকুর বার বার কুয়াশাতে অদৃশ্য হয়ে আবার দেবুর দৃষ্টিপথে ফিরে আসছে। দেবু বুঝতেই পারল না একটা রাস্তা এই প্রচণ্ড শীতে কুয়াশাতে হঠাৎ অতিজাগতিক রূপ নিচ্ছে কী করে। কদমগাছ থেকে টপটপ শিশির পড়ে ওদের বাইরের ঘরের টিনের চালে। বাড়ির পাশের মহামায়া হিন্দু হোটেলে গেঁজেল সংকীর্তনের দল খোলকরতাল নিয়ে হরিনাম করছে। প্রচণ্ড সমবেত চিৎকার। গভীর নরম এবং সুরেলা হয়ে আবহাওয়াতে ভাসছে। হঠাৎ দেবু দেখল নিউ চিত্রালী সিনেমা হলের বেদানা আগাগোড়া লাল কম্বলে সারা শরীর জড়িয়ে একটা লণ্ঠন হাতে অন্ধকারকে দুফালি করে কেটে ফেলছে। একটা বিরাট রাক্ষুসে তরমুজের মতো দুফালি হওয়া অন্ধকারের মাঝখানটা লাল টুকটুকে। বেদানার পিছনে চাদরে কানমাথা চোখমুখ অদৃশ্য একটা লোক। লোকটা কে? বেদানা ভালো মেয়ে নয়। দেবু দুফালি-করা অন্ধকার আর লণ্ঠনের আলো মেলাতে পারল না। অথচ কুয়াশার মধ্যে বড় আকারের জোনাকির মতো লণ্ঠনটা সরে যাচ্ছে। সেই আলোতে পেছু পেছু হেঁটে যাওয়া নাকমুখচোখ ল্যাপামোছা পুরুষের ছায়া অনেকক্ষণ দেবু দেখতে পেল। মশারির ভেতর থেকে নেমে বাবা যে লণ্ঠন ধরাচ্ছেন দেবু সেটা বুঝতে পারল। কারণ দেশালাইকাঠি জ্বালানোর দু-একটা ব্যর্থ চেষ্টার শব্দ দেবু বুঝতে পারল। নাকের ডগা আর দু ঠোঁট ঠাণ্ডাতে হিম হয়ে আসছে। লণ্ঠন জ্বললো ঘরের ভেতরে, বাবা খড়ম পায়ে এগিয়ে এলেন, দরজা খুললো। বন্ধ ঘরের একটা গরম গন্ধ দেবুকে ঝাপ্টে ধরলো। তার মধ্যে আধোঘুমে আধো-জাগরণে বাবার গায়ের গন্ধ একসময় পৃথকভাবে নাকে এল। দেবু মাকে দেখেনি। আজ প্রায় উনিশ বছর বাবার কাছাকাছি। বাবার গায়ের গন্ধ তার খুব চেনা। পেছনের দরজা দিয়ে লণ্ঠন হাতে বারান্দার দড়ি থেকে গামছা নিয়ে দেবু কুয়োতলাতে গেল।

দেবু হাতমুখ ধুতে ধুতে উপলব্ধি করল যে বাইরের হিম ঠাণ্ডার চেয়ে কুয়োর জলটা গরম। কুয়োর গরম জল বালতিতে টলমল করছে, ধোঁয়া উঠছে বালতি থেকে। দেবু হঠাৎ খালি কুয়োপাড়ে একটামাত্র কালিপড়া লণ্ঠনের অতি ম্লান আলোয় ঠাণ্ডাতে পাথর হয়ে ভাবতে বসলো, আমার মা নেই। কতদিন আগে কবে থেকে মা নেই, দেবু তা ভাবতেই পারে না। দেবু জেনে এসেছে তার মা থাকবার কথা নয়। বাবা অদ্ভুত লোক, এত রাতে বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞাসাও করে না। মুখ বুজে অফিস, ট্যুইশানি, রান্নাবান্না আর বই পড়া, এর বাইরে বাবাকে পাওয়া মুস্কিল। অফিসে মাসে একদিন করে ফিস্ট হয়, বাবা সেদিন খুব ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া বাবা খেতে খুব ভালোবাসেন। শুধু কোয়ানটিটি নয়, কোয়ালিটিও বটে। শহরের বড় বড় বাড়িতে ট্যুইশানির সুবাদে বাবার প্রায়ই নেমন্তন্ন থাকে। ইস, কী ঠাণ্ডা ভাত রে বাবা, ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে দেবু ভাবলো। দীপু শালার হেভি মজা। গরম ভাত নিয়ে মা বসে থাকবে। দীপুর পরের বোন রীণা কালোর মধ্যে দারুণ দেখতে। সবে বড় হচ্ছে। দেবুর যতবার রীণার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে তা সে মনের মতো ব্যাখ্যা করল। হ্যাঁ, রীণাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

খাওয়া শেষ করে দেবু ঘরে ঢুকলো। একখানা তক্তপোশ পাতা, এককোণে একটা ছোট্ট বইভর্তি টেবিল। দেবু দরজা বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিল। মাথার কাছে লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে জীবনানন্দের নতুন কবিতার বইখানা খুললো। নতুন সংখ্যা একটা "কবিতা" পত্রিকা এসেছে। ওটা শুধু উল্টে-পাল্টে দেখার। "কবিতা" উল্টেপাল্টে দেখতে প্রথমে ভীষণ ভালো লাগে। মোটা খসখসে কাগজ, একটু বা টাটকা গন্ধ, পত্রিকাটা টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে নিতে কেমন আলস্য লাগল। ইতিমধ্যে জীবনানন্দের বইয়ের প্রথম কবিতার মধ্যে দেবু মগ্ন হয়ে গেল। প্রথম চারটি লাইন বার বার পড়তে পড়তে দেবু যেন দেখতে পেল ঘুমের ঢেউ আসছে, তিস্তার বানের মতো সেই ঘোলাটে জলের ঢেউয়ের মধ্যে দেবু ডুবে গেল। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

বেণুর সমস্যা বেণুর ভীষণ খিদে পায়। জীবনে প্রেমের সমস্যা, শিল্পে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণা, রাজনীতিতে ক্ষমতা লাভ করার বিড়ম্বনা—এসব কিছুই না। গোড়ার কথা খিদের সমস্যা, একেবারে মৌলিক ব্যাপার। ডলিদের ওখানে একটু চা এবং জলখাবার কখন হজম হয়ে গেছে। পেটের মধ্যে বিছে কামড়াচ্ছে।

বেণুর বাবা-মা ছোট একটা গ্রামে থাকে। শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। দেশবিভাগের পর ওখানকার একটা প্রাইমারি স্কুলে বেণুর বাবা পড়ায়, মা চিররুগ্ণা। বাবারও মাথায় একটু সামান্য গোলমাল আছে। বাবার মাথার গোলমালটা কেউ বুঝতে পারে না। বাবা সব কাজ করে। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও ঠিকমত বলে, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে, মাঝে মাঝে বাবা ইহকাল আর পরকাল সব হারিয়ে ফেলে। বেণুকে আট টাকা ঘরভাড়া দিয়ে তিনটি ট্যুইশানির ওপর নিজের খরচ চালাতে হয়। গত এক মাস থেকে একটা ট্যুইশানি নেই।

বেণু অন্ধকার ঘরে খিদেতে কেঁদে ফেলল। কাঁদবার সময় বেণুর মায়ের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। খিদে পেলে মায়ের কাছ ছাড়া আর কারও কাছে খাবার চাইবার কথা ভাবাই যায় না।

দেবুর ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। দেবুর সমস্ত সরব চিন্তার তলাতে বেণুকে নিয়ে একটা অন্তঃশীলা দুশ্চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। দেবু বুঝতে পারে নি ভাবনার এতগুলি স্তর আছে। অথচ ঘণ্টাখানেক ঘুমোবার পর হঠাৎ সেই চাপাপড়া চিন্তাটা ভূতের মতো দেবুর গলা টিপে ধরল। দেবু প্রকৃতপক্ষে আজ সারাটা সন্ধ্যাই বেণুকে নিয়ে ভেবেছে। আজ সারাদিন বেণুর চলাফেরা এবং শুকনো মুখ দেখে দেবুর মনে হয়েছে যে বেণুর খাওয়াদাওয়া কিছু হয়নি। সন্ধ্যাবেলাতে ডলিদের বাড়িতে বেণুর জলখাবার খাবার সময় অতিরিক্ত ব্যগ্রতা দেখে দেবু আরও নিশ্চিত হয়েছিল যে বেণু খুব ক্ষুধার্ত। অথচ ডলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেবুর হঠাৎ মন খারাপ লাগল। একা-একা এই ফাঁকা, অন্ধকার আর ঠান্ডা বাড়িতে দেবুর কিছুতেই ফিরতে ইচ্ছা করল না। দেবু সিনেমা ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে পারল না। কিন্তু লণ্ঠন নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেও কেমন মনে হতে লাগল বেণু আজ সারাদিন না খেয়ে আছে। দেবু উঠে বসল। বেণু না খেয়ে আছে এই ভাবনাটা দেবুকে কেমন অস্থির করে তুলল। লেপমুড়ি দিয়ে বসে থেকেও দেবুর কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। এখন কত রাত কে জানে। রাত একটা হবে। সুকুল কাইয়ার গদিতে পেটা ঘড়িটার জন্য দেবু কান পেতে রইল। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে দেবু এই দুপুর রাতে

কোন শব্দ শুনতে পেল না। দেবু সময়ের গভীরতার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগল। অথচ দেবু সাঁতার জানে, সুকুল কাইয়ার গেটে পেটা ঘড়ি না বাজলে দেবু আজ বাঁচবে না; অনির্ণীত কাল-যুগ-শতক-ঘণ্টা-মিনিটহীন সময়ের বিপুল পয়োধিতে সে ডুবে যাবে। দেবু বিছানার ওপর উঠে বসল। গায়ে লেপটা জড়িয়ে নিল। তারপর কিছুক্ষণ তন্দ্রাতে আচ্ছন্ন থাকবার জন্য নিজেকে পালকের মতো হালকা ভাবল, শুধু তাই নয়, নিজের লম্বাটে শরীরের ছিমছাম গঠন এবং শক্তি সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল। দেবু তার কিছুক্ষণ আগের আত্মবিলুপ্তির অন্ধকার থেকে মানসিকভাবে বেরিয়ে এল, দেবু ঠিক করে নিল সে নির্জন হিমশীতল সমুদ্রে ভাসমান মহাদেশতুল্য সময়ের সঙ্গে এবার মোকাবিলা করতে পারবে।

দেবু লেপ ফেলে দিয়ে তক্তাপোশ থেকে কিঞ্চিৎ শারীরিক প্রয়াসের দ্বারা প্রায় লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল। দেবু নিজে কিছুতেই বুঝতে পারল না যে চৌকি থেকে নামবার সময় তার লাফ দেবার কী প্রয়োজন ছিল। আস্তে আস্তে দেবু নিজের বিশ বছরের জীবনে এই মাঝরাতে গভীর বেদনা বোধ করল। সে ভাবল আন্ডারওয়ার পরে সে তটভূমির উপরে বালিয়াড়িতে চিত হয়ে পড়ে আছে আর সময় তাকে না ছুঁয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে বয়ে চলেছে। দেবু টেবিল হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বের করল। লণ্ঠন জ্বালল, তারপর দ্রুত ধুতিখানা পরতে লাগল। দেবু এত তাড়াতাড়ি কাজগুলো করতে লাগল যে মনে হল তাকে এখনই একটা ট্রেন ধরতে যেতে হবে। দেবু তার মোটা গরম চাদরখানা দিয়ে নাক মুখ জড়িয়ে লণ্ঠন আবার নিভিয়ে দিল, ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দিক থেকে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল, তারপর টিনের গেট ভেতর থেকে খুলে রাস্তায় বের হল। এই রাতদুপুরে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নির্জন রাস্তাতে কনকনে শীতে দেবু ভাবল সে গৃহত্যাগ করল। স্বর্গ এবং মর্ত্য তখন কুয়াশাতে জমাট। আকাশ দেখা যায় না, শুধুমাত্র দেরি-করে-ওঠা চাঁদ এত অস্পষ্টতার মধ্যেও কোনও অদৃশ্য পথচারীর হাতের লণ্ঠনের মতো এই রাতবিরেতে তেপান্তরের মাঠ পেরুচ্ছে। সেই লোপাটকরা ঘন কুয়াশাতে ডুবে যেতে যেতে দেবু ভাবল এইমাত্র তার মৃত্যু হয়েছে, সে দেবু নয়, দেবুর আত্মা, দেবযানে মর্ত্য ছেড়ে প্রেতলোকে শূন্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আকাশপাতাল ডুবিয়ে কুয়াশার তমসার বাইরে তাদের বাড়ি, বাবা, কলেজ-বন্ধুদের অস্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ একটা স্মৃতির মতো মনে হল। দেবু তার নিজের চারপাশের সম্পর্কগুলোকে ছোটবেলাতে শোনা গানের মতো অনুভব করল। দেবু ভাবল কোথাও কোন গান হচ্ছে এবং আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে দূর-থেকে-ভেসে-আসা সেই গানের রেশ তার কানে লাগছে। আস্তে আস্তে বায়বীয় কুয়াশাঘন রাতের তরলতাতে একখণ্ড মাটির ঢ্যালার মতো সে গলে যেতে লাগল। দেবু মন্ত্রচালিতের মতো ললিতের দোকানের সামনে থামল। সে দোকানের ঝাঁপে বেশ জোরে জোরেই ধাক্কা দিল এবং উঁচু গলাতে ডাকলো,—ললিত, ললিত! দোকানের টিনের ঝাঁপে দেবু ধাক্কা দেবার ফলে একটা কাঁপা-কাঁপা ঝনঝন শব্দ তরঙ্গের মতো রাতের হিম আর কুয়াশার মধ্যে মিষ্টি রিনিরিনি হয়ে মিলিয়ে গেল, দেবুর গলার আওয়াজ, ললিত-ললিত! কাউকে কেউ খুঁজছে। 'ললিত-ললিত' কোন ঘুমন্ত মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত আওয়াজ হতে পারে। কিন্তু এই হিম অন্ধকার এবং কুয়াশাতে রাতদুপুরে একজন আর একজনকে যদি নাম ধরে ডাকে তবে সেই শব্দ ব্রহ্মত্ব লাভ করে। দেবু এবার তার গলা চড়াল, ললিতের নাম ধরে প্রায় চেঁচাতে লাগল, কাছাকাছি অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল। দেবুর গম্ভীর গলাতে, ললিত, ললিত! একটা ছন্দপরম্পরাতে গ্রথিত ছিল। কুকুরগুলির ডাকে দেবুর গলা চাপা পড়ল। কুকুরের ডাক আকাশ-বাতাস-কুয়াশা-অন্ধকারকে

কাচের বাসনের মতো খান খান করে ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটা হা হা রবে পরিণত হল। দেবু এবার সত্যি ভয় পেল। দিকবিদিক প্রতিধ্বনিত সেই সারমেয়-কোলাহলের ভয়াবহতায় সে আশঙ্কিত বোধ করল। কিন্তু ততক্ষণে ললিত দোকানঘরের ভেতরে জেগে গেছে। দোকানের ভেতর থেকে ললিত জিজ্ঞাসা করল,—কে? ললিত একই রকম অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন।—আমি দেবু, দরজা খোল, দেবু খুব নরম এবং আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল। দেবু জানে এখন একটু গলা চড়ালেই শব্দগুলো জ্যামুক্ত তীরের মতো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে এই নিশুতিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে তোলপাড় শুরু করবে,—তুই দাঁড়া, আমি আলোটা জেবলে নিই, দোকানের ভেতর থেকে ললিতের গলা শোনা গেল এবং তারপরই টুক করে সুইচ টেপার শব্দ হল। ঝাঁপবন্ধ দোকানের ভেতর থেকে আলোর ছটা বাইরের অন্ধকারকে একটু ঘোলাটে করে তুলল। নাকমাথা চাদরে জড়িয়ে এবং কম্বলে মুড়িসুড়ি দিয়ে ললিত দোকানের ঝাঁপ খুলল। দেবু নিঃশব্দে দোকানের ভেতর ঢুকে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট থেকে বাঁচবার জন্য ললিত আবার দোকান বন্ধ করে দিল। ঘরভরা আলো, বাসি বিছানা এবং মানুষের দেহবাস আরও অনেকগুলো ঘ্রাণের সঙ্গে মিশে একটা জটিল গন্ধের আবর্ত ঘরের মধ্যে। ললিত ঘুমে তখনও কাতর, এই কাতরতার কারণে দেবুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এল, দেবু দোকানের ভেতরে ঢুকে বসবার পরও ললিত অনেকক্ষণ কথা বলল না। দুটো বেঞ্চি এক করে যে বিছানা পাতা ছিল ললিত সেখানে ফিরে গিয়ে বসল এবং কম্বল গায়ে দিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। দেবু একটু দূরে আর-একটা বেঞ্চির ওপর বসে নাক ঝাড়তে লাগল। এত ঠাণ্ডাতে নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। ললিতের বিড়ি ধরানো এবং দেবুর নাকঝাড়ার মধ্যে অন্তর্বর্তী সময়টাতে প্রকৃতপক্ষে ললিত এবং দেবুর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। দুজনেই একটা নৈরাজ্যে বাস করছিল। অবশেষে নাক মুছে রুমাল পকেটে রাখতে রাখতে দেবু ললিতের দিকে চেয়ে বলল,—দেখ ললিত, এই রাতদুপুরে তোকে ঠেলে তুললাম। ললিত তখন চোখ বুজে আছে, টান দেবার জন্যে বিড়ির আগে আগুনটা উসকে উঠেছে। ললিতের সমস্ত ভঙ্গি এবং অবয়বের মধ্যে ঘুমের প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য এবং জাগতিক আর সমস্ত জীবন্ত বস্তুর প্রতি নিরাসক্তি প্রকাশ পেল। অথচ দুপুররাতে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠাবার জন্য দেবুকে প্রথমেই ললিতের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল,—কী ব্যাপার? অথচ সে এখনও পর্যন্ত কোনও কথা বলেনি। হঠাৎ দেবু ভাবল, ললিতটা একটা প্রচণ্ড স্বার্থপর হীন প্রকৃতির ছেলে। এমনি দুপুর রাতে কেউ এসে পড়লে আগন্তুকের আগমনের হেতুটা সম্পর্কে একটা সাধারণ কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। ললিত এতটুকু কৌতূহল দেখাল না, তার মানে দেবুর বাঁচা-মরা, বিপদ-আপদ সম্পর্কে ললিতের কোন দায় নেই। দেবু প্রায় ঠিক করে ফেলল সে এখনই চলে যাবে। এমন সময় ললিত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল,—দেবু, কেউ কি মারা গেছে? শ্মশানে যেতে হবে না কি? এতক্ষণে দেবু ব্যাপারটা বুঝতে পারল। মড়া পোড়ানোর জন্য ওদের একটা দল আছে। দেবু এবার হাসল,—নারে তেমন কিছু না। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। হঠাৎ মাঝরাতে আমার মনে হল বেণুটার আজ রাতেও খাবার জোটেনি। চিন্তাটা এমন কুরে কুরে খেতে লাগল যে কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। ভাবলাম একটা পাউরুটি আর একটা মাখন তোর দোকান থেকে কিনে বেণুর ওখানে যাব। অবশ্য যাবার সময় দীপুকেও ডেকে নিয়ে যাব। ললিত দেবুর কথার কোন উত্তর দিল না। জ্বলন্ত বিড়িটা মুখে রেখেই উঠে দাঁড়াল। বিড়ির ধোঁয়াতে চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল। ললিত ক্ষিপ্র হাতে একটা পাউরুটি এবং মাখনের প্যাকেট বের করে দিল। প্যাকেট দুটো হাতে নিতে নিতে দেবু বলল,—এক প্যাকেট

সিগ্রেটও দে। দেবু পকেট থেকে টাকা বের করল। ললিত বলল,—পয়সা লাগবে না। দেবু জানে, ললিত খুব মেজাজী ছেলে। সুতরাং পয়সা নেবার জন্য আর ঘাঁটাঘাঁটি করল না। তাছাড়া সংসারের ঝামেলাতে পড়াশোনা ছেড়ে ললিত দোকান দিয়েছে, সুতরাং ললিতকে বন্ধুরা সব সময়ই খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করে।

বেণু প্রথমে ঘুম ভেঙে বুঝতেই পারল না কে তাকে ডাকছে। আলো জেলে বাইরে এসে দেখে দেবু আর দীপু দাঁড়িয়ে আছে। বেণু একটা লাল কম্বল দিয়ে কানমাথা ঢেকে জড়িয়ে এল। লাল কম্বলের ফ্রেমে বেণুর মুখখানা ম্লান ধূসর এবং অনেক দূরের মনে হল। বেণু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—তোরা এই সময়ে? দেবু আর দীপু প্রায় ঠেলে বেণুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর দেবু হাসতে হাসতে বলল,—দুপুর রাতে আমার দারুণ খিদে পেল। সিনেমা থেকে ফিরে বাড়িতে ঠাণ্ডা ভাত সত্যি খাওয়া যায় না। তারপর ললিতের দোকান থেকে রুটি মাখন আর সিগ্রেট কিনে দীপুকে তুলে তোর এখানে চলে এলাম। বেণু দেবুর উল্লাস এবং বক্তব্য খুব মন দিয়ে শুনল। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা বলল না। লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে অনেকগুলো ঢোক গিলল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল,—আগে একটা সিগ্রেট দে। দেবু সিগ্রেটের প্যাকেট বেণুর দিকে ছুঁড়ে দিল। দেবু আর দীপু কেউ তখন আর বেণুর দিকে তাকাচ্ছে না। তারা দুজনেই একটা পরিস্থিতি রচনা করে তার তোড়ে বেণুকে ভাসিয়ে নিতে চাইল, ফলে সেই খণ্ডিত মুহূর্ত-গুলোতেও দেবু দীপু অনেকগুলো কৌশলগত ব্যাপার ভাবতে শুরু করল। দীপু একটা সত্যি-কারের পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। সে প্রস্তাব করল,—আমার কাছে একখানা কচকচে দশ টাকার নোট আছে। আমরা মাড়োয়ারী পট্টিতে হালুইকরের দোকানে গিয়ে গরম-গরম পুরি তরকারি আর চা খাব। হালুইকরের দোকান সারারাত খোলা থাকে।

—বেণু, মাইরি তুই আর শালা ইনটেলেকচুয়াল পোজ করিস না। পাজামা পরাই আছে, গায়ে চাদর জড়িয়ে চল। আর দেরি করিস না। বেণুর মন তখনও খোলসা হয়নি। একটু খুঁতখুঁতে ভাবেই সে লণ্ঠনটা ছোট করে, তালাচাবি হাতে নিয়ে বাইরে এল।

এত হিম এবং কুয়াশার মধ্যেও বেণুই বোধ হয় প্রথম উপলব্ধি করল মাঘের শেষ রাতে একটা মৃদু হাওয়াতে বসন্ত-বসন্ত ভাব মনে আসে। শীতের সর্বব্যাপী একনায়কতন্ত্রে এই ভাব দীর্ঘ-দিনের জ্বরে অসুস্থ বালিকার কণ্ঠস্বরের মতো ক্ষীণ এবং রিনরিনে। তবু খুব সূক্ষ্ম, প্রায় অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে শীতের অন্ধকারের নিরেট দুর্গের মধ্যে বেণু অপেক্ষাকৃত মনোরম একটা বসন্ত ঋতুর কথা ভাবতে পারল। বেণু জানে এমনি হয়। বৎসরের এই সময়ে হঠাৎ-হঠাৎ হাওয়া ছাড়ে, চারিদিকের কনকনে ভাবের মধ্যেও বাতাসটা গরম লাগে। বেণুর একটা অদ্ভুত তুলনা মনে এল,—টয়েনবির স্টাডিজ ইন হিস্ট্রিতে একটা অনুমান আছে। প্রত্যেকটা সভ্যতার জন্মসময়েই তাতে ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকে। আজকের এই শেষরাতে হিমঠাণ্ডা কুয়াশার সাম্রাজ্যে ঈষৎ উষ্ণ এই দক্ষিণের বাতাস তেমনি যেন পতনের বীজ। আজকে রাতে কল্পনাই করা যায় না যে কুয়াশা কাটবে, ঠাণ্ডা হটে যাবে; আগামী নয় মাসে ঠাণ্ডার চিহ্ন থাকবে না। লাইনগুলো ভেবেই বেণুর মনে হল উপমাটা ভীষণ রিমোট হয়ে গেল। তবু বেণু সিদ্ধান্ত নিল, কোন মৃত্যু ধ্বংস অথবা পতন হঠাৎ একদিনে আসে না। কিন্তু প্রথম সূচনা আজকের এই উষ্ণ ঝিরঝিরে বাতাসের মতো না হয়েই পারে না। বেণু স্থির করলো ইতিহাসের এই টয়েনবীর ব্যাখ্যার ওপর সে একটি দীর্ঘ কবিতার

পরিকল্পনা করবে, তাতে ব্যাপারটা সে নিশ্চয়ই ফুটিয়ে তুলবে।

দীপু হালুইকরের দোকানের অর্ধেক পথ পার হবার পর নিজেকে বোঝাতে চাইল যে কমিউনিজম ছাড়া এই পৃথিবীর মানুষের আর কোন মুক্তির পথ নেই। সুন্দর দুখানা নতুন বই পড়েছে দীপু, "অর্থনীতির অ আ ক খ" আর "রাজনীতির অ আ ক খ"। তাছাড়া সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মার্কসের জীবনী পড়ে দীপুর প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়েছে। দীপুর বাবা পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বিক্রী করে করে সংসার চালাচ্ছেন, ঠাটঠমক বজায় রাখছেন, অথচ নিজে উপার্জনের চেষ্টা করছেন না। জীবনের প্রতি এটাই ফিউডাল অ্যাপ্রোচ,—লাইনটা মাথায় আসতেই দীপু হঠাৎ ভাবল আসলে ফিউডাল আবহাওয়া ছাড়া কোন ট্রাজিক চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। ওয়েজ ইকনমিতে মানুষ অনেক সংসারী হয়, বাঁচবার প্রবণতা বাড়ে এবং বাঁচবার জন্য সংগ্রামশীল হয়। নিজেকে ধ্বংস করার প্রবণতা অবক্ষয়েরই পরিণাম। আমি এখন আর কোন সিরিয়াস চিন্তা একেবারেই করব না, তবে মা না থাকলে অনেক আগেই আমাদের বাড়িতে হরিমটর শুরু হত। যদিও মা শেষ পর্যন্ত রুখতে পারবেন না। বাবা আমাদের পথে বসাবেন।—তোরা কি তোদের মুখের ভেতর তোদের ইয়ে ঢুকিয়েছিস, সব শালা চুপচাপ হেঁটে চলেছিস, কথা না বললে ঠাণ্ডাটা যেন বেশী লাগে, দেবু বেশ রাগতভাবে কথাগুলো বলল, বেণু এবং দীপু বুঝলো দেবু তাদেরকেই খিস্তি করছে। দীপু প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তবু কোন কথা বলতে পারল না। বেণুও হাসতে চাইল কিন্তু বহুক্ষণ চুপ করে রইল। দীপু আর বেণু দুইজনে মূক-বধিরদের মতো আরও পাঁচ মিনিট গভীর ঘন কুয়াশায় কথা খুঁজে পেল না। দেবু এবার খেপে গেল, চিৎকার করে বলতে লাগল,—আমরা এই বেজোড় সংখ্যার তিনজন কি কোন মড়া নিয়ে চলেছি? অথবা তোদের দুজনের প্রেমিকা মারা গেছে? তোরা এমনি ঢং করলে আমি এখ্খুনি চলে যাব। এই চূড়ান্ত অবস্থাতে হঠাৎ দীপুর মাথাতেই খেলাটা এল। দীপু ফিসফিস করে দেবু আর বেণুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার পরিকল্পনার কথা বলল। সব শুনে বেণু এত জোরে হা হা করে হেসে উঠল যে এই অন্ধকারে ওকে ভীষণ দুঃসাহসী মনে হল।—বেণুর হাসিটা অনেকটা রক্তকরবীর রাজার হাসির মতো, সামনের কলেজ ফাউন্ডেশন ডে-তে অভিনয় করার সময় অবিকল তোর হাসিটা কপি করব। দেবু বেণুর হাতে চিমটি কাটল, কিন্তু চিমটিটা চাদরের ওপর দিয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছুল না। দীপু বলল,—বেণু ব্যাটার হাসিটা কাল্পী ডাকাতের মতো। এত অন্ধকারে আর কুয়াশাতে ডাকাত পড়ল বুঝি।

দেবু দীপুর কথা কেড়ে নিয়ে ফুট কাটল,—ও শালা পাকিস্তানে জমিদার ছিল, তাই ওর হাসির গমকটা একটু ফিউডাল।

হালুইকরের দোকানে চা শেষ করার পর বেণু, দীপু এবং দেবু দারুণ ক্লেশ বোধ করল। বেণু এলিয়টের ফাঁপা মানুষ কবিতা ফিসফিসিয়ে যখন আবৃত্তি করছিল তখন দীপু ভাবল, দেবুর অনুমান ঠিক। বেণুর সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল। খালি পেটে খাবার পড়বার পর একটা নরম আরামে চোখ বুজে আসে। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি বেণু এখন সুখী।

পুরো এক-এক গেলাস গরম চা আর প্রচুর গরম পুরি খেয়ে ওরা তিনজন যখন হালুইকরের দোকান থেকে বেরুল তখন আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। কিন্তু কুয়াশা তেমনি ঘন এবং জমাট বেঁধে আছে। দোকান থেকে বেরিয়েই দীপু হি হি করে হাসতে শুরু করল, দীপুর হাসি দেখে দেবু আর বেণু দাঁড়িয়ে গেল। ততক্ষণে দীপুও দাঁড়িয়ে গেছে এবং তীব্র হাসির বেগে পেট ধরে প্রায় বেঁকে গেল। ক্রমে ক্রমে দীপু পেট ধরে মাটিতে বসে পড়ল হাসতে হাসতে। হাসির তোড়ে

দীপুর দু' গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।—শালা হাসছিস কেন বল না! বেণু বসে-থাকা দীপুর পশ্চাদ্দেশে একটা আলতো লাথি মারল। ততক্ষণে কিছু না বুঝে না শুনে দেবুও হাসতে শুরু করল। বেণু দেবুকে ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল,—তোরা হাসছিস কেন? কিন্তু দেবুর জবাব শোনবার আগেই বেণুও হি হি শুরু করল। ততক্ষণে দেবুও হাসতে হাসতে বসে পড়েছে। বেণুও হাসির তোড়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাসিতে ফেটে-পড়া তিনজন যুবকের মাথার ওপরে ভোরবেলার কুয়াশা জমাট বাঁধল। ওরা কুয়াশার কবরের মধ্যে হারিয়ে গেল। শুধু বিনা কারণে, কেউ কারও কথা না শুনে ওরা তিনজন হেসে চলল। ওদের তিনজনের হাসির শব্দ পাখির কাকলীর মতো পাতলা অন্ধকার এবং কুয়াশাকে কাঁপিয়ে তুলল। তিনজন যুবার কণ্ঠ-নিঃসৃত অট্টহাসি কুয়াশার দেওয়ালে অনেকগুলো আগুন রঙের উল্কিচিহ্ন এ'কে দিল। সারা গায়ে সেই উল্কিচিহ্ন নিয়ে কুয়াশার দেওয়াল ওদেরকে ঘিরে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেবুই প্রথমে থামল, তারপর বেণু এবং সবশেষে দীপু। তিনজনই চাদরের খু'ট দিয়ে চোখ মুছল। মাঝে মাঝে খুকখাক হাসির শব্দ একজন না একজন করল। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওরা আস্তে আস্তে সেই অহেতুক উল্লাসের বিস্ফোরণ থেকে দণ্ডায়মান তিনটি চুপচাপ মূর্তিতে পরিণত এবং তখনই দীপু বলল,—আমি হাসি শুরু করেছিলাম কেন জানিস? দেবু ল্যাং মারার ভঙ্গিতে তার পায়ের সঙ্গে নিজের পা লাগিয়ে দিল, তারপর বলল,—বল্ না ভাই, তুই হাসছিলি কেন? আমরা এখন আমাদের প্ল্যান অনুসারে গলির মুখে পানের দোকানটার আড়ালে দাঁড়াব, তাই না?

—হ্যাঁ সে তো আগেই তুই প্ল্যান করেছিস। কারণ এই কাক-ডাকা ভোরে ওখান থেকে আমাদের শহরের চেনা দু-চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বেরুতে পারে এবং দোকানের আড়াল থেকে তাদের নাম ধরে ডাকা হবে এই তোর প্রস্তাব। দেবু একটু থেমে আবার বলল,—তোরই বা এত হাসার কী হল আর আমরা দুজনই বা কিছু না বুঝে না শুনে এতক্ষণ হেসে পেট ব্যথা করলাম কেন?

—হঠাৎ আমার মনে হল যদি দেখি গলির ভেতর থেকে আমাদের লজিকের প্রফেসর বেরিয়ে আসছেন। আমার চোখের সামনে ছোট্টখাট্ট গোলগাল লালচে মুখখানা ভেসে উঠল। গান্ধীবাদী লজিক স্যারের মাগীবাড়ি থেকে সুরুৎ করে বড় রাস্তাতে উঠে মর্নিংওয়াকের ঢঙে হাঁটা শুরু করার এমনি কল্পনা, কথাটা শেষ করতে পারল না দীপু, আবার হাসি শুরু হল। বেণু বলল,—ওসব প্ল্যান আজ ছেড়ে দে। সকাল হয়ে গেছে। নটার মধ্যে কলেজে যাবি। প্রথম দুটো ক্লাস করেই আজ গতকালের প্ল্যানমাফিক চাঁদা আদায় করতে বেরুতে হবে। সরস্বতী পুজো পুরো জাঁকের সঙ্গে করতে পারলে দেবুর প্রো-ভাইস ইলেকশানের সুবিধা হবে। পুজোটা আমাদের কাছে একটা ভাইটাল ব্যাপার।

[ক্রমশ]

যে কোনো দোকানে

শামসুর রাহমান

সামগ্রী সৌন্দর্য; রাশি রাশি ওরা জগৎ সংসারে
জেগে আছে থরে থরে, কখনো বা খুব এলোমেলো,
চেতনার নানা স্তরে। এমন কি অবচেতনায়
সামগ্রীর গ্রীবা লীলায়িত; নৃত্যপর চোখ যৌথ
স্মৃতির আভায় জ্বলজ্বলে। অকস্মাৎ গৃহাগুলি
জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভেসে যায়। সুপ্রাচীন পানপাত্র,

চিত্রিত রেকাবি, কলসের কানা আর অলংকার
গভীর সংগীতময়। গৃহাগাত্র ছায়া ধরে কত,
রাত্তিরে আগুন নিভে গেলে কেউ কেউ মাংস ছেড়ে
করে স্তব প্রত্যুষের। অনেকেই সামগ্রীর দিকে
পুনরায় ধাবমান জাগরণে নেশাগ্রস্ত প্রায়।
স্বপ্নেও সামগ্রী ঝরে, কতিপয় নান্দনিক ফোঁটা।

নানা সামগ্রীর সাথে দেখা হবে ভেবে বার-বার
আমিও দোকানে যাই। এরকম দেখাশোনা ভালো
লাগে ব'লে বহু ঘণ্টা দোকানেই কাটে মাঝে মাঝে
এবং দোকানে গিয়ে দেখি খুব লোকজন আছে;
দোকান গুঞ্জনময়, দরাদরি চলে কমবেশি;
প্রতিটি শো-কেস যেন বর্ণোচ্ছল ফুলের কেয়ারি।

দোকানে নানান দ্রব্য, প্রতিটি দ্রব্যকে খুঁতখুঁতে
গ্রাহকের কাছে অতিশয় লোভনীয় ক'রে তোলা
দোকানদারির তরকিব। আমি এক কোণে একা
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিই এটা সেটা, কোনো কোনো
দ্রব্য হাতে তুলে, যেন নির্জন স্বপ্নাংশ নিচ্ছি তুলে,
খানিক পরখ করি; তারপর যথাস্থানে রাখি

অত্যন্ত নির্মোহভাবে। স্মিত হেসে ব্যস্ত, চটপটে
সেলসম্যানের দিকে সলজ্জ তাকাই। পুনরায়
দৃষ্টি ঘোরে চারপাশে—প্রতিটি সামগ্রী থেকে কিছু

আভা বিচ্ছুরিত ক্ষণে ক্ষণে, দেখি তাদের অস্তিত্বে
অনেক সকালবেলা, দিগন্তের মেদুর ইশারা।
দ্রব্যের আড়ালে কিছু গোপনীয় মায়া সৃষ্টি হয়।

দোকানে অপেক্ষা করি। প্রতীক্ষা সুদীর্ঘ হ'লে বলি,
নিজেকেই বলি, তুমি এই কোণে জীবনানন্দের
হরিণ মুখস্থ করো, দ্যাখো এ দোকান নিমেষেই
আচ্ছাদিত আগাগোড়া ওডেসীর পাতায় পাতায়,
অথবা স্মরণ করো মার্বেল কুড়াতে গিয়ে দ্রুত
সে কখন খেয়েছিলে চুমো বাল্যসখীকে হঠাৎ।

কখন যে দোকানের অভ্যন্তরে আরেক দোকান
জেগে ওঠে সপ্তবর্ণ কলরব নিয়ে। সে দোকানে
কোনো দ্রব্য নেই, তবু কেমন প্রোজ্জ্বল প্রদর্শনী—
কিন্নরের কণ্ঠে শুনি সেলসম্যানের শব্দাবলী,
জলকন্যা কাউন্টারে মূল্যতালিকার চতুষ্পার্শ্বে
তোলে সমুদ্রের সুর। গ্রাহকেরা বন্দনা-মুখর।

সেদিন অনন্ত মধ্যরাত

শঙ্খ ঘোষ

বৃষ্টি হয়েছিল পথে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে
বাসা ভেঙে গিয়েছিল, গাছগুলি পেয়েছিল হাওয়া
সুপুরিডানার শীর্ষে রুপোলি জলের প্রভা ছিল

আর ছিল অন্ধকারে—হৃদয়রহিত অন্ধকারে
মাটিতে শোয়ানো নৌকো, বৃষ্টি জমে ছিল তার বুকে
ভেজা বাকলের শ্বাস শূন্যের ভিতরে স্তব্ধ ছিল

মাটি ও আকাশ শুধু সেতু হয়ে বেঁধেছিল ধারা
জীবনমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে বায়বীয় জাল
কাঁপিয়ে নামিয়েছিল অতীত, অভাব, অবসাদ

পাথরপ্রতিমা তাই পাথরে রেখেছে শাদা মুখ
আর তার চারধারে ঝরে পড়ে বৃষ্টি অবিরল
বৃষ্টি নয়, বিন্দুগুলি শেফালী টগর গন্ধরাজ

মুছে নিতে চায় তার জীবনের শেষ অপমান
বাসাহীন শরীরের উড়ে-যাওয়া ম্লান ইশারাতে
বৃষ্টি হয়েছিল বুকে সেদিন অনন্ত মধ্যরাতে।

একটা সকাল

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একটা সকাল ক্রমশঃ ফুরিয়ে যাচ্ছে—

কতো কী হ'তে পারতো এখন,
কতো কী!

দুটো চড়ুই গাছ থেকে লাফ দিয়ে উড়ে গেলো,
পাশের বাড়িতে একটা ছেলে পড়া মুখস্ত করছে,
সাইকেলের মিছিল রাস্তা পার হ'লো—
এই সব টুকরো টুকরো ছবিকে
একটা তাৎপর্যের দিকে ঠেলে নিতে গিয়ে
সকালটা আস্তে আস্তে বুড়িয়ে গেলো,

কিছুই হ'লো না
কিছুই হবার নয়
কিছুই না।

দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়ে প'ড়বো॥

অথচ আমাকে টানে

জাহিদ হায়দার

অস্বচ্ছ স্রোতের নীচে কম্প্রমান সোনালী পাথর,
মুখরিত রৌদ্রালোকে ঢেউ বোনে রশ্মির আলপনা।

নিজ চোখে নিজে অপরাধী
এ জলের মুকুরে, এলোমেলো মুখ,
বেশ আলুথালু, তারুণ্য উধাও
মধ্যাহ্ন ঢালু হয়ে, অপরাহ্নে নামে
চলোর্মি আয়ুতে প্রৌঢ় সবুজে অকাল,
জলশব্দে শোনা যায় পদাবলীমীড়।

অক্ষম।
তবুও এই সোনালী প্রস্তর ভালবাসি
আকাশ বধির আর আমিও নির্বোধ
আরো বেশী কম্প্রমান সোনালী পাথর।

অথচ আমাকে টানে সন্ধিভাবে সরু ইচ্ছামতী

তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

গ্রামে, এই গড় হলাম।

এ-কথার উচ্চারণে, এ-ক্রিয়ার করণে যে-স্ফূর্তির স্রোতস্বিনী আমাদের শিরায়-শিরায়, মধুবাত আমাদের অন্তরের অরণ্যে, এই গড় হলাম তার প্রতিও। নমস্কার সর্বপ্রথমে নিশ্চয়, তবু সেই নমস্কারের কল্পনার প্রতিও আমাদের যে এই স্বতোৎসারিত ঘনীভূত নমস্কার, আপাতত তার নামকরণ করা যাক পূর্বদিক—আমাদের প্রারম্ভিক দশ দিক বন্দনার সেই প্রথম চরণ।

এখনো কী প্রচণ্ড মোহ, আমাদের কী আত্মাভিমান, কী অভীপ্সা! কাটো কাটো কাটো, বন্ধন ছিন্ন করো। বৈরাগ্যের বাউল এই যে-স্বর অমাদের ভিতরে থেকে-থেকে আপনা-আপনি বেজে ওঠে, অস্তসূর্যের অন্তিম কিরণে ধূলোর আস্তরণের ঊর্ধ্বে সেই গৈরিক মেঘ, তার প্রতি গড় হলাম, তাকে নাম দিলাম আমাদের পশ্চিম দিক। বন্দনার দ্বিতীয় চরণ।

যে-যাত্রা সম্বন্ধে বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ করতে সমবেত হয়েছি, এতাদৃশ বামন লিপিকারদের সকল সম্ভাব্য সাধ্যের চূড়ান্তরূপে অতীত বলেই তা যে-হাহাকারের অন্ধকূপের মধ্যে আমাদের ক্রমশই নিমগ্ন করবে, নিশ্বাস বারে-বারে বন্ধ হয়ে আসবে, সেই অসামর্থ্যের উপলব্ধির এই অগ্রিম সংকেতের প্রতি গড় হলাম। এতৎ দ্বারা চিহ্নিত করলাম আমাদের উত্তর দিককে—বন্দনার তৃতীয় চরণ।

আনন্দ আনন্দ আনন্দ, যে-আনন্দটা পাগলামি, যেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যেহেতু তা অন্তত এ-মুহূর্তে কিছুতে থাকতে পারে না—কী করে রয়েছে?- তবু আশ্চর্য, রয়েছে রয়েছে রয়েছে, আমাদের মধ্যে তার সেই অমোঘ অস্তিত্বের জ্ঞানের প্রতি গড় হলাম। বন্দনার এই দক্ষিণ দিক ও চতুর্থ চরণ।

যে-জিনিস দেখব বলে নিশ্চিত ধারণা ছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত দেখলাম, স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে সেই আসমান-জমিন ফারাক, ও তজ্জনিত হঠাৎ যে-অকল্পনীয় দারিদ্র্য আমাদের, যে-রিক্ততার গ্লানি, এবার সকলে নতজানু হয়ে আমাদের এই নৈরাশ্যের চত্বরে তার প্রতিও গড় হচ্ছি, বলছি তুমি হও আমাদের এ-উপক্রমণিকায় উত্তর-পূর্বের ঈশান কোণ, বন্দনার পঞ্চম চরণ।

আমরা ক্ষুদ্র তুচ্ছ, আমাদের ব্যক্তিগত সকল দারিদ্র্য ঐশ্বর্য তুচ্ছ। একমাত্র সারবস্তু তা-ই যাকে দেখতে চেয়েছিলাম ও দেখার সময় দেখি সে নেই; সেই সারবস্তু যা ছিল বলে জানি ও যা থাকবে বলেও জানি। তার অভাবের রূঢ় দুঃস্থ দুঃসহ এই যে-বর্তমান, গড় হই তার প্রতি, আমাদের দক্ষিণ-পূর্বের এই অগ্নি কোণে, বন্দনার ষষ্ঠ চরণে।

ঋষি যা বললেন, ঐ হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি, তা সত্য কিনা জানি না; তবু ঋষি যা বললেন, ঐ হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি, তা একদিন সত্য হবে, যেন সত্য হয়, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রকাশ করছি দুরু-দুরু বুকে। তা সত্য হবে, যেন সত্য হয়, যেহেতু প্রথমত, ঋষি তা বলেছেন : দ্বিতীয়ত, এবং আরো মুখ্যত, যেহেতু তা সত্য না হলে এই বিশাল ভূমিখণ্ডের, তার প্রখ্যাত পুণ্য নিশ্বাসের, শৌর্যের-সৌন্দর্যের-গাম্ভীর্যের সকলই আগামী চিরকালের জন্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে; এবং যেটা আমরা কিছুতে মানব না, এ-আকাশ-বাতাস-নিসর্গ মানবে না,

এ-ভূমিখণ্ডের অতীত-ভবিষ্যৎ মানবে না। মানবে যে না, আমাদের সেই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় গড় হলাম, বন্দনার এই সপ্তম চরণে, দক্ষিণ-পশ্চিমের নৈর্ঋত কোণে।

কিন্তু তার অর্থ কি এই যে তা সত্য হতে হলে আমাদেরও হাত বাড়াতে হবে সহযোগিতার, কোন্ সর্বগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে হয়তো বিদ্রোহেরই, অর্থাৎ প্রয়োজন পড়বে অন্য এক আরো ভীষণ, আরো অজস্র গুণে দুর্গম-সুদীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতির? এই আমরা যারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, চাই সহযোগিতার হাত সেই তাদেরও? অহো, এ-প্রশ্ন মাত্রেই যে-কম্পন আমাদের হৃদয়ের গুহায়-গুহায়, যে-মূর্ছন এই মুহূর্তে-মুহূর্তে, তার প্রতি গড় হচ্ছি বন্দনার অষ্টম চরণে, উত্তর-পশ্চিমের এই বায়ু কোণে।

যা হাঁপাতে-হাঁপাতে উপস্থাপিত করেছি ইতিমধ্যেই, এইটুকুতেই, তা এত উল্টোপাল্টা প্রসঙ্গ, আমাদের এই এত বিক্ষিপ্ত চিত্তের, যে তা যেন অর্থপূর্ণ ঐক্যে একদা মিলিত হতে পারে এক শুভ্র দুঃখের সূর্যরশ্মিতে, ঊর্ধ্বের প্রতি এই প্রার্থনায় গড় হচ্ছি বন্দনার নবম চরণে।

যাত্রাকে লিপিবদ্ধ করার যে-যাত্রা শুরু করছি, তা শুভ হোক, সত্যবান হোক; মাতৃরূপা রাত্রি তাঁর স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে আমাদের রক্ষা করুন শক্তির সকল স্খলন হতে; অধঃতে, গড় হলাম এই বলে বন্দনার দশম চরণে।

শেষে, সম্মুখের এই সমবেত শ্রোতা ও পাঠকমণ্ডলী যাঁরা এসেছেন, ধন্য করেছেন, আমাদের বিক্ষিপ্ততায় তাঁদেরো মনে যে-ঢেউএর সৃষ্টি করছি, সে-কারণে অগ্রিম মার্জনা ভিক্ষা করি, গড় হই তাঁদের প্রতি। করযোড় এই মনস্কার, বারংবার।

অতএব এবার হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, আসনপিঁড়ি হয়ে বসা সারি-সারি সভ্যবৃন্দ, উৎসুকা কিশোরী কেউ কোথাও, এবার আমাদের অধিকার দিন পালাটা আরম্ভ করার; অনুমতি দিন সরাসরি আপনাদের সম্বোধন করার, যে-আপনারা আমাদের আপাততের কত করাল উল্কি-আঁকা এই একটার-পর-একটা মুখ দেখছেন, মুখ দেখে হয়তো অনুমানও করার চেষ্টা করছেন কী-সর্বনাশ হঠাৎ ঘটে গিয়ে থাকতে পারে এই প্রাণীদের। তবু সে-সর্বনাশ শুধু আমাদেরই নয়, আপনাদেরও; আবার শুধু আপনাদেরই নয়, আপনাদের সন্তান-সন্ততিরও, ঐ যারা এখনো আসেনি, কিন্তু আসবে একদিন দূর-দূর ভবিষ্যতের খনি হতে উঠে-উঠে। নাকি আসবে না, কারণ সর্বনাশটা ঘটে গেছে, তাই সকলের সব আসার পথ সহসা লুপ্ত, বা লুপ্ত এখনো না হলেও হবে শীঘ্রই, ধীরে-ধীরে? সময়ে, বা অনুমতি যদি দেন তো অসময়েও, অর্থাৎ খেয়ালখুশিতে, সব প্রসঙ্গই পাড়ব রয়ে-সয়ে—পরম্পরা হয়তো সর্বত্র রক্ষা হবে না, এখনই হচ্ছে না, তবু সেইসব ও আনুষঙ্গিক আরো অনেক ত্রুটির জন্য তো আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে রেখেছি। অবশ্য সে-ক্ষমা চেয়েছি বলেই যে আপনারা ক্ষমা করলেন, বা আপনারা ক্ষমা করলেন বলেই যে ক্ষমার যোগ্য আমরা হলাম, তা বলছি না।

দেখছিস তোরা, এই বৃন্দাবন, ওরে ও সমীরণ, লোকগুলো যে আমাদের চিনতে পারছে না রে? দ্যাখ্-দ্যাখ্ তাকাচ্ছে দ্যাখ্, শেষকালটা একেবারে এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল? তাহলে বোঝ বাবা, কী-পরিবর্তনটা হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আমরা নিজেদের চিনতে পারছি, এখনো পারছি, কারণ একসঙ্গে রয়েছি সবসময়, নইলে সেটাও পারতাম না। তাছাড়া শুধু ওরাই-বা কেন, আমরাই কি পারছি ওদের ভালো করে চিনতে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব ঐ নাকে নোলক-পরা মেয়েটাকে দেখেছিলাম, ঐ যখন উঠতি পথে রাত্তিরের জন্যে গ্রামটাতে থামি?

অবশ্য রাত্তিরটা কাটাব বলে এক গ্রামে এসে নামলাম সন্ধ্যার কাছাকাছি, তখন সে-গ্রামের কাকে

দেখলাম না-দেখলাম তা কি মনে থাকে, বিশেষত এতদিনের ব্যবধানে, এবং তার চেয়ে বা অনেক বড়, অভিজ্ঞতার এই তছনছ নৃত্যের পরে, সকল প্রত্যাশার এই সম্পূর্ণ ও মর্মান্তিক ওলটপালটের পরে? অর্থাৎ এদের কাউকে-কাউকে দেখেছি, কিম্বা হয়তো গ্রাম ছোট বলে এদের সবাইকেই সেদিন দেখে থাকতে পারি, কিন্তু এখন সেটা মনে পড়ছে না, এবং সেই মনে না-পড়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই মনে পড়ছে না বলেই যে দেখিনি, তা বলা চলবে না—যেমন না-ও যদি দেখে থাকি এদের সবাইকে, বা এদের যে-কোনো কাউকেও, তার মানেই যে এ-গ্রাম দিয়ে একেবারেই যাইনি, সেটাও বলা চলবে না। কারণ গ্রামে অন্য অনেক লোক তো থাকতে পারে, আমরা তো পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে প্রত্যেকের নাম-ধাম টুকে নিতে আসিনি, টুকে নিইও নি, এমন-কি সেই মুহূর্তে চূড়ার স্বপ্নে সকলেই এত বিভোর ছিলাম যে তলার জগতের এইসব প্রাণীদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ রীতিমতো কমেই এসেছিল বলা চলে—তা এত কমে এসেছিল যে অনাদের অর্থাৎ এ-গ্রামের এই লোকেদের মতো অপরিচিতদের কথা তো বাদই দিলাম, নিজেদেরই তোয়াক্কা রাখছিলাম না—তাই কাকে দেখলাম না-দেখলাম কী করে মনে থাকবে? তবে মানছি, এখানে অন্য একটা ভীষণ সম্ভাবনাও রয়েছে, কারণ প্রশ্নটাকে ভিন্নভাবে পাড়া যায়। বলা যায়, এই যাদের দেখছি এখন, তাদের সেদিন সত্যিই দেখেছিলাম, এবং সে-দেখার স্মৃতি এখনো আমাদের মনে উজ্জ্বল না হলেও একেবারে মুছে যায়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কাউকেই চিনছি যে না, অন্তত এ-মুহূর্তে না, তার কারণ হয়তো হল এই যে যে-সর্বনাশ ঘটে গেছে, যার কথা এরা এখনো জানে না, তার ফলে এরাও ইতিমধ্যে ধীরে-ধীরে বদলে যেতে শুরু করেছে, এখনো শব কেউ নয়, মর্গে বা শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার মতো নয়, তবু মৃত্যুর আগেই পচন ধরতে শুরু করেছে; এবং তাই, হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই কারণেই, যে-আমরাও এখনো মরিনি তবু পচতে শুরু করেছি, এক গলিতদের সেই আমরা অন্য গলিতদের ঐ ওদের চিনতে পারছি না, ও তাই ভয়াবহ এক পারস্পরিক অপরিচয়ের সূত্রপাতে আমরা উভয় দল আজ জড়োসড়ো হয়ে মিলিত হয়েছি এই সভায়, এই লণ্ঠনের আলোছায়া-দোলা আলোয়, যখন রহস্যের ঘনীভূত অঙ্কে আমাদের বা ওদের এই ছায়াগুলো কখনো কোন্ দৈত্যের মতো, কখনো-বা তারা কোন্ ভীত মূষিক পালাতে ব্যগ্র। পচন ধরবে না? মনে পড়ছে না, ঋষি বলেনি? ঐ হাড়িপা-জুড়িপা-মুড়িপা মুনি? আপেল নব বসন্তে গাছে ধরতে-না-ধরতে পচবে, কিশোরীর স্তন উঠতে-না-উঠতে বাহাত্তুরী বুড়ীর বুকের আমের মতো কুঁকড়ে-কুঁচকে যাবে, মানুষের চেহারাগুলো হবে সেই পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমার অধিবাসীদের মতো—ইত্যাদি-ইত্যাদি, কী, মনে পড়ছে না, হাড়পা-জুড়পা-মুড়পা মুনি বলেনি?

বৃন্দাবন, বা সমীরণ, বা তোমরা যারা অন্যেরা এই আমাকে শুনছ এখন বা এ-ধরনের কথা তোমরাই কেউ বলছ এবং আমি ও অন্যেরা শুনছি, শোনো, এমন আঁৎকে উঠে তেমন বিশেষ লাভ কি কিছু আছে আমাদের, কারণ আঁৎকে ওঠার সবে তো কলির সন্ধে আজ; তাছাড়া লাভের কথাটা তুললাম বলেই এটাও বলে রাখা ভালো যে লাভ-লোকসান আর কিছুতে নেই, আগাগোড়া প্রশ্নটাই অতীতের অন্তর্ভুক্ত। শুধু, একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে যেহেতু মিলিত হয়েছি, সেটা রক্ষা করা যাক এই যখন গলিত-পচিত হতে শুরু করলেও মনুষ্যত্বের কিছু বাহুর দুয়েকটা উস্কানি এখনো অনুভব করছি ভিতরে-ভিতরে। কারণ, আরম্ভে তো খুব জাঁকজমক করে বন্দনা করলাম, বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ পাড়লাম, সে-বৃত্তান্তটা তাই না বলে পার এখন পাচ্ছি কী করে, এবং সে-পার পেতে চাই-ও না: আর তা বলার জন্য চাই যে-ধৈর্য ও নিষ্ঠা, পারম্পর্যের যথাযথ পুনর্নির্মাণের জন্য যে-পরিশ্রমের

প্রতি আসক্তি, এভাবে যখন-তখন এমন আঁৎকে উঠতে থাকলে তার থেকে আমাদের চ্যুতি ঘটা অবধারিত। শুধু প্রতিশ্রুতিই বা কেন, ঐ-যে মনুষ্যত্বের কথাটা তুললাম—যার সম্যক অর্থ অবশ্য জানি না তবু বোধে একটা অনির্দেশ্য-অপ্রকাশ্য উপলব্ধি আছে-আছে-আছেই—বৃত্তান্তটা বলার জানি সেই মনুষ্যত্বের বোধের অস্তিত্বের প্রত্যয়ে আমরাও হঠাৎ-হঠাৎ জ্বলে উঠব যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শমী-কাষ্ঠখণ্ডের মতো, তা সে-মনুষ্যত্ববোধ আমাদের ইতিমধ্যে যতই স্তিমিত হয়ে পড়ুক না কেন, সম্পূর্ণ নিধনের তা যতই নিকটবর্তী হয়ে থাকুক না কেন। অর্থাৎ ওদের জন্যে যতটা নয়, গল্পটা বলা তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার যেন আমাদের এই নিজেদেরই জন্যে। অবশ্য এখানেও, আমরা এই নিজেরা এবং অন্যেরা ঐ ওরা, এই দুয়ের মধ্যের ভেদ-রেখাটিকে এত জোরের সঙ্গে অনর্থক টানা-ই বা কেন, যেহেতু নিয়তি উভয়েরই এক, যা ঘটছে তার ফলাফল একই রূপে প্রযোজ্য যেমন এই আমাদের তেমনি ঐ ওদেরও পক্ষে! এর চেয়ে এমন বলাই তাই হয়তো শ্রেয় হবে যে উক্ত বৃত্তান্তের বর্ণন-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেমন এই আমাদের নিজেদের ঠিক তেমনি ঐ ওদেরও সেই মনুষ্যত্ববোধের এখনো অবশিষ্ট কিছু আগুনটাকে উস্কানো চলবে।

ধৈর্যের সেই শক্তিগুলোকে অতএব ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা যাক; এবং দেখছি, যে-বন্দনা আমরা করেছি প্রারম্ভে, নিশ্চয় তারই ফলে অবস্থা নানাভাবে এত প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সেই শক্তি ধীরে-ধীরে ফিরে আসছে। কারণ এই-তো স্পষ্ট দেখছি কোন্ ভুলটা কিছু আগে করে বসে আছি, ঐ যখন বললাম গ্রামে এসে নামলাম সন্ধ্যার কাছাকাছি। সত্যবান হওয়ার যে-প্রার্থনা প্রারম্ভে জানিয়েছি, এমন একটি উক্তির সঙ্গে তার মিল নেই; যেহেতু সত্যের খাতিরে যেটা বললে আরো যথার্থ হত তা সেদিন এ-গ্রামে আমরা পৌঁছোই সন্ধ্যায় নয়, বিকালের দিকে—ঠিক বিকালও নয়, বরং অপরাহ্ণের একেবারে গোড়ারই দিকে, আসলে বেলা বোধ হয় তখন দুটো কি পৌনে-দুটো হবে। কারণ, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ-তো শক্তি ফিরে আসছে, বেশ মনে পড়ছে খাওয়াটাও তখনো হয়নি আমাদের, হঠাৎ বাস্-এর টায়ার পাংচার, ও তাই ড্রাইভার ও তার সঙ্গী বলে নেমে পড়ুন সকলে চটপট, যা পান খেয়ে-দেয়ে নিন, আমরা ততক্ষণ চাকাটা সারিয়ে নি।

হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, আপনাদের এই গ্রামটি সেদিন আমাদের বড় ভালো লাগে—পাহাড়ের একেবারে কোলে, যদিও সরাসরি ঠিক পাহাড়ের পায়ের তলায় বলব না, কারণ পৌঁছানোর আগে মনে পড়ছে বাস্ সর্পিল রাস্তায় চক্কর খেয়েছে অন্তত খানিকক্ষণ, উঠেছে কিছুটা পথ; কারণ বাস্ থেকে নামার পরে অল্প-নিম্নে দূরে ধোঁওয়ার মতো উপত্যকা দেখি, যেন নীল-সবুজের এক মনোরম হাতছানি, বা হাতছানিও নয়, আমাদের প্রতি রঙিন এক শুভেচ্ছা, যাতে যে-পর্বত সামনে পড়ে আছে আমাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় বা বরং আমরাই যে-পর্বতকে আবিষ্কার করার অপেক্ষায় কাল গুনছি, তার দুর্গম পথে-পথে আমাদের যাত্রা কল্যাণকর হয়, যাতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নেমেই মনে পড়ছে কেউ-কেউ পেচ্ছাব করতে ছোটে, অন্য যাত্রীদের চক্ষুর অন্তরালে; বাস্এর ক্রমাগত হেঁচকানিতে কোমরে ব্যথা ধরেছিল অনেকক্ষণই, নেমেই অন্য কেউ-কেউ নিযুক্ত হয় তাই হাত-পা এলাতে, আলিস্যি ভাঙতে। কেউ ছোটে প্রথমেই তৃষ্ণা-নিবারণে, বা মুখ-চোখ ধোওয়ার জন্য জলের খোঁজে, এবং যে-জল খুঁজে পায়ও তারা অচিরে, পাহাড় থেকে নেমে-আসা ঝরনায়, যে-ঝরনা অন্যান্য আরো অনেক ঝরনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই নদীর কলেবর বৃদ্ধি করতে যারই উৎস-সন্ধানে এই যাত্রা আমাদের ও যে-নদীকে ঐ দূরের উপত্যকায় দেখছি, অর্থাৎ বাস্ থেকে নেমেছি যেই সেদিন, এই গ্রামে, এবং বলা বাহুল্য যে-নদীর দেখা এখনো পাওয়া যাবে, একটু

চেষ্টা করলেই, ঐ দূরের একই উপত্যকায়। অবশ্য ইতিমধ্যে আজ এখানে সন্ধ্যা নেমেছে, সেটা একটা কথা বটে—তবু খালি চোখে এ-মুহূর্তে না দেখা গেলেও উপত্যকাটাকে দেখি কোন্ দিকে, যেখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, আন্দাজে সে-দিকের প্রতি হাত হয়তো তুলতে পারব, নির্ভুলভাবেই।

অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন এখানে নেমে পড়তে হয়, এবং নেমে পড়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের ছোটোখাটো চাহিদাগুলি মোটামুটি বেশ মিটেও যায়। এমন-কি ঝট করে খুঁজে পাই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভোজনালয় পর্যন্ত, যেখানে রান্না সুস্বাদু, কাঁসার বাসন ঝকঝকে, পরিপাটী চাপাটি-সব্জি-দই, এবং যেখানে বিলক্ষণ তৃপ্তিতে সকলে আহারে নিযুক্ত হই। এইসব আনুষঙ্গিক কারণে গ্রামটাকে রীতিমতো ভালো লেগে যায়, যাত্রার প্রথম পদক্ষেপে কয়েক ঘণ্টার জন্য এই বাধ্যতা-মূলক বিরতিটাকে কাজে লাগাই গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে দেব-দেবতার ছবি বা সস্তা মলাটের ধর্ম-পুস্তকের বিক্রেতাদের সারি-সারি দোকানে উঁকি মেরে। এবং এভাবে ঘুরছি যখন, বাস্ তৈরী তখনো নয়, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, আমরা ছাড়া-ছাড়া ভাবে দু'তিন দলে এখানে কয়েকজন ওখানে কয়েকজন, এইরকমই কোনো একটা সময় হঠাৎ নজরে পড়ে ডাকঘরটাকে—পথ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, ডাকঘরের পক্ষে বেশ বিচিত্র বাড়িটা, সুন্দর খাসা বাংলো মতন, ঢোকার মুখে অমন বড় করে লালের ওপর গোটা-গোটা কালো হরফে লেখা সাইনবোর্ডটা ঝোলানো না থাকলে কার সাধ্যি বুঝত ডাকঘর! মনে পড়ছে, ঢুকে পড়ি, আমরা দু'জন বা তিনজন, আমি বোধহয় সর্বপ্রথমেই, কারণ হঠাৎ খেয়াল হয় কাঁধের ঝোলায় বেশ কয়েকটা রঙিন ছবির কার্ড রয়েছে, কিনেছিলাম ট্রেন থেকে নেমেই, ইস্টিশানে, অর্থাৎ হিমালয়ের পথে সেই বাস্ ধরার আগে, এবং কার্ডের ছবিগুলো হিমালয় নিয়েই—তাই সাধ হয় তখনো যেহেতু দিনের আলো রয়েছে, আর ডাকঘরটাও দিব্যি খোলা রয়েছে দেখছি, তখন দুটো-একটা কার্ডে কিছু লিখে পাঠানো যাক-না একে-ওকে-তাকে, কলকাতায়-কাশীতে-কানপুরে। ঢুকে দেখি, অতি মনোরম বৃহৎ হল্-এর মতো ঘর একখানি ভিতরে, যদিও অত বড় ঘরটা একটি মাত্র লোক ব্যতীত একেবারে ফাঁকা—সে-ভদ্রলোক বয়সে উত্তর-তিরিশ, সুশ্রী গৌরবর্ণ, নাকে সোনালি ফ্রেমের চশমা লাগানো: এবং এত বড় ঘরটা ফাঁকা যে কেন তার কারণটাও, আমরা কিছু জিজ্ঞেস না করতেই, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করার জন্য যেন রীতিমতো ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। বললেন, ইংরেজীতে-হিন্দীতে মিশিয়ে, কারণ হয়তো ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছিলেন না কোন্ ভাষাভাষী আমাদের এই দলটি—আজ দোসরা অক্টোবর কিনা, গান্ধীজির জন্মদিন, তাই সব ছুটি। ওঃ-হো, তার মানে ডাকঘর আসলে বন্ধ, ঢোকাটা আমাদের অন্যায় হয়েছে? না-না-না, চিঠি ফেলতে চান ফেলুন, খাম কিনতে চান কিনুন, এই-তো আমি রয়েছি—তবে অন্য কোনো কাজ, এই যেমন চিঠি বিলি করা বা অন্যত্র চিঠি পাঠানো, সেসব আজ হবে না। খাসা অমায়িক ব্যবহার ভদ্রলোকটির, আমরা যে যেখানে পারলাম লেখার জন্যে বসে পড়লাম। আমি নিজেকে এখনো বেশ দেখতে পাচ্ছি, সরু গলির মতো লম্বা এক কাঠের বেঞ্চিতে বসে এককোণে আমার কার্ডের ওপর ঝুঁকে পড়েছি, কিছু লেখার চেষ্টা করছি—ঘরের মধ্যে তত আলো নেই। ঐ চিঠি লিখতে-লিখতেই এটা-ওটা কথোপকথনও চলছে, কখনো ভদ্রলোক বলছেন, কখনো আমাদের কেউ-কেউ। এই যেমন ভদ্রলোক, হয়তো জানতে চাইলেন, কোথায়-কোথায় চললেন? এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমরা আমাদের ফিরিস্তি আওড়াতে শুরু করলাম। ভদ্রলোক বললেন, বা-বা-বা, অমুক জায়গাটা খুব সুন্দর, তমুক জায়গাটা আপনাদের বড্ড ভালো লাগবে; দেখবেন, গেলে আর ফিরতে মন চাইবে না। মনে পড়ছে, এমন সময় আমাদের কেউ নেহাতই কৌতূহলের বশে তাঁকে ফট করে প্রশ্ন করে বসে, আপনার নিশ্চয়

নখদর্পণে এসব জায়গা, অনেকবার গিয়েছেন, না? যে-উত্তরটা দিলেন তিনি, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। বললেন, না-না, আমি তেমন কোথাও যাইনি-টাইনি, আসলে ওসব জায়গার কোনোটাতেও যাইনি; তবে দেখছেন তো, আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটি সব পথের মধ্যেই পড়ে, তাই শত-শত যাত্রী যাঁরা নিত্যি আসছেন-যাচ্ছেন, তাঁদের দেখা পাই, ওসব জায়গার খোঁজখবর যা পাই তাও তাঁদেরই কাছে। আমরা একটু চমকে উঠলামই—সে কি মশাই, আমরা আসছি কত দূর-দূর দেশ-বিদেশ থেকে, আর এত কাছে বাস করেও আপনি কিছুই দেখেননি এখনো? কবে দেখবেন? ভদ্রলোক তখন বলেন কিনা, ও বাবা, বড্ড কষ্ট, অত হাঁটতে আমি পারব না। শোনো কথা! এরা কিন্তু পাহাড়ে লোক, অন্তত একেবারে পাহাড়ের না হলেও পাহাড় তো ঐ হাত বাড়ালেই, অর্থাৎ আমাদের তুলনায় পাহাড়ে লোক তো বটেই, হন-হন করে হাঁটতে পারে, উঁচু-নিচু ভাঙতে পারে অনায়াসে, পাহাড়ে পায়ে হেঁটে যা লাগে পনের মিনিট সে-পথ এরা পেরোবে পাঁচ মিনিটে। পরে ভদ্রলোক আবার বলেন, আগে বাস্ হোক, তখন যাব। অর্থাৎ, যেটা তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন, তা হল এই-তো তাঁদের জীবদ্দশাতেই দেখলেন রাস্তাঘাটের কী-অবিশ্বাস্য উন্নতি, মানুষ যা-খুশি তাই করছে; যেখানে বাস্ যাওয়ার কল্পনাও করা যেত না দুই বা তিন কি চার-পাঁচ বছর আগে, পায়ে হেঁটে যে-পথটা পেরোতে লাগত দশ-বারো-পনের দিন, এখন সেখানে দিব্যি বাস্ চলেছে, পৌঁছনো যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টায়, সকালে রওনা হয়ে দুপুরে বা বড় জোর বিকালে; বাস্ চলেছে তের-চোদ্দ হাজার ফিট উপরে পর্যন্ত। অতএব তিনি এইসব দূর-দূর কোনো জায়গাতেই এখনো যাননি, কিন্তু যাবেন, নিশ্চয় যাবেন, তার আগে শুধু অপেক্ষা করে আছেন কবে বাস্ হবে, যাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত—তবে সেসব জায়গায় কী আছে না-আছে, পৌঁছলে সেখানে কী দেখতে পাওয়া যায় না-যায়, ও তা দেখার পরে দর্শকের মনে কী ইচ্ছা জাগে না-জাগে, লোকমুখে শুনে-শুনে তা তাঁর মুখস্থ। এবং লোকমুখ মানে যে-সে লোকের মুখ নয়, যারা সেখানে যায়নি তারা নয়, যারা গেছে, চোখে অন্য জ্যোতি নিয়ে ফিরে এসেছে—এবং যাদের তো তিনি নিত্য নিয়মিত দেখছেন, এই উপরে উঠছে, কিছুদিন বাদে এই নিচে নেমে এল। আপনারাও মশাই নামবেন, এই ফিরে এলেন বলে, সেভাবে আমি আপনাদের এখনই দেখতে পর্যন্ত পাচ্ছি—হেসে এটাও যোগ করলেন ভদ্রলোক।

এখন বলুন, এ-ভিড়ের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক, সুশ্রী গৌরবর্ণ, মাথার মাঝখানটায় অল্প টাক ধরেছে, নাকে সোনালি ফ্রেমের চশমা? লণ্ঠনের এই অস্পষ্ট আলোয়, এই অগুন্তি মাথার ভিতরে কোন্ মাথাটা তাঁর? কেন তিনি এগিয়ে আসছেন না বা হাত তুলছেন না বা গলায় খক-খক শব্দ করে জানাচ্ছেন না যে হ্যাঁ-হ্যাঁ তিনি আছেন? দ্যাখো-না বৃন্দাবন, সমীরণ, খুঁজে পাচ্ছ কিনা! এই নীরবতার অর্থ কি অতএব তিনি নেই? না আসলে আছেন, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চাচ্ছেন না? হতে পারে, যে-আশ্বাস তিনি সেদিন আমাদের দেন, ঐ ডাকঘরেই, যখন বলেন দেখবেন একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে হবে না, এখন সে-আশ্বাসের এই অভাবনীয় পরিণতি যেহেতু নিজেরই চোখে দেখছেন, তাই টুঁ শব্দটি করতে চান না, হয় ভয়ে নয় লজ্জায় নয়তো এক আত্মধিক্কারের ভাবে? তবে মশাই, যদি থাকেন, আপনার ধিক্কৃত বোধ করার তো কিছু নেই, কারণ অপরাধ আপনার হয়নি, যেমন আমাদেরও হয়নি, অন্তত জ্ঞাতসারে তো হয়নি—যাকগে, সে অন্য কথা।

আসলে তিনি হাত তুলুন বা না-ই তুলুন, এই গ্রামটাই যে সেই গ্রামটা, এ আমি জোর করে বলতে পারি। কারণ এসে যখন পৌঁছলাম আজ, তখনো সন্ধ্যা হয়নি, পৌঁছেই গ্রামের রাস্তাঘাট

তো বটেই, ধর্ম-পুস্তকের দুয়েকটা চটী দোকানও, এমন-কি ডাকঘরটাকেও দিব্যি দেখতে পাই, চিনতে পারি—সনাক্ত করার সময় আমি একলাই ছিলাম না, আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গ আরো অনেকে ছিল। বাড়ি-ঘর-দোর যে, এগুলো পাথর যে, তাই পচন ধরতে সময় লাগে—অর্থাৎ, কতটা সত্য জানি না, যে-পচন আমাদের ভিতরে ইতিমধ্যেই ধরতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে, তার হাত থেকে এরা হয়তো এখনো সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে আছে, এবং তাই এদের যেমনটি দেখে গেছি কিছুদিন আগে, ঠিক তেমনি রয়েছে। যাই হোক, পৌঁছেই ডাকি আপনাদের সকলকে, কথাটা বলতে, পালাটা নামাতে। ফেরার পথে আসতে-আসতে আগেও গল্পটা বলেছি, যখন কাউকে পেয়েছি, যেখানে থেমেছি। কোনো বৃত্তান্তই সম্পূর্ণ নয়, অর্থাৎ আমাদের এই যে-বৃত্তান্ত আমরা ইতিমধ্যেই বহুবার বলার চেষ্টা করছি এখানে-ওখানে, শুধু হাঁপাতে-হাঁপাতে নিশ্বাস ফেলার মতো তা এখানে একটু ওখানে একটু, আগে-পরের সম্বন্ধ না-থাকা টুকরো-টুকরো, যা আমাদের এই বিস্ময় ও প্রচণ্ড নৈরাশ্যের ধক-ধক আগুনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ফুলকি। এখানে যা বলব, তাও হয়তো হবে তা-ই—অতএব, আবার, মার্জনা চাই।

আমাদের সকলেরই পক্ষে, যার মানে আপনাদেরও পক্ষে, দরকার আছে সেই স্বপ্নের এমন বারংবার আবাহনেব, যাতে বাইরের চোখে অন্তর্হিত হয়ে গেছে যে-সুষমার শীর্ষ, তার উপর নিক্ষিপ্ত রাখা যায় আমাদের ভিতরের দৃষ্টি, অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ-না ধ্বংসের করাল কীট দাঁত বসাতে আসে অস্থিতে, আপনাদের, আমাদের, সকলের। সে-কীট জানি ইতিমধ্যেই ধাবমান, এমন-কি সেই আমাদেরও কারুর-কারুর দিকে যারা এই কণ্টকর যাত্রায় স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয় একদিন—এবং সে-কীট তাদের মধ্যে অল্প-অল্প মাথা তুলছে, ইতিমধ্যেই তুলছে, হীন নীচ পঙ্কিল সন্দেহের রূপে। মাথা তুলছে বললাম, যদিও ঝড় বয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, তর্কের, বচসার। যখন নেমে আসতে শুরু করলাম আমরা, নৈরাশ্যে অধোবদন, বহুক্ষণ কারুর মুখে টুঁ শব্দটি নেই, জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলাতেও অনুশোচনা হচ্ছে, যেন এখনো যে বেঁচে আছি সেইটেই নিজেদের পক্ষে এক গভীর কুণ্ঠার বিষয়, তখন কে-একজন হঠাৎ বলে ওঠে দূর-দূর-দূর, চিরকালই জানতুম, এসব ছিল না, নেই। বেশ মনে পড়ে কোথায়, ঠিক কোন্ বাঁকে আমরা তখন, যখন এ-উক্তি কেউ করে, সেই প্রথম বার। এটাও মনে পড়ে, শুনে তখন সেবার আমরা অন্যেরা কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। আরো কয়েক ঘণ্টা যায়, সন্ধ্যায় পৌঁছই ছোট্ট এক চটীতে—অতি ছোট্ট, অতি নোংরা, সারা রাত্রি ধরে ছারপোকার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকি। শুধু ছারপোকারই নয়, সন্দেহের সেই ভীষণতর কামড়ও। কখন একজন উরু চুলকোতে-চুলকোতে হঠাৎ বলে ওঠে ওসব বরফ-টরফ তুষার-টুষার আসলে হল গিয়ে প্লেন ধাপ্পা, স্রেফ গাঁজা। শুনেই চমকে উঠি অন্যেরা, কারণ বক্তব্য বাদ দিলেও যে-কথাগুলো ব্যবহার করা হল, এবং যে-স্বরে সেই কথাগুলো উচ্চারিত হল, তাদের উভয়কেই অত্যন্ত তুচ্ছ ঠেকে, কটু ঠেকে, অশ্লীল ঠেকে। যেন বিচরণ করছিলাম কোন্ পারিজাত-কাননে, হঠাৎ কে জননেন্দ্রিয়ে প্রচণ্ড লাথি মেরে আমাদের ফেলে দিল মলমূত্রে-ভরা এক ডাব্বায়। তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না কারুর-কারুর পক্ষে, বলি, গাঁজা? ধাপ্পা? তবে এত ফটোগ্রাফ, তাই নিয়ে এত লোকের এত কাহিনী, আমাদের আগাগোড়া এত পুরাণ, এত ইতিহাস, এমন-কি ইদানীং কালেরই প্রত্যক্ষদর্শীদের কত বিবরণ, সেগুলোও কি ধাপ্পা, গাঁজা? তার্কিক তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, উত্তর দেয়, যা-কিছু উল্লেখ করলে এখুনি, তা সবই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ, বিবেচনার যোগ্য নয়—কারণ তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী-দের বিবরণ হাজার হলেও অন্যের দেওয়া বিবরণ মাত্র, তা শোনা কথা বই নয়। এবং ফটোগ্রাফ?

চাইলে আধুনিক বিজ্ঞান অনায়াসে যা-খুশি কল্পনাকে যে-কোনো ফটোগ্রাফে হুবহু সত্যের রঙে জাহির করতে পারে—পারে না? ইত্যাদি-ইত্যাদি।

এই তর্কবিতর্ক চলছে যখন, কখন একজন ডুকরে কেঁদে ওঠে, ঐ ছারপোকার কামড় খেতে-খেতেই : ছুঁড়ীর মাইটা চটকাতে বড্ড ইচ্ছে করছে রে করছে রে করছে রে! বুকে শপাং-শপাং চাবুক পড়ে আমাদের অনেকের।

এখনো পড়ছে, পড়ে চলেছে, নিয়তই, নীরবেও, এই যখন কত কৃষ্ণ-করাল উল্কি-আঁকা মুখে দাঁড়িয়েছি আপনাদের সামনে। সন্দেহবাদীরা এখন ডাকঘরের সেই ভদ্রলোকের দোহাইও অনায়াসে পাড়তে পারে, বলতে নিশ্চয় পারে, কই, সে-ভদ্রলোকও তো যাননি, নিজের চোখে দেখেননি! অর্থাৎ, হ্যাঃ, যত সব!— কারণ সব বিবরণই ঐরকম, অন্যের মুখে ঝাল-খাওয়া কথা!

এই গড় হলাম।

আমাদের আজেবাজে কথায়, বিশেষত আজেবাজে কথার ব্যবহারে এইটুকুতেই এই সভায় ময়লার তুফান তুলেছি। হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, আমাদের মার্জনা করুন। তবু জানবেন, যা বলছি বা করছি, তা যদি অশ্লীল হয়, কটু হয় অযোগ্য হয়, তো তা হবে আমাদের এই অবস্থারই স্বাভাবিক প্রকাশ—কারণ কোন্ শ্যেনপক্ষীতে জ্যোতি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে চোখ থেকে!

আরম্ভ করা যাক, আমাদের কল্পনায় সেই জ্যোতির দৃশ্যের আখ্যানের। অতএব পূর্ব প্রসঙ্গ। মুছে যাক এই সভা আমাদের দৃষ্টি হতে। আমরা যখন উঠছিলাম, বা এমন-কি উঠতে চাইছিলাম, পৌঁছনোর স্বপ্ন নিয়ে বুকে, এবার তখনকার সেই কথা। ইচ্ছার সেই ঝলকিত অলিন্দ কত, পর্দার পর পর্দায় দৃশ্যের পর দৃশ্য।

এসব দৃশ্য অঙ্কিত হয়ে আছে। দৃশ্য বলছি, কিন্তু অদৃশ্যে, অর্থাৎ অঙ্কিত হয়ে আছে যেখানে, সেখানে তাকে দেখা যায় না, সেখানে পৌঁছনো যায় না। তবু আভাস পাওয়া যায়, এই-তো পাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তেই, আমি একলাই নই, আমরা সকলে, যারা সঙ্ঘবদ্ধ এখানে-ওখানে, কোথাও কেউ-বা বিচ্ছিন্ন, ছড়িয়ে আছি পথে-পথে। সেইসব দৃশ্যের কী-এক অপ্রকাশ্য অনির্দেশ্য চেতনা আমাদের হাঁটুতে-হাঁটুতে, ক্লান্তির নিশ্বাসে, অল্প জিরিয়ে নেওয়ায়। অথবা যে-ক্লান্তি জাগেনি এখনো, কিন্তু জানি জাগবে একদিন চড়াইএর সূর্যদগ্ধ উৎক্রমণে, যখন বুকে দামামা বাজবে, নিশ্বাস পড়তে থাকবে কামারের হাপরের আগুন-ফুৎকারের মতো। এই সবই, যা চেতনা বা কল্পনা, কখনো কল্পনার চেতনা বা চেতনার কল্পনা, এই সবই সেই দৃশ্যাবলীর অন্তর্গত, যা এখনো অদৃশ্য, তবু যা এখনই অঙ্কিত হয়ে আছে। এককথায়, উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশের অক্ষমতায়, বলা চলে তা অঙ্কিত হয়ে আছে মনে, এই আমার ও আমাদের বোধশক্তির গহনের কোন্ স্তর হতে অন্য দুর্ভেদ্য স্তরে।

যাত্রায়, রাত্রির অন্ধকারে বা দিনশেষের বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মিতে, আমরা নিজেদের প্রায়ই নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, করে চলেছি—হ্যাঁ, শুধু আলোতেই নয়, অন্ধকারেও যে নিরীক্ষণ করা যায়, এ-শোনা কথাটাকে সত্য হতে দেখেছি। এইরকম আরো কিছু-কিছু অভিজ্ঞতার অর্জনে আমরা অনেকেই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর সমৃদ্ধ, তবু যে-সমৃদ্ধি নিয়ে খুব-একটা উচ্ছ্বাস করার মতো ভাবও আমাদের কারুরই নেই—অন্তত এ নিয়ে একটা কথাও আমরা বলেছি কি কেউ কাউকে? এমন-কি এইজাতীয় কিছু অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি যে সঞ্চিত হচ্ছে, সে-বিষয়ে সজাগ হতেও সচেষ্ট হইনি কেউ। যেন সময় এলে কৃষ্ণকরাল মেঘ থেকে যেমন পুণ্যতোয়া বারিধারা বর্ষিত হয়, হয়ই,

তেমনই এক স্বাভাবিক, নিয়মানুবর্তী উত্তরণ ঘটেছে আমাদের। আবার উত্তরণই বা বলা কেন? যেন একই জায়গায় চিরকাল ছিলাম, একই অনুভবের সমৃদ্ধি সাজানো-ঘরের মতো হৃদয়ে বিরাজমান ছিল ও আছে, শুধু আগে সেটা জানিনি, এখন জানছি—বা আগেও জানতাম, শুধু সেই জ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ হইনি, যেটা এখন হচ্ছি। কারণ, জানি তো, এখনো যা আসেনি, তবু আসবে, তাও, সেই দৃশ্যেরও সবই, এখনই অঙ্কিত হয়ে আছে।

বলা চলে, এটা আমার কথা, হয়তো আমার একলারই কথা; এবং তাই যদি হয় তো জিজ্ঞাসা করা চলে, তবে এভাবে এই কথা আমাদের সকলের হয়ে বলার অধিকার কে আমায় দিচ্ছে? এর উত্তর হবে, সময় আসলে এমন টের পাওয়া যায়; অন্যের সঙ্গে এক ঐক্যে এরকম এক হওয়া যায়। এবং এক যে হচ্ছি, অথবা হয়েছি, সেটা নিজে যেমন বুঝি, জানি তেমনই বুঝছে অন্যেরাও, এবং এই জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহের তিমির পার হওয়া যায়। যেন গর্ভের ভিতরে ভ্রূণ, ভ্রূণেরও ভিতরে ভ্রূণ, তার অন্তরে প্রস্ফুটিত এক ফুল, ও যে-ফুলকে দেখা যাচ্ছে। যুক্তিতে নয়, তর্কেও নয়, একমাত্র বোধেই এর প্রমাণ।

কিন্তু এরা কারা? অর্থাৎ কারা এই আমরা সকলে?

এ-প্রশ্ন আমি নিজেকে করি, ইতিমধ্যেই জানি না আরো কতবার করেছি, ততটা এর উত্তরের দ্বারা অন্যের কোনো কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে নয়, যতটা নিজেরই যাত্রার ক্ষণকে ভরিয়ে রাখতে—অর্থাৎ অতীত যে-মুহূর্তে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ও তারও আগের অতীতে এইসব সঙ্গীদের যেভাবে চিনতাম-জানতাম-দেখেছি কতবার, এবং যাত্রার বর্তমান মুহূর্তের বিন্দুটিতে তারা কে কেমন হয়েছে, রূপ বদলেছে কি বদলালো না, এবং যদি বদলে থাকে তো তা কতটুকু বা কতখানি, এবং আগের তুলনায় কোথায় ও কেমন সেই বদলানো, স্বীকার করব এই চিন্তায় মশগুল হতে আমার প্রায়ই ভালো লেগেছে। যেন সেতু বাঁধা হয়েছে অতীতের এক পার হতে বর্তমানের অন্য পারের মধ্যে এবং যে-সেতু ক্রমান্বয়েই নূতন, যতবার বাঁধতে চাই ততবার নূতন-নূতন সেতু, কারণ আপেক্ষিকভাবে অতীতটা সামান্য স্থির থাকলেও বর্তমান কেবলই বহতা নদী, কেবলই বদলে যাচ্ছে—এবং শুধু বর্তমানই বা কেন, অতীতও বদলাচ্ছে, যেহেতু যা ছিল এই তো খানিক আগেই বর্তমান তা এ-মুহূর্তে অতীত, আশপাশের গাছপালার অন্য রূপ এখন। গাছপালা বলছি, সেতু বলছি, কারণ এই যাত্রায় আমাদের বাইরের চোখেও কেবলই এসবই দেখছি, পার হতে হচ্ছে এমন কত বিচিত্র বিরাট খেলনার মতো সেতু যা বহু নিম্নের বজ্রভাষিণী তটিনীর উপর দিয়ে মেলায় এক পাহাড়ের সঙ্গে অন্য পাহাড়কে, সেতু পেরোলেই আবার পাথর-কাটা বা এত উঁচুতেও হঠাৎ মাটির ছোঁওয়া-লাগা পথ—পথেও কেবলই বাঁক নেওয়া, এবং একবার বাঁক নিলেই নিসর্গের অদল-বদল, গাছের জায়গায় আকাশ, আকাশের জায়গায় ঝরনা। তাই ভিতরের চোখেও, অতীত ও বর্তমানের তুলনামূলক প্রসঙ্গেও, কথা সেতুর, বহতা নদীর, নিসর্গের।

কিন্তু এই পরিচিতি বা পরিচয়-জ্ঞাপনের তালিকা শুরু করব কোথা থেকে, কাকে দিয়ে? চিনি কি সকলকে? অন্তত চেনাবার মতন করে চিনি কি প্রত্যেককে? নিশ্চয় না। কারণ প্রথমত, অনেক অনেক লোক, যারা ব্যক্তি হিসেবে গুনতে গেলে সামান্য সংখ্যার জ্ঞানে যদিও সহজেই ধরা পড়বে, তবু যখনই মনে করতে যাব এরা তো আলাদা-আলাদা নিছক বস্তুপিণ্ড নয় বা আমাদেরই হাতের মুঠিতে-ধরা ঐ লাঠিগুলোও নয় যে-লাঠি ব্যতীত পথের এই ক্রমান্বয় ওঠা-নামা নিশ্চয় বহুগুণে দুরূহতর ঠেকত, উল্টে এরা যে প্রত্যেকেই এক-একটা প্রাণী, প্রাণবন্ত মানুষ, যে যার

নিজের নাম-ধাম-সংসার বা স্মৃতিশক্তি-আকাঙ্ক্ষা-হতাশার এক-একটি সসাগরা ধরিত্রী, যখন মনে পড়বে এটা, তখন আবিষ্কার না করে পারব না যে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো খেই-ই পাচ্ছি না, এদের অধিকাংশকে নিতান্ত মোটামুটিভাবেও চিনছি না, এবং যেহেতু নিজেই চিনছি না, তাই চেনাতেও পারছি না। তার উপর মনে রাখা দরকার যে এ-ক্ষেত্রেও, এই গণনায় ধরছি আমি একমাত্র তাদেরই যারা সর্বক্ষণ আমার আশেপাশে রয়েছে, কেউ কখনো পিছিয়ে থাকলেও জানি এই এসে পড়ল বলে, একমাত্র সেই তারাই যাদের নিয়ে অতি বিশদ হলেও নিজের কাছে কোনো একটা বোধগম্য অর্থে বলতে পারি হ্যাঁ-হ্যাঁ এটা আমারই দল। অর্থাৎ আমাদেরই দল। তার মানে, এ-গণনায় বলা-বাহুল্য ধরা হচ্ছে না এ-পথের সকল যাত্রীদের সেই সমুদয় সমষ্টিকে যারা কাছে-দূরে ও নিশ্চয় দূর হতে আরো দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যাদের কেউ-কেউ এমন-কি গন্তব্যেও হয়তো পেশছে গেছে, এতক্ষণে হয়তো ফেরারই পথে, কে জানে হয়তো এই তাদের দেখা মিলল বলে, উল্টোদিকে মুখ অর্থাৎ আমরা যদি উত্তরে তো ওরা দক্ষিণে মুখ, এখন উতরাই-এ চলেছে বলেই আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লিষ্ট মন্থরগতি একেবারেই নয়, বরং পিছনে ধাক্কা দিতে-দিতে সজোরে কেউ নামাচ্ছে যেন ওদের, নামিয়েই চলেছে, হন-হন পা-কে থামায় সে-সাধ্য তাদের নিজেদেরই নেই, আমাদের দিকে চেয়ে হাসলো কি হাসলোই না, হয়তো ওঠার ক্লান্তিরই দরুন আমরাও ওদের দিকে তাকালাম কি তাকালামই না, যখন নিশ্বাসও তাদের যদিও আমাদের মতোই ধকর-ধকর শব্দ করে পড়ছে, তবু বুকে একেবারেই লাগছে না, কারণ উঠছে না তো, নামছে; এবং বলা বাহুল্য, এ-গণনায় ধরছি না এ-পথের সেই অন্য যাত্রীদেরও যাদের যাত্রা এখনো আরম্ভ হয়নি তবু হল বলে।

এ ছাড়াও, যখন আমাদের এই ছোট দলের কথাই হচ্ছে, তখনও পরিচয় দিতে যাওয়ার আরো একটি দ্বিতীয় বাধাও আছে। সেটি হল, এই যে-পরিচয়ের কথা এখন বলছি, তারও বহু স্তরভেদ রয়েছে; এবং সেই বিভিন্ন স্তরগুলির রূপ কী, তাও নিজের কাছে আমার একেবারেই পরিষ্কার ঠেকছে না। কারণ এই ছোট দলটির ভিতরেও প্রথম দর্শনেই বেশ কয়েকটি শ্রেণী-বিভাগ পরিলক্ষিত হবে। এক, যাদের মোটামুটিভাবে ভালো চিনতাম যাত্রারও আগে থেকে; দুই, যাদের সঙ্গে অল্প আলাপ ছিল আগে, কিন্তু যে-আলাপ এখন যাত্রায় ঘনীভূত; তিন, যাদের একেবারেই চিনতাম না, এখন বেশ চিনে ফেলেছি। এবং এর বাইরেও আরো এক শ্রেণী রয়েছে যারা এভাবে একসঙ্গে চলায়-চলায় এক ধরনের অস্পষ্ট পরিচয়ে মিলিত হয়েছে, যাদের নিয়ে একটা গোষ্ঠীর ভাব জেগেছে মনে; তবু দ্বিধা থাকবে, অন্তত এখনো যেন রয়ে গেছে, একেবারে আপন ভাবতে এদের যে-কোনো কাউকে বা নির্দিষ্টভাবে অন্তত কাউকে-কাউকে তো বটেই। এটা গেল উপর-উপর শ্রেণী-বিভাগ; ভিতরে ঢুকতে চাইলেই দেখা যাবে আরো গূঢ় গন্ডগোল রয়েছে। কারণ, হয়তো একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে, ধরা যাক যাত্রার আগেও যাদের ভালো করে চিনতাম তাদেরই কথা। আমাদের বেশ কিছু কাল ধরে মনে হতে শুরু করেছে যে যাত্রার আগের অবস্থার এই ব্যক্তিগুলি যেন সেই-সেই ব্যক্তি এখন আর নয়; অন্তত কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয়ের ইতিহাসকে যদি কোনো রেখার সঙ্গে তুলনা দিতে চাওয়া যায়, বলা যায় আলাপ শুরু হওয়ার প্রথম বিন্দু হতে সে-রেখা একই ও ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, তো এ-ক্ষেত্রে তাহলে হয়তো মানতেই হবে তুলনাটা টি'কছে না, রেখাটাকে এক মনে হচ্ছে না আর। যেন যাত্রার সময় বা যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পরে কোনো অনির্দেশ্য মুহূর্তে সহসা আগের রেখাটার ছেদ পড়েছে ও সেখান হতে অন্য আরেকটা রেখার উদ্ভব ঘটেছে। রেখার সেই নতুন পর্যায় নিয়তই সঙ্গ পাচ্ছে এই চারিপাশের বিরাটের অভিনিবেশের, এই দেবদারুর অরণ্যানীর—তার

ফ্‌সফ্‌সের ভিতরের অলিতে-গলিতে খেলা করছে কী-এক অন্য অম্লজান। তাই পরিচিতদের এই দলের কারুর-কারুর চোখে চাইতে গিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে, আরে, এটা কি সেই লোক? অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের সেই অতীত পর্যায়েরই লোক? আজ তার মুখে দেখি ছায়া পড়েছে গিরিশৃঙ্গের, চোখে শুনি গান তন্বী তটিনীর, তার চলমান হাঁটুর ছন্দে অনুভব করতে পারি কী-আকুল আর্তির এক অন্ধকার যা থেকে-থেকে যেন একটু-আধটু এদিক-ওদিক ছিটকে-ছিটকে পড়ছে, ক্রমাগতই।

অর্থাৎ মনে হওয়া স্বাভাবিক তখন, এও কি সম্ভব যে এ-ই সেই বৃন্দাবন? কিছু মনে করিসনে বৃন্দাবন, আপাতত তোর কথা হচ্ছে, যেমন সময়ে আমারও কথা হবে, অন্যেরও হবে।

বৃন্দাবন, মানে বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকের মধ্যে একজন, যে-অনেককে বা যে-অনেকের অন্তত কাউকে-কাউকে মাঝে-মাঝেই নিজের কাছে নিজে পরিচিত করাতে চাই, যাদের পরিচয় এক নিত্যনূতন সভায় দিতে চাই—এই যেমন, এই সভাতেই। যেন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়েছি—যেমন আজই দাঁড়িয়ে রয়েছি, আপনাদের সকলের সামনে—মুখে পড়েছে অজস্র জনার দৃষ্টি, ভূমিকা আমার সূত্রধারের। একটু হেসে, বিনয়ের শিক্ষিত কায়দায় অবনত হয়ে বলা, আর এই হলেন গিয়ে শ্রীমান অমুক, বা শ্রীমতী অমুক-তমুক, এই হল গিয়ে বংশবৃক্ষ তাঁর, জন্মবৃত্তান্ত, পরে শৈশব-কৈশোর, শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসা, এবং এই ইনি হয়েছেন, এবার দেখুন এই হতে চলেছেন, ইত্যাদি-ইত্যাদি। সামনে দর্শক বা শ্রোতা যারা, যেমন এখনই এই সভায়, তারা তো অগুন্তি অন্ধকার। আগেই বলেছি, এ-খেলাটা ভালো লাগে, যেন অন্যের এভাবে পরিচয়-জ্ঞাপনের এক চড়াইভাতি-খেলায় গনগনে আঁচে কেবলই রান্না করছি নিজেরও একটা পরিচয়, যাতে প্রায়ই খেয়ালখুশিতে এক-মুহূর্তে আঙুল ছুঁইয়ে পরেই সে-আঙুল জিভে ঠেকানো ও দেখতে চাওয়া রান্না কতটা হল না-হল।

ভালো লাগে এটাও, এই এভাবে কথা বলতে। যাঁরা প্রশ্ন তুলবেন, এ কী, হঠাৎ এখানে রান্নার প্রসঙ্গ কেন, এ কী আদিখ্যেতা? তো তাঁদের তো তাহলে বলতেই হয় যে ঐ আদিখ্যেতা কথাটাও যে এখানে ভালো লাগছে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো আমি চাই, তুচ্ছ যারা অতীত ও বর্তমানে, যারা আমার অভিজ্ঞতার অঙ্গ এবং হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই আমার নাম ও নিজেরও সেই পরিচয়েরও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের আমি মেলাই এই আশপাশের বিরাটের সঙ্গে, বা যে-বিরাট চোখ জুড়ে বসতে এখনো আসেনি কিন্তু শীতকঠিন শিলার অন্তরে নিহিত উষ্ণ প্রস্রবণের মতো যার ভাপ মাত্রই ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথের মাধ্যমে যেন থেকে-থেকে হঠাৎ-হঠাৎ পাচ্ছি, নিশ্চয় নিশ্চয় পাচ্ছি, সেই বিরাটকে মেলাবো দৈনন্দিনের অনেক খড়কুটো বা পোড়া গুল্ম-উদ্ভিদের সঙ্গে। অথবা সেটা মেলাবার আমি বা আমাদের মতো নগণ্য প্রাণীরাই-বা কে, বরং সে-চিন্তাই কি নয় অকল্পনীয় স্পর্ধা আমার বা আমাদের পক্ষে? কারণ তা তো আপনা থেকেই মিলে রয়েছে এই নিসর্গের বাহ্যিক শরীরে পর্যন্ত, ঐ খড়-কুটোই উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের সঙ্গে এক দৃশ্যে বিধৃত হয়েছে আমাদের চোখের দীপ্ত উপলব্ধিতে জাগ্রত হতে—না-না-না, সেভাবে জাগ্রত হতে পেরেছে বলে ধন্য বোধ করতে নয়, নিশ্চয় নয়, বরং আমরা না দেখলেও দৃশ্য তার আপন সত্য ও মহিমায় সমানই বজায় থাকবে, তবু আমরাও যে তাকে দেখতে পাচ্ছি বা তপস্-এর অমোঘ কারুণ্যে দেখার মতো করে দেখতে পাব একদিন, তাতে যেমন তার তেমনি আমাদেরও যেন বহু যুগযুগান্তরের একটি প্রতিশ্রুতি রক্ষা হওয়ার আছে। আসলে এসব ভাবনা বেশি ভাবতে চাই না, পাছে তাতে গন্তব্যের যে-শেষ অর্জনের জন্য আমাদের যাত্রার

সমস্ত ক্ষণগুলি উন্মুখ হয়ে আছে, অর্জুনের মুহূর্তটি এলে সে-অর্জুনকে সম্যকভাবে অসামান্য মনে না হয়, পাছে করুণার হানি হয়, এসব চিন্তা নিয়ে আগেভাগে এত নাড়াচাড়া করেছি বলেই যথার্থ মুহূর্তটি এলে আমাদের কল্পনা বা উপলব্ধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। তাই মনকে বলতে চাই, ক্ষতি কী, যেমন রয়েছে তেমনই থাক-না ঐ আদিখ্যেতা কথাটা, বা রাম্না কথাটা, বা ঐ বৃন্দাবনই, মানে বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নামটা শুনলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, যেন একটু বেশি নাটকীয়, বা অতি-নাটকীয়, যেন এ-নাম রেখেছিলেন যিনি, হয়তো বৃন্দাবনের পিতাই, বা নাতিকে কোলে নিয়ে গদগদ পিতামহ-ই, তিনি কোথায় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। যেন এ-নাম রেখেছেন যিনি, নামের মাধ্যমে যেমন একদিকে তাঁর ধর্ম-ভাব—যেহেতু বৃন্দাবন—অন্যদিকে তেমনি তাঁর কাব্যরস-জ্ঞান—যেহেতু বৃন্দাবন-এর পরেই নাচতে-নাচতে ও অনুপ্রাসের ঝংকার তুলতে-তুলতে আসছে বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুইয়েরই পরিচয় দিতে চেয়েছেন তিনি। এবং সেই উভয়েরই চিন্তাতেও এক ধরনের আনন্দ আমার, চিন্তাটা জাগলেই ভিতরে কোথাও যেন রসের ক্ষরণ—নামে যে-একটু বাড়াবাড়ি, যে-একটু অস্বাভাবিকতা, তাও যেন মনে হয় এই যাত্রার বহুবিধ অভিজ্ঞতার পক্ষে গোড়া হতেই কাম্য ছিল। অন্যদিকে নামের ঐ গুরুগাম্ভীর্যের পাশে মানুষটার মোটামুটি সাধারণত্বে রঙের যে-বৈষম্য বা ঐক্যের যে-আপাত হানি, সেটারও চিন্তায় পাওয়া চলে এক সমানই সুখকর অনুভূতি। দেখা যাক তো, অন্যেরা কারা? ঐ পাশেই, সমীরণ পরমানিক। তারও পাশে, অর্থাৎ পথ সংকীর্ণ বলেই একেবারে প্রায় গায়ে-গায়ে লেগে-থাকা পিছনেই, সমীরণের স্ত্রী; আরো একটু পিছনে, ধিকোতে-ধিকোতে হলেও বেশ দৃঢ়পদ এখনো, সেই স্ত্রীর মা বা সমীরণের শাশুড়ী; যে-উভয়ের নাম জানি না, কিন্তু যাদের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় না হলেও ইতিমধ্যেই মোটামুটি বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ। আশেপাশে আরো চোখ চালালে নজরে পড়ছে ঐ তো ধ্রুব রুদ্র, এবং তার ঠিক সামনে কনক—দ্বিতীয়টি পুংলিঙ্গ, পদবী জানি না, জানার দরকার পড়েনি। কিন্তু পটাপট মনে এল বলেই যে-ক'টি নাম উচ্চারণ করলাম এইমাত্র, এই যেমন বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমীরণ পরমানিক বা ধ্রুব রুদ্র, কান আছে যার শোনার, সব ক'টিতেই সে নিশ্চয় শুনছে একই অনুপ্রাসের কুলুকুলু ঢেউ। এর বাইরেও এমন কি কেউ আছে যার নামে অনু-প্রাস নেই, এই যেমন কোনো নেহাত-ই লোকনাথ ভট্টাচার্য বা ভোলানাথ গুঁই বা ক্ষান্তমণি দাসী বা হোক-না খেঁদী-ই বা পেঁচী-ই, কিম্বা বুড়ো বা ভোম্বল-ই, অর্থাৎ এমন কেউ-কেউ যাদের বাপ-মা ভুলে গিয়েছিল ও তাই ভালো নাম রাখা হয়ে ওঠেনি? মনে পড়ছে না—কারণ সেরকম কেউ থাকলেও, ঐ বললামই তো, তারা এক অন্য কাপড় পরে ফেলেছে এখানে, এই পার্বত্য চূড়ার-পর-চূড়ার ফ্রেমে-আঁটা আলেখ্যে, এই স্নিগ্ধ শেওলার মতো এক বিচিত্র সবুজ আলোয়, খরস্রোতা নদীর শব্দের টুং-টাং জলতরঙ্গে। নাকি হাঁক দিয়ে দেখব একবার, আদালতের পেয়াদার মতো, হে-এ-এ-ই লোকনাথ ভট্টাচার্য, হা-জি-ই-ই-র? এবং পরেই কান পেতে শুনব প্রত্যুত্তরটি পাচ্ছি কিনা, কেউ বলতে চেঁচিয়ে উঠছে কিনা, হা-জি-ই-ই-র?

অর্থাৎ, যখন দৃশ্য অঙ্কিত হয়ে আছে, এরকম খেলাও ভালো লাগে। কিন্তু প্রশ্নটা পেড়েছি-ই যখন, স্মৃতির জাবর কাটছি-ই যখন, ফিরব কোথায়? হ্যাঁ, একেবারে গোড়াতেই যদি ফিরতে হয় তো তুলতে হবে সেই পাণ্ডুলিপিটার কথা, এক ভ্রমণবৃত্তান্তের কাহিনী, যেটা কীভাবে হাতে এসে পড়ে ঠিক মনে নেই—ও হ্যাঁ, পাণ্ডুলিপির লেখকের এক বন্ধু, যে আমারও বন্ধু, সে-ই মতামত জানার জন্য পড়তে দেয়, অর্থাৎ আমার সামান্য বিচারে সে-পাণ্ডুলিপি ছাপার যোগ্য কিনা। অবশ্য পাণ্ডু-

লিপিটাও নিমিত্ত মাত্র, সেটাকেই এ-ইতিহাসের আরম্ভের একেবারে প্রথম বিন্দুটি বলা-ও নিশ্চয় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত হবে না, যেহেতু পাণ্ডুলিপি তো আর হিমালয়কে আবিষ্কার করে বসেনি, বরং অতীতের আরো কত অনাদি-অনন্ত কাল হতে আমাদের চিন্তা ও কল্পনার শীর্ষ পরে ছিল সেই হিমালয়েরই ঝকঝকে মুকুট; যেহেতু সে-দৃশ্য, তখন আবছা হলেও, তখনো, অস্পষ্ট অতীতের সেই নিবিড় গহনেও, অঙ্কিত ছিল আমাদের মনে।

বিরতি বিরতি বিরতি—কে আমায় থামাচ্ছে, বৃন্দাবন? না কনক তুমিই? যেটা সমবেত, সেটা কি একটু বেশি ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে?

হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, অনুমতি করুন, আমরা নিজেদের সঙ্গে বাক্যালাপটা একটু সেরে নিই।

[ক্রমশ]

অন্ধকার

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রাস্তার উপরে ঝুলে থাকা ধুলোয়, ধোঁয়ায় বয়সে কালো জীর্ণ লাল দেয়ালের গায়ে ছয় ফুট বাই চার ফুট এক চৌবাচ্চা যেন। কালচে দেয়ালের গায়ে আঠায় লাগানো যেন। নাকি ব্যালকনি! তার নিচের দিকের আধখানা একতলার জুতোর দোকানদারের রংচটা মস্ত সাইনবোর্ডে ঢাকা পড়েছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ডের মাথাটা ছোঁয়া যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সারাদিন নিচের পথে ধেয়েচলা পাকখাওয়া জোয়ার-ভাটালাগা স্রোতের মতো নানা রঙের মিশ্রণে নোংরা ধূসর জনস্রোত চোখে পড়বে। রাত এগারোটার পরে অন্ধকার যত ঘন হ'তে থাকে, দোকানের দরজাগুলো যখন বন্ধ, মাঝে মাঝে চলা ট্রাম বাস ভেঙে পড়ার আগে ঝন্ ঝন্ শব্দ ক'রে চলে, এখানে ওখানে কুপি যেন জোয়ার-নেমে-যাওয়া পাথারে ফসফরাস-লাগা আবর্জনা। আর সকালে ভোরের আলোয় কালকের ভুক্তাবশিষ্ট দিনকে দেখা যাবে ডাবের খোলায়, নানা জঞ্জালে, বাজার-ঝাঁটানো আবর্জনায়। ভালো লাগে না। ধনের জোয়ার সরে গেছে, দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে, এখন বালীগঞ্জ, সাদার্ন এভেন্যু ছাড়িয়ে আলিপুরের ওদিকে কোথাও থৈ থৈ করছে। কলেজ স্কোয়ারের এই পাথারে এখন মরা কাঠ, শামুকের কঙ্কাল। তখনকার দিনের আধুনিক, এখনকার মেরামতের অতীত এই বাড়িটা প'ড়ে যাচ্ছে না কেন, তাই মনে হবে পথে যেতে যেতে কেউ ব্যালকনি-লাগানো বাড়িটাকে যদি দেখে।

বিজয়ার অনুভব হল এ কী এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছে সে! যেন ঘরভরা শীতের সকালের মধুর রোদ্দুর, খুব মচ্‌মচে বাদামী ভাজা টোস্টে মাখন লাগালে যেমন সে মাখন মধুর মতো টোস্টের অসংখ্য খোপগুলোকে টৈটম্বুর ক'রে দেয় গ'লে গ'লে টোস্টের গরমে, কিংবা সিঠার্ন সাইটোল বাজছে, আর কাস্টানেটও একটা মিষ্টি রোদে ভরা ঘরে, যার কাঠের ব্যালকনিতে ঝুঁকে আছে; ঘুম-ঘুম স্বপ্নটা টুটে গেলো, তর্ক করতে গিয়ে, তর্কের ঝাঁজ আছে তো। যেন বাদ্যযন্ত্র-গুলোর নাম কয়েকটিকে কী ক'রে উচ্চারণ করতে হবে তা নিয়ে তর্ক। এটা বিজয়ার একটা হবি যে শব্দগুলোর উচ্চারণ ঠিক রাখতে চায় সে যদিও জানে না কী হবে তাতে। যেন একটা সুন্দর উচ্চাভিলাষ। যেন শব্দটাকে ঠিক উচ্চারণ করতে পারলে শব্দটার আকাশকেও ছোঁয়া যায়। কিন্তু কাণ্ড! জয়া নাচছে কাস্টানেট বাজিয়ে, যেমন ধুলোর কণা আলোয় নাচে।

পড়ে যাবি, পড়ে যাবি বলতে গিয়ে বিজয়ার ঘুমটা একেবারে ভেঙে গেলো। যেন নাচতে নাচতে জয়া একটা নড়বড়ে কাঠের ব্যালকনির ধারে চ'লে গিয়েছে। সত্যি নাচছে দেখো। কিন্তু ব্যালকনিটাও তো ঝুরঝুরে ঘুণখাওয়া কাঠের। যার স্ক্রুপগুলো মরচে-ধরা। কিন্তু কাঠের ব্যালকনি কোথায়? শব্দটা প্রকৃতপক্ষে চেস্টানেট হওয়া উচিত। হাসিমুখে চোখ মেললো বিজয়া, কি সুন্দর নাচছে জয়া যেন আলোতে খুব রঙীন একটা বোলতা। পুবের ব্যালকনির উপরে দরজাটা খোলা, তা দিয়ে সিনেমার প্রোজেকশনের মতো আলোর একটা প্রবাহ এসে মেঝেতে জলাশয় হয়েছে, ঠিক সেখানে মেঝেতে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে দু হাত তুলে নাচছে জয়া। কাস্টানেট নয়, হাত তালি দিচ্ছে সে, দু হাতের প্ল্যাস্টিক-কাচের বালাগুলো শব্দ করছে, সরু কোমরের নিচে কমলা রঙের লুঙ্গিপরা নিতম্ব বোলতার মতোই দোলাচ্ছে। গায়ের হলদে-কমলায় ডোরাকাটা হাল্কা সোয়েটারের

হাতা কব্জির পাঁ ছ ইঞ্চি নিচে শেষ হয়েছে, অর সেখানে দ্ু হাতে মিলিয়ে অন্তত দশ জোড়া কাচ-প্যাস্টিকের চুড়ি। একহাতে নীল, অন্য হাতে ফিরোজা।

জয়া বললে,—দিদি, দিদি, দিদি, দুটোতেই ফুল ফুটেছে। দুটোতেই। তোরটা ফিরোজা আর আমারটা সত্যি নীল। নীল! নীল! অবাক হবি যে ফিরোজা আর নীল।

অবাক হওয়ার কথাই। কেউ কি সত্যি আশা করেছিলো তাদের ব্যালকনিতে রাখা টবে ডালিয়ার চারা দুটো বাড়বে, কলি আসবে, ফুল ধরবে।

বিজয়া এগিয়ে গেলো বিছানা থেকে নেমে ব্যালকনির দিকে। দুটো গাছেই কলি এসেছিলো, এখন বোঝা যাচ্ছে তার একটি ফিরোজা রঙের, অন্যটিতে একেবারে নীল নয়, নীলের ধারঘেঁষা বেগুনি। হাসিতে মুখ ভ'রে উঠলো বিজয়ার। প্রায় পাঁচ মিনিট জয়া আর বিজয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নোংরা রঙের ব্যালকনিতে বেরঙা রোদে ফুটে উঠতে চাচ্ছে এমন দুটি সুন্দর কলিকে দেখলে। জয়াই বললে,—যা, দিদি, তাড়াতাড়ি ক'রে আয়। মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এলুম। বলছিলেন একটু সকালে উঠলেই তো হয়। বললুম,—একজন যদি একটু বেশী ঘুমিয়েই সুখ পায়। উঠলোই বা একটু বেলায়। একেবারে স্নানও ক'রে নিস। আমি আজ স্নান করবো না।

বোকার মতো ক'রে মুখ নামালো জয়া।

কিন্তু এখন, দিদি নিশ্চয়ই তার কথা শুনবে, দিদি স্নান সেরে ফেরার আগেই ঘরটাকে গুছিয়ে নিতে হবে।

তা, ঘরটা গোছানোর কিইবা তেমন আছে। অনেকদিন যার দেয়ালে চুন পর্যন্ত পড়েনি, যার মেঝে ফাটা, সিমেন্ট চটা, সে ঘর গোছানোর তেমন কিছু থাকে না, উপরন্তু যেটুকু তাকে গুছিয়ে রাখা যায় তা সব সময়েই করা হচ্ছে। কাল শুতে যাওয়ার আগেই মেঝেটা ঝাঁট দিয়েছিলো জয়া। এক কোণে একটা সেকেলে রোলটপ্ ডেস্ক যার উপরে কিছু বই, একটা ভাসে জাপানি কায়দায় রাখা একটা ডাল আর একটা ফুল, ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার যার হাতলে কোথাও কোথাও এখনও সোনালী রং চিকচিক করে। বিছানার উপরে রাগটায় একটা গরম কাপড়ের তালি। কিন্তু কী সুন্দর করেই না ভাঁজ ক'রে তুললো রাগটা। এক কথায়, এ ঘরে দাঁড়ালে কোনটা বেশী বলার মতো তা বোঝা যায় না যেন—(যেমন জয়ার পরনের লুঙ্গিটা আসলে সেটা মায়ের পরিত্যক্ত পুরনো শাল যার উপরে উলের সুতো নকশা তুলেছে জয়া) দারিদ্র্যের কথা বলা হবে কিংবা মেয়ে দুটির সুরুচির।

জয়া তবু একবার ঘরের মেঝেতে ঝাঁটা বুলালো। মেঝেতে কয়েকটা ইট যেন আলগা হ'য়ে গিয়েছে সরু ছোট আলনাটার পায়ের কাছে। ঝাঁটা বুলাতে বুলাতে একটা ইঁটের কাছে এসে সে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখলো। একবার যেন সে আলগা ধুলো টেনে টেনে ইঁটটার চারিদিকের খাঁজ ঢেকে দিলো। সে ঝাঁটা হাতে তবু দু হাত আড়াআড়ি বুকের উপরে রেখে কিছু ভাবলো। তার মনে হ'লো আসলে জানো ব'লেই ইঁটটাকে অন্যগুলোর তুলনায় বেশী আলগা বোধ হচ্ছে। কিন্তু সিমেন্ট পেলে একটা আস্তর করে দিতে পারলে মেঝেতে মনে হবে পুরনো ভাঙা মেঝে আনাড়িভাবে মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু সিমেন্ট কিছু পরিমাণে যোগাড় হয় না, কিনতে হলে একটা ব্যাগ কিনতে হয়, আর বালি। এমন কি তা যোগাড় হলেও মিস্ত্রী ছাড়া কিছু করা যাবে না। যদিও সে আর বিজয়া দুজনে একটা বড় স্ক্রুড্রাইভার যোগাড় করে সাত-আট দিনের চেষ্টায় স্ক্রু আর কাঠ দিয়ে এ'টে দেয়া খড়খড়িটার উপরের অংশ খুলে ফেলে আবিষ্কার করেছে এতদিন যাকে দেয়ালের গায়ে কাঠের রঙীন কারুকার্য মনে হতো, প্রকৃতপক্ষে তা একতলার ছাদে যাওয়ার

দরজাই ছিলো সেকালে, যার উপরের অংশ খুললে জানালা হ'তো, আর সবটা খুললে দরজা। এখন তারা জানালা খুলে নিয়েছে। ঘরে আলো বেশী আসছে। কাল তো নিচের অংশটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কিছুক্ষণের জন্য বিজয়া। কিন্তু তা ভালো নয়। পুরনো খড়খড়ি, নিচের অংশটাও নড়বড়ে। আসল কথা, আলগা ইঁটটাকে সিমেন্ট দিয়ে বসিয়ে দিতে পারে না জয়া। তার পক্ষে অসম্ভব। বরং ধীরে ধীরে ঝাঁটানো ধুলো খাঁজে ঢুকতে ঢুকতে এক সময়ে এমন জম্পেশ হতে পারে যে আলগা ব'লে মনে হবে না।

সে অনুভব করলো যেন জীবনের কয়েকটা আলগা দিন যেন কয়েকটা স্বচ্ছ আলগা ব্লক যা আবার জীবনের গায়ে মিশে যাবে অনেকদিনের অভিজ্ঞতা খাঁজে জমতে জমতে। কিংবা তা হয় না, অনেক দিনের পুরনো একটা মনে ধরা জামার রং যেমন স্বচ্ছ বাতাসের গায়ে কখনও ক্বচিৎ ফুটে উঠতে চায়, এসব আলগা দিনও কি তা পারবে? ভবিষ্যতে? ধরো যখন জয়ার বয়স ত্রিশ হয়েছে?

স্নান করতে গিয়ে বিজয়া ভাবলো : এখনকার দিনে কিন্তু স্বপ্নের কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ তো বোঝাই যাচ্ছে ঘুম তখন হাল্কা হ'য়ে গিয়েছিলো, চোখ কিছুটা খুলে ছিলো। তাই পর্দায় জয়ার নাচটা ধরা পড়েছে কিন্তু পুরো ঘুম ভাঙেনি বলে স্বপ্নে মিশে যাচ্ছিলো। হ্যাঁ, স্বীকার করাই ভালো তেমন মচমচে ভাজা গলা-মাখন-চোঁয়ানো টোস্টে তার লোভ আছেই। আর সিঠার্ন সাইটেল এসেছে যে কবিতা থেকে তাতেই একজন স্বর্গের বারে, বোধহয় কোন গেটের আড়কাঠে, বুক রেখে নিচের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো, যেমন সে নিজেই কাল বিকেলে দাঁড়িয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের আবিষ্কার করা জানালাটার নিচের বন্ধ করে রাখা অংশের উপরে ঝুঁকে। তখন দরজার বন্ধ নিচের অংশটুকু দুটো কাঠের বারে লাগানো থাকলেও নড়ছিলো আর তার ভয়-ভয়ও করছিলো। ঘুমের মধ্যেও যেন পায়ের তলা শিরশির ক'রে উঠছিলো। কিন্তু ভয়টা, পড়ে যাওয়ার ভয়টা, যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মনে এসে থাকে তবে তা তো নিজের সম্বন্ধেই, কিন্তু স্বপ্নে সে সাবধান করছিলো জয়াকে। কী জানি কেন স্বপ্নে এরকম পাত্রবদল হয়।

কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি করতে হবে। আজও দেরি হ'য়ে গেলো। কেন যেন সকালে বিছানার নরম স্পর্শটা তাকে নেশার মতো আটকে রাখে। অবশ্য নেশামাত্রেই তাই, যেমন চায়ের কুবোষ্ণ স্পর্শ জিভে গলায়। ত্বকেরও নেশা থাকতে পারে, তা যেন ঘুমের আবেশ নেমে আসা। দেয়ালের গায়ে বিবর্ণ সস্তার আয়না। বিজয়া ভাবলো কারো কি একদিন খুব ভালো লেগে যেতে পারে। কিন্তু সংগে সংগে লজ্জায় সে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

গামছা দিয়ে হাত দুটোকে মুছলো সে। দুখানা হাতই খালি, একদম খালি। না, চুড়িবালা কিছু নেই। কিন্তু ত্বকের রং আর আঙুলের গড়ন কি ভালো নয়। একদিন সুদেষ্ণা বলেছিলো, সেই ফার্স্ট ইয়ারে,—তোর হাতে কালো সিল্কের ব্যান্ডে যা মানাতো!

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গেলো বিজয়া। চায়ের জল যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে জয়া তবে সে নিজেই নিয়ে যাবে। জল তৈরী পেলো সে। মা এসব ব্যাপারে গোছালো। একটা কাঠের ট্রের উপরে মা তাদের জন্য টীপট, কাপ, ডিশ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখেন। টীপটে জল ঢেলে নিয়ে মুড়ির বাটিসমেত ট্রেটাকে নিয়ে বিজয়া তাদের শোবার ঘরে ফিরে চললো। মা রান্নাঘরে নেই। বোধ হয় বাবার জন্য চা নিয়ে গেছেন।

বিজয়া ভাবলো : কী যে দুষ্টু জয়া! কাল বিকেলের কথা ভাবো। বললে কলেজ থেকে এসে —চল দিদি কাজ আছে। একেবারে গড়িয়াহাটায়। সেখানে পৌঁছে তবে বললে,—কাজ আর কী?

এই একটু আউটিং হলো। কলেজ স্কোয়ার থেকে গড়িয়াহাটা। কোন কাজ নেই, এটাই তো। চল ফুটপাত ধরে ধরে হাঁটি। বেশ খানিকটা হেঁটে তারপর আবার তারা বাসে উঠবে ঠিক করলো। তা খানিকটা খোলা বাতাস গায়ে লাগছিলো বৈকি। একবার এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নীল আর ফিরোজা রঙের চুড়িগুলো কিনেছিলো তারা।

কিন্তু নীল আর ফিরোজা কেন? ও দুটিই কি রঙের মধ্যে সব চাইতে ভালো! বিজয়ার খেয়াল ছিলো না। জয়া বলেছিলো, —ওই দেখ সেই বাড়িটা। সে বাড়ির একতলার টেরাসে অনেক ডালিয়া বটে। তারপর তারা তাদের টবের ডালিয়ার কথা আলোচনা করেছিলো। নীল নীল ডালিয়া কি সত্যি হয়, কিংবা সত্যি ফিরোজা রঙের, হলেও তা কি হবে তাদের টবে? তারপর তারা নীল আর ফিরোজা রং-এর কাচের চুড়ি কিনেছিলো। প্লাস্টিকের চুড়ি, কিন্তু কাচের মতো জেল্লা।

বিজয়া ঘরে ঢুকে বললে,—মিষ্টি, চা খাবি আয়।

জয়া যে রকম নিপুণ, সে ইতিমধ্যে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার উপরে নিচু ছোট জলচৌকি পেতে রেখেছে। বিজয়া চায়ের জল না আনলে সে নিজেই আনতো। চা খাওয়া হ'য়ে গেলে প্লেটা পিছনে রেখে জলচৌকির উপরে বই রেখেই জয়া পড়তে শুরু করে।

মাদুরে বসে চা ভেজার অপেক্ষা করতে করতে বিজয়া ভাবলো,—আসলে নামটা মিষ্টি না হ'য়ে দুষ্টু হলেও চলতো।

মুড়ি আর চা (স্বপ্নের টোস্টের কথা মনে পড়ায় বিজয়া নিশব্দে হাসলো একবার) খেতে খেতে বিজয়া লক্ষ্য করলো জয়া ইতিমধ্যে দু হাত থেকেই সবগুলো চুড়ি খুলে ফেলেছে।

বিজয়া বললে,—চুড়িগুলো খুলে ফেললি? তোর হাতে ভারি ভালো মানিয়েছিলো।

—আমিও দেখেছি ফিরোজা চুড়িগুলো তোর হাতে আরও গর্জাস দেখায়, দিদি। কিন্তু খুলে রাখা ভালো নয়? হঠাৎ যদি ভুলে যাই কলেজে যাওয়ার সময়ে, যদি ওগুলো হাতে দিয়ে কলেজ চ'লে যাই?

বিজয়া বললে,—বাহ্?

কিন্তু সে ভাবলো। গল্পটা দু' বছরের পুরনো। স্বাতী একদিন কলেজে চুড়ি পরে গিয়েছিলো, সেগুলো ছিলো বেলোয়ারি কাচের। কে একজন বলেছিলো, ভারি ভালো মানিয়েছে। তা থেকেই কথাটা উঠলো। এর, ওর, তার মুখে ঘুরে ঘুরে প্রমাণ হ'লো : মন্দিরা আর তার বান্ধবীরা হাতের সোনার চুড়ি, গলার দামী সোনার হার খুলে রেখে কাচের চুড়ি আর প্লাস্টিকের পুঁতি হার পরে আসে তাতে তাদের রুচির নবীনতা প্রকাশ পায়, কেননা তখন বিশেষ করে তাদের পরনে যে শাড়ি থাকে তার দামই প্রমাণ করতে থাকে ব্যবস্থাটা সোনার অভাবে নয়। কিন্তু স্বাতীর বেলায়? বেলোয়ারি কাচের চুড়ির সঙ্গে তাঁতের সস্তা মোটা শাড়ি। যতই রঙে ম্যাচ করুক, ওতে স্বাতীর সোনার অভাবটাই প্রমাণ করেছিলো। কথাগুলো চড়া সুরে কেউ বলেনি। কিন্তু তারপরে স্বাতী দু মাস কলেজে আসেনি। এমন কি মন্দিরা আর তার বান্ধবীদের এড়ানোর জন্যেই (অন্তত বিজয়ার তাই ধারণা) স্বাতী ইকোনমিকস অনার্স ছেড়ে দিয়ে হিস্ট্রি অনার্স নিলে।

বলবে,—এ আর এমন কী। কিন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপার কেন যে মানুষকে এত কষ্ট দেয়!

জয়ার প্রথম কলেজে যাওয়ার দিন বিজয়া তাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিলো। বলেছিলো আমার বোনকে ভারি ভালো দেখায়, মা, দেখো। মাঝারি দামের সেই ছাপা শাড়ি বাবা জয়ার কলেজে যাওয়ার জন্যেই কিনে এনেছিলেন। জয়ার মনে খুশী ছিলো, তার সঙ্গে একটা গর্বের ভাবও বোধ

হয়। নিছক ব্যক্তিগত গর্ব, কলেজে যাওয়ার বয়স পাওয়ার গর্ব। যা সকলেই পায়, কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথক ক'রে নিজের মতো ক'রে পেতে পারে। কিন্তু বিজয়া অবশেষে জয়ার হাত থেকে তার প্রায় আবাল্যের সাথী পিতল-হেন বালা দুগাছা খুলে নিয়েছিলো। জয়া অবাক হয়ে বলেছিলো, কেন রে? কলেজে বুঝি পরতে নেই।

হ্যাঁ, খুব সামান্য সামান্য ব্যাপার মানুষকে কষ্ট দিতে পারে। পাশাপাশি হেঁটে কলেজে যেতে যেতেই বিজয়ার মনে কষ্টটা সমস্যার চেহারা নিয়ে রইলো। কেন যে এমন হয়? ইংরেজিতে একটা কথা আছে, স্টেইনস্ অব ম্যানহুড। বয়সলাভের কলঙ্ক। স্বাতী, মন্দিরা, সে নিজে একই স্কুলে পড়তো। সেই বেণী দোলানো, স্কিপিংরেসে, লজেঞ্জ-টফির সময়ে স্বাতীর হাতে সোনার বালা আছে কিংবা নেই কেউ ভাবেনি; তখন বরং স্বাতীর টিফিন বাক্সে রাখা একটুখানি পুদিনার চাটনির জন্য মন্দিরা যাকে বলে লালায়িত তা ছিলো। তখন, অবশ্য, লালায়িত শব্দটা প্রয়োগ করতে জানতো না বিজয়া। এখন স্বাতী মন্দিরার সঙ্গে কথাও বলে কি? দেখা হলে হয়তো ভদ্রতা হিসাবে মুখ টিপে হাসে।

জয়া বললে,—দিদি, অত চুপ ক'রে থাচ্ছিস কেন? চা ঢাল।

—মুড়ি ভালো লাগছে না।

—কে তোমাকে ভালো লাগাতে বলেছে? হেলথ্ ইজ ওয়েলথ? ওটুকু আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে খেয়ে নিতে পারবো। তুমি এমনি শুধু শুধু চা খাও। না, মাকে বলবো না।

চা ঢেলে নিলো বিজয়া। সেই কবোষ্ণতা তার ভালো লাগে। সে ভাবলো, তা সত্ত্বেও কী যে ভালো! ভালো তো বটেই সকালের প্রথম চা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন? কি কি তেমন হওয়া সত্ত্বেও?

চা শেষ করে বিজয়া বই নিয়ে এলো। তার দেখাদেখি জয়াও। বিজয়া পড়তে শুরু করেছিলো কিন্তু লক্ষ্য করলে যে জয়া বই খুলে, ইংরেজি কবিতায়, স্থির হয়ে বসেছে বটে, কিন্তু এদিক ওদিক চাইছে। বোঝা যাচ্ছে কবিতাটায় ঢুকতে পারছে না জয়া।

বিজয়া তার বইটা টেনে নিয়ে দেখলে সেটা মিলটনের অতিপরিচিত সেই সনেটটাই যা তাঁর অন্ধত্বের উপরে লেখা। বিজয়া পড়ে দিলো। বললে,—এটাও কিন্তু আয়াম্বিক, অথচ লক্ষ্য করে দেখ ডার্ক শব্দটা তিনবার পাশাপাশি আছে। তিনটের উপরেই কিন্তু স্ট্রেস পড়বে।

জয়া বললে,—আ, দিদি, কাল আমাকে আমার সহপাঠীরা বলেছিলো আমাদের পরীক্ষায় এমনকি অনার্সেও আজকাল আয়াম্বিক-ফায়াম্বিক লাগে না।

—বাহ্, কিন্তু কবিতা তো শব্দের মালা। ছাপার কালো অক্ষরে সবই তো এক রং। উচ্চারণ ঠিক না হ'লে, শ্বাসাঘাত ঠিক না হ'লে কী ক'রে বুঝবি কোনটা সোনার গোট কোনটা বা পান্নার ফুল। নে, আমি যেরকম পড়ছি সেরকম ক'রে পড়। এরকম স্ট্রেস-দেয়া আর-একটা আয়াম্বিক লাইন বলতে পারিস? পারলি না? কেন সেই যে ব্রেক্, ব্রেক্, ব্রেক্, অন দাই কোল্ড গ্রে স্টোনস ও সী। না রে, উচ্চারণ ঠিক না রাখলে, কবিতা পড়া বৃথা।

জয়া মুখের কাছে বই তুলে নিয়ে কবিতাটা পড়তে শুরু করলো, বিজয়া হেঁট হয়ে জল-চৌকির উপরে রাখা বইএর দিকে মুখ নামালো। কিন্তু জয়া পড়তে পড়তে দিদির ঠোঁটনাড়া দেখে ভাবলো ইংরেজিতে পিউরিস্ট ব'লে যে কথা আছে, দিদিই বলেছে কয়েকদিন আগে, উচ্চারণের ব্যাপারে দিদি হয়তো তেমন পিউরিস্ট। কী বলবে,—শুচিবায়ু না শুচিপ্রিয়তা? আরও দুবার

কবিতাটাকে পড়লো জয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করলো,—অন্ধ হ'লে সব কি কালো হ'য়ে যায়?

—চোখ দিয়েই তো আলো ; সে চোখ যদি না থাকে?

—আচ্ছা, ওদের ভাষায় ডার্ক শব্দটাই কি সব চাইতে কালো?

—আমার তো তাই মনে হয়। যেমন স্যাড্ শব্দর চাইতে দুঃখিত শব্দ আর নেই ওদের।

বিজয়া আবার বইএর দিকে মাথা নামালো। দু এক মিনিটেই সে অনুভব করলে জয়া উঠে গেছে। মুখ তুলে দেখলে জয়া উঠে গেছে। বরং ব্যালকনিতে টব দুটোর পাশে কিছু করছে।

—পড়লি না?

—বাহ্, আমরা তো পড়ছি। কিন্তু আমাদের জীবনের এই নতুন অতিথিদ্বয়? রোদ সরে যাচ্ছিলো। আর রোদ সরে গেলে—

—কিন্তু পড়াও তো দরকার। ওটা কিন্তু খুব ইমপর্ট্যান্ট কবিতা।

—জানি। ওটার সাবস্ট্যান্স আসে। নোট বইএ পড়ে নেবো। সত্যি কথা বলতে কি, অত কালো আমার ভালো লাগে না। তার চাইতে কালকের সেই কবিতাটা পড়ে শোনা। সেই যে ব্লেসেড্ ড্যামোজেল স্বর্গের সোনার গেটে বুক চেপে দাঁড়িয়েছিলো। সেই যে যার মধ্যে সিঠার্ন সাইটোল বাজছে।

হাসলো বিজয়া, বললে,—কেন? তবে নাকি আয়াম্বিক-ফায়াম্বিক লাগে না। এমন কি, আমি যে ভয়ে সারা, অমন সুন্দর কবিতাটা পড়তে গিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলছি। ডিকশনারি দেখে আর কত ঠিক করা যায়! ওই যে বাদ্যযন্ত্র দুটোর নাম করলি, ও দুটো শব্দের ব্যবহার শুধু দ্যোতনার জন্যে নতুবা যন্ত্র দুটোতে প্রকৃতপক্ষে তেমন তফাতই নেই। অথচ কী দুঃখের দেখ—কেউ আমাকে বলে দিচ্ছে না (এমন কি অকস্‌ফোর্ড অভিধানও নয়) ও নাম দুটোর প্রথমে যে 'সি' অক্ষর তা কি 'চ' না 'স'।

—বাহ্, তা কেন? কবিতাটায় কত আলো না। আমি যেন দেখতে পাই ড্যামোজেলের সোনালী চুলে আলো, তার সেই হেলান দেয়ার গেটের সোনায় আলো, চুলের সাতটি তারায় আলো।

জয়া ডালিয়া সমেত টব দুটোকে রোদে পৌঁছে দিয়ে, পড়বার মাদুরে ফিরে এলো। এক বই থেকে অন্য বইএ যেতে বিজয়া ভাবলো : কাউকে কাউকে আলোর মধ্যেই যেন ভালো মানায়। ভাবো সে দিনের কথা। ট্রামের মান্থলি রিনিউ করাতে দেরি হয়ে গিয়েছে, (কারণ টাকাটা যোগাড় হয়নি) তাই তারা দুই বোন হেঁটে আসছিলো কলেজ থেকে। মোড়ের সেই বাড়িটা, সেই পুরনো বাড়ি যা এখন নতুন হ'য়ে উঠছে, মালিকের রুচি বদলেছে, টাকাও হয়েছে বোঝা যায়—সেখানে এসে বিজয়ার মনে পড়েছিলো গত শীতে অনেক ফুল দেখা গিয়েছিলো গাড়িবারান্দার ছাতে, গেটের ফাঁক দিয়ে সামনের ছোট লনটাতে। সেদিনও দেখা গেলো বোধ হয় বাড়ির মালিকই অনেক টব বসাচ্ছে একজন মালিকে দিয়ে। গেটের ফাঁক দিয়ে তাকে লনের উপরে এক বেতের চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেলো। হঠাৎ জয়া বললে,—চল, দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

—ওমা, সে কী? কাকে?

তক্ষণে জয়া গেট খুলে ফেলেছে, সরাসরি এগিয়ে গিয়েছে। যেন নির্ভীক হরিণী। কী কথা? না, এমনি এসব ডালিয়ার চারা কোথায় পান?

আবার রাস্তায় এসে বিজয়া জিজ্ঞাসা করেছিলো,—সে কী রে? ওকে চিনিস? ভয় করলো না তোর এতটুকু? কী দস্যি! কী দস্যি!

—চিনতে হবে কেন? চেহারা, গায়ের ফ্লানেল, চৌকো চোয়াল, ডবল থ্‌ুতনি, বাড়ি, ডালিয়া, মালি এসব দেখেই তো বোঝা যায় উঠ্‌তি শিল্পপতি কেউ হবে। ভয় করবে কেন বল? কোনো আধ্‌ুনিক কবির কবিতা যদি ভালো লাগে তবে তার সংগে হঠাৎ দেখা হ'লে কি কথা বলতে ভয় করবে? না কি আমাকে জানতে হবে সেই কবি কোন কাগজের অফিসে হ্‌ুকুম-মানা চাকুরে।

—অর্থাৎ ওই ভদ্রলোকের ডালিয়া চাষ ওর পক্ষে যা সেই কবির পক্ষে কবিতা লেখাও তাই।

—দিদি, মাঝে মাঝে তুই এমন সত্যি কথা বলিস!

কারো কারো আলোর দিকে অদ্ভুত টান থাকে। ছোটবেলাতে তো বটেই, এখনও জয়া ঘরে আলো না থাকলে ঘ্‌ুমাতে পারে না।

জয়া মাদ্‌ুরে উপ্‌ুড় হয়ে শ্‌ুয়ে কিছ্‌ু লিখছে। তার মস্ত এলো খোঁপাটা চোখে পড়ে। বিজয়া সেদিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলো : আলো, নয় আগ্‌ুনও। নাকি বলবে আগ্‌ুন যখন আগ্‌ুনের চাইতেও বেশী তখন আলো। আগ্‌ুন বড় হলে আলো হয়। ছোটবেলাতেই খ্‌ুব চুল। চোদ্দ-পনেরোতেই পাছা ছাড়িয়ে পড়তো। কোথা থেকে শ্‌ুনেছিলো ব্রাশ করলে ঝকঝকে হয়। মার কাছে বায়না ধরলো ব্রাশ আর চির্‌ুনির। একট্‌ু ঝগড়াই হয়ে গেলো। মা বললেন, এতও লাগে, আজ ক্লিপ, কাল নেট, পরশ্‌ু ব্রাশ্‌। ম্‌ুখ চোখ লাল হলো জয়ার। সেলাই ঝ্‌ুড়ি থেকে কাঁচি তুলে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত মাত্র রেখে অত শখের চুল কচ কচ ক'রে কেটে ফেলেছিলো। না, সে চার বছর আগে, এখন এই কোমল চুলের খোঁপা দেখে ব্‌ুঝতে পারবে না সে কী আগ্‌ুনে রাগ।

এটার কিন্তু কোন কারণও খ্‌ুঁজে পাওয়া যায় না এমনকি কোনো মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখকের গল্পেও কেন একজন তেমন করে ঘ্‌ুমের ঘোরেও আলো-অন্ধকারের তফাত বোঝে যে অন্ধকার হলেই ঘ্‌ুম ভেঙে যায়। খ্‌ুব ছোটবেলায় কিছ্‌ু ব্‌ুঝবার আগেই কি অন্ধকারে ভয় পেয়েছিলো।

মা এসে বললেন,—নটা হ'লো।

না, এখনই তাদের উঠতে হবে না। সময়টা জানিয়ে দেয়া, কারণ এ ঘরে ঘড়ি নেই।

তা সত্ত্বেও সে বাড়িতে ফিরেছে দ্‌ুপ্‌ুরবেলায়। এখন, এই অন্‌ুভূতিটা নিয়ে একট্‌ু গোলমাল আছে। 'সত্ত্বেও' শব্দটা যেন একটা নিরেট অথচ স্বচ্ছ প্রাচীর। ব্‌ুকসমান উঁচু বলতে পারো। এপারে তো সে নিজে, একা, একেবারে একা যেমন সে তাদের শোবার ঘরে ঠিক এখন ; ওপারে? অর্থাৎ ও তা শব্দটা কি? কার বা কাদের হওয়া, থাকা করা ইত্যাদি বোঝাতে থাকবে? কলকেতার এই দ্‌ুপ্‌ুর, দ্‌ুপ্‌ুরের পথের ট্র্যাফিক? কলেজ চৌথ্‌ুপী যে বাক্সের একদিকের দেয়াল সরালে তার সমবয়সী কতগ্‌ুলি স্ত্রীলোককে নানা গড়নের ম্‌ুখ, চেহারা, পোশাক, উচ্চারণে কথা বলতে দেখো? অন্‌ুভূতিটা যেন বরং এরকম সব কিছ্‌ু সত্ত্বেও, পৃ্থিবী সত্ত্বেও যে পৃ্থিবী বলতে জয়ার নিজেরও আজকের কলেজ যাওয়া পর্যন্ত ইতিহাসকেও বোঝায়, সে নিজেকে প্‌ৃথক ক'রে নিয়ে বাড়িতে এসেছে।

বললে তার বোরিং মনে হচ্ছিলো কলেজ? তা তো হবেই, কারণ এই নয়, কলেজের আজকের পড়া, বা সেখানকার আজকের গল্পগ্‌ুজব অন্যদিনের তুলনায় নীরেস ছিলো। বোরিং মনে তো হবেই, কেননা তার অন্‌ুভূতিই ছিলো নিজেকে প্‌ৃথক ক'রে নিয়ে।

কেন তা হ'লো? সকলেরই কি তা হয় এসময়ে? একথা কাউকে বলা যাবে না, কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না বলেই এত ব্যক্তিগত গোপন অনুভূতি। হয়তো বলতে পারো পৃথিবীর আদিকন্যার অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মিলে যাওয়ার কথা বলো না। যদি বলো এ অবস্থায় মনে হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কোনো কবি পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন সময়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে কবিতা লিখেছে তবে বলতে হবে যখন অন্য কিছু ব'লে অনুভূতিকে স্পষ্ট করতে পারছো না তখন ওটাকে মেনে নাও। হয়তো এমন হতে পারে এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কেউ বলেনি বলেই এই গোপন অনুভূতি একদিকে যেমন অব্যক্ত অনির্দিষ্ট, অন্য দিকে তেমন একেবারে অনন্যসাধারণ ব'লে মনে হয়। কিন্তু তা হয়তো অভূতপূর্ব নয়। না, জয়া বরং এই অনুভূতিটা আদিকন্যার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। যদি তা সম্ভব হতো, (সম্ভব নয় তা কে না জানে এই কলেজ স্ট্রিটের বিংশ শতাব্দীর দুপুরে?) তবে অন্য কারো সঙ্গে না হলেও তার সঙ্গে জয়া আলাপ করে নিতে পারতো।

একে কী বলবে? এই শতাব্দীর ভাষায় সেক্স? পুরনো শতাব্দীর ভাষায় যৌবন?

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠিক এখন তার মনে পড়ছে অশোক সোমের কথা। রোল নাম্বার টেন। জয়ার ঠোঁটে হাসি ফুটবে এমন হলো। কিন্তু তখনই যেন নিজেকে শাসন করলো। হাতের কাছে প্রবাদ পেয়ে সেটাকেই কাজে লাগালে যেন। না, মৃত সম্বন্ধে খারাপ কিছু ব'লো না। তার ফলে সেই শাসন মেনেই যেন তার চোখ দুটি ছায়াচ্ছন্ন হলো। প্রকৃতপক্ষে এতক্ষণেই তো মাত্র তার নিজের অনুভূতি একটা আকার নিচ্ছে।

কিন্তু, বলো, না হেসে থাকা যায়? মাথায় জয়ার চাইতে ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা হবে, বয়সেও হয় চার পাঁচ মাস। অত্যন্ত ফর্সা রং, রোগা, ভয়ঙ্কর ধারালো নাক, একমাথা চুল, লালে সাদা ডোরা (যেন জেল কয়েদি কিংবা হসপিট্যালের ওয়ার্ড) জামা, সরু কালো প্যান্ট, ধুলোভরা পায়ে ময়লা স্যান্ডাল, এছাড়া রোল নম্বর টেনের আর কী ছিলো। কাছে এলে বোঝা যেতো চোখে যেন কেমন একটা ক্ষুধার্তভাব। সহপাঠিনী রোল নম্বর সিকস্‌টিন বলছিলো ফিস্‌ ফিস্‌ করে এই বয়সেই চোখ কোন খোঁদলে। নিশ্চয় ভয়ঙ্কর খারাপ, মদ তো খায়ই, আর ভয়ঙ্কর—। কিন্তু টম-সইআরের ভালো বর্ণনা আছে। আবার হাসি দেখা দিলো জয়ার ঠোঁটে। তেমন শীর্ষাসন করাই। সেই যে আট বছরের টমসইআর সাত বছরের প্রণয়িনীর দৃষ্টি কাড়ার জন্য শীর্ষাসন ক'রে দেখিয়ে-ছিলো। না, কলেজের সিঁড়ির ব্যানিস্টার বেয়ে নামেনি। কিন্তু ভাবো সেই প্রকান্ড কালো চুরুটটা ধরানোর কথা। সদ্য উঠেছে এমন গোঁফ সেকেলে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কের কায়দায় কমিয়ে যেন প্রমাণ করা যাচ্ছিলো না যে রোল নম্বর টেন একজন পুরুষ।

তারপর দুদিন সে কলেজ ফেরার মুখে জয়ার পাশে পাশে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলো। একটা কবিতার বই একদিন দিয়েছিলো। সেদিন তারা কফি হাউসে পনেরো মিনিট বসেছিলো দু কাপ কফি নিয়ে।

আর তারপর সেই পাগল পাগল ব্যাপার। দুপুরের মাঝামাঝি থার্ড পিআরিয়ডের পরে সে কমনরুমে ফিরছে এমন সময়ে পাশ থেকে হন্তদন্ত এসেছিলো অশোক। না ছুটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।—আপনার বই খাতা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন। একটুও দেরি করবেন না। বিপদ!

কমনরুমের থেকে ঝোলানো ঝোলা কাঁধে করে জয়া বেরিয়ে আসতে আসতেই অশোক বলেছিলো—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন, দাঁড়াবেন না। পথে বেরিয়ে পিছিয়ে পড়ে সে একটা দোকানের কাছে গেলো। যেন কিছু কিনলো এমন ভাব করলো। তারপর জয়াকে ধরে বললো,—

এটা নিন। ঝোলায় পুরুন। দাঁড়াবেন না। বাড়িতে চলে যান। আমার অনুরোধ। কাল নয়, পরশু দিন দেখা করবো। তখন কৈফিয়ত দেবো। সোজা হেঁটে চলে যান।

হঠাৎ একটা গলি দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো অশোক।

বাড়িতে ফিরে তার অবাক লাগছিলো। লম্বাটে মোজার বাক্সে কী দিয়েছে তাকে অশোক। তা কি উচিত হয়েছে তার দেয়া কিংবা তার নিজের নেয়া। বাক্সটা খুলে সে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠেছিলো। হীরের নেকলেস দেখলেও বোধ হয় তত বিস্মিত হতো না। বাক্সটার মধ্যে তুলোর মধ্যে বসানো একটা বিঘৎপরিমাণ রিভলবার।

না, অশোক সোম রোল নম্বার টেন সেটা নিতে আর আসেনি। তিনদিনের মাথায় রোল নম্বার সিকস্‌টিন বলেছিলো কমনরুমে,—জানিস কাণ্ড? আমাদের সেই রোল নম্বার টেন কাল কী এক অ্যাকসিডেন্টে মরেছে। একেবারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো জয়া। অন্য সহপাঠিনীরা ভাগ্যে তাকে আড়াল করার মতো ভিড় করেছিলো। রোল নম্বার সিকসটিনের কাছে তখন জানা গেলো তার বাবা পুলিশের ফটোগ্রাফার। ফটো ডেভেলাপ যে সব প্রিন্ট করেন তা দেখেই সে চিনেছে রোল নম্বার টেনকে। সেই ডোরা শার্টই গায়ে, তেমনি কপালের উপরে চুল, আর সেই নাক।

বইখাতা ঝোলা থেকে বার করে এতক্ষণে ডেস্কের উপরে রাখলো জয়া। সরে এসে ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ন্যাকড়া দিয়ে যখন তার চটিজোড়া ঝাড়ছে তখন ঘরের মেঝের আলগা ইঁটটার দিকে নজর গেলো। ওটার তলাতেই আছে রিভলবারটা সেই বাক্সসমেত।

না, একে কেউই প্রেম বলবে না। অন্যদিক দিয়ে সেই রোল নম্বার টেনই এ পর্যন্ত একমাত্র যুবক যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলো। রোজ তার কথা মনেও আসে না। বলতে পারো এই তিন মাসে বার চার-পাঁচ। পরে কী হবে বলা যায় না। এমন হ'তে পারে, কিছু সিমেন্ট পেলে যেমন সে নিজেই পারে, ওই বাক্স আধেয়সমেত চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর পরে এ বাড়ি ভাঙা হলে কেউ রিভলবারটাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না। আর পঞ্চাশ বছর পরে তারও সত্তরের কাছাকাছি বয়স হবে। কিংবা সে কি বাড়বে তার মনে মনে?

তা হলেও, এখন, ঠিক এখন, মনে হচ্ছে না দুপুরের আলো যার গভীরতা তেমন এক নিস্তব্ধ পুকুরের জলে যেন সে নেমেছে স্নান করতে? সেই গভীরতায় তার এই একান্তভাবে নিজের অনুভূতিকে সে বিসর্জন দিতে পারে। কিংবা বলো দুপুরের যে আলো থেকে অনুভূতিগুলোকে তৈরী করেছিলো তার মন সেই আলোকে আবার ফিরে যেতে দেয়া।

ঠিকঠাক এই কথাগুলো তার অনুভূতিতে এলো না। কিন্তু যেন হাল্কা আর আলোর মত শক্তিশালী মনে হলো নিজেকে। বারবেল তোলার শক্তি নয়। সিংহীর স্নায়ুতে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে অতবড় কেশরওয়ালা একটা রাজকীয় মুখের সামনে দাঁড়ায় কি করে? ধীরে ধীরে বার কয়েক পায়চারি করলো জয়া ঘরের মেঝেতে। কিন্তু এটা তার একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার যেন দুদিকের খোলায় লুকানো থাকবে।

তার চাইতে এখন বরং সে গিয়ে মার রাতের রুটি কখানা বেলে দিতে পারে। মায়ের যদি এখনও তিনটের চা খাওয়া না হ'য়ে থাকে এক কাপ চা ক'রে দিলে মা খুব খুশী হবেন।

সুতরাং আলনা থেকে বাড়িতে পড়ার সেই লুঙ্গি আর জামা, আর গামছা নিয়ে সে কলঘরের দিকে রওনা হ'লো।

কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে সে দেখতে পেলো ঠিক রুটিনমাফিক মা রান্নাঘরের দিকে চলেছেন। সংসার করার কৌশল আছে, এটা মায়ের এক কৌশল। সন্ধ্যাবেলায় উনুনে আঁচ দেন না। সকাল এবং সন্ধ্যায় দুবার ধোঁয়া খাওয়ার চাইতে একবার ভালো। সকালের উনুন ঝেড়ে কুচি কয়লার আঁচ রেখে রেখে টুকটাক করে, দিনের রান্না শেষ হওয়ার পর থেকেই, বিকেলের জল-খাবার, রাতের রান্না গুছিয়ে তোলেন।

মা জয়াকে দেখে বললেন,—এখন চা খাবি?

—পরে। তুমি খাওনি তো?

—তা হ'লে আমারও পরে হবে।

জয়া ভাবলো, এমনি হিসেবী বটে মা। বললে,—তা হ'লে এসো রুটি করি।

মা হেসে বললেন,—ত'ই?

জয়া ভাবলো, এ হাসির কোন অর্থ করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন হাসেন মা। কেউ বলতে পারে এটা জয়া বড় হওয়ার অভিনয় করছে বলে মার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু জয়ার মাঝে মাঝে মনে হয় এ হাসিটার আরও কিছু আছে। যেন তাঁর নিজের এই সংসার করার ব্যর্থ চেষ্টার হাস্যকর দিকটা যা সব সময়েই মনে আছে তা হঠাৎ একটু বেশী হাস্যকর হ'য়ে মনে এলো। এত নাই-নাই দিয়ে, পাতা দিয়ে লুচি করে, কাঁকর দিয়ে পোলাও করে, পুতুল খেলা যায়, প্রাপ্তবয়স্কের সংসার হয় না। নিজেকে যেন পুতুল খেলতে দেখতে পান মা কখনও কখনও।

জয়া বললে,—তুমি বেলে দাও, রুটি আমি ভেজে নেবো।

মা উঠে এসে উনুনের মুখ থেকে লোহার কী একটা সরিয়ে আঁচটাকে ঠিক ক'রে রুটি বেলতে বসলেন।

মানুষ প্রাণের দায়ে যা করে তাকে কেউ কেউ আত্মপ্রবঞ্চনা বলেছে। যেমন ঠিক এই সময়ে এ বাসার মধ্যে নিস্তব্ধতা। যেন রাস্তার হৈ হট্ট, ট্রামবাসট্যাক্সির সেই কুৎসিত শব্দগুলো যেন এখানে আসে না, অর্থাৎ এরা যেন কানের একটা দরজা বন্ধ ক'রে দেয়ার কৌশল উদ্ভাবন করতে পেরেছে, যেমন নাকি বাসযোগ্য জল ক্রমশ কাদা হ'য়ে এলে মাছেরা তবু সেই কাদা থেকে প্রাণধারণের অক্সিজেন সংগ্রহ করতে শেখে।

হ্যাঁ, এই সময়টা এমন নিঃশব্দ হয়ে যায় বাড়ি। শুধু ওদিকের বাবার বসবার ঘর থেকে ঘড়িটা থেকে ধুলো-বোজা গলার টিক্ টিক্ শব্দ ভেসে আসে। উনুনে কেটলি থাকলে মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ কখনও তোমাকে সচেতন করে। রুটি বেলার একটা মৃদু শব্দ আছে। জয়ার একটু অবাক লাগলো যেন। মা তো রুটি বেলছেনই বটে, তবে? শব্দটা কি জয়ার মিষ্টি লাগতো? শব্দটা নেই, সেটাই আসল কথা। জয়া এবার তাকিয়ে দেখলো। মায়ের হাতে শাঁখার পাশে দুগাছা ক'রে চুড়ি ছিলো। তারই শব্দ হ'তো তবে। সেই চুড়িগুলো নেই। শুধু শাঁখা আছে। ও, তা হ'লে এবারের ভর্তির সিজনে গিয়েছে। সে ফার্স্ট ইয়ারে আর দিদি থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছে, তাছাড়া দুজনের কলেজে যাওয়ার দু-একখানা ক'রে শাড়িজামা কিনতে হয়েছে।

জয়া দেয়ালের দিকে চাইলো। দেয়ালের এই এক সুবিধা তুমি তোমার দৃষ্টিকে ওখানে নিবিয়ে দিতে পারো।

দেয়ালটার রং হলদে ছিলো। এখন তা নেই। মনে হবে কোন একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উনুনের ধোঁয়া থেকে আলকাতরা তৈরী হচ্ছে দেয়ালের গায়ে জানলা-দরজার গায়ে। আর সেজন্যই যেন এ-ঘরের আলোতে, এমনকি এ-ঘরের পাশে যে প্যাসেজ, তার আলোতে যেন রং আছে। এ-ঘরের আলোতে মেটে রং, প্যাসেজের আলোতে ছাই রং। কারণ খুব সহজ, রোদ আসে না। নাকি আসে, ওদিকের ঘরে একটা মাত্র জানলা দিয়ে বাবার টেবলে কিছুক্ষণের জন্যে দুপুরের দিকে। আগে এরকম ছিলো না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে বাসার পুবের অংশ কাঠের পর্দা দিয়ে পৃথক করে অন্য একজনকে ভাড়া দেয়াতেই। তুমি কি বলবে মা সকালে একবার উনুন জ্বাললেও সেই সকালের ধোঁয়াই সবটুকু বেরিয়ে যেতে পারে না। দিনের পর দিন জমা হচ্ছে। কোণঠাসা, চাপা, এরকম একটা অনুভূতি হলো জয়ার। জয়া কাশলো।

—কাশি হয়েছে?

—কই, না তো!

রুটি ভাজতে শুরু করে জয়া। আবার কাশলো।

বললে,—বোধ হয় উনুন থেকে গ্যাস গলায় লাগলো।

জানালার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আবার ফিরে আসে রুটি ভাজতে। হাসে, যেন কিছুটা জোর ক'রে। ভাবলো : প্রকৃতপক্ষে হাইজিন বইএ যা বলে তা ল্যাবরেটরির কথা। মানুষের নাকগলা এমন সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিকসে তৈরী নয় যে—

—হাসছিস যে? মা জয়ার হাসি লক্ষ্য করলেন।

জয়া বললে,—আমাদের গলা নাক খুব সূক্ষ্মযন্ত্রে তৈরী হলে কিন্তু মুস্কিল হত।

—মানে?

—মনে করো, বাতাস যতটুকু খোলা না হ'লে আমাদের ক্ষতি, বাতাস ঠিক সেই জায়গায় এলে টুংটুং ক'রে বাজবে। আলো যতটুকু না হ'লে আমাদের চোখের পক্ষে ক্ষতি তার চাইতে কম হওয়া মাত্র টুংটাং করে ঘন্টা বাজবে। এক কথায় সব সময়ে সেই বিপদ-জ্ঞাপক ঘন্টাগুলো বাজছে। আমি, দিদি, তুমি, বাবা সকলের গা থেকে কেবল মৃদু টুংটাং।

মা হাসলেন, এই মেয়েটা কি তাঁর বড় হ'লো? না, কেউ কেউ বড় হ'লেও তার ছোটবেলার দুষ্টু স্বভাব কথাবার্তায় ধরা পড়ে।

জয়া বললে,—এবার একটু চা খাও মা। তুমি বসো, বিশ্রাম, একেবারে বিশ্রাম। তুমি বরং একটা বই নিয়ে বসো। নো ওরি, নো অ্যাংজাইটি।

মা বললেন,—তুই বরং কিছু খা। আমি চা করি। দেখ, ওখানে মুড়ি আছে। হবে না ওতে দুবোনের?

—হবে আবার না?

জয়া জানে মা এখন রান্নাঘর কাউকে ছেড়ে দেবেন না। প্রায় খালি তরকারির ঝুড়িটা চোখে পড়লো জয়ার রোজ যেমন পড়ে। আসলে এখন রাতের তরকারি হবে। ওই সামান্য জিনিস দিয়ে কী করে তা হবে তা ভেবে নেয়ার সময় চাই, তখন সেখানে আর কেউ থাকলে চলবে না। কিংবা দিদি যেন ম্যাজিককে কি বলে ব্ল্যাক আর্ট। প্রয়োগ করার সময়ে মা চান না কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।

মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে এলো জয়া। তার মনে হ'লো ছোট ছোট বেল্ বাজছে। ওমা কোথায়? সে মুখ টিপে হাসলো। কি কান্ড দেখো! নিজের তৈরী গল্প কিরকম কায়দায় মনে

ফেরে! ও, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমরা? আলো স'রে যাচ্ছে তাই? যেন সেই নীল আর ফিরোজা এখন কেমন একটা ম্যাটমেটে রংএর আলো নামবে।

টব দুটোর কাছে গিয়ে টেনেটুনে পড়ন্ত রোদটুকুতে কোনভাবেই আর দুটো টবকেই রাখা গেলো না। তা হ'লে? কী সুন্দর হয়েছে ফুলদুটি। ফিতে দিয়ে মেপে দেখবো? কেউ কেউ নাকি চামচে করে খাওয়ায় এমন কি গাছের পাতাকে। হয়তো এগুলো তত ভালো নয় যেমন সেই শিল্প-পতির বাড়িতে আছে। স্বীকার করতে হবে ভদ্রলোকের রুচি ভালো। তাহ'লে কিন্তু, এত অল্প রোদ পেয়েও এ দুটো কী সুন্দর হয়েছে, কী পরিপূর্ণতা। আর সার বলতে তো শুধু চায়ের পাতা। ফিরোজাটাকেই সে রোদে রাখলে, একটু ছায়ায় যেন পড়লো নীলটা। চুমু খেতে গেলে যেমন ঠোঁট হয়, যেন চুমু খেতেই সে এগোচ্ছে, কিন্তু কথাই বললো বরং ফিস্‌ফিস্‌ করে নীলটাকে—বাহ, ও তোমার দিদি নয়? তাকিয়ে দেখো। ওগো যুবতী, দিদির যে আগে বিয়ে দিতে হবে। ওর একটু বেশী যত্ন দরকার নয়?

উঠে দাঁড়ালো সে। এবার ঘরটাকে গুছিয়ে নিতে হয়। ওই, দেখো আজ কলেজের মালির কাছ থেকে ডাল চেয়ে আনা হয়নি। কি যে হলো দুপুরে। বরং আজ একটা ধূপকাঠি জেবলে দিতে হবে সন্ধ্যায়। আর দিদি ফিরলে তখনই সে চা খাবে। প্রকৃতপক্ষে একা খেতে কারই বা ভালো লাগে।

এখন সে কি করবে। খানিকটা সে বেরিয়ে আসতে পারে ফুটপাত ধরে ধরে, কিংবা বইএর পাড়া দিয়ে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে, ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে। হাতে একটা ব্যাগ থাকলেই হ'লো। লোকে ভাববে এই মেয়েটা পুরনো বইএর দোকানে বই কিনতে কিংবা কলেজ স্ট্রীটের বাজার থেকে তরকারি কিনতে বেরিয়েছে। হয়তো পোশাকটা তেমন ভালো হবে না। একবার সে এক বুড়ী মেমকে রংচটা গাউনে হাঁটতে দেখেছিলো রয়েড স্ট্রীটে। রংচটা কিন্তু ফিটফাট। তার এই পুরনো শাল থেকে তৈরী লুঙ্গি আর একটু খেপেযাওয়া পুলোভারে তেমনই দেখাবে।

হঠাৎ তার মনে হ'লো প্রকৃতপক্ষে রোল নম্বর টেনের গায়ে যে স্ট্রাইপ্‌ তা বোধ হয় ফিরোজার ধারঘেঁষা লাল। ইটের কি সেরকম রং হয়। আলগা ইটটায় গিয়ে চোখ পড়লো। হঠাৎ তার মনে হলো ওটা কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক। তুমি কি বলবে রোল নম্বর টেনকে অনুসরণ ক'রে ক্লু ধ'রে ধ'রে কেউ কেউ ক্রমশ এই ঘরখানার দিকে এগোতে পারে। ব্যাপারটা নেহাত দিশেহারা হয়েই করেছিলো রোল নম্বর টেন।

পথে বেরিয়ে সে ভাবলো—এটা কিন্তু কৌতুকের যে রোল নম্বরকে যতদিনই দেখেছো তা কিন্তু ওই একই শার্ট গায়ে, একই প্যান্ট পরনে। কেন পোশাক সম্বন্ধে উদাসীন? নাকি বদলাবার মতো পোশাক তার ছিলো না? এখন আর জানার কোন উপায় নেই।

তা অনেকটা ঘুরে তবে বাসায় ফিরলো জয়া। ঢুকতে দেখা হলো মায়ের সঙ্গে। মুখটা একটু গম্ভীর। কিন্তু একটু অবাক হলেন মা।

—কিরে, ব্যাগ হাতে কোথায় গিয়েছিলি।

—বা, একটা মেয়ে খালি খালি ফুটপাতে ঘুরছে, দেখে লোকে কী ভাবে? ভাববে বাড়িঘর নেই। আর ব্যাগ হাতে দেখলে ভাববে কাজের জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। দিদি এসেছে?

—হ্যাঁ। চা নিয়ে যাচ্ছি। ঘরে যা।

—আমার তো মনে হয় কপাল মানা উচিত। কোন কোন দিন যেন কী বিশ্রী দিন হয়ে আসে, দিনের শেষে বোঝা যায় কী ছোট মন তার।

—আয়, দিদি, খাই ব'লে মুড়ি নিয়ে বসেছিলো জয়া। বিজয়া বললে তার খিদে নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ধরে ফেললেন মা। বললেন,—চিড়ে ভিজিয়ে দেবো? বিজয়া তার উত্তরে যখন বললে, —থাকগে। তখন মা বললেন, বেশ ঝাঁজালো সুরে, —বড়লোকের মেয়ে বললেই পারো বাপকে ছানা এনে দিতে, খাবার ক'রে দেবো। চায়ের পট নামিয়ে রেখে মা চ'লে গেলেন।

জয়ার মুখে কথা নেই, বিজয়ার মুখে কথা নেই।

অবশেষে জয়াই বিজয়ার হাতমুঠ খুলে বিজয়ার আঙুল কাপের কানে লাগিয়ে দিলো। আস্তে আস্তে বললে নিচু গলায়,—একেবারে খালি পেটে চা খাবি দিদি?

বিজয়া যেন একটু হাসতে পেরে বেঁচে গেলো। বাটি থেকে একমুঠো মুড়ি নিলো তুলে।

জয়া তখন হাসতে হাসতে বললো, —র'সো। আমি বুদ্ধি বার করেছি। কাল থেকে ছোলা ভিজিয়ে রেখে ঘুঘনি ক'রে দেবো তোকে। সে বেশ নরম আর শুকনোও নয়। জানিস, দিদি, স্বয়ং বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন ছোলার প্রোটিন মাংসের প্রোটিনের মতো শক্তিশালী।

লজ্জায় বিজয়ার মুখ লাল হয়েই থাকলো।

কোন কোন সময়ে জয়ার খুব শক্ত হ'তে ইচ্ছা হয়। চায়ের কাপ ডিশ নিয়ে রান্নাঘরে ধুয়ে রাখতে রাখতে দেখলো যে মা মুখ নিচু ক'রে উনুনের কাছে কিছু করছেন। জয়া মায়ের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলো। অনেক কথা মুখোমুখি না বলা বরং সহজ।

সে বললে তেমন করে বসেই,—তোমারও যেন কী হয়েছে মা। কেউ যদি শুকনো জিনিস খেতে না-পারে, তবু তাকে শুকনো জিনিসই খেতে দেবে?

উত্তর না পেলে কথা বলার সার্থকতা থাকে না। সেজন্য উঠে এলো ধোয়া শেষ করে।

বললে,—মা, শুনছো—

হয়তো সে কোন প্রস্তাব করতো। কিন্তু দেখলো মা মুখ তুলতেই, মায়ের নাকের দুপাশ দিয়ে চোখের জল নামছে তখনও।

সুতরাং তাড়াতাড়ি ক'রে ঘরে ফিরে এলো জয়া। কিছু করার না পেয়ে গামছা টেনে নিয়ে শুকনো হাতটাই আবার মুছলো ঘরের ঠিক মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে গিয়ে।

একটু পরে জয়া বললে,—দিদি, আলোটা জ্বাল। বাবার ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসি। আজকাল একেবারেই কাগজ পড়ি না আমরা। তুই আগে কিন্তু পড়তি।

কাগজ নিয়ে এলো জয়া। আলো জ্বাললো।

বিজয়া বললে,—তুই পড়।

—কেন, তুই একটা শীট নে।

বিজয়া কাগজ নিলো। একটু চোখ রেখেই বললে, আজকাল যে কী কাগজ হয়েছে। রঙীন কাগজ, আর প্রেসে বোধ হয় কালিও থাকে না।

—সে কী!

—তাই নয়? মনে হয় সব অক্ষরই অস্পষ্ট।

—আসলে রাজনীতি তোর ভালো লাগে না। তোর রুচিটা ক্ল্যাসিক। আমাদের সময়ে কী হচ্ছে তার চাইতে শেকস্‌পীয়ারের কোন নাটকে কোন টপিক্যাল কথা তা জানতে তোর ভালো লাগে।

বিজয়া একটু ভাবলো যেন। বললে,—অনেক সময়ে কিন্তু এমন মনে হয় দারুণ রাজনীতি করি। মনে হয় তা করা দরকার। পড় তুই।

বিজয়া উঠে গিয়ে বরং অন্ধকার হয়ে আসা সেই ব্যালকনিতে দাঁড়ালো।

বেশীক্ষণ কাগজে মন রাখতে পারলো না জয়া। তার মনে হলো কাগজেও একটা ছোটলোকী ঝগড়াটে সুর। যেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বদলে ঈর্ষাকাতর নিন্দা রটনা।

জয়া দিদির কাছে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো, বললে,—তা হ'লে চল, দিদি, আজ আগে আগে পড়তে বসি।

জয়া বইখাতা নিয়ে এলো। বিজয়া এসে পাশে বসলো। জয়া বললে,—তুই বরং সনেট সম্বন্ধে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে, তারপর নিজে পড়।

দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে সেটাকে চেপে দিলো বিজয়া। কিছুক্ষণ ধ'রে সে জয়াকে বোঝালো কবিতার ফর্ম ছাড়া কবিতাকে কেন ভাবা যায় না। সনেটের বৈশিষ্ট্য তো নিশ্চয়ই বলতে হবে। জয়া বললে,—এত সব কথা কিন্তু কলেজে হয়নি। রোল নম্বর বেয়াল্লিশ না বত্রিশ একবার উঠে দাঁড়িয়ে মিলটনের সনেটের বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো। তাতে বিরক্ত হয়ে এম এম বি বললেন,—সে সব অ্যাডভানসড্ স্টুডেন্টদের জন্যে। রোল বত্রিশ এমন লজ্জায় পড়লো!

বিজয়া বললে,—আচ্ছা তুই এখন পড়। মিলটনের অন্ধকারেরটাই পড় আগে। তারপর মিল্টন সম্বন্ধে যে সনেটগুলি আছে তা পড়িয়ে দেবো।

কিন্তু রোজ পড়ার মতো মন থাকে না বোধ হয়।

জয়া বললে,—দিদি, বড় হওয়া সব সময়ে ভালো নয়।

—কেন? তোর কি মনে হ'লো মিল্টন যে কালো কালো কালো বলেছেন সেটা সিম্বলিক। তা কি বয়সের ফলে যে জটিলতা আসে তার প্রতীক, জটিলতা এবং তা থেকে হতাশা? আদৌ নয় কিন্তু। ওটা স্টয়িক সহনশীলতা বরং বলা যায়। সত্যি দুচোখই হারিয়েছিলেন তিনি।

—তোর কি মনে হয় না কলেজেও মেয়েরা যদি ইউনিফর্ম পড়তো। সেই মোটা কাপড়ের ফ্রক। সেই একই রকম মাথার রিবন।

—কি হতো?

জয়া বললে,—সেদিন ভারি কৌতুক হয়েছিলো। এ তো আজকাল সকলেই জানে যে কোন রকমের দুগাছা সোনার বালা করতে দু হাজার টাকা লাগে। আজকাল সকলেই সে জন্য সোনার বালার বদলে ঘড়ি পরে। ঘড়ি, তোমার, আজকাল একশ' দেড়শ'তে হয়। ভালো নয়? ঘড়ি হাতে থাকলে আধুনিকও হয়, হাতও খালি থাকে না।

বিজয়া বললে,—একেবারে খালি হাত মেয়েদের বুঝি আধুনিক নয়।

জয়া বিজয়ার খালি হাত দুখানা দেখলে। বললে,—আসলে কি জানিস দিদি, প্রথমে দু একজন খালি হাতে চলে এসেছিলো স্কুলের অভ্যাস থেকে। এখন প্রায় সকলেই আমাদের ক্লাসে ক্রমশ বালা পরছে। যারা পারছে না তারাও ঘড়ি কিনছে। বিজয়া লক্ষ্য করলে জয়া নিজের খালি হাত দুখানা কোলের মধ্যে আড়াল করলো। জয়া বললে,—আসলে, দিদি, মানুষের অপমান বোধ হয়, খুবই অপমান হয়। রোল নম্বার ষোলর কথা সেদিন যেমন সুস্মিতার মুখ একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিলো। আসলে, অপমানটা হয় বাবার। এত গরীব যে মেয়ের চুড়িবালা পড়ার বয়স হয়েছে তবু তা পরতে দিতে পারেনি, মেয়ের খালি হাত যেন এটাই প্রমাণ করে। তখন কিন্তু

কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। মনে হয় কেউ যেন সকলের সামনেই কান মলে দিলো।

জয়া বইএর দিকে মুখ নামালো। কিন্তু আবার তাকে মুখ তুলতে হলো। বিজয়ার দীর্ঘ-নিশ্বাস আর বই বন্ধ করার শব্দ একই সঙ্গে কানে গেলো তার।

জয়া যেন লজ্জা পেয়ে মুখ নামালো। ছি-ছি, ঘড়ির কথা বলা কি ভালো হয়েছে? কিছুক্ষণ পরেই আবার মুখ তুললো সে। দেখতে পেলো বিজয়া দুই হাঁটুতে চিবুক রেখে বসে আছে।

—পড়বিনে, দিদি! তুই আমাকে ক্ষমা কর। কোনদিন আর ঘড়ির কথা তুলবো না।

—আজ মাথাটা ধরেছে।

জয়া হাসলো।—তা তো হবেই, অত না খেয়ে থাকলে শরীর দুর্বল হয়। আর তাতে মাথা ধরে। কিন্তু, রসো, তা তো নয়। আচ্ছা, দিদি, সত্যি ক'রে বল। এই যে কাগজ পড়িস নে, রাত্রিতে পড়াও কমিয়ে দিয়েছিস, আগে ঘুম ভেঙেও দেখতেম তুই পড়ছিস। বল, রোজ সন্ধ্যায় তা হ'লে মাথা ধরে? তাহ'লে, তাহ'লে, তোর চোখ খারাপ হয়েছে?

—বোধহয়।

—কী সর্বনাশ!

মিল্টনের অন্ধত্বের হাহাকারের সনেট পড়তে চোখ খারাপ হওয়ার কথাটা বোধহয় তীব্রতর অনুভূতি হয়।

—চোখ দেখাস না কেন, দিদি?

—হবে।

—হবে কেন? এতদিন হয়নি কেন? র'সো, এখুনি মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসছি। খুব মা তো!

—বস। হবে। ষাট-সত্তরটা টাকা লাগবে।

—তাই বলে—

—কিন্তু একসঙ্গে ঝপ্ করে এক মাসেই কি টাকাটা যোগাড় হয়? ওরকম করতে গেলে হয়তো বাবার দুধ খাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে মা। আর তা হ'লে কি করে পরিশ্রম করবেন?

—ওহ্! তাই বলে তোর পড়া নষ্ট হবে?

—এখন থেকে দিনের বেলায় বেশী ক'রে পড়বো।

—তা হ'লে অন্তত আমাদের এই বালবের পাওয়ারটা বাড়া।

—এমনিতে খরচ বেড়ে গেছে ইলেকট্রিক বিলের।

ব'সে ব'সে ভাবলো জয়া। অবশেষে বললো, —দেখ, দিদি, তোকে একটা লজ্জার কথা বলি। তুই আমার জন্যে রোজ দশ পাওয়ারের বালবটা সারা রাত জ্বালিয়ে রাখিস। রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা সাত ঘণ্টা জ্বলে। আজ থেকে আলো নিবিয়ে দিবি। ওতে যে খরচ বাঁচবে তাতে এই পড়ার আলোটা চল্লিশ পাওয়ার বাড়িয়ে তিনঘণ্টা তুই পড়বি। আমি সোজা অঙ্কের হিসাবে বলছি তাতে খরচ কমই থাকবে। আমি এখন বড় হয়েছি। তুই নিশ্চয় আলো নিবিয়ে দিবি রাতে।

সেদিন রাত্রিতে শুতে গিয়ে আলো নিবিয়ে দেয় জয়া। শুয়ে বললে,—এই তো ঠিক আছে। এখনই ঘুমিয়ে পড়বো। মিছিমিছি এ খরচটা এতদিন হয়েছে।

একটু পরে সে বললে,—দেখ তো, তোর সামনে টেস্ট। ঘুমিয়ে পড়লি?

—না। ভাবছিলাম।

—কী ভাবছিস?

—ভারি মজার। ভাবছিলাম আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের পড়ে কী হয়?

—পড়াই তো একমাত্র আশা। একমাত্র আলো।

—তোর সেই অধ্যাপকের কথা মনে কর, যে রোল নম্বর বত্রিশকে ধমক দিয়েছিলো। এক নম্বর, দু'শ' ছেলেকে সমানভাবে ঠিক করে পড়ানো যায় না, দু নম্বর, দু'শ' ছেলেমেয়ের সকলেই প্রতিভাবান হয় না ; এ অবস্থায় ভালো নম্বর পেতে হলে হয় নকল করতে হয়, নয় দু'শ' টাকা দিয়ে অধ্যাপককে প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়। নিজের চেষ্টায়, একা একা অনেক বই পড়ে সেকেন্ড ডিভিশনে, সেকেন্ড ক্লাসের বেশী হয় না।

—তা হ'লে? হাসছিস দিদি?

—কি অদ্ভুত অবস্থা নয়? উইদাউট অল হোপ অব্ ডে। কখনও দিন আসবে না এই মধ্যবর্তীদের জগতে।

—অথচ এরাই কি সংখ্যায় সব চাইতে বেশী নয়?

অন্ধকারে কিছুক্ষণ জয়া চোখ বুজে রইলো। তারপর বললে,—আচ্ছা আমরা যা বুঝছি, বাবা কি তা বোঝেননি। বাবাও তো মধ্যবর্তী হয়ে রইলেন। কী দরকার ছিলো লার্নেড প্রফেশনের, অ্যাডভোকেটের স্বাধীনতার এখন কী মূল্য? তখন যদি বিদেশী সরকারের চাকরি নিতেন, ভেবে দেখ ডিয়ারনেস এলাউন্সের হিসাবেই কত উপার্জন হতো। প্রতিভাবান না হ'লে, বাপের টাকার জোর না থাকলে অ্যাডভোকেট হয়ে নিজের শক্তিতে বড় জোর মধ্যবর্তীই হওয়া যায়। এত কষ্ট, এত অভাব, এই মুখ নিচু করে চলা। এমন ভদ্রলোক হওয়ার চাইতে শ্রমিক হওয়াও কি ভালো না? কী মূল্য বলো বাবার সেই স্বাধীন রুচির?

—তুই ঘুমো এখন। অন্ধকারে বোধ হয় ঘুম আসছে না।

—না।

কিছুক্ষণ পরে জয়া বললে আবার,—কী অন্ধকার নারে, দিদি, সব দিকে।

—আলোটা জেলে দেবো?

—না। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

বিজয়া ভাবলে চোখ খারাপ হতে দিলে চলে না। একটা মাস্টারি যোগাড় করলে হয়। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে জয়ার। ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে।

হঠাৎ জয়া চিৎকার ক'রে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে।

—কী হলো? এই, এই, এই বোকা মেয়ে। এই দেখ। কিছু হয়নি।

জয়া বললে,—দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো যেন অন্ধকারে।

—চোখ মেল, চোখ মেলে দেখ, কিছু হয়নি। শুধু ঘরটা অন্ধকার। এই নে, তোর গায়ে হাত রাখছি।

জয়া দিদির হাত ধ'রে রাগের তলায় দিদির বুক ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

মাস দু-এক পরে এক রবিবারের বিকেলে জয়া আর বিজয়া তাদের শোবার ঘরে প্রায় মুখোমুখি বসেছিলো। জয়া একটা মোড়ায় ব'সে একটা বই পড়ছে। বইটা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে।

বিজয়া কোথাও যাবে মনে হচ্ছে অন্তত তার বেরোবার মতো ক'রে পরা শাড়ি আর তার সেই কালো উলের কার্ডিগান দেখে মনে হয়। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হ'ল জামাটা গায়ে দিয়েছে। চটিপরা পা একটা মেঝের উপরে নড়ছে। তার মনে যেন ভয়ানক দ্বিধা, তার পাটা সামনে পিছনে এগিয়ে সেই দ্বিধা ভাসছে।

বইটা নিতান্ত অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জয়া বিরক্ত মুখে তার সেই টবের ব্যালকনির কাছে উঠে গেলো। একের পর এক বেশ কয়েকটি ফুল দিয়েছে গাছদুটি। কিন্তু এখন কি ফুল ছোট হ'য়ে আসছে? তা কি টবে সারের অভাব, কিংবা রোদ পাচ্ছে না। তা হ'লে কি বলতে হবে ভালো আর বড় ফুল ফোটানোর যে ক্ষমতা ছিলো পারিপার্শ্বিকের চাপে এতদিনে তার অবক্ষয় শুরু হ'লো।

জয়া পড়ছিলো উপন্যাস, উঠে গিয়েছে ফুলগাছের তদারকিতে, কিন্তু বললে বিজয়ার পড়ার কথা। বললে,—কয়েকদিন পরে টেস্ট, আর কয়েক মাস পড়েই ফাইনাল। পড়লি না কিন্তু আজ। তুই কি সত্যিই হতাশ হলি, দিদি?

—ভাবছি চাকরি করা কিরকম হবে।

—দিদি, জীবনটা কি উপন্যাস? চাকরি একটা কি মুখের কথা? যেন, কি যেন তুই বলিস সেই যে উপন্যাসে নাটকে মেশিন। কিছুতেই প্লট মেলাতে পারছে না, তখন নায়কের অ্যাকসিডেন্ট অসুখ, বড় চাকরি ইত্যাদি যোগাড় করে দেয় যেমন কাঁচা লেখক। যেন ভগবান এসে, ভাগ্য এসে সুরাহা করে দেয়।

কিন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো বিজয়া। যেন দ্বিধার অবসান হওয়াতে সে তার অবাধ্য পা মাটিতে পেতে দিলো।

জয়া বললে,—কখন ফিরবি?

বিজয়া হাসলো, বললে, —দেখি ভাগ্য কি ফাঁদ পাতে।

জয়া ভাবলো এটা কি দিদির বিদ্রোহের মতো কিছু? সত্যি পড়ে যেন কিছুই আর হয় না এখন। পড়া তো শেখা নয় শুধু, পড়া মানে পরীক্ষায় ক্লাস পাওয়া ডিবিশন পাওয়া। আর আজকাল সেসবের অন্য নাম হয় মাস্টার রাখা, নয় কচিৎ যেমন হয় বাবাই অধ্যাপক, কিংবা হাজারে একটা যেমন হতে পারে, অনন্যসাধারণ প্রতিভা। বাবার পক্ষে দিদিকে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো সম্ভব নয়। মাস্টার রাখা তো স্বপ্ন। তাছাড়া দল বেঁধে নকল ক'রে খেটে পড়ার মর্যাদাও কমে গেছে, পরীক্ষার ঘর গিয়ে তেমন পড়ার মূল্যও থাকে না, না-পড়া ছাত্ররাও ডিঙিয়ে যায়। অথচ দিদি সাহিত্যটাকে কি গভীরভাবেই না পড়তে চেয়েছিলো। যেন প্রতিটি শব্দর ভিত্তি থেকে আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরিচিত হবে। এসবই সম্ভব হতো বাবা যদি ভুল না করতেন। লার্নেড, স্বাধীন উপজীবিকার স্বপ্ন না দেখে যদি একটা কারখানাতেও চাকরি নিতেন এতদিনে ফোরম্যান টোরম্যান হ'য়ে ভালোও রোজগার করতেন।

টবগুলোর কাছ থেকে মাটি হাতে উঠে এলো জয়া। হাত দুটো ধুতে হবে। কিন্তু ঘরের মাঝখানে যেন অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সত্যটাকে দেখতে পেয়ে। —ও, দিদি, তুইও বাবার মতোই ভুল করেছিস! তোর মতো মধ্যবর্তীর শব্দগুলির আকাশ চিনবার দরকার ছিলো না। সাধারণভাবে পড়লেই হতো।

জয়া যেন দেখতে পেলো বাবা যা করেছেন মধ্যবর্তীর পক্ষে অসম্ভব গভীর অভিলাষ নিয়ে

চলতে, দিদিও যেন বংশধারার মতো সেই ধারাকেই অক্ষুণ্ন রেখে চলতে চেষ্টা করেছে। আশ্চর্য তো!

এ যেন এক আবিষ্কার। জয়া ভাবলো, এ তো আশ্চর্য ব্যাপার এই মধ্যবর্তীদের অভিলাষ। বাবার মতো, দিদির মতো, আমাদের সকলের মতো হাজার, লাখ, নিযুত মধ্যবর্তী। যারা শ্রমিক নয়, ধনী নয় ; যারা প্রতিভাযুক্ত নয়, নির্বোধও নয়, তাদের কথা—কেউ কি ভাববে না। জীবনের সেকেন্ড ডিবিশান, সেকেন্ড ক্লাস পাওয়া নিযুত নির্মজ্জিত মানুষ—এদের জন্য কি এমন কোন ব্যবস্থা থাকবে না যাতে তারা ভদ্রের মতো বাঁচে? তাদের সাধারণ, মধ্যবর্তী উচ্চাশাগুলো মেটে? এই সেকেন্ড ডিভিশনের মানুষগুলো—তারাই তো সংখ্যায় বেশী, তারাই তো রবিঠাকুর পড়ে, সত্যজিতের প্রশংসা রটায়, শরৎচন্দ্রকে কাঁধে করে তুলেছিলো। এই যে এত সব লিটল ম্যাগাজিন তার কজন লেখক, কজন পাঠক অসাধারণ। অথচ সাহিত্যেও আমাদের কথা লেখে না।

সেদিন সন্ধ্যা পার ক'রে ফিরেছিলো বিজয়া।

—বাব্বা রে, মেয়ে, এত দেরি। আমি ভেবে মরি।

—কেন ভাববি, কেন?

—তা না হয় নাই ভাবলাম। সত্যি চাকরির খোঁজে গিয়েছিলি? হ'লো চাকরি।

—হ্যাঁ।

—বলিস কী? এক কথায়? এত সোজা।

বিজয়া হেসে বললো, —বলতে গেলে তোর জন্যেই।

—আশ্চর্য কথা।

—সেই যে তুই এক বড় বাড়িতে গট্‌গট্‌ ক'রে ঢুকে পড়েছিলি ডালিয়া দেখে। ভদ্রলোককে সেটা এমন প্রভাবিত করেছে, যে তিনি ভুলতে পারেননি।

—কী চাকরি?

—সেক্রেটারির কাজ। পোলিটিক্যাল সেক্রেটারি বলতে পারো।

—কী যে বলবো? আনন্দিত দেখালো জয়াকে। চা খেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ, তিনিই খাওয়ালেন।

সেই সন্ধ্যাতেই জয়া নিজে পড়তে ব'সে বললে,—তোর পড়ার কী হবে?

—হবে। রোজ কাজ থাকবে না। শনিবার-রবিবারেই যা কাজ। একটু অসুবিধা হবে পরীক্ষার মুখে। কিন্তু ভেবে দেখ মাসে আড়াই শ' টাকা, কাজ করতে গেলে বিকেলে চা জলখাবার ফ্রি। এ মাসেই চোখ দেখাতে পারবো। চাই কি দেড় শ' টাকা দিয়ে একজন অধ্যাপককে টিউটর রাখাও যেতে পারে।

সেদিন রাত্রিতে ঘুমাতে গিয়ে জয়া বললে,—দিদি, সত্যি তোর মনে হয়, আমরা গটগট ক'রে তাঁর গেট পেরিয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম—এটা তাঁর মনে ছিলো?

—বললেন তো—যেন হরিণের মতো।

—কী কান্ড!

একটু পরে আবার বললে জয়া,—আচ্ছা, দিদি, পুরুষরা খুব সহজে প্রভাবিত হতে পারে, তাই না? তোকে একটা গল্প বলি। মনে কর এক বিপ্লবী ছাত্র। সামান্য আলাপ এক সহপাঠিনীর সঙ্গে। বিপদে পড়লে সেই বিপ্লবী তার গোপন কথা সহপাঠিনীকে কি বলতে পারে? এমন কি তার বিপ্লবে জড়িয়ে থাকার প্রমাণ, এমন কাগজপত্র মনে কর, সহপাঠিনীর হাত দিয়ে পাচার করার

চেষ্টা করতে পারে? পারে বোধহয়, তাই নয়? পুরুষরা কি খুব সহজে বিশ্বাস করতে চায় মেয়েদের?

অন্ধকারে জয়ার ঘুমাতে দেরি হয়। ঘুমের ঠিক আগে তার লাল স্ট্রাইপ জামার সহপাঠীর কথা মনে এলো যার রোল নম্বর ছিলো টেন।

ডালিয়া একসময়ে শুকাতে শুরু করে। সে তো মৌসুমী ফুল, শুকাবেই।

একদিন বিজয়া বললো সকালে পড়ার সময়ে,—টব দুটো একেবারে খালি থাকবে? বর্ষার ফুল কী হয় জানলে হয়। রজনীগন্ধা হয় নাকি?

—জিনিয়া লাগাতে পারি। কিন্তু তুই কি মনে করিস, দিদি আমি চিরকালই ছোট থাকবো।

বাস্তবিক গম্ভীর দেখালো জয়াকে। আধময়লা ডুরি তাঁতের শাড়িতে যেন তার বয়সও বাড়িয়ে দিয়েছে।

—জিনিয়া লাগাবি না?

—আদৌ না।

একটু পরেই জয়া বললো,—জানিস দিদি, সব সময়ে কিন্তু মধ্যবর্তীরা সব কিছু মেনে নেয় না। জানিস একটা সাধারণ ছাত্র একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টায় প্রাণ দিতেও ভয় পায় না। তুই রাস্তায় যেমন দেখিস, তেমন চটি ফট্‌ফটিয়ে হাঁটা, বড় বড় চুলের ডোরাকাটা জামা গায়ে, রোগা রোগা ছাত্রদের একজন।

বিজয়া বললে,—হচ্ছিলো ফুলের কথা—

—আমি তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম আমার বয়স হয়েছে।

জয়া পড়তে লাগলো। কিন্তু আজ আবার তাকে যেন কথায় পেয়েছে। বললে, দিদি মাঝে মাঝে আমার খুব রাগ হ'য়ে যায়। জানিস তোর কেনা বইগুলোর মধ্যে দুই বোনের গল্প ছিলো। সেই যে একবোনের অসুখ, অন্য বোন সেবা করতে এলো। পড়েছিস? ধিক্ ধিক্, অসুস্থ বোনের থেকে তার স্বামীকে কেড়ে নেয়াটাই কি গল্প।

—ও যে রবিঠাকুরের গল্প।

—তাতেই প্রমাণ হয় সমাজ কেমন পচা। আমরা কি প্যান্টি আর ব্রেসিয়ার শুধু।

—মনে হয় তোর খুব রাগ হয়েছে।

—না প্রমাণ হয় অসুস্থ দিদির কাছ থেকে তার শেষ আশা কেড়ে নেয়ার চাইতে আমি অমন স্বামীকে চাবকে দিই। নে, এখন পড়। টেস্ট তো যা হ'লো। মা জিজ্ঞাসা করছিলেন তোর পরীক্ষার ফিস্ কবে।...কিন্তু দিদি, তুই যে এত বই কিনছিস, পড়বি কবে? আর তা ছাড়া তোর চশমারই বা কী হলো।

—হবে এ মাসেই।

কিন্তু মাসখানেক পরে এই কথা বলতে গিয়েই জয়া ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো।

বিজয়া বললে,—সব কথাই তোমাকে জানাতে হবে কেন?

অন্ধকারে বিছানায় জয়া বিজয়া এপাশ ওপাশ করতে অনুভব করলো পরস্পরকে।

বিজয়া আস্তে আস্তে বললে,—মিন্টি, তুই টাকা চেয়েছিলি কেন?

—থাকগে।

—বল না। আজকাল কয়েকদিন থেকে সহজে ঘুম আসে না, তাই হঠাৎ রাগ হয়ে গেলো

তুই কথা বলার।

—গত বছর তোর জন্মদিনে শুধু রাখি বেঁধে দিয়েছিলাম তোর হাতে, এবার ভেবেছিলাম তোর জন্মদিনে তোকে কিছু উপহার কিনে দেবো।

—দিস।

—দিদি, তুই যে ঘুমের জন্যে ওষুধ খাচ্ছিস তা আমার বোঝা উচিত ছিলো।

ব্যালকনি থেকে টব দুটোকেও সরিয়ে ফেলেছে জয়া। আরও মাসখানেক পরে জয়া সেই ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে ছিলো। বিজয়া তখনও ফেরেনি। কয়েকদিন থেকে বিজয়া সন্ধ্যা পার ক'রে ফিরছে। বলে রাজনীতির কাজ, কখনও বেশী, কখনও কম। আর শনিবার বলেই হয়তো বেশী দেরি হচ্ছে। কিন্তু দিদির পড়া আর বোধ হয় হ'লো না। বলতে পারে হাতে পরার মতো একটা ঘড়ি হয়েছে দিদির।

মাথার উপরে আকাশ। আকাশে তারা। হঠাৎ জয়ার অনুভব হ'লো জোয়ার নেমে গেলে যে কাদার পাথার পড়ে থাকে, আকাশটাই যেন তাই। তারাগুলো যেন পচা শঙ্খের টুকরো।

না, এ তার ভালো লাগছে না। অফিসের চাকরির তবু ভবিষ্যৎ আছে। এটা কি ঠিকে চাকরের কাজের মতো কাজ নয়? হয়তো তা নয়, হয়তো দিদি রাজনীতির জগতে পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু ভাবো এ কি দিদি চেয়েছিলো। পোশাকের উন্নতি হয়েছে, এইমাত্র।

পাঁচ-সাতদিন বাদে আবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে জয়া দিদির প্রতীক্ষায়। সে ভাবলো এর আগে ফিরতে রাত দশটা হয়েছিলো সেদিন। আজও কি তাই হবে। সেদিন রাত্রিতে পরের দিন সকালে মাকে বোঝাতে তাকে অনেক মিথ্যে বলতে হয়েছিলো।

বিজয়া আটটা না বাজতেই ফিরলো। আরও কৌতুকের সঙ্গে জয়া লক্ষ্য করলো গাড়ি থেকেই নামলো সে বাড়ির কাছাকাছি।

হাসি-হাসি মুখে বিজয়া সোজা গিয়ে বিছানায় বসলো।

জয়া দিদি বলে ডাকতেই বললে,—দাঁড়া, দম নিয়ে নি আগে।

—খাবি না? আজ তোর আমার খাবার এই ঘরে রেখে গেছে মা। মার কাণ্ড ডালডা এনে লুচি ভাজলেন। তার উপরে আবার ডিম দিয়ে ডালনাও। বল তো কেন? তুই খেয়ে আসিস নি তো?'

—আমার মনে আছে। আজ আমাদের মিষ্টির জন্মদিন।

—আয়, হাত পা ধুয়ে আয়। খেয়ে নি। মাকে বলেছি জেগে থেকো না। দিদি মাস্টারের বাড়িতে পড়তে যাবে। ফিরতে দেরি হবে।

বিজয়া বিছানার উপরই তার ব্যাগটা খুললো। চাকরিতে যাওয়ার জন্য বিজয়াকে শাড়ির মতো, কমদামী ঘড়িটার মতো এই ব্যাগটাকেও কিনতে হয়েছে। তা করতে হয়। জয়ার মতে আমাদের মধ্যবর্তীদের সব কিছু মেনে নিয়ে দলের সকলের মতোই চলা ভালো।

—সে কি রে? জয়া চমকে উঠলো। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। তাদের স্বল্পোজ্জ্বল ঘরের আলোতেও ঘড়িটা ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠলো বিজয়ার হাতের তেলোয়। যেন ঘড়ির ডায়ালে, ব্যান্ডে পাথর বসানো আছে, এমন উজ্জ্বল।

বিজয়া তাকে পাশে বসিয়ে বললে,—এ জন্যই তো দেরি।

বিজয়া ঘড়িটা উল্টে দেখালো তার তলায় জয়ার নাম খোদা।

জয়া নিজেকে সম্বৃত করে। বলে,—চল আগে খেয়ে নি।

কিন্তু বিজয়া আবার ব্যাগ খোলে। যেন সে নিজেকে আর সম্বৃত রাখতে পারছে না।

জয়া দেখতে পেলো নীল ভেলভেটের কাসকেটটার পাশে বিজয়ার ব্যাগের মধ্যে এক তাড়া নোটও বটে।

—দিদি, দিদি, এ যে হাজার টাকার চাইতেও বেশী হবে। আর কাস্‌কেটটায় কি হার!

বিজয়া বললে, —আমি পরবো? দেখবি?

জয়া চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলো,—দিদি, দিদি, দিদি, এ কি চাকরির টাকা, দিদি এ কি সেই মোপাসার গল্পের মোতির হার?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জয়া।—দিদি, তুই কি দাম দিলি এই হারের, এই ঘড়ির!

সাদা মোমের তৈরী মূর্তির মতো বিজয়া বসে রইলো বিছানায়। যে মূর্তি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে গলে গলে।

মোপাসার গল্পের মতো, আপীল-অ্যাড্‌ভোকেট বললে, এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হয় না মধ্যবর্তীদের বেলায়।

পরের শনিবারে কাণ্ডটা ঘটে গেল। ক্রোজরেঞ্জের তিনটে গুলি বিঁধেছে। সেই উদীয়মান শিল্পপতি এস. এস. কে. এম হসপিট্যালে। রবিবারে জয়া ধরা পড়লো। খুব সহজ। বাড়ির চাকর দারোয়ান তাকে চিনতে না পারলেও প্রথমে বিজয়ার কথা বললো, পরে বলেছিলো হত্যাকারীর বাবা, মা, দিদি কেউ এ বিষয়ে কিছু জানে না। তারপর থানা থেকে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে নিজেই রিভলবারটা তাদের দেয়। মামলাতেও দেরি হলো না। জয়ার সহপাঠিনী রোল নম্বর সিকস্‌টিন সাক্ষ্য দিয়েছিলো। বলেছিলো পেটে এতো তা কি সে জানতো। জয়ার অনুরোধে তার বাড়িতে গিয়ে তার বাবার রিভলবার নিয়ে রোল নম্বর সিকস্‌টিনই জয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, কোনটা সেফটি ক্যাচ্, কি করে দেখতে হয় গুলি ভরা আছে কিনা, কি করে ট্রিগার চাপতে হয়।

হ্যাঁ, দ্বীপান্তরের হুকুমই হ'লো। দ্বীপান্তর হওয়া উচিত নয় কেন? এ তো ঝোঁকের মাথায় হত্যা নয়। এবং এ সময়ে এরকম অনেক রাজনৈতিক হত্যা হচ্ছে। এ অবস্থায় আসামীর পক্ষে যায় এমন কোন ঘটনাও কাজ করে না। আর এক্ষেত্রে তো আসামী বলেছে আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই।

অনুতপ্ত যে নয় তার প্রমাণ হাইকোর্টে আপীল করতে অস্বীকার করেছিলো।

শুধু আসামীর স্টেটমেন্টে একটা প্যারাগ্রাফ আছে যার পাশে পাবলিক প্রসিকিউটার লাল পেনসিলে দাগ দিয়েছে কিন্তু পরে বিচারের সময় যার কথা তোলেনি, বোধহয় বুঝতে পারেনি আসামীর জবানবন্দীর ওই অংশটুকুর কি তাৎপর্য। যদিও বিচক্ষণ পাবলিক প্রসিকিউটর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মার্জিনে লেখা আসামীর মন্তব্যের তীব্রতা থেকে প্রমাণ করেছে উপন্যাসে ভগ্নিপতিস্থানীয় পুরুষের প্রতি নিজের গুপ্তকামনার ছায়া দেখতে পেয়েই আসামী নিজের দুর্বলতা গোপন করতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তেমন কঠোর মন্তব্য করেছিলো। মাই লর্ড, এটাই মটিব অব মার্ডার। ভগ্নির প্রেমজীবনে ঈর্ষা। আসামী বলেছিলো সেই প্যারাগ্রাফে (যার পাশে এখনও পাবলিক প্রসিকিউটরের লাল পেনসিলের দাগ, যার অর্থ সে করতে পারেনি বলে মামলার সময়ে তোলেনি) : "আমার দিদির মনের মধ্যে ইচ্ছে হয়ে থাকা সেই সোনালী স্বপ্নগুলি যারা হয়তো নব্বুইএর দশকে, চোখা নাক, কপালঢাকা চুল, ধুলোপায়ে স্যান্ডাল পায়ে ফিরোজা লম্বা ডোরার শার্ট পরে বেড়াতো রোল নম্বর টেনের মতো তাদের যারা বিষ দিয়ে সেই মনের মধ্যে নীল ক'রে দিয়েছে, বলুন, তাদের ক্ষমা করা যায়।"

অ্যাপীল-অ্যাডভোকেটের সিপিয়া রঙে ঢাকা ধুলোজমা ফাইলসমেত ঘরে দাঁড়িয়ে বিজয়া শুনলো অ্যাডভোকেট বললে,—তুমি একবার দেখা করো। মার্সি পিটিশন দেয়ার চেষ্টা করা যাক।

বিজয়া অনেকক্ষণ থেকেই স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। বসেনি পর্যন্ত। শেকসপীয়র-পড়া মেয়ে তো। যেন হাসিমুখেই বললে,—শি হেটস্ হিম্ দ্যাট্ আপন দিস্ টাফ উয়াল্ড উড স্টেচ হার আউট লংগার। বলুন আর কি তাকে—

অ্যাডভোকেট বললে,—বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি, এরপর যতদিন বাঁচবে কখনই আর সাধারণ দশজনের মতো হতে পারবে না। চিরকালের মতো দাগী হয়ে যাবে, কিন্তু তা হ'লেও জীবনও তো দুবার আসে না।

বিজয়া বললে,—ও একবার দেখা করতে চেয়েছে আমার সঙ্গে।

—কালই ব্যবস্থা হবে।

তারপর দিন বিজয়া জেলখানায় গিয়েছিলো। জয়া এলো যেভাবে কনডেমড সেল থেকে ফাঁসির আসামীকে আনা হয়। কী বলবে বিজয়া। ব্যাগ থেকে সোনার ঘড়ি বার করে বললে,—মিণ্টি, একবার এক মুহূর্তের জন্য পর। আমি তোর ঘড়িপরা হাতটাকে একবার দেখি।

বিজয়ার প্রচণ্ড শীত লাগলো যেন। দুচোখ দিয়ে অবিরল জল পড়তে লাগলো। ঠোঁট দুটো ফাঁক হ'য়ে রইলো। দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হ'তে লাগলো অবিরাম। জয়া ঘড়িটা হাতে বাঁধলো। তারপর বললো জেলরকে, দিদির পা দুটো ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি একবার?

জয়া নিচু হয়ে বিজয়ার পায়ের আঙুলগুলো ছুঁয়ে বললো যেন অভ্যাসবশেই,—কী সুন্দর।

জেলর বললে,—ভিজিটর অসুস্থ, ধরো, ধরো, নিয়ে যাও বাইরে।

জয়া কি দাঁড়িয়ে দেখলো? নাকি নিজেও পিছন ফিরেছিলো জেল কোড অনুসারে ঘড়িটা খুলে জেলরের টেবলে রাখতে।

বিজয়া বাড়ির কাছে এসে দেখলো কি অন্ধকার তাদের পাড়া, কি অন্ধকার আকাশ, যেন আলোর জোয়ার বলো, সভ্যতার জোয়ার বলো ভুল ক'রে এদিকে এসেছিলো, চটচটে কালো কাদা রেখে সরে গিয়েছে।

অবশ্যই এটা ভুল। দোকানে আলো জ্বলছে তো।

রাত্রি অনেক হলো বোধ হয়। বাবা মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাঁদতে কাঁদতেও মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কি যেন অন্ধকার। ও, এবার সে বুঝতে পেরেছে, মৃত্যুর পরে সে কি ভয়ঙ্কর অন্ধকারই নয় সব কিছু। কি আশ্চর্য, আর মিণ্টি কি ভয়ই পায় অন্ধকারে, আর সেখানে তো সে একেবারে একা।

জল গড়িয়ে নিলো বিজয়া। ঘুমের ওষুধ এখন রোজ তাকে খেতে হয়। সে আটদশটা বড়ি চিবিয়ে গিলে জল খেলো। বিছানায় গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। হ্যাঁ, ওখানে মিণ্টি একেবারে একা আর অন্ধকারে, কি ভয়ই পাবে।

বিজয়ার হার্ট, কিংবা মস্তিষ্ক যেন টের পেলো কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের এক অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে, তারা এক আর্ত প্রতিবাদ করে উঠতে গেলো। বিজয়াকে প্রায় ঠেলে তুলে দিলো—যেন সে মা বলে কেঁদে উঠবে ভয়ে। কিন্তু তখন এমন ঘুম পেয়েছে—

সে বলতে চেষ্টা করলো,—ভয় নেই মিঠুয়া মিণ্টি আমার, এই তো দিদি। হাত বাড়িয়ে জয়াকেই যেন অন্ধকারে বুকে টেনে নিতে গিয়ে হাতটাও ঘুমিয়ে পড়লো।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'সিভিলাইজেশন' ও 'কালচার' বলে দুটো নতুন শব্দ বানানো হয়। তার মানে এ নয় যে ওই দুই বস্তু তার আগে কোনোদিন কোনোখানে ছিল না। ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু বস্তুর উপযোগী নামে অভিহিত ছিল না। গত দুই শতাব্দী ধরে শব্দ দুটি মন্ত্রের মতো কাজ করে এসেছে। এমনও দেখা গেছে যে নামই আছে, বস্তুর অস্তিত্ব নেই। মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে সভ্য মানুষ আসলে বর্বর আর সংস্কৃতি তো কোল-ভীল-মুণ্ডাদেরও থাকতে পারে।

এখানে বলে রাখি যে 'সভ্যতা' শব্দটা 'সিভিলাইজেশনে'র ভাষান্তর। পারিভাষিক শব্দ হিসাবে সেটার প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রভৃতি ভাষায়। আর 'কালচারে'র পারিভাষিক শব্দ কী হবে সেটা আমাদের জীবদ্দশাতেই স্থির হয়, প্রথমে 'কৃষ্টি' ও পরে 'সংস্কৃতি'। কালচারের সঙ্গে কাল্টিভেশনের মিল আছে। মনের জমিন আবাদ করাকেই বলে কালচার। 'কৃষ্টি'ই কৃষির সঙ্গে মেলে। কিন্তু কথাটা কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথ তো তা নিয়ে মশকরা করেন তাঁর 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে। তার চেয়ে শ্রুতিমধুর 'সংস্কৃতি'। কিন্তু তার মধ্যে কর্ষণের ভাব কোথায়? প্রাকৃতকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃত। প্রকৃতিকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃতি। এটা কিন্তু বিদেশী 'কালচার' কথাটির বক্তব্য নয়।

যাই হোক, চালিয়ে যখন দেওয়া হয়েছে 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' তখন সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। কেউ কেউ এখনো কৃষ্টি নিয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে যেটা সবাই মেনে নেয় সেটাই চলিত হয়। কৃষ্টি একদিন অচলিত হয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে কৃষ্টিই সত্যিকার পারিভাষিক শব্দ। সংস্কৃতি তা নয়। তা সত্ত্বেও সংস্কৃতি এখন দখলদার। স্বত্ববানের চেয়ে দখল-দারেরই জোর বেশী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কেবল শব্দ দুটির উদ্ভাবন হয় না। তাদের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে বিদ্বানরা মোটামুটি একমত হন। আমরাও পরবর্তীকালে তাঁদের মতের সঙ্গে মত মিলিয়েছি। এখন ওইসব মত আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসমাজের সাধারণ মতে পরিণত হয়েছে। আর বিদ্বৎসমাজও তো সেই সমাজ যে সমাজ আধুনিক ধরনের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি-নির্ভর। এসব প্রতিষ্ঠান তুলে দাও, তারপর দেখবে কারো সঙ্গে কারো মত মিলছে না। 'কালচার' ও 'সিভিলাইজেশন' শব্দ দুটোরও নানা মুনি নানা অর্থ করবেন।

'স্কুল', 'কলেজ' ও 'ইউনিভার্সিটি' এই তিনটি শব্দও বহিরাগত। এদের আমরা ভাষান্তরিত করে 'বিদ্যালয়', 'মহাবিদ্যালয়' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ করেছি। তার ফলে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছে যে এসব তো আমাদের দেশে চিরকাল ছিল। না, কোনো কালেই ছিল না। যা ছিল তার নাম পাঠশালা, টোল বা চতুষ্পাঠী। আরো আগে গুরুগৃহ বা গুরুকুল বা বৌদ্ধ বিহার। মুসলমানদের মধ্যে মক্তব, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া। দেশে শিক্ষিত জনের অভাব ছিল না, উচ্চশিক্ষিত জনেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে এই যে সিস্টেম এটা বহুদিন ধরে ইউরোপে

বিবর্তিত হবার পর ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। আরো পরে চীনে জাপানে। ইউরোপের মধ্যেও পশ্চিম ইউরোপ অগ্রণী, রাশিয়া অনুসরণকারী। বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কী কী পরিবর্তন করেছেন ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁরাও সিস্টেমটার মূলোচ্ছেদ করেননি। সেই কাজটি করতে চাইছেন চীনদেশের মহানায়ক মাও ৎসে-তুং। কতদূর সফল হয়েছেন ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ষোল আনা সফল হওয়া সম্ভবপর। কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চীনকেও অগ্রগামী হতে হবে। অগ্রগামী হতে হলে একই রাস্তায় এগোতে হবে। ভিন্ন পথে চললে তার নাম অগ্রগামিতা হবে না, হবে ভিন্নগামিতা। সে রকম অভিপ্রায় থাকলে কি চীন হাইড্রোজেন বোমা বানাত? হাইড্রোজেন বোমার পেছনে যে ফলিত বিজ্ঞান সে বিজ্ঞান যাঁহা মার্কিনে তাঁহা চীনে। বিজ্ঞানীদের সবাইকেই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির জাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যাঁরা ভিন্ন পথে চলবেন তাঁরা হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পারবেন না, বানাবেন তীরধনুক বা গাদা বন্দুক।

জাঁতাকল জিনিসটা আমার দু'চক্ষের বিষ। তাই আমি স্কুলজীবনে ছিলুম স্বভাব-পলাতক। স্কুল থেকে বেরিয়ে পণ করি যে আর নয়। এখন থেকে আমি জীবনের কাছেই শিখব। জীবন আমাকে যা শেখাবে তাই শিখব। কলেজে ভর্তি হব না। বই মুখস্থ করব না। পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন দেখব না। ডিগ্রীর জন্যে রক্ত জল করব না। কিন্তু সাংবাদিক হতে গিয়ে যা দেখলুম আর যা শুনলুম তাতে আমার উৎসাহ একেবারে জল। কলেজে গিয়ে পেছনের সারিতে বসি। বন্ধুদের নিয়ে একটু-আধটু সাহিত্য করি। অবাক হয়ে যাই একটার পর একটা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এর জন্যে আমাকে বড়ো কঠোর মাশুল দিতে হয়। মাশুলটা ইনটেলেকটের অতিকর্ষণ। এতে হৃদয়বৃত্তি, কল্পনাশক্তি, ইনটুইশন ও ঈশ্বরবিশ্বাস অবহেলিত বা উপেক্ষিত হয়। দেহচর্চারও সময় মেলে না। এক ভদ্রমহিলা আমাকে একটা অতি নিষ্ঠুর কথা শুনিয়ে দেন। 'ইউ আর এ ব্যাগ অব বোনস।' আমি নাকি হাড়ের বস্তা। তার চেয়েও নির্মম বাক্য এক বন্ধুর মুখে শুনি। 'আপনার বিয়ে করা উচিত নয়। ছেলেমেয়ে জন্মালে তারা হবে প্যাঁকাটির মতো।'

এদিকে আমি কিন্তু মনঃস্থির করে বসে আছি যে, কেউ আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে না চাইলে আমি বিয়েই করব না। আমার চাকরিকে ভালোবাসা তো আমাকে ভালোবাসা নয়। আর চাকরিও কি আমি করতে চাই নাকি? করলেও সে আর কদ্দিন! জোর পাঁচ বছর। তা ছাড়া আমার আরো একটা পণ ছিল। সেটাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। আমি যেদিন স্কুল থেকে বেরুই সেইদিনই ঠিক করি যে আমার যদি ছেলেমেয়ে হয় তাদের আমি স্কুলে পড়তে পাঠাব না। কোনো স্কুলেই না। স্কুলমাত্রেই আমার চক্ষুঃশূল। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই পড়বে। কিন্তু মনের আড়ালে একটা মোহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তো তেমন নয়। আহা! কী প্রাকৃতিক পরিবেশ!

বিয়েও হলো, ছেলেও হলো। তার চেহারা দেখে এক ভদ্রমহিলা আদর করে বললেন, 'গুণ্ডা'। এখন সেই বলিষ্ঠ বালককে আমরা স্কুলে পাঠালুম না। বাড়িতেই পড়ালুম, কিন্তু ইংরেজীতে নয়। মাধ্যম হিসাবে না হোক ভাষা হিসাবেও ইংরেজী শিক্ষা নিষেধ। ওদের মা ইংরেজীভাষিণী। তাঁকেই বাংলা শিখে নিতে হলো ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমি যে আমার ছেলের সর্বনাশ করছি এ বিষয়ে ইংরেজ বাঙালী একমত। কিন্তু বাংলা ভাষায় ওর বয়সের ছেলেদের জন্যে যতরকম বই ছিল সবই ওকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। আর মুখে মুখে বাংলায় তর্জমা করে ইংরেজীতে

যতরকম বই ছিল সেসবও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজী ভিন্ন আর সব বিষয়েই ও পাকা। এইভাবে চলল ওর জীবনের প্রথম আটটি বছর। আমার তো ইচ্ছা ছিল আরো চার বছর চালাবার। বারো বছরের আগে ওকে আমি ইংরেজী শিখতে দিতুম না। আমার থিওরি ছিল মানুষ কেবল একটা ভাষাতেই চিন্তা করতে পারে, একাধিক ভাষায় নয়। গোড়া থেকেই একাধিক ভাষায় চিন্তা করলে চিন্তার শক্তি ক্ষয় হয়। আগে বাংলা ভাষায় চিন্তা করতে করতে চিন্তাশক্তিতে শক্তিমান হোক। তার পরে ইংরেজী শিখবে ও দ্রুত দক্ষ হবে।

ইতিমধ্যে আমার আরো দুটি সন্তান হয়েছে ও তাদের উপর দিয়েও একই একসপেরিমেন্ট চলেছে। বন্ধুরা একবাক্যে না-মঞ্জুর করছেন এই শিক্ষাপদ্ধতি। আমার তো খেয়াল ছিল ওদের যদি কোথাও পাঠাতেই হয় তা হলে শ্রমিকদের বিদ্যালয়ে। মধ্যবিত্তদের বিদ্যালয়ে নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় সহযোগী আমাকে বললেন, 'অমন কাজটি করবেন না। ওখানে গেলে ওরা নোংরা কথা শিখবে।' শ্রেণীশূন্য সমাজের জন্যে আমার যে কল্পনা ছিল সেটা তাঁর অগ্রাহ্য।

পুণ্যের যখন আট বছর বয়স তখন তার ছোট ভাইকে হারায়। শোকে দুঃখে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। ছুটি নিয়ে চলে যাই শান্তিনিকেতনে। সেখানে বসে বই লিখব। তাই দিয়ে যেমন করে হোক সংসার চালাব। সেই সময়ই স্থির করি যে পুণ্যকে রবীন্দ্রনাথের পাঠভবনে ভর্তি করে দেব। নইলে ওই দামাল ছেলেকে বাড়িতে সামলানো যাবে না। গুরুদেব তো খুব খুশি, কিন্তু আমাদের রেখে তিনি চলে যান কালিম্পং। আর আমরা শুনি পুণ্যকে তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করতে পারা যাবে না। কারণ সে আর সব বিষয়ে পাকা হলেও ইংরেজী বিলকুল জানে না। ইংরেজীর ক্লাসে হাঁ করে বসে থাকবে। ওর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কি করা যায় না? পাঠভবনের গুরু যাঁরা তাঁরা বলেন, 'না। তা কী করে হয়! নিয়ম নেই যে!' পুণ্যকে সবচেয়ে নিচের ক্লাসেই ভর্তি হতে হবে। হোক না কেন দু'বছর নষ্ট। কৃষ্ণ কৃপালিনী তখন পাঠভবনের অধ্যক্ষ। একদিন তিনি স্বয়ং এসে আমাকে বলেন, 'আমি ওদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছি। আমি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এই ছেলেটিকে নিয়ে আপনারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন ফল কী হয়, ইংরেজী কি কম সময়ের মধ্যে শিখে নেওয়া যায় না? ওঁরা কিছুতেই রাজী হন না। ওঁদের ওই এক কথা। নিয়ম।'

অর্থাৎ 'তাসের দেশ' আর কী! ওখানে প্রত্যেকটি ছেলেকে সবচেয়ে নিচের ক্লাস থেকেই ইংরেজী শেখানো হতো। গুরুদেবের থিওরি যাই হোক। থিওরিতে ও প্র্যাকটিসে গরমিল শান্তি-নিকেতনেও দেখব প্রত্যাশা করিনি। আমার মোহভঙ্গ হয়। ওদিকে পুণ্যও আমাকে গুরুদেবের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সময় দেয় না। ফল পাড়বার জন্যে গাছে ঢিল ছোঁড়ে আর সেই ঢিল পড়ে ওর নিজেরই মাথায়। কলকাতা নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হয়। তারপরে ওকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই কর্মস্থলে। চাকরিটা রাখি। বাড়িতে ইংরেজী শেখাই।

বার্টরান্ড রাসেল স্কুলের পড়া বাড়িতে বসেই শেষ করেন, তারপর সরাসরি কলেজে যান। কী এমন ক্ষতি হয়েছিল তাঁর? আমরাও সেই মহাজনের পন্থায় আস্থাবান ছিলুম। কিন্তু তিনিই তো আবার তাঁর সন্তানদের জন্যে স্কুল স্থাপন করলেন। তা হলে কি আমরাও নতুন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করব? সে বাসনা আমাদের ছিল না। পুত্রের সমবয়সীরা সবাই যাচ্ছে স্কুলে, সবাই ফুটবল ক্রিকেট খেলছে, ডিবেট করছে, অভিনয় করছে, আর সে বেচারা একেবারে কুনো। মেলামেশার সাথী নেই। ভবিষ্যতে যারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভার পাবে তাদের কারো সঙ্গে তার চেনাশোনা

হচ্ছে না। স্কুল কি কেবল বিদ্যাস্থান? ইটনের মাঠ তো ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র। আজকের দিনের জীবনসংগ্রামে স্কুল হচ্ছে উদ্যোগপর্ব। স্কুলে না পড়ে বাড়িতে পড়েও মানুষ হওয়া যায়, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়া আরো দশটা দিক আছে যার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে স্কুলজীবনই প্রশস্ত। ধীরে ধীরে আমার মত বদলায়।

আদর্শ স্কুল যখন হাতের কাছে পাচ্ছিনে তখন যেটা পাচ্ছি সেটাই শ্রেয়। আমার নিজের শিক্ষাও তো আদর্শ বিদ্যালয়ে হয়নি। এগারো বছর বয়সে পুণ্যকে ভর্তি করে নেন এক ইংরেজ মিশনারি তাঁর স্কুলে। আমিও বদলী হতে হতে চলি। সেও ট্রানসফার হতে হতে চলে। শেষের দিকে ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ইংরেজীতেও বোধ হয় তাই। কলেজেও ভালো করে। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে যায়। কাজেই আমাদের ঘরোয়া এক্সপেরিমেন্টটা ব্যর্থ হয়নি। আমরা ওকে বাঙালী করতে চেয়েছিলুম। ও বাঙালীই হয়েছে। সাহেব হয়নি। কিন্তু জার্মান ভাষায় লিখেছে থীসিস ও ইংরেজীতে লিখেছে গ্রন্থ।

স্বাধীনতার পরে দেশে উল্টো দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে। তার ফলে ওর ছেলেটি হয়েছে ইংরেজীতে পয়লা নম্বর আর হিন্দীতে দোসরা। কিন্তু বাংলায় একেবারে কাঁচা। যদিও বাংলাই ওর মাতৃভাষা। একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আমার অন্যান্য পুত্রকন্যার সন্তানদের বেলাও। ওরা নিজেরা যে সুযোগ আমার দোষে পায়নি সে সুযোগ দিচ্ছে ওদের ছেলেমেয়েদের। আমার এক্সপেরিমেন্ট কি কোথাও কেউ অনুসরণ করল? মুখে যিনি যাই বলুন কার্যকালে সেই ইংরেজী। আর তার উপর হিন্দী। এ দুটো ভাষা ভালো করে না শিখলে চাকরির পরিধি সংকীর্ণ।

এখন সংস্কৃতির কথায় আসি। কেবলমাত্র সংস্কৃতির কথা ভেবে কেউ স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে জীবনের ষোল-সতেরোটা বছর কাটাতে যায় না। এত খরচও করে না। মানবজমিন আবাদ করলে সোনা ফলবে, এই বিশ্বাস থেকেই ষোল-সতেরো বছর ধরে চাষ-আবাদ। কাল্টিভেশন। কালচার। সোনা হয়তো সকলের বেলা ফলে না, তবু সংস্কৃতির সোহাগা তো উপজায়। সমাজকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করার ওর চেয়ে উত্তম উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রশ্ন উঠবে, কোন্ সমাজকে? উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজই কি সমগ্র সমাজ? কৃষক শ্রমিক কারিগরদের ঘরের ক'জনকে তোমরা ষোল সতেরো বছর ধরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারো? ওভাবে শতকরা ক'জনের মানব জমিন আবাদ হতে পারে? তাতে সোনা ফলতে পারে? সোনা যদি-বা না ফলে সোহাগা উপজাতে পারে? একশো বছর সময় পেলেও কি তোমরা দেশের সাধারণ মানুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে সংস্কৃতিমন্ত করতে পারবে? শ্রীমন্ত করা তো দূরের কথা। সংস্কৃতিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ভর করো তবে সে আশা দুরাশা। যদি বিশ্ববিদ্যালয়নিরপেক্ষ করো তা হলে আশা আছে। তা বলে শিক্ষানিরপেক্ষ করলে চলবে না। শিক্ষাই হচ্ছে মনের চাষ আবাদ। কাল্টিভেশন। কালচার।

বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের মাটিতে রোপণ করার সময় ওদেশের মতো এদেশেরও সুধীজনের ধারণা ছিল যে, উচ্চতর পদের জন্যে চাই উচ্চতর শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তাদের জন্যেই উচ্চতর পদ। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাস এই কথাই বলে যে, চার্চের তথা রাষ্ট্রের উচ্চতর পদগুলির জন্যে যোগ্যতা যাচাই করার নিরপেক্ষ উপায় হচ্ছে পরীক্ষা ও ডিগ্রী। পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকলে তো নিরপেক্ষতা থাকে না। সরষের থেকে ভূতকে দূরে রাখার খ্যাতি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশবিদেশে সমাদর পেতো। বহুদূর

থেকে বহু বিদ্যার্থী আসত তাদের আকর্ষণে। ফিরে গিয়ে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে চাকরিও পেতো স্বদেশে। এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হয় তখন পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকে না। তাই ডিগ্রীর জোরে এক প্রদেশের গ্র্যাজুয়েট অপর প্রদেশে চাকরি পায়। সম্মান পায়। তখনকার দিনের সেই ঐতিহ্য কি আর আছে! রাখতে কি পেরেছি আমরা! তাই উচ্চতর পদের জন্যে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনই অনেকে উড়িয়ে দিতে চান। তার জন্যে ডিগ্রী না হলেও নাকি চলে। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তারাই কেবল উচ্চতর পদের জন্যে যোগ্য বিবেচিত হবে এ ধারণাও ক্রমে লোপ পেতে চলেছে। সব কিছু সকলের জন্যে সুলভ করলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। শাসনের পক্ষেও মারাত্মক।

ইউরোপের মাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হলো কী করে আর কেন? রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অধ্যয়ন অধ্যাপনার দায়দায়িত্ব রোমান ক্যাথলিক চার্চের উপরে অর্সায়। চার্চের কাছে তার নিজস্ব বিদ্যার বাইরে আর সব কিছুই পেগান। রোমান আইন বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাতে হলে পেগানদের ডাকতে হয়। সবাইকে খ্রীস্টান করাই যাঁদের উপরে মহামান্য পোপের নির্দেশ তাঁরা পেগানদের সহ্য করতে পারেন না। নিজেরাও পেগান বিদ্যা শিখতে বা শেখাতে পারেন না। অথচ তার চাহিদা একটা ছিলই। চাহিদা ছিল ল্যাটিন সাহিত্যের ক্লাসিকসের। গ্রীক সাহিত্যের ক্লাসিকসের। সংস্কৃতিকে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বে বা স্মৃতিশাস্ত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় ছেদ পড়ে যায়। সংস্কৃতির নায়ক শাস্ত্রী মহাশয়রা হতে পারেন না। তার জন্যে চাই কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, চিত্রকর। তার জন্যে চাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, স্থপতি, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক। চার্চের কর্তারা না পারেন এঁদের স্থান পূরণ করতে, না পারেন এসব বিদ্যাকে নির্বাসিত করতে।

বেশ কয়েক শতাব্দীর অব্যবস্থার পর দেখা গেল গ্রীক ভাষায় রচিত চিকিৎসাগ্রন্থ চেয়ে পাঠিয়েছেন বাগদাদের খলিফা। তাঁর আনুকূল্যে সেগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করেন সীরিয়ান খ্রীস্টান পণ্ডিতরা। আরবরা সেসব তর্জমা করা বই নিয়ে যায় ইউরোপে। সেখানে আরো এক দফা তর্জমা হয়—ল্যাটিন ভাষায়। পড়ানোর জন্যে ডাক পড়ে ইহুদীদের। এমনি করে পত্তন হয় সালের্নোতে এক চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ। পরে আইনের বিদ্যাপীঠ পত্তন হয় বোলোন্যায় ও প্যারিসে। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ল্যাটিন ভাষার ক্লাসিকস। বিদ্যাপীঠের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। পড়ানো হয় অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, লজিক ইত্যাদি বিষয়। আরো পরে থিওলজির থেকে স্বতন্ত্র করে ফিলসফি। বলা বাহুল্য থিওলজি শিক্ষার ব্যবস্থা বরাবরই ছিল। চার্চের অধীনে চাকরি পেতে হলে থিওলজি তো পড়তে হতোই, তার সঙ্গে খ্রীস্টীয় বিধিবিধান। বিজ্ঞান আসে আরো পরে। আর তাই নিয়ে কত লোকের প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড হয়! তেমনি করে উচ্চশিক্ষিতদের মানসে সংঘটিত হয় এক অদৃশ্য ঘটনা। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। মানবিকবাদে দীক্ষা। রেনেসাঁস।

বিদ্যাপীঠগুলিকে গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি বলা হতো না। কথাটা আসে লাটিন ভাষার 'universitat' থেকে। তার মানে কর্পোরেশন বা কমিউনিটি। আমাদের যেমন কাশী মিথিলা নবদ্বীপে নানা প্রদেশ থেকে বিদ্যার্থীর সমাবেশ হতো তেমনি ওদেরও হতো বোলোন্যায়, পাদুয়ায়, প্যারিসে। স্বদেশী বিদ্যার্থীদের চেয়ে বিদেশী বিদ্যার্থীদের সংখ্যা বহুগুণ। স্থানাভাব হতো, ঢুওয়ালারা চড়া হারে ভাড়া দাবি করত, এমন কোনো প্রথা ছিল না যে গুরুই শিষ্যকে আশ্রয়

দেবেন। তাই ওরা দায়ে ঠেকে সংগঠন করে। সংগঠনের নাম উনিভারসিটাট। অর্থাৎ ছাত্রপরিষদ। বিদেশ থেকে অধ্যাপকরাও আসতেন। তাঁরাও তেমনি সংগঠিত হতেন। বহু স্থলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একই সংগঠন। আবার এমনও দেখা যেত যে একই বিদ্যাপীঠে তিন-চারটি উনিভারসিটাট। একটা হয়তো ফরাসীদের, আর একটা হয়তো জার্মানদের, আর একটা হয়তো ইংরেজদের, আরও একটা হয়তো প্রোভাঁস অঞ্চলবাসীদের। প্রোভাঁস তখন ফ্রান্সের অঙ্গ নয়। যতগুলো 'নেশন' ততগুলো উনিভারসিটাট। পরে ওই একই শব্দের অর্থান্তর ঘটে। গোটা বিদ্যাপীঠটাকেই বলা হয় ইউনিভার্সিটি।

ওদিকে দেশী বিদেশী শিক্ষক মহাশয়রা একজোট হয়ে পত্তন করেন 'collegia' নামক সংস্থা। উদ্দেশ্য ডিগ্রী দান। তথা আশ্রয়দান। দরিদ্র ছাত্ররা থাকবে সেখানে। সেখানে থেকে পড়াশুনা করবে। তাদের ব্যয়বহনের জন্যে এনডাউমেন্ট সংগ্রহ করা হয়। তার থেকে এল কলেজ। কলেজমাত্রেই আদিতে ছিল আবাসিক। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে এখনো তাই। আবাসিকরা এখন প্রচুর দক্ষিণা দেয়। সাধারণত বড়লোকের ছেলে। ইদানীং সরকারী ছাত্রবৃত্তি নিয়ে গরিবের ছেলেরাও আবাসিক হচ্ছে। অনাবাসিক কলেজের সূত্রপাত ইংরেজদের দেশে হয় উনবিংশ শতাব্দীর লন্ডনে। তারই অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হয় ডিগ্রীদানের। ডিগ্রীদান যখন ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হয় তখন তার হেতু ছিল এই যে শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা কাজকর্মের সন্ধানে বেরবে তখন তাদের আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে না। ডিগ্রী দেখালেই চার্চ বা রাষ্ট্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করবে যে প্রার্থীরা যথারীতি পরীক্ষা দিয়েছে ও পাশ করেছে। ডিগ্রীর গুরুত্ব যখন এত বেশী তখন ডিগ্রীদানের অধিকার প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠ দাবি করতে পারত না। সেইসব বিদ্যাপীঠকেই পোপ কিংবা সম্রাট কিংবা রাজা সেই অধিকার দিতেন যেসব বিদ্যাপীঠ তাঁদের বিচারে উৎকৃষ্ট। তবে অক্সফোর্ডের মতো অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি বিদ্যাপীঠকে যাজকীয় বা রাজকীয় আদেশপত্র নিতে হয়নি।

এককথায় বলা যেতে পারে যে সেইসব বিদ্যাপীঠই ইউনিভার্সিটি-পদবাচ্য যাদের ডিগ্রী দেখাতে পারলে আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয় না। সেই ডিগ্রীর জোরেই কর্মপ্রাপ্তি সুগম হয়। যদি কর্ম আদৌ খালি থাকে। সেকালেও কর্মের অভাব ছিল যথেষ্ট। চার্চের বা রাষ্ট্রের ঘরে কর্মাভাব, তাই বড়লোকদের ঘরে প্রাইভেট টিউটর হতেন অনেকে। কেউ কেউ হতেন প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাণিজ্য আর সাম্রাজ্য মিলে ইউরোপকে চার শতাব্দী পূর্বে অপ্রত্যাশিত একটা স্টার্ট দেয়। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যায়, অধ্যাপনার বিষয়ও যায় বেড়ে। কাজকর্মও জুটে যায় ডিগ্রীধারী বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর। দেশে না হোক বিদেশে। ডিভিনিটির ডিগ্রী নিয়ে বা না নিয়ে খ্রীস্টীয় প্রচারকরাও আসেন। সরকারের অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন করেন প্রধানত তাঁরাই। তবে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বেলা সরকারই হন অগ্রণী। অতঃপর ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার কাজে হাত দেন বেনারসে মদনমোহন মালবীয়, আলীগড়ে সার সৈয়দ আহমদ খানের অনুসারকগণ, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, পুনায় ধোন্দো কেশব কার্বে। বেনারস ও আলীগড় ডিগ্রী দেয় সরকারের আদেশপত্রের বলে। বিশ্বভারতী তা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে পারে না, পরে ভারত সরকারের আইনের জোরে পারে। কার্বের প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত কি না আমার অজ্ঞাত। মোটের উপর ভারতের সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের দেওয়া ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত।

যতদূর জানি শ্রীরামপুরের খৃীস্টীয় কলেজ ডেনমার্কের রাজার আদেশপত্রের জের টেনে এখনো দিয়ে আসছে তার থিওলজির ছাত্রদের ডিভিনিটির ডিগ্রী। ওরা সরকারী চাকরি চায় না, ওদের কাজকর্ম জোগায় বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান।

টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসার ঐতিহ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্য নয়। ইউরোপীয় ঐতিহ্য যারাই মেনে নিয়েছে তারাই ইউনিভার্সিটির কাছে প্রত্যাশা করে ডিগ্রী আর তাদেরও কাছে ইউনিভার্সিটি প্রত্যাশা করে পরীক্ষা। ওটা যেন অলিখিত একটা চুক্তি। শিক্ষার্থীরা দেবে পরীক্ষা, শিক্ষাগুরুরা দেবেন ডিগ্রী। পরীক্ষা যদি ফাঁকি হয় ডিগ্রীও হবে ফাঁপা। অমন ডিগ্রী দেখে কেউ চাকরি দেবে না। বলবে, আবার পরীক্ষা দাও। অথচ ডিগ্রীর সৃষ্টিই হয়েছিল দ্বিতীয়বার পরীক্ষা এড়াতে। পরীক্ষাই যদি আবার দিতে হলো তবে ডিগ্রীর কী প্রয়োজন? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা আলাদা, সেক্ষেত্রে পদের সংখ্যা পরিমিত, প্রার্থীর সংখ্যা অপরিমিত।

ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা ও ডিগ্রী পাওয়া আজকাল হামেশা ঘটছে। কিন্তু তার বিপরীতটাও সত্য। একজন অতি মেধাবী ছাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বা অন্য কোনো কারণে পরীক্ষায় ফেল করে বা খারাপ করে। বেচারার কেরিয়ারটাই ব্যর্থ। তা বলে তো সে বিদ্যার দিক থেকে কাঁচা নয়। সংস্কৃতির দিক থেকেও খাটো নয়। মনের জমিনের যে চাষ-আবাদটা সে করেছে সেটার ফসল থেকে কি কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে? কালচার হচ্ছে নিজেই নিজের পুরস্কার। এই কথাটিই সার কথা যে, অধ্যয়নটাই আসল, ডিগ্রীটা তার সুদ। আসলটা হারায় না, সুদটা হয়তো হারায়।

কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে উচ্চপদের সংখ্যা এখন ইংরেজ আমলের চাইতে অনেক বেশী। তার সঙ্গে তাল রেখে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও সমান বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেবে একথা আর ভাবাই যায় না। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন যে সমাজবিপ্লবের পরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও বিলুপ্ত হবে। তেমন দিন যদি কখনো আসে তখনো দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় আবার ঘুরে ফিরে আসবে। কারণ উচ্চপদও আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে। কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে। এই নিয়েই তো চীনদেশে এমন তীব্র মতভেদ। এর নাম রেখেছে ওরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সত্যি কি তাই?

ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীটাকে উৎসন্ন করতে পারো, জমিদার শ্রেণীটাকে উচ্ছেদ করতে পারো, কিন্তু তোমাদের কলকারখানা ব্যাঙ্ক ট্রেজারি চাষের জমি বাসের জমি ও জাতীয় সম্পত্তি ম্যানেজ করবে কারা? তার জন্যে যে চাই একটি ম্যানেজার । সেইজন্যে রুশ বিপ্লবকে বলা হয়ে থাকে ম্যানেজারিয়েল রেভোলিউশন। এই যে নতুন ম্যানেজার শ্রেণী এর খাঁই বড়ো কম নয়। যাতে এরা লোভে পড়ে অসৎ না হয় তার জন্যে এদের মজুরি সাধারণ মজুরের তুলনায় বহুগুণ। তা ছাড়া এদের দক্ষতারও মূল্য আছে। একজন জেট বিমানচালক তো একজন বাসচালকের চেয়ে বেশী ঝুঁকি নেয়, বেশী সাহস দেখায়, বেশী কৌশলী হয়। মুড়িমিছরির একদর হলে জেট বিমান চালাতে কেই বা রাজী হবে? গায়ের জোরে রাজী করানো কি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব? এমনি করে উৎপত্তি হয় নতুন একটা উচ্চতর শ্রেণীর। তখন তার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা আবশ্যক হয়। তার উত্তরে যদি প্রতিবিপ্লব ঘটে তখন? সমাজতন্ত্রের দুর্ভাগ্য হচ্ছে ব্যুরোক্রাসির সর্বব্যাপী প্রসার। কিন্তু ব্যুরোক্রাটদের মধ্যেও গুণকর্মবিভাগ অনুসারে বিত্তবৈষম্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করাই কি এর

সমাধান ?

উচ্চতর শিক্ষা, উচ্চতর সংস্কৃতি, উচ্চতর পদ, উচ্চতর বিত্ত, উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা, উচ্চতর আর্থিক ক্ষমতা, উচ্চতর রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চতর জীবনদর্শন আদিকাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পরনির্ভর। যখনি এদের একটিকে ছিন্ন করা হয় তখনি আর একটির অঙ্গে লাগে। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকা যায় না। সেটা যেদিক থেকেই আসুক না কেন ফলভোগ করতে হবে সাহিত্যকেও। যা নিয়ে আমি আছি। শিক্ষা নিয়ে আমার কথা বলার অধিকার এই সূত্রে। নতুবা আমি শিক্ষকও নই, শিক্ষার্থীও নই, শিক্ষা-অধিকর্তাও নই, বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ বা পরিষদের সদস্যও নই। মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে, তাই দু-এক কথা বলতে হয়।

সমাজের ন্যায়সম্মত পুনর্বিন্যাস নিয়ে যাঁরা চিন্তাকুল আমিও তাঁদের একজন। যারা নিচে পড়ে আছে তাদের উপরে তুলতেই হবে। যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের সামনে টেনে আনতেই হবে। যারা ক্রীতদাস না হলেও মজুরিদাস তাদের মুক্তি দিতেই হবে। স্লেভারি রহিত হয়েছে, ওয়েজ স্লেভারি আরো বেড়ে গেছে। একালের মানুষ এক হিসাবে সেকালের মানুষের চাইতেও অধম, কেননা এরা যুদ্ধকালে কনসক্রিপ্ট হয়। শান্তিকালেও রেহাই পায় না। এটা ক্যাপিটালিস্ট তথা কমিউনিস্ট উভয় সমাজেই সমান সত্য। এ প্রথা রহিত না হলে লিবার্টির অভিমান বৃথা। আর ইকোয়ালিটি বলতে যারা অজ্ঞান তাদের সমাজে পার্টি মেম্বর ও পার্টি মেম্বর নয় এই দুই ভাগে বিভক্ত নাগরিক কি সমদৃষ্টির অধিকারী? ক্লার্জি এখন পার্টি সেজে ফিরে এসেছে।

শিক্ষাঘটিত ব্যাপারে আমার বিচার জাতীয়তাবাদীর মতো নয়। দেশ নয়, যুগই আমার বিবেচনায় মুখ্য। এ যুগের মুখ্য স্রোতটা পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। সেইজন্যে আমার তরুণ বয়সের ধ্যান ছিল যেমন করে হোক একবার পশ্চিমের মুখ্য স্রোতে অবগাহন করে আসতে হবে। একই ধ্যান আজকের দিনের তরুণবয়সীদেরও। প্রথম সুযোগেই তারা পশ্চিমযাত্রা করে। তাদের আটক করার জন্যে কি কম চেষ্টা হয়? সমুদ্রযাত্রা সেকালে সোজাসুজি নিষিদ্ধ ছিল। একালে প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ। এসব না করে আমাদের নেতারা মুখ্য স্রোতটাকে আবার প্রাচ্যদেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে উদ্যোগী হোন। যেমনটি ছিল মৌর্য ও গুপ্ত যুগে। রিভাইভাল আর সম্ভব নয়, কিন্তু রেনেসাঁস সম্ভব। এর খানিকটে হয়ে রয়েছে বহিরাগত শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে। কিন্তু এমন ঘুণ ধরেছে এতে যে এর মূলোচ্ছেদ না করে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। রিয়ালিটির সঙ্গে নতুন করে মন মিলিয়ে নিতে হবে। আর চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়।

আবহমানকাল

অসীম রায়

সেদিন ভিড় ঠেলে বোঝা কাঁধে বাড়ি ফেরার পর আরও তিন মাস কেটে যায়। ইতিমধ্যে টুটুলের সঙ্গে মাধব ব্যানার্জীর বেশ নাটক জমে ফোনে। ফোন করলেই মিষ্টভাষী মাধব ব্যানার্জী বলতে থাকেন টুটুলের লেখা সম্পর্কে তাঁর অসীম আগ্রহ কিন্তু তিনি পাটনা যাচ্ছেন অথবা বোম্বাই যাচ্ছেন। তিন মাস পর তিনি বললেন যে, লেখাটা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এখনও অম্লান কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা ফার্স্ট ক্লাস লেখকদের কাজ টেক-আপ করেছেন। তবু তিনি চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে আর-এক ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন। ইতিমধ্যে শনিবারে তাঁদের বোর্ড মিটিং হবার আগেই যদি লেখাটা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে ভালো হয়।

এবার বর্ষার জল ঠেলে টুটুলের বাস কলেজ স্ট্রীটে থামে। সকাল থেকে মোটা ধারায় বৃষ্টি। বাস থামতেই ছাতের কানা থেকে ছর ছর করে জল পড়ে, টুটুল ও আর দু-তিনজন যাত্রীর গা ভিজে যায়। টুটুলের ব্যাগও ভেজে। আকাশে মেঘের বাজনা বাজে। বেশ ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া বয়।

টুটুল যখন থলি থেকে তার দিস্তা দিস্তা কাগজের বাণ্ডিল বার করতে থাকে তখন আতঙ্কে মাধব ব্যানার্জীর চোখ ঠিকরে বেরোয়।

—এ কী, এ কী করেছেন? প্রায় আর্তনাদ করেন। আমি ভেবেছিলাম—আপনি কি রসিকতা করছেন নাকি মশাই?

টেবিলের ওপর উপুড়-করা দু-তিন বছরের কাজের ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে টুটুল বলে, —উপন্যাস তো এই রকমই হয়। তাই না?

—আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন প্র্যাকটিকাল লোক। অচিন্ত্যের ভাই। আপনি কি ভাবছেন না আমাদের এগুলো পড়তে হবে? তবে?

দিস্তাগুলো আবার গুটোতে থাকে টুটুল। তাকে দেখায় ঠিক এক রিফিউজি হকারের মতো। একবার নিজের মনে মনে বললে,—তাহলে আপনারা ছাপবেন না?

—ইমপসিবল। আপনার এত বড় বইয়ের কত ইনভেস্টমেন্ট জানেন? জানেন না তো? না জেনেই সোজা নিয়ে এলেন! পাঠক আপনাকে চেনে? আগে এই সব পপুলার কাগজপত্তরে লিখুন। নাম-ডাক হোক। তারপর দেখা যাবে।

থলিতে বাণ্ডিলগুলো ভরার পর টুটুল উঠে দাঁড়ালে মাধব ব্যানার্জীর বোধহয় একটু মায়া হয়। পাঁচ-সাতজন বাঙালী লেখক তাঁদের কম্পানি বিল্ড করেছে, তাদের নাম এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে। চোঙার ভাই বলেই তিনি অনিন্দ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। হয়ত অনিন্দ্য বাংলাদেশের ষষ্ঠ লেখকরূপে দাঁড়িয়েও যেতে পারে এরকম আশা হয়েছিল। টুটুলের দিকে চেয়ে বললেন, —আচ্ছা, আপনার কি ধারণা আমরা ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ি?

—পড়েন না?—টুটুল অবাক হয়ে বললে।

—এত গণ্ডায় গণ্ডায় তরুণ লেখক গজাচ্ছে। লেখা পড়তে গেলে তো আমরা পাগল হয়ে যাব মশাই। আমাদের তাই অনেকটা হাঞ্চের ওপর চলতে হয়। কোন্‌টা খাবে সেটা বুঝতে হয়।

বেশীর ভাগ সময়ই দেখি আমাদের আন্দাজ ঠিক।

কাপড়ের ঝুলিটা পিঠে তুলে নিয়ে টুটুল বললে,—আপনি ঠিক আমার দাদার মতো বলছেন। কোন্‌টা কাগজে খাবে কোন্‌টা খাবে না।

—একজ্যাকট্‌লি, দুটোই এক ব্যাপার।

বাইরে আসতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। টুটুল তাড়াতাড়ি একটা চায়ের দোকানে ঢোকে। দোকানে দোকানে ছাত্র-ছাত্রীর দল ঠাসা। টুটুল অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে চা খায়। বাইরে যখন বেরোয় তখন বৃষ্টি ধরে গেছে। অন্ধকার নামছে, আকাশে তারা ফুটছে। ইউনিভার্সিটির সামনে কয়েকটা পুলিশের ট্রাক। একটু দূরেই রাস্তা ইঁটের টুকরোয় লাল। দুপুর বেলার দিকে ছাত্র-পুলিশ এক কিস্তি লড়াই হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কিস্তি যে কোনো সময় হতে পারে। ট্রাম নেই। ভিড়ে টলমল প্রাইভেট বাসগুলো সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যায়। টুটুল হাঁটতে হাঁটতে মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে ঢোকে। অ্যামবুলেন্স থেকে মারাত্মক জখমের কেস নামে স্ট্রেচারে। টুটুল ভিড়ের মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা চেনা মুখ ভেসে ওঠে। লিলির বন্ধু প্রবীর না? টুটুল কাট মারবার তাল করছিল। প্রবীরই ডাকে,—কী মশাই, পালাচ্ছেন কোথায়?

—লিলি?

—জানি না, ক্যান্টিনে দেখতে পারেন।

ক্যান্টিনে লিলি নেই। কিন্তু পেছন ফিরতেই টুটুল একেবারে লিলির মুখোমুখি।

—বাঃ, আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিই নি।

—আমি কিন্তু ভাবছিলাম।

—কী ভাবছিলেন? খুব আনরিলায়েবল টাইপ, না?

নিস্তব্ধ টুটুলের কাছে এসে লিলি বলে,—এ কয়েক মাসে বয়সটা অনেক বেড়ে গেল।

—আমারও।

—আপনার কী হল? বুড়ী-দি বম্বে যাবার পর কিছু জানি না। অবশ্য আমারই দোষ, আমার গোঁতোমি। আমার কী ভাল লাগে, আসলে সেইটাই বুঝি না। যা ভাল লাগে না তার পেছনেই দৌড়ই।

তারা আবার হাঁটতে হাঁটতে ভেজা মাঠটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—বসে পড়া যাক, বলে ভেজা ঘাসেই বসে পড়ে টুটুল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে পাশে বিছিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ ব্যাগটার দিকে নজর পড়ায় লিলি বলে,—আপনি সেই বোঝাটা আজকেও বইছেন? নিশ্চয় কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি যা কেউ ছাপবে না?

—ঠিক, কী করে বুঝলেন? তারপর কয়েকটা কচি ঘাস ছিঁড়ে পাশে রাখা লিলির হাতখানায় বোলাতে বোলাতে বললে,—ওসব আপনি-টাপনি ছেড়ে দাও লিলি। তোমাকে খুব আপনার লাগছে আর ভয়ও লাগছে।

লিলি অবাক হয়ে চাইলে। টুটুল বললে,—হ্যাঁ ভয় লাগছে, কারণ আমরা আবার একটা ভালবাসার মেক-বিলিভ তৈরী করব। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই ভাবব নিজেদের ঠকাচ্ছি।

লিলি তার হাত দুটো দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে টুটুলের কথা শুনছিল। মুখ তুলে বললে, —তোমাকে একটা কথা বলব? তুমি এত অভ্রান্ত হতে চাও কেন? আর সবাই ভুল করতে পারে,

তুমি ভুল করতে পার না?

লিলির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে টুটুল বলে,—ঐটা আমার দোষ লিলি। ওটা আমি কাটিয়ে উঠতে চাই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে করুণা করছো না তো? প্লিজ্ লিলি, আমাকে দয়া দেখিও না।

—উঃ, তোমার সঙ্গে কিন্তু আমি খুব ঝগড়া করব। আমি চেঁচামেচি করতে খুব ভালবাসি। তুমি কিন্তু মাস্টারমশাই হবে না, প্লিজ। ছেলেবেলা থেকে গাদা-গাদা উপদেশ শুনছি। আর শুনতে পারছি না।

লিলি হেসে উঠল। তারা এতক্ষণ নিজেদের কথায় এত ব্যস্ত ছিল, এমনভাবে নিজেদের তন্ময়ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছিল যে, গেটের বাইরে যে ছাত্র-পুলিশের লড়াই ঘনিয়ে আসছে সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। এবার কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার আওয়াজ আসে।

লিলি সেদিকে ফিরে তাকাতেই টুটুল বললে,—কিছু না। টিয়ার গ্যাস।

লিলি বললে পাশে রাখা কাপড়ের ব্যাগটার দিকে চেয়ে, তুমি এত শত কী লেখো?

—এই যা চারপাশে ঘটে।

লিলি হেসে বললে,—র-লাইফ?

এবার বোমার আওয়াজ আসে। টুটুল বললে,—ঠিক তা নয়। যা ঘটছে তাকে সাজিয়ে লেখা নয়। আমি তার থেকেও আর একটু বেশী বলতে চাই। এই ধরো, একদিকে এই বোমা-লাঠি-গুলি, পুলিশের সঙ্গে লড়াই, আর একদিকে ছেলেরা বয়ে যাচ্ছে, গুণ্ডা হচ্ছে, এর মাঝখানে মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করছে, পথ খুঁজছে,—এই সবগুলো নিয়ে একটা রূপকথা লিখতে চাই। বাংলাদেশ নিয়ে এক নতুন রূপকথা। বিশ্বাস করো, আমার কোনো উদ্ভাবনী শক্তি নেই। আমি বানাতে পারি না। আমি শুধু নিজেকে ওলোটপালট করে দেখতে চাই।

আবার বোমার আওয়াজ আসে। হাসপাতালের ভেতরের রাস্তাও নির্জন হয়ে পড়ে।

—প্রবীরের সঙ্গে...টুটুলের গলার আওয়াজ বেরোয় না।

লিলি ছলছল করে হেসে ওঠে।—আমি জানতাম, তুমি জিজ্ঞেস করবে। প্রবীর ঠিক তোমার উল্টো। তারপর হঠাৎ টুটুলের চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বললে,—তোমারও কি সব কিছু আনকোরা পাবার বাই?

টুটুল আস্তে আস্তে বললে,—আমি আর কিছু চাই না। তুমি আমার পাশে থাকো।

দোতলা বাস থেকে যখন তারা গড়িয়াহাট মোড়ে নামে তখন রাত প্রায় দশটা।

—এখন তো আবার ফিরতে হবে তোমাকে? লিলি বললে।

—আমি তো এখন যাদবপুর যাব।

—তার মানে?

—কেন? বুড়ী বলেনি?

লিলি বললে,—সেই যে তোমাদের বাড়ি একদিন গিয়েছিলাম তারপর তোমাদের বাড়ি যেতে বুড়ীদি বারণ করে দিয়েছে। বম্বে যাবার আগেও কিছু বলেনি।

—ও বাড়িটা হয়ে গেছে। মা-বড়দার বাড়ি—পার্ক সার্কাস, চোঙা চৌকিও, বুড়ী বোম্বাই, আমি যাদবপুর।

—আবার কবে দেখা হবে?

—যেদিন বলো, টুটুল বললে।

—যারা বসে যায় তাদের মধ্যে একদল স্রেফ বসে যায়। চাকরি-বাকরি করে, সংসার করে, ইন্সিওরেন্সে মোটা প্রিমিয়াম দেয়। আর একদল হয় বদমাইশ। তারা যেমন মজুর পেটাতে পারে তেমন কেউ পারে না।

—যেমন নন্দবাবু, অধীর বলে কালো ঢ্যাঙা তরুণ উৎসাহী কর্মীটি বলে ওঠে।

পটল বোস অধীরের দিকে ফেরেন। চাঁদিভর্তি টাক, বেঁটে, বছর পঁয়তাল্লিশ, স্থানীয় পার্টি সেক্রেটারি এমন এক ধরনের নেতা যাঁর কাছে সমস্ত অঞ্চল নখদর্পণে। সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফেরেন। একটু হেসে অধীরের দিকে চেয়ে বলেন,—ঠিক বলেছেন, নন্দবাবু। রিফিউজি নেতা। জেলে বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে সামনের সব ক'টা দাঁত ভাঙা।

—এত টাকা কি করে করলে নন্দবাবু মাত্র এই ক'বছরে? সুধীর আবার ফস্ করে বলে ওঠে।

—স্ক্রু, রেলের স্ক্রু। ছ'আনার মাল আড়াই টাকায় বিক্রি করে।

—লোকটা শয়তান! আমাকে সেদিন কী বলেছিল পটলদা জানেন? বলছিল ওর ফ্যাক্টরিতে কোনোদিন স্ট্রাইক হবে না। মজুরকে কেমনভাবে ধোঁকা দিতে হয় তার মতো কেউ জানে না। আবার শালা পার্টি ফান্ডে টাকাও দেয়!

পটল বোস ভুরু কুঁচকে বলেন,—আমরা তো সাধু-সন্ন্যাসী নই অধীর। আমাদের সব লোককে নিয়েই কারবার। পয়সা দেয় বলেই তো আমরা তার কাছে বাঁধা নেই। আমরা সব খবর রাখি কে কী করছে না করছে। কে ফরেন এমব্যাসিতে হাঁটাহাঁটি করছে সে খবরও রাখি।

—আপনি পটলদা একজনের নাম করলেন না, সরকারী কর্মচারী মানিক বললে।—অনিন্দ্য বাবুকে আমরা কী চোখে দেখব? আমাদের লোক না আমাদের এনিমি? লোকটা আজকাল বাগান করে, ছেলে নিয়ে বেড়ায়।

পটল বোস ভুরু কুঁচকে বললেন,—অনিন্দ্য তো বসে গেছে।

—সে তো জানি। কিন্তু শুনি সে নাকি উপন্যাস-টুপন্যাস লেখে। অবশ্য আমি পড়িনি। কে একজন বলছিল।

পটল বোস যেন এক অপরিচিত সমস্যার মধ্যে পড়ে যান। বলেন,—ওসব সাহিত্য-শিল্প আমি বুঝি না। ওগুলো বিপ্লবের পরে দেখা যাবে।

মানিক বললে,—এক্‌জ্যাক্টলি, আমিও তাই বলি।

—আমি অবশ্য একটু অন্যরকম চিন্তা করি। সাহিত্য ইজ এ ওয়েপন। যেমন মায়াকভস্কি। আমাদের দেশে সুকান্ত ভট্‌চাজ।

মানিক বললে,—ওসব কবিতা দিয়ে বিপ্লব হয় না। বাংলাদেশের লোক এত ভূরি ভূরি লেখে যে, কবিতা দিয়ে বিপ্লব হলে অনেক আগেই হয়ে যেত।

—ন্যানার সঙ্গে দেখা হয়? পটল বোস প্রসঙ্গান্তরে যান।

ন্যানার কথায় এই গ্রুপ মিটিংয়ে হঠাৎ থমথমে ভাব হয়। ন্যানা ওয়াগন ভাঙার নেতা। বাঁ হাতে দশঘোড়া আমেরিকান পিস্তল চালায়। কয়েকটা কলোনির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তার রাজত্ব অবিসংবাদিত।

অধীর ঝপ্ করে বললে,—সেদিন ন্যানা আমাদের পাড়ায় এসেছিল। আমি সোজা মুখের

ওপরে বলে দিয়েছি ও যদি আবার আসে ওর হাত ভেঙে দেব।

পটল বোস অস্থিরভাবে বললেন,—তোমরা কবে থেকে গান্ধী মহারাজের চেলা বনে গেলে?

—তার মানে? অধীর প্রশ্ন করে।

পটল বোস স্থির গলায় বললেন,—আমার সঙ্গে ন্যানার কথা হয়েছে। আমি বলেছি আমরাও ওকে ঘাঁটাব না, ও-ও আমাদের ঘাঁটাবে না। ন্যানার সঙ্গে টার্মসে আসতে হবে।

অধীর চেঁচিয়ে উঠল,—অসম্ভব! আপনি জানেন না কমরেড আমাদের পাড়ায় ও কী করেছে! দেড় মাসে তিনটে মার্ডার। একটা মেয়েকে স্রেফ ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছে। পুলিশ কিছু বলেনি। পুলিশ ওকে যমের মতো ভয় পায়।

—সেই জন্যেই তো বলছি টার্মসে আসতে হবে। খাদ্য আন্দোলনের কথা মনে আছে? কলকাতার বুকের ওপর সত্তর-আশিটা লোক খুন করল পুলিশ। এখন আর সেদিন নেই। এ দশক মুক্তির দশক। এখন রাইফেলের সামনে বোমা। বোমা কে ছুঁড়বে? সাহিত্যিক, কবি? বাইরের অর্গানাইজেশানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব সময় আন্ডার গ্রাউন্ড অর্গানাইজেশান চালিয়ে যেতে হবে। এ অর্গানাইজেশানে এমন লোক চাই যারা যে কোনো সিচ্যুয়েশান মোকাবিলা করতে পারে।

এতক্ষণ যে লোকটা চুপ করে ছিল সে বললে,—খাল কেটে কুমির আনছেন কমরেড?

পটল বোস হাসেন। অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে শান্ত সমাহিত তাঁর মুখখানা।—এসব ভাবের কথা বলবেন না, পলিটিক্যাল কথা বলুন।

—আমাদের প্রতিপক্ষরা গুণ্ডার সর্দার পোষে, শ্রমিক বস্তিতে হামলা করায়, দরকার হলে পিটিয়ে মারে। ভোটের সময় জাল ভোটের ব্যবস্থা করে। আমরা কি ঠিক সেই পথই ধরব? তাহলে সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের কী দাম? বছর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বয়স লোকটার। প্রায় মাকুন্দ মুখে সযত্নে রক্ষিত মঙ্গোলীয় গোঁফ। গলা ও ঘাড়ের টিবি গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে ওঠায় এই গরমেও কম্ফার্টার বাঁধা।

—মাস্টারি করে করে পানু মাথার ঘিলু তোমার পচে গেছে। পটল বোস বিরক্ত হয়ে বললেন, —এসব তাত্ত্বিক কচকচি করলে কিছু কাজ হবে? যে রাস্তায় এগোলে আমাদের পার্টি জোরদার হবে আমরা সেই রাস্তায় এগোব। এসব কচকচি অনেক হয়েছে। সাপের মাথায় লাঠি মেরে সাপ জব্দ করতে হয়। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনেকদিন আমরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছি, হেরেছি। এখন জেতার শ্লোগান দিন কমরেড। লড়াই করে জিততে হবে।

সচরাচর তেতে ওঠেন না পটল বোস কিন্তু যখন ওঠেন তাঁর কথার ওপর কোনো জবাব নেই।

পানুবাবু মাথা নীচু করে বললেন,—লড়াই করেই তো জিততে হবে।

—তবে?

—ন্যানার দল এবার পুজো-চাঁদা আদায়ে নেমেছে। বোধহয় নন্দবাবু এর পেছনে আছে। চাঁদা দেয় নি বলে বম মেরেছে। আমরা কী করব? নাছোড়বান্দা পানুবাবু প্রশ্ন করেন।

—বম আমরাও মারব, কিন্তু বিচার করে। পুজোটা এমন এক ব্যাপার না যেটা ইস্যু করতে হবে। এত বছরের অনাচার, অব্যবস্থা—এ জন্যেই অ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্টসরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানে আমরা কী করব? আমাদের পার্সপেক্টিভ কী হবে। দেখতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে না কি? তা হলে আমরা নিশ্চয় রুখে দাঁড়াব। কিন্তু এইসব পুজো-ব্যাপারে আমরা নেই।

পটল বোস বিড়ি ধরান। স্থানীয় পেন্ট কারখানায় পনেরো-ষোলো দিন গন্ডগোল চলছে বোনাস নিয়ে। সেখানে রাতেই একটা মিটিং আছে। তারপর ছায়ানট সিনেমায় স্ট্রাইক, সেখানেও যাওয়া দরকার। বিড়ি টানতে টানতে দম নেন। ঘামে চ্যাটচেটে মুখখানা মোছেন রুমাল দিয়ে।

ক্লান্তিতে গলা বুজে আসছিল। গলা ঝেড়ে পটল বোস বলেন,—আসল ব্যাপারটা আপনারা নজর দিচ্ছেন না। পাঁচ-ছ বছর আগেও যা অবস্থা ছিল তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন লোকে এগিয়ে আসছে। আমরা নেতৃত্ব দিতে পারছি না। এখন বাজে চিন্তার সময় নেই কমরেডস। আমাদের লক্ষ্য ঠিক, আমাদের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না।

ঘরে পাখা নেই। তক্তাপোশের ওপর লোকগুলো হাতপাখা দিয়ে গুমোট কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে সামান্য হাওয়া দেয়। তাতে অবশ্য ঠিক রাস্তার গায়ে পানায় মজা পুকুরটার পাঁকের চাপা গন্ধে ঘরখানা ভরে যায়। পটল বোস ক্লান্ত গলায় ডাকেন,—রুনু! দশ-বারো বছরের একটা রোগা ফর্সা গেঞ্জিপরা ছেলে বেরিয়ে আসে।—মদনের দোকানে বল আর ছ'টা ভাঁড় চা দিতে।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে লোকগুলো কাজের প্ল্যান করে। পার্টি বাড়ছে, কাজ বাড়ছে, রোজ সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। আর সর্বত্র চরকি-পাক খাচ্ছে এই পাঁচ-ছ'টা লোক। বক্তৃতা দিচ্ছে, তর্ক করে করে মুখের ফেনা তুলছে। আর ঠিক কাজের মাঝখানে এলে তাদের অন্তর্লীন বিরোধ চাপা পড়ে যাচ্ছে। একটা প্রত্যক্ষ নির্দিষ্ট লক্ষ্য আর তার ঝটাপট সমাধান—এই প্রচন্ড কর্মময় বৃত্তে লোক পাক খাচ্ছে আর চারপাশের লোকগুলোকে পাক খাওয়াচ্ছে।

ঠিক এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে রুনু ঢোকে। উত্তেজনায় সে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলে, —বাবা, ন্যানা!

—কোথায়? পটল বোস ভাঁড়টা একটা ফুটো টিনের ডোলে ছুঁড়ে মারেন।

—মদনের দোকানে।

—আমি আসছি, পটল বোস উঠে দাঁড়ান।

অধীর আর মানিক লাফিয়ে উঠল,—আমরাও যাব।

—থামো! বোসো তোমরা। প্রচন্ড ধমকান পটল বোস। আবার মুখ পোঁছেন, তারপর রাস্তায় নামেন। একটু দূরে সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড। কারবাইডের আলোয় কলা বিক্রি করছে একটা লোক। আর একটু দূরে নন্দবাবুর পাঁচিলতোলা বাগান থেকে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ডাক আসে। একটা সাইকেল-রিকশায় এক বৃদ্ধা বোধহয় তাঁর দুই নাতি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। দুটি তরুণ ফিল্মস্টার সুচিত্রা সেনের তারিফ করতে করতে যাচ্ছিল, পটলবাবুকে দেখে চুপ করে যায়। একটা লোক হালকা পায়ে এগিয়ে আসছে। পটল বোস চিনতে পারেন,—অনিন্দ্যবাবু না, কেমন আছেন?

অনিন্দ্যকে বেশ খুশিতে ঝলমলে দেখায়। একমুখ হেসে দাঁড়িয়ে যায়।—আপনি কেমন আছেন পটলদা?

—সাহিত্য-টাহিত্য হচ্ছে বুঝি?

—এই একটু-আধটু, আত্মসচেতনভাবে টুটুল জবাব দেয়।

—চালিয়ে যান, চালিয়ে যান, ভদ্রলোক মদনের দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, টুটুল সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মদনের দোকানে ইলেকট্রিক আলো নেই। দরমার ঘরে একটা খুঁটিতে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের তিন-চারটে বেঞ্চ একেবারে ফাঁকা। শেষের বেঞ্চে তিনটি তরুণ। দু'জনের চোঙা প্যান্ট,

এত রাতেও একজনের চোখে সানগ্লাস। তৃতীয়জন ন্যানা, পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি। বছর আটাশ বয়স। রোগা শরীর। কিন্তু হাতের থাবা চ্যাটালো। বক্সিং-এ প্রাক্তন ব্যান্টাম চ্যাম্পিয়ান।

মদন কালীভক্ত, দাড়ি রাখে। তেলচপচপে ব্যাকব্রাশকরা ঘন কালো চুল। এত রাত্তিরে নতুন করে আলুর চপ ভাজে আর বিড় বিড় করে,—মা তারা!

ন্যানার সঙ্গীটি ঘোড়ার মতো শব্দ করে হেসে ওঠে,—ওসব তারা-ফারা রাখো। ভালো করে ভাজো। ডিম নেই?

মদন সভয়ে বললে,—না।

—নিয়ে এসো।

এমন সময় পটল বোস আসেন। ন্যানা দাঁড়িয়ে উঠে হাত তুলে নমস্কার করে। পটল বোস ন্যানার সামনের বেঞ্চিতে বসে বলে,—একটা মিঠে-কড়া করে চা করো তো মদন।

—হ্যাঁ স্যার, মদন এতক্ষণে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে।

তিনটে লোক গরম আলুর চপ খেতে খেতে মাঝে মাঝে উঃ আঃ আওয়াজ করে। চায়ে চুমুক দিয়ে পটল বোস বলেন,—এদিকে কেন ন্যানা?

—স্যার, পুজোয় এবার চাঁদা উঠছে না একদম।

—সেজন্যে তো তুমি এদিকে আসো নি।

—একটু দেখতে এলাম স্যার। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। সাহাবাবু ডেকেছিল।

পটল বোস যেন এ উত্তর আগে থেকেই জানতেন।—ওখানে একটা গণ্ডগোল চলছে জানো। ওখানে তুমি আসবে না।

অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে হাসতে গিয়ে। তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো ঝলকায় পেট্রোম্যাক্সের আলোয়।—আমাদেরও তো স্যার বেঁচেবর্তে থাকতে হবে।

—ওখানে আমাদের গায়ে হাত দেবে না, তোমাদের গায়ে আমরা হাত দেব না। বুঝেছো?

ন্যানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—আচ্ছা।

পটলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাই তোলেন। এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলেন,—ব্যাঙ্ক রবারির দুটো মার্ডার কেসের সব ডকুমেন্ট আমার কাছে। গরিব মানুষের রুজি নিয়ে লড়াই চলছে, এখানে যদি আসো আমরা চুপ করে থাকব না।

চাপা রাগে থমথমে দেখায় ন্যানার ছুঁচলো মুখখানা। পাতলা ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চাটে। জবাব দেয় না।

পটল বোস চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—তুমি আবার কবে থেকে মা-কালীর ভক্ত হলে হে? বাড়ি বাড়ি লোক পাঠাচ্ছ চাঁদার জন্যে?

—ওটা স্যার আমাদের সাইড বিজনেস, ন্যানা বললে।

দুই

পেন্ট ফ্যাক্টরির গায়ে আর-একটা সাইকেল-রিকশা স্ট্যান্ড। সামনের অপরিসর রাস্তা দিয়ে অষ্টপ্রহর কালো ডিজেলের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঝুলন্ত যাত্রীদের নিয়ে গোঁ গোঁ করে বেরিয়ে যায় সরকারী বাসগুলো। সার-সার টিনের চালের নীচে উদ্বাস্তুদের দোকান, কাঠের কারখানা, মজা

পুকুর আর তার গায়েই ঝকঝকে নতুন বাড়ির গা দিয়ে বোগেনভিলিয়ার বাহার—ধোঁয়া, ধুলো, মশা আর ঈশ্বরের এক প্রবল রসিকতার মতো বাঁশঝাড়ের মাথায় নির্লিপ্ত নীল আকাশ। বাঁশঝাড়ের গা দিয়েই যে সরু গলি সেটা সোজা গিয়েই বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে একতলা এককালীন মালীদের ঘরে এখন টাইপরাইটিং স্কুল থেকে খটাখট শব্দ আসে. সম্পন্ন বাঙালী মধ্যবিত্ত বাড়ির পাঁচিলের গায়ে ফলঝুমঝুমে পেঁপেগাছ. এ'চড়-আঁটাকাঁঠাল গাছও এক-আধটা চোখে পড়ে। তারপর এক-চিলতে ফাঁকা জমি। দুটো ফুলন্ত সাদা ফুরুশের পেছনে একতলা সাদা-বাড়ির সিঁড়িতে একটা চার বছরের ছেলে সম্প্রতি একটি চালু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা লাইন চীৎকার করে গাইবার চেষ্টা করে, কাঁ কর্ সজনী, কাঁ কর্ সজনী, আয়ে না বালম, আয়ে না বালম। তারপর ব্যাপারটা পছন্দ না হওয়ায় ফুরুশ গাছটার নীচে ধুলোভর্তি গাছটায় হে'চড়ে-মেচড়ে উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটু উ'চু ডাল থেকে পা ফসকে দড়াম করে নীচে পড়ে চে'চাতে থাকে, ওমা, মা আমার কী হল! আমি মরে গিয়েছি।

দরজা খুলে হাসিমুখে লিলি দাঁড়ায়।—পড়ে গেছিস তো, বাঃ!

—আমি মরে গিয়েছি, ছেলেটা শুয়ে শুয়েই বলে।

লিলি ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তার গায়ের ধুলো ঝাড়ে।—কী করে ঝাড়ছো, ভালো করে ঝাড়ো। ছেলে মাকে হুকুম করে। তারপর তার পুরনো প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করে.—বাবা কখন আসবে?

—এই এখনই।

—বাবা কোথায় গেছে?

—বর্ধমান।

—বর্ধমানে অফিস?

—নাঃ, বেড়াতে গেছে।

টাবু মার সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে,—এবার আমি সব ভেঙে ফেলব বলে দিচ্ছি মা। আমি হেভি রেগে গিয়েছি।

লিলি তার ছেলের শব্দব্যবহারে হেসে ওঠে। টাবু বোধহয় পাশের বাড়ির ছেলেটার কাছ থেকে শিখেছে। টাবু আজকাল হেভি লজ্জা পায়, হেভি রেগে যায়।

একেবারে মায়ের চেহারা টাবুর। তবে বড্ড রোগা। ফ্যাকাশে হাতটা মুঠি করে বললে,— বাবা আজকাল খুব মাস্তান হয়ে গেছে, না?

—এরকম বোলো না টাবু। এগুলো বিচ্ছিরি কথা।

—এগুলোই ভালো কথা। তারপর জানলায় দাঁড়িয়ে এক তরুণ সাইকেল আরোহীকে ডাক দেয়,—টুবলু-দা, আমাকে তোমার সাইকেল নিয়ে চল। তরুণটি হাত নাড়িয়ে ইশারা করে চলে যায়।

টাবু ফু'সতে থাকে,—দাঁড়াও না, বাবা ফিরুক—আমি কী করি। ব্যাটাকে আমি...

—আবার!

হঠাৎ জানলায় দাঁড়িয়ে টাবু চে'চাতে থাকে,—ভুটি, ভুটি! পরিষ্কার সাদা একটা নেড়ি কুকুর তাদের গেটের সামনে ল্যাজ নাড়ায়।

মা-র দিকে চেয়ে বলে,—মা, প্লিজ, এক মিনিট! বলেই টাবু হাওয়া।

—রাস্তার কুকুর অতো ঘাঁটিস নে টাবু, লিলি ব্যর্থ চেষ্টা করে ছেলেকে ফেরাতে।

গেট খোলার আওয়াজ আসে। ভুটিকে নিয়ে টাবু হাজির। সঙ্গে সাদা ধবধবে এক মাসের

বাচ্চা। সঙ্গের ছানাটি বাস চাপা পড়েছে। এটাও হারিয়ে গেছিল বলে রিক্সাওয়ালার নাম দিয়েছে —হারানি। টাবু বললে,—মা প্লিজ, বেশী করে পাঁউরুটি দাও। চোখ পাকিয়ে বললে,—যা চার্জ দেয় না মা হারানি। সেদিন অ্যালসেশিয়ানকে চার্জ দিয়েছিল।

—তোর মাথা!

—কী! আমাকে বকছো? টাবু তেড়ে আক্রমণ করল তার মাকে। খোলা চুল ধরে ঝুলে পড়ল।

—টাবু, খুব খারাপ হচ্ছে বলে দিচ্ছি, আজ বাবা আসুক, তারপর দেখা যাবে।

টাবু কিছু বলে না। সে নিঃশব্দে মায়ের চুল ধরে ঝুলতে থাকে।

এমন সময় ভুটি আওয়াজ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে টুটুল ঘরে ঢোকে। শ্রান্তি তার গায়ে-পায়ে কিন্তু মুখ-চোখ খুশিতে জ্বলছে।

—আমি যা ভেবেছি ঠিক তেমনি। অবিকল এক রকম। এদের সংগঠন এমন যেন একটা বিপ্লব ঘটাতে চলেছে।

টুটুল সম্প্রতি তার তৃতীয় উপন্যাস লিখছে। গত পাঁচ-ছ'বছরে তার দুটো উপন্যাস বেরিয়েছে, তা নিয়ে লোকে বেশী মাথা ঘামায় নি। এবারের উপন্যাস চাল পাচার কাহিনী নিয়ে। বছর দুয়েক হল চালের দাম বাড়ায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এক নতুন সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়েছে। সাইকেলে, মাথায়, ট্রেনে, ঠেলায় চাল আসছে কলকাতায়। গ্রামশুদ্ধ মরিয়া মানুষ নেমেছে এই ব্যবসায়। পুলিশের সঙ্গে যত সংঘর্ষ বাড়ছে ততো আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে এই সমস্যা। টুটুলের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা চাল স্মাগলার।

টুটুল ভেজা গেঞ্জি খুলে ফ্যানের নীচে বসে।—আগে যখন লেখা শুরু করেছি তখন খুব বেশী করে দেখতে চেষ্টা করতাম। এখন খুব কম করে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার মনে আছে লিলি বছরখানেক আগে কয়েকবার গিয়েছিলাম বর্ধমান! সারা ট্রেন জুড়ে এই এক ব্যাপার—ছ' বছর বয়স থেকে সত্তর বছরের বুড়ো-বুড়ী, এদেরকে যদি স্মাগলার বলো আমি বলব দেশশুদ্ধ লোক স্মাগলার।

লিলি এতক্ষণ টুটুলকে লক্ষ্য করছিল। টুটুলের এই লেখার জগৎ তার কাছ থেকে অনেক দূরে। তার অনেকটাই সে বোঝে না, খালি এই কথাটা বোঝে যত দিন যাচ্ছে টুটুল একেবারে মাখা-মাখি হয়ে যাচ্ছে তার লেখার সঙ্গে।

এতক্ষণ পর বললে,—আর আমি?

টুটুলের যেন চটকা ভাঙে। হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় লিলিকে কোলে তুলে নেয়।

—অতো হেঁচকা টান মেরো না। হার্টে চোট পড়বে।

—ওরে আমার ডাক্তারনি! বলে টুটুল তাকে জাপ্টে চুমু খায়।

টাবু হঠাৎ জানলায় উঠে চেঁচাতে থাকে,—তোমরা সবাই শোনো! বাবা মা-কে চুমু খাচ্ছে!

—দেখছো কান্ড! টাবু, ওখান থেকে নেমে আয়।

—চোঁচাক! টুটুল লিলিকে গভীর আলিঙ্গন করে।

লিলি টুটুলের চুল টানতে টানতে বলে,—তোমাকে দেখে আমার পচার কথা মনে পড়ে।

—ও বাবাঃ! আর কোনো নাম পেলে না?

—আমি তখন খুব ছোটো। আমাদের মানিকতলা বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে ওরা থাকত।

সবসময় রকে আড্ডা দিত, কিন্তু খুব শাই টাইপ। আরও অনেক বন্ধুর মধ্যে মিশে থাকত। তারপর পুজোর সময় পাড়ার থিয়েটারে "চন্দ্রগুপ্ত" প্লে হোল। পচা-কে আর চেনা যায় না। দারুণ গমগমে গলা পচার, এমনি কথা বললে বোঝা যায় না। চন্দ্রগুপ্তের পার্টে নামত। মাথায় মুকুট, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা. আমরা ছোটরা সবাই পুজোর সময় ওর ভক্ত হয়ে পড়তাম। তুমিও ঠিক তেমনি।

টুটুল প্রতিবাদ করে,—একদম মিলল না। আমি অফিস করি, সংসার করি, তার সঙ্গে সঙ্গে লিখি।

—পচাও একটা চাকরি করত পোর্ট কমিশনে। আমি বলতে চাচ্ছি তুমি যখন লেখো তখন তোমাকে সবচেয়ে ভালো লাগে। তুমি যখন লেখার কথা বলো—

—আমি তো বলি না। লেখার কথা বলতে ভালো লাগে না, আমার লিখতে ভালো লাগে।

বাইরে গরমের বিকেল। হঠাৎ একজোড়া কোকিল বাঁশঝাড় থেকে অতিক্রান্ত বসন্তের জন্যে একসঙ্গে বিলাপ করে উড়ে যায়। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলে পেন্ট ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা যায় মিছিল করে। একটা সবুজ অ্যামবাসাডর এসে দাঁড়ায়।

গামার সঙ্গে বুড়ী নামে। গামা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কিন্তু বুড়ীর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েনি। মাঝখানে সামান্য মোটাচ্ছিল কিন্তু এখন বম্বেতে সামলে গিয়েছে। হাতকাটা সাদা পুঁচকে ব্লাউজ আর কমলাপেড়ে টাঙ্গাইলের শাড়িতে তাকে আরও কমবয়সী লাগে।

লিলি ঘরের মধ্যে থেকেই চেঁচিয়ে উঠল,—বুড়ীদি কবে এলে?

বুড়ীর কিন্তু মুখ ভার, চোখ ছলছলে। ঘরে এসে দেয়ালের এক কোণে রানাঘাটে তোলা তাদের বাল্যকালের একটা ছবির দিকে একনজর চেয়ে থমথমে মুখে বসে থাকে।

—কবে এলি? টুটুল বললে।

—আমরা কাল এসেছি। বম্বে থেকে স্ট্রেট গাড়িতে এসেছি। মানস আবার ট্রান্সফার হয়েছে হেড অফিসে।

লিলি হাততালি দিয়ে বললে,—বাঃ, আমি একলা থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠছিলাম। আমিই তো খালি বকবক করি। আমার বকবকানি শুনতে শুনতে ও মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে।

—অতো থমথমে মুখ করে আছিস কেন?

—আসবার সময় গাড়িটা ঘুরিয়ে আনতে বললাম আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। কথাটা বলতেই চোখে জল এসে যায় বুড়ীর। এতক্ষণে টুটুল নজর করে একটা খুব হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ লাগিয়েছে বুড়ী।

একটু থেমে বললে,—বাবা যেখানে বসতেন নীচের ঘরে ইজিচেয়ারে অবিকল সেইরকম একটা ইজিচেয়ার পাতা। গাড়িটা থামতে দেখি জয়রাম বসে। সামনে ফুটপাতে একটা বিরাট মুলতানি গরু বাঁধা। দারোয়ান ভুষি খাওয়াচ্ছে। আমাকে দেখে বোধহয় চিনতে পারল। কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকাতেই আমি ড্রাইভারকে বললাম স্টার্ট দিতে।

—বাড়ি নিয়ে ভাবিস নে বুড়ী, মানুষ নিয়ে ভাব।

—আমি তো তোর মতো অতো বিজ্ঞ নই টুটুল। বুড়ী রুমাল বার করে চোখ মোছে।

—ভেবে কী লাভ বল? পাবনার বাড়ি গেছে, বালিগঞ্জের বাড়ি গেছে। এ বাড়িও কি থাকবে? থাকবে না।

বুড়ী অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে বললে,—তাহলে কী থাকবে? সব পাল্টে যাবে? পাঁচ বছর পর কলকাতা ফিরে আর কলকাতা মনে হচ্ছে না। এর থেকে আমার বম্বেই ভালো ছিল।

—তুই নিশ্চয় বলছিস না বুড়ী কলকাতাটা ভীষণ নোংরা, চারদিকে চীৎকার চেঁচামেচি।

—তোকে ঠিক আমি বোঝাতে পারছি না টুটুল। কলকাতা বলতেই মনে হয় আমার দোতলার ঘরখানা, মা-র হাঁকডাক, বাবা ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। এখন সে কলকাতাটা ছত্রাকার হয়ে গেছে। আজ ছুটছি পার্কসার্কাস, কাল যাদবপুর।

—এই রকমই হয় রে! টুটুল বলে।

—উঃ কী বিজ্ঞ রে! আচ্ছা লিলি, এই রকম বিজ্ঞ বরকে তুই স্ট্যান্ড করতে পারিস? আমার সঙ্গে তো টুটুলের বরাবর ঝগড়া হয়।

—আমারও হয়। তবে লোকটা খারাপ না, লিলি বললে।

—মানসের খবর কী?

—ওর চাকরিটা খুব ভালো লেগে গেছে, একেবারে চাকরিপাগল। আমার ভালই লাগে। একটা কিছু পাগলামি থাকা ভালো।

কফি খেতে খেতে বুড়ী বলে,—মানস বলছিল কলকাতাটা একদম পাল্টে গেছে। ওদের মানিকতলার পুরনো বাড়িও ভাগ হয়ে গেছে। ওদের ভাইরা সল্টলেকে জমি কিনছে। মানসও কিনবে বলেছে।

—আসল ব্যাপার হল লোকের মেজাজ পাল্টে যাচ্ছে, তাই না? টুটুল বললে।

—কী জানি! বুড়ী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

পরদিন ভোরে লিলি হাসপাতালে গেছে। টাবু ঘুমোচ্ছে। এই সামান্য ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা-দেড়েক অবসর—তার কাজের সময়। বাকিটা সত্যিই পচার রকে আড্ডা দেওয়া। অফিসটার সমস্ত পরিবেশ চীৎকার করে 'না' বলছে। এই 'না' বলার অভ্যাস দারুণভাবে রপ্ত করেছে বাংলাদেশ। অসম্ভব সাংগঠনিক দক্ষতায় তাকে দৈনন্দিন ভাষা দিচ্ছে বাংলাদেশ। আর তার মধ্যে বসে চীৎকার করে যদি বলা যায় তাহলেই কথা শোনা যাবে কিন্তু যে স্বর উচ্চারিত হবার আগে চিন্তিত-ভাবিত সে স্বর বোধহয় অনিবার্যভাবে হারিয়ে যাবে। অথচ এই পরিবর্তনের আবেগে বেপথু বাংলাদেশ আজ এমন আশ্চর্য সজীব বিষয়বস্তু যা বোধহয় কোনোকালেই ছিল না, এমনকি গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেও এ অবস্থা ছিল না। এখানে অনেক বিরক্তির ব্যাপার আছে, অবসাদের ব্যাপার আছে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নামে ড্রেনে রক্তঢালার মর্মান্তিক নাটকীয়তা আছে, এমনকি অবিশ্বাসের দাঁত সবসময় ঝলকাচ্ছে চারপাশে। সবসময় লেখককে দেবদূত অথবা শয়তানের পর্যায়ে ভূষিত করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু কিছু এসে যায় না। গত আট-দশ বছরের লেখার অভিজ্ঞতায় টুটুল একথাটা হাড়ে হাড়ে টের পায়, লেখাটা আসলে দমের ব্যাপার। একটা-দুটো মাস্টারপিস লিখে ধূমকেতুর মতো ছিটকে বেরোনোর ব্যাপার নয়। ক্রমান্বয়ে লিখে যেতে হবে বছরের পর বছর ধরে এক আজীবনব্যাপী দূরপাল্লার দৌড়বীরের মতো। সে কি পারবে? শূন্যে ডান হাতের আঙুলগুলো আলোর দিকে তুলে যেন পরীক্ষা করে টুটুল। তারপর কখন লিখতে লিখতে এই আত্মচিন্তা ভেসে যায়। বর্ধমান স্টেশনের একটু আগে এক ছোটো স্টেশনের কাছে রেল পুলিশের সঙ্গে চাল পাচারকারীদের বর্ণনার মধ্যে ডুবে যায়। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের কয়েকটা মুখ জ্বলজ্বল করে। টুটুলের লেখা ভরা-পালে এগোতে থাকে তরতর করে। খুট করে আওয়াজ হয়। ঘুমচোখে বাপের

কোলে এসে ওঠে টাবু।

—গামাটা হেভি দুষ্টু, জানো বাবা। কী অসভ্য কথা বলে। বলে পোঁদ-পাছা!

—মুখ ধোও। ওখানে একটা লেবু আছে, ছাড়িয়ে খাও।

লেবু খেতে খেতে টাবু বললে,—তুমি আজকে অফিস থেকে আমার জন্যে—তারপর মনে পড়ে না কী বায়না করবে।

—একটা রিভলবার আনবে। আগুন ছিটকায় এমন রিভলবার। গামা বললে ওর আছে। বাপের নিস্তব্ধ মুখের দিকে চেয়ে বলে,—এখন খুব দরকার জানো। চোরদের মারতে খুব দরকার। একবার চোর এসেছিল। তুমি শুনছো?

—তুই বাইরে গিয়ে খেল, আমি আসছি।

—তুমি এসো।

—বলছি না আমি যাচ্ছি।

—ও বাবা! তুমি আজকাল হেভি রাগী হয়ে গেছ!

গত রাত্তিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোমা টেস্টিং হয়েছে পাড়ায়। লিলি আতঙ্কিত বোধ করছিল। আজকাল এ পাড়ায় সপ্তাহে একদিন দুদিন এরকম টেস্টিং চলে। আবার থেমে যায়। বোমা আর ছুরি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করছে। লোকপ্রমুখাৎ সপ্তাহে একটা-দুটো মৃত্যুর খবর আসে।

টাবুকে নিয়ে বাজারে যায় টুটুল। টাবু মাছ পুষবে। সেজন্যে টুটুলের আপত্তি সত্ত্বেও দুটো জ্যান্ত ক্ষুদে ট্যাংরা সযত্নে চেপে ধরে বাপের হাত ধরে ফিরছিল এমন সময় একটা বিরাট গাড়ি তাদের পাশে হঠাৎ ব্রেক কষে।

স্টিয়ারিং-এ চেনামুখ। লোকটার কথা শুনে এসেছে কিন্তু এযাবৎ দেখা হয়নি।

—আপনি অচিন্ত্যর ভাই না? লোকটা বললে।

ভদ্রলোকের আশ্চর্য ঔদ্ধত্যে থতমত খেয়ে যায়। লোকটার সঙ্গে এক সাথে রাজনীতি করেছে এককালে। এখন সে সব ভুলে তার দাদার পরিচয়ে তার একমাত্র পরিচয় দাঁড়িয়েছে।

—অচিন্ত্য ছাড়াও আপনার সঙ্গে আমার একটা পরিচয় ছিল, টুটুল কঠিনভাবে বললে।

—সে সব কথা ছাড়ুন ভাই। তারপর কতো জল গঙ্গার পুল দিয়ে বয়ে গেল। সব চোর, বুঝেছেন! সব ব্লাফ! দেখবেন মশাই, বোমা মারবেন না। বেশ আত্মতৃপ্ত সফল মানুষের গলা নন্দ বোসের।

—আপনি এমন লাফ মারলেন কী করে?

—লাফ? তা যা বলেছেন। যে উপায়ে লোকে মারে—চুরি করে।

টুটুলের কৌতূহলী মুখের দিকে চেয়ে পরম রোয়াবে লোকটি বললে,—সব ব্যাটা চোর!

—বাঃ, আপনি ভালো লাইন নিয়েছেন।

ভদ্রলোক মুখখানা বিকৃত করে বললেন,—আপনার দেখছি আইডিয়ালিজম এখনও কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। আর কদিন যাক। এখন কোথায়? দাদার মতো কাগজে বোধহয়!

—নাঃ, কেরানী। এ জি বেঙ্গলে।

—সে কি মশাই, আমি ভাবলাম অন্তত একটা পাবলিসিটি ফার্মে। যাই হোক আসবেন একদিন। এই রাস্তার মোড়টাতেই লাল বাড়ি। পেতলের নেমপ্লেট আছে। আর এ মিয়াকে এ তল্লাটের সব শালা জানে। চলি স্যার। নন্দ বোসের গাড়ি বেরিয়ে যায়।

চেহারা? টুটুল কোনো জবাব পায় না। মাঝখানে অধীর এসেছিল। তার তারুণ্যের চেহারা অন্য রকম। পেন্ট কারখানার শ্রমিকদের সে নেতা। ন্যানাকে ঠেকিয়েছে। কারখানা থেকে বম্বেগামী ট্রাক আটকে সে চাপ দিয়ে মালিকের কাছে শ্রমিকদের জন্যে পঞ্চাশ টাকা অ্যাড-হক বোনাস পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এসব কথা জানাতে সে আসে নি। সে এসেছিল অনিন্দ্যবাবুকে সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে। অনিন্দ্যবাবু আসলে নন-পলিটিকাল এবং নন-পলিটিকাল মানেই প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার এই কথাটা বলার জন্যে।

—আমি অতো শিল্প-সাহিত্য বুঝি না, বুঝতেও চাই না। আমাদের এখন প্রকাণ্ড বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। একথা আপনি স্বীকার করেন কি করেন না?

—করি। কিন্তু এ বিপ্লব শুধু মিটিংয়ের বিপ্লব নয় কিংবা রাস্তায় নেমে বারবার পুলিশের সঙ্গে ফাটাফাটি করার বিপ্লব নয়। টুটুল জবাব দেয়।

—তবে কিসের বিপ্লব?

—মানুষ পাল্টাচ্ছে সেইটা ধরাই লেখকের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ, সবচেয়ে বড় দায়।

—তার মানে লেখাটা একটা ওয়েপন, তাই তো বলছেন?

—ভালো লেখা মানেই তা ওয়েপন, সাজানো ফুল নয়।

অধীর অস্থিরভাবে বললে,—আপনি বড্ড হেঁয়ালি করছেন। আসলে আপনি প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছেন।

টুটুল শান্তভাবে বললে,—প্রশ্নটা ভুলভাবে করা হচ্ছে বলে।

—তার মানে, আপনি চারপাশের ঘটনাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না?

টুটুল জোর দিয়ে বলে,—চারপাশের ঘটনাকে পাত্তা দিচ্ছি বলেই তো বলছি আমার কাছে চারপাশের চেহারা আরও কমপ্লেক্স। সেখানে আপনাদের পেন্ট ফ্যাক্টরির কর্মীদের জয় যেমন আছে তেমনি আছে ন্যানার অত্যাচার, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে নাচন-কোঁদন। এই সবটাই রিয়ালিটি। আপনার পকেট থেকে রিয়ালিটি বার করে দিলেই তো আমি মেনে নেব না।

—আপনার সম্পর্কে আমার অন্য ধারণা ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অধীর বললে, —আমি ভাবতাম আপনি আমাদের লোক।

—এখন ভাবছেন আমি আপনার শত্রুশিবিরের লোক?

—ঠিক শত্রুশিবিরে নয়, তবে সেদিকে যাবার জন্যে আপনি পা বাড়িয়েছেন।

টুটুল শান্তভাবে বললে,—অনেক সময় দেখার ভুল হয়।

অধীর জোর দিয়ে বললে,—আমাদের হয় না।

চার

প্রত্যেকবার এরকম হয়। নিজেকে মনে হয় একটা সেঁচা পুকুর। কোনদিন যে হাওয়ায় জল ছলছল করত এ পুকুরে বিশ্বাস হয় না। একটা বড় কাজ শেষ হয়ে গেলে একেবারে শূন্যে ফাঁকা ঠেকে। জীবনের সমস্ত আকর্ষণ যেন ঢিলে হয়ে যায়, দিন থেকে রাত্রি আর রাত্রি থেকে দিনের যাত্রার পৌনঃপুনিকতা একেবারে চেপে ধরে পাথরের মতো। তখন টুটুল অস্থির হয়ে ঘোরে। আবার চেনা-অচেনা লোকজনের মাঝখানে তার আবির্ভাব ঘটে। খবরের কাগজের সাধারণ রিপোর্ট

মন দিয়ে পড়ে। ট্রামে-বাসে কান পেতে থাকে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া কথা ধরবার জন্যে। এমনি এক রিক্ততার সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যে কালীপুজোর ঢাক বাজে। সারা রাত্তির বাজি পোড়ে। বাংলাদেশে টাকার কী দাম সেটা বোঝাবার জন্যে কলকাতা আর তার শহরতলীর ছেলেদের ধুম পড়ে। নিওন আলোয় আর বোমার শব্দে সন্ধ্যে কাটে। টুটুলের অফিস ছুটি। টাবুকে নিয়ে গেছে বুড়ী। লিলি বেরিয়েছে কলে, বেশ দূরে ডেলিভারি কেসে। টুটুল পাজামা আর পাঞ্জাবি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখনও পৃথিবীতে বেশ কিছু কিছু গলি আছে যেখানে হল্লা নেই সেই রকম রাস্তার সন্ধানে চলে টুটুল। পেন্ট ফ্যাক্টরির সামনেই লরি সাজানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে অধীরকে এক ঝলক দেখে টুটুল। বিশাল নীলচে কালীমূর্তি লরিতে উঠছে। আরও খানিক দূর গিয়ে আর-একটা লরি। প্রচুর চোঙা-প্যান্ট-পরা ছেলে। এর মধ্যে দু-তিনটেকে দেখে চমকায় টুটুল। ন্যানার দলের লোক বলে মনে হয়। তারপরই একটা নাকপোড়া হিংসির গলি। তার গায়ে বিরাট আঁচড়ে আলকাতরায় লেখা 'শোধনবাদ নিপাত যাক' তারপর বাঁশঝাড়, তার পাশ দিয়ে একটু খোলা জায়গা, কয়েকটা নারকেল গাছে পড়ন্ত বিকেলের রোদ। এবারে আকাশটার এককোনা গাছ আর বাড়ির ফাঁক দিয়ে বেশ দেখা যায়। কমলা রঙ ধরেছে আকাশের কোণে। হাওয়ায় নারকেল গাছগুলো শব্দ করে ওঠে। টুটুল ভাবছিল কী আশ্চর্য পরিবর্তন। কলকাতায় এসে তার কৈশোরকালে সেই একলা একলা লেক পাক দেওয়া, সেই অনেক পুরনো 'গল্পগুচ্ছে'র জগৎটা মাথায় করে হাঁটা। আর আজকের এই শহরতলী যেখানে অতীতের সমস্ত স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে এবং ঠিক এই জন্যেই নতুন স্বপ্ন দেখবার সময়। স্বপ্ন না থাকলে মানুষের জীবন একেবারে অর্থহীন। স্বপ্নকে আনতে হবে রাজনীতিতে ভালবাসায় লেখায়। এক নবীন বসন্তের জাগ্রত শিখার মতো তা সবসময় ঝলমল করবে আমাদের মনের ন্যাড়া মাঠেও। রাজনীতিটা শুধু কতগুলো ঘোড়েল হিসেবী দাদা এবং মুগ্ধ কিশোরের ব্যাপার নয়, সাহিত্যটাও কয়েকজন ছ্যামড়া-ছেমড়ির ব্যাপার নয়। এক কঠিন বাস্তবের ন্যাড়া মাঠে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে হবে। আবার হাওয়া দেয়। পাশে মজা পুকুরটা থেকে পাঁকের গন্ধও আসে। যদি সে না পারে হবে না। কী আছে? লড়াই করে সব সময়ই জেতা যায় না। অনেক সময় হারতেও হয়। সে হারার দলে। আর দরকার হলে সেই হার মেনে নিতে হবে মুখ না বিচাঁড়িয়েও।

টুটুলের রাস্তাটা আবার ঘুরে ঘুরে বাস রাস্তায় পড়েছে। আবার ঝুলন্ত মানুষ খোলা ড্রেন আর দরমার দোকানে পেট্রোম্যাক্সের আলো। কমলা আকাশ কিন্তু নীচে ঘনায়মান অন্ধকার। নন্দ বোসের বাড়ির কাছটায় আসতে না আসতেই একটা হৈ হৈ লেগে যায়। আলোর ত্রিকোণ কাঁধে নিয়ে মিছিল আসছে যতদূর চোখ চলে। সামনে লালবুটি তোলা কালো আঁট ভেলভেটের কুর্তা আর সাদা পেন্টুলুন পরা হলুদ পেল্লাই পাগড়ি মাথায় বাজনদাররা আসে ব্যাগপাইপ আর ফ্লুট বাজাতে বাজাতে। একটা লরির ছাতে পনেরো-ষোল বছরের একটি তরুণ মাথার ওপর থালাভর্তি মোমবাতির আলো নিয়ে সমস্ত শরীরটা পাকিয়ে পাকিয়ে টুইস্ট করে। একপাল ছেলে হাততালি দিয়ে তারিফ করতে থাকে। এমন সময় হঠাৎ সামনের লোকগুলো ছুটে আসে। পেছনে ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা বুড়ী ধাক্কা না সামলাতে পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একঝাঁক ইঁট আসে লরি লক্ষ্য করে। আহত ন'-দশ বছরের একটি ছেলে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। দু-তিনটে বাজনদার হঠাৎ হাউমাউ করে ছুটে আসে। লোহার রডে তাদের মাথা ফেটেছে। চারদিকে দৌড়চ্ছে লোক। কয়েক মুহূর্তে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়। হঠাৎ টুটুলের চোখ পড়ে ট্রাকের ওপর। মা-কালীর মাথা কেটে

নিয়ে গেছে এই গোলমালে। ট্রাকের ওপর কেউ নেই। শূন্যো ট্রাকে নিওন আলোয় দেদীপ্যমান ছিন্নমস্তা কালী।

টুটুল ফেরে। সামনে রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। একশো গজ দূরেই তাদের বাড়ি। অন্ধকার থেকে হঠাৎ দুটি তরুণ উঠে আসে।—ওদিকে যাবেন না স্যার।

—কেন? এদিকে আমার বাড়ি।

—বলছি স্যার আপনার ভালোর জন্যে।

টুটুল কথা না বলে এগোতে থাকে। রাস্তায় আলোর সব ক'টা বাল্ব ভাঙা। ইঁটের টুকরোয় পিচের রাস্তা লাল। তাদের বাড়ির সামনেও দু-তিনটে প্যান্টপরা তরুণের চকিত আনাগোনা। এখনি লড়াই শুরু হবে কথাটা মনে আসতে না আসতেই টুটুল হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। আর ঠিক সেই সময় দুই দলের বম চার্জ শুরু হয়। ধোঁয়া ঠেলে দৌড়ে আসছিল টুটুল। কিন্তু দ্বিতীয় বোমাটায় সে আছড়ে পড়ে।

থানায় সবচেয়ে আগে খবর দেয় অধীর। ক্লান্ত কমবয়সী বড়বাবু বললেন,—ন্যানার দলের সঙ্গে তো? আমরা সব জানি। কী করব বলুন! দুটো বন্দুক দিয়ে কী করা যাবে? পরশু দিন বোমায় আমার সেপাইয়ের পা উড়ে গেছে। আপনারা যদি সবাই মিলে ঠিক কল্লেন বোমা চালাবেন পিস্তল চালাবেন দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যে, তাহলে আমরা কী করব বলুন?

অধীর বললে,—আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই না স্যার। দুই দলে লড়াই চলছে, আপনাকে খবর দিতে এলাম।

বড়বাবু প্যান্ট থেকে শার্ট বার করে হাওয়া খাচ্ছিলেন। অধীরের কথায় বেজারভাবে প্যান্টের মধ্যে শার্ট ভরতে ভরতে বললেন,—আপনারা স্যার বরের মাসি কনের পিসী। তারপর অধীর পেছন ফিরতেই নিজের মনে বললেন,—আমাদের দৌড় তো জানেনই। আধ ঘণ্টা পরে গিয়ে দুটো টিয়ার গ্যাস ফুটিয়ে আসবো।

বাস্তবিক আধঘণ্টা পরে যখন টুটুলদের বাড়ির রাস্তায় বড়বাবু ট্রাক নিয়ে এলেন অচেতন টুটুল তখনও পড়ে আছে। ডান হাত দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে ঘাসে রক্তের চাপ বেঁধে আছে। রাস্তা অন্ধকার, আশেপাশে কেউ নেই। বড়বাবু টুটুলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—একেবারে ক্রিমিনাল টাইপ নয় মনে হচ্ছে। দু'জন সেপাইকে বললেন ধরাধরি করে ট্রাকে তুলতে। ক্লান্ত গলায় হাঁকলেন,—চলো হাসপাতাল।

লিলি খবর পেল রাত দশটায়। ট্যাক্সির জন্যে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। তারপর পরম সৌভাগ্যের মতো খালি একখানা ট্যাক্সির দেখা মেলে। হাসপাতালে তখন অপারেশন হয়ে গেছে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী বাদে ডান হাতের তিনটে আঙুল উড়ে গেছে টুটুলের। ব্যান্ডেজ-মোড়া হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে লিলি কেঁদে ওঠে, —তোমার লেখা টুটুল, তোমার লেখা?

টুটুলের জ্ঞান ফিরে আসছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—বাঁ হাতে লিখব।

সাতদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আসতে না আসতেই টুটুলের সব আত্মীয়রা ভেঙে পড়ে তার বাড়িতে। প্রতাপ বলে,—এই রকম বারবারাস জায়গায় তোমার থাকতে

হবে না। আমার নীচের ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে, সেখানে উঠে এসো। না হয় আমাকে ভাড়াই দেবে। স্বর্ণসুন্দরীও কাঁদতে কাঁদতে এ প্রস্তাবে সায় দেন। বুড়ী বললে, সে কথা দিচ্ছে, সাত দিনের মধ্যে বালিগঞ্জ প্লেসে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দেবে।

—একবার যে বোমা খেয়েছে বুড়ী, সে শতায়ু, টুটুল বললে।

ঘা সম্পূর্ণ শুকোতে মাস দেড়েক লেগে গেল। হাতের চেটোর ওপরের অংশটা অসাড় হয়ে যায়। বাগানে গিয়ে আলোয় হাত মেলে টুটুল রোজ ভোরে হাত মুঠি করে আর খোলে। ধীরে ধীরে হাতের আর দুটো আঙুলের সাড় ফিরে আসতে থাকে। আর তেমনি ধীরে ধীরে তার মনের সেঁচা পুকুরে জল উঠতে থাকে। ব্যথা সত্ত্বেও অফিসে টুকটাক কাজ দু-আঙুলে অভ্যাস করতে থাকে কিন্তু নিজের কাজে হাত দিতে সাহস হয় না। আবার সে হাঁটতে শুরু করে। সন্ধ্যের পর একলা একলা ঘোরে উত্তরে দক্ষিণে, কখনও কখনও শহরতলীতে। সামান্য চেনাজানার সূত্র ধরে আলাপ করে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে। কারুর মুখ, কথা মনের মধ্যে জেগে থাকে, আবার কোনো কোনো মুখ মন থেকে মুছে যায়। বরানগরে শীতের রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অপরিচিত তার সঙ্গীটিকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,—সবচেয়ে কী দরকার জানেন? ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে তার দিকে ফিরতেই টুটুল বলে,—সবচেয়ে দরকার জীবনটা একটা রুটিনে বেঁধে ফেলা। হাওয়ায় কথাটা ভেসে যায়।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর লিলির পাশে বসে পড়ে কী একটা কথা বলতে গিয়ে টুটুল চুপ করে থাকে। সামনে ছোট খাটে টাবু অঘোর ঘুমোতে ঘুমোতে একবার বিড়বিড় করে বকে। লিলি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে,—আমায় কিছু বলছো?

লিলির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে টুটুল বললে,—আজ সারা সকাল লিখেছি জানো? আবার লেখায় ফিরে এসেছি।

লিলি চিরুনিশুদ্ধ হাতে টুটুলের মাথাটা জাপটে ধরে তার বুকের মধ্যে। তারপর টুটুলের চুল টানতে টানতে নিজের মনে বলে ওঠে,—রূপকথা! আমার রূপকথা!

॥ সমাপ্ত ॥

স মা লো চ না

World's Seven Poets. *Edited By* Geoffrey Summerfield. Penguins, London. Rupa, Calcutta, 12.

প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই সংকলনগ্রন্থের প্রত্যেক কবিই বয়সের দিক থেকে উত্তরচল্লিশ। ইংরিজি ভাষায় প্রথম সারির কবি হিসেবে এ'দের স্থান চিহ্নিত হয়ে গেছে। নিজের নিজের জগতে এ'রা প্রত্যেকেই সাবলীল ও নির্মিতির প্রকরণে স্বতন্ত্র। সময়ের দিক থেকে এই সাতজন কবি সমকালীন হ'লেও চিত্রকল্প, ভাবনা ও অনুষঙ্গ-বিচারে কেউ কেউ ইংরিজি কাব্যের রোমান্টিক যুগের কোনো কোনো পথিকৃতের অনুগামী। ফলে সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ বস্তুতপক্ষে আধুনিক কবি হ'য়ে উঠেন নি। আধুনিকতার চরিত্র তাঁদের কবিতায় স্ফুরিত হওয়া প্রায় অসম্ভব ব'লে মনে হয়। তবু একটা সূত্রে সাতজন কবিকে গ্রন্থিত করার পেছনে সম্পাদক একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। তা হচ্ছে—প্রকৃতি। এই সূত্রের প্রকৃতিগত সহধর্মিতা থাকলেও আসলে তা এক-একজন কবির নিজের পারিপার্শ্বিক জগৎ; অর্থাৎ নদী, সমুদ্র, অরণ্য বা প্রান্তর, মানুষ বা গৃহস্থালী কেবল তাঁরই চোখে দেখা, তাঁরই ভালোলাগা রমণীয়তা। অন্যের মধ্যে এই ভালোলাগা সঞ্চারিত করতে, অন্যকে আপ্লুত করতে, তাঁর কবিতাকে অন্যের কাছে গ্রাহ্য ক'রে তুলতে যে উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন তার সার্থকতা অনস্বীকার্য।

সাতজন কবির কিছু কবিতা চয়ন ক'রে সেই ভাষার কাব্যরূপের কোনো সম্পূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ'দের ছাড়াও এমন অনেক কবি ইংরিজি ভাষায় কাব্যচর্চা করেন যাঁদের স্বাতন্ত্র্য, যাঁদের মৌলভাবনা, নির্মিতির রীতি অনেক কাব্যপ্রেমীর প্রিয়। তাঁদের সংকলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন অনেককে পরিত্যাগ করা হয়েছে যাঁরা আসলে গ্রন্থিত অনেকের তুলনায় বেশি সার্থক, অনেকের তুলনায় বেশি প্রকৃত কবি। ফলে সম্পাদকের মতে প্রকৃতপক্ষে কাব্যের প্রাজ্ঞ পাঠক—যাঁরা তাঁদের প্রিয় কবিতাগুলি অথবা প্রিয় অংশসমূহ নতুন ক'রে পাঠ করে পুরনো আনন্দ আস্বাদন করবেন, সংকলনটি তাঁদের জন্য নয়। অথবা যাঁরা 'আধুনিক কবি' শীর্ষক সংকলনগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চান অনুসন্ধানী পাঠক হিসেবে তাদের জন্যও নয়। বস্তুত এই গ্রন্থ তাঁদেরই সাহচর্য দেবে, তাঁদের জন্যই সংকলিত—যাঁরা ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক কবিতায়, প্রায় প্রথম ছাত্রের অনুসন্ধান-স্পৃহা নিয়ে প্রবেশ করতে চান। সম্পাদকের মতে এই শ্রেণীর পাঠকদের কাব্যশিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য তিনি সংকলনে গ্রহণ করেন নি—চার্লস টমলিনসন ও জিওফ্রে হিলকে। বাদ দিতে হয়েছে আয়ান হ্যামিল্টন ফিনলের কবিতা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সাম্প্রতিক ইংরিজি কবিতা—যা ইংরেজরা রচনা করছেন, তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পরিণত, আধুনিক, সংবেদনশীল ও সার্থক ব্যবহৃত কাব্য রচিত হয়েছে ফিলনে ও ফিলিপ মারকিনের লেখনী থেকে।

আসলে এই সংকলনটি অত্যন্ত সাধারণ, শিক্ষানবীশ পাঠকদের মনোনিবেশের জন্যই সংকলিত। যে কারণে লারকিন এই শ্রেণীর একটি সংকলনে গ্রন্থিত হ'তে রাজি হন নি। অহংকারী এই কবি তরুণ ও অপরিণত পাঠকদের কাছে সহজপাচ্য হওয়াটাকে আত্মহত্যার সামিল জ্ঞান করেন।

কবির এই অহংকার যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও, সন্দেহ নেই সম্মানযোগ্য।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়—সংকলনটিতে একজনও মহিলা-কবির কবিতা গ্রহণ করা হয় নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে সাম্প্রতিককালে ইংরিজি ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য মহিলা-কবির উপস্থিতি নেই। কথাটা খাঁটি। একমাত্র যাঁর নাম প্রথমেই মনে পড়ে তিনি ডেনিস লেভেরটভ। কিন্তু তিনিও তো অনেকদিন আগে দেশত্যাগ ক'রে মার্কিন দেশে বসবাস করছেন মার্কিন নাগরিক হিসাবে। ফলে তিনিও সংকলনে পরিত্যক্ত। অবশ্য এই প্রসংগেই মনে হবে টমগান-এর কথা। তিনিও বাস করেন, যতদূর জানি, ক্যালিফোর্নিয়ায়। তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে এখানে। হয়ত বা তিনি আইনের চোখে এখনো ব্রিটেনের নাগরিক। তাই গ্রহণীয়।

সংকলনটি পাঠান্তে প্রথমেই মনে হবে একটি মূল বিন্দু—যাকে ঘিরে আবর্তিত প্রত্যেক কবির কাব্যভাবনা—তা হচ্ছে, এক বিশেষ স্থান, এক বিশেষ সময়। যেখানে কবি সচেতনভাবে জীবিত, যেখানে কবি সম্পূর্ণভাবে প্রোথিত। বিভিন্নভাবে, নানা দিক থেকে চেতনায় অনুরঞ্জিত সেই স্থানই তাঁর কাব্যের মূল বিষয়। সেই প্রকৃতি তাঁর কাছে ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এই প্রকৃতির এমন কোনো পৃথক ব্যঞ্জনা নেই যা থেকে পাঠকের মনে জাগ্রত হবে কাব্য ও প্রকৃতির, নারী ও প্রকৃতির, জীবন ও প্রকৃতির এবং সর্বোপরি আর্ট ও নেচারের ঘনিষ্ঠ, রহস্যময় ও অনিবার্য তুলনা। যা একদা ভাবিত করেছিলো বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোকে। উদ্বেল করেছিলো, তারো আগে, ভিকতর য়ুগো ও থিয়োফিস গোতিয়ের কাব্যসত্তা। পক্ষান্তরে এই প্রকৃতি যেন আমাদের চেনা, যেন ওয়র্ডস্বার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখা প্রকৃতির অনুগ। অথচ অনেকখানি ছোটো ক'রে রচিত জগৎ। ছোটো মাপে রচিত—কারণ এই কবিসপ্তকের প্রকৃতি সময়ের সূক্ষ্ম বেড়াজালে ঘেরা বাগানমাত্র। রবীন্দ্রনাথ এমন কি ওয়র্ডস্বার্থ পর্যন্ত প্রকৃতিকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছেন—সেই উত্তরণের সিঁড়ি টপকে যেতে আত্মার উন্মোচন প্রয়োজন। প্রয়োজন নির্ভার তপস্যার কান্তি। সম্ভবত এডউইন মোরগ্যান, চার্লস কজলি এবং গ্রন্থিত আরো অনেকের কাব্য তাঁদের হৃদয়ের, বিশ্বাসের, জীবনের বা শোণিতের অত গভীর থেকে উদ্গত নয়—যেখান থেকে ভূমিষ্ঠ হ'লেই কাব্যভাবনাকে মহত্ত্বের গজে মাপতে হয়।

প্রথমগ্রাহ্য হচ্ছে জীবন। এবং তারপর জীবনকে ঘিরে প্রকৃতি। কোনোমতেই প্রকৃতিকে ঘিরে জীবন নয়। জীবনকে ঘিরে যে প্রকৃতি প্রাতিনিয়ত আমাদের বোধকে গ্রাস করতে স্ফুরিত হচ্ছে তার সঠিক, যথার্থ উপস্থাপনাই কাব্যের বিষয় হবার যোগ্য। কিন্তু পক্ষান্তরে প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে যে জীবন তা নিদ্রিত সমাজবিজ্ঞান বা নৃতত্ত্ব-র বিষয়, কাব্যের সংগে তার কোনো যোগসূত্র স্থাপন—মহৎ তো নয়ই, আজ আর সাধারণ পদ্যলেখকেরও গ্রাহ্য বিষয় নয়। র‍্যাঁবো চেয়েছিলেন মানুষকে পরিবর্তিত করতে, এবং জীবনকে সরাসরি অস্তিত্বের সংগে একাত্ম ক'রে তুলতে। মানুষ যদি একবার কেবলমাত্র অস্তিত্ব হ'য়ে উঠতে পারে তবে ক্ষয়িত হবে জীবনের শত্রু যুক্তিহীন, বিবেকহীন ক্ষমতাগুলো। এই ক্ষমতার মধ্যে রিপুও গ্রাহ্য। প্রকৃতিও গণনীয়।

কিন্তু মানুষ কখন অস্তিত্ব হ'য়ে উঠবে? যখন দীর্ঘ ও ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে সক্ষম হবে নিজের সব চেতনার বিশৃঙ্খলা ঘটাতে। উজাড় ক'রে দেবে নিজের সব প্রেম, দুর্দশা ও বিকৃতি আর তবেই তার অধিগত হবে যা অজ্ঞাত, যা অজ্ঞেয়। কিন্তু প্রকৃতি, সে তো স্বচ্ছ; তাতে কোনো প্রতিবিম্ব ধরে না। তা নয় রচিত, নির্মিত। সচেতন অথবা অপার্থিব।

'প্রকৃতি, মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;

সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
যে অরণ্য দ্যাখে তাকে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।'

(বোদলেয়ারের প্রতিষঙ্গ। বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত)

প্রকৃতির পর এই কবিসপ্তকের রচনাগুলিতে লক্ষণীয় তাঁদের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। মোরগ্যান রচনা করেন গ্লাসগো থেকে। লেখেন গ্লাসগোর ভাষায়। কজলির কবিতায় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে করনোয়াল তার পুরনো দিনের দুঃখ, বিষাদ, জাদু ও রহস্যময়তা নিয়ে। তেমনি আড্রিয়ান মিটচেল, টেড হিউজেস, সিমাস হিনি অথবা নরম্যান ম্যাক্‌কেইগ। কিন্তু শোনা কি যায় মন্দিরোপম প্রকৃতির অস্পষ্ট প্রলাপ তাঁদের কবিতায়?

প্রত্যেক কবির পারিপার্শ্বিকতা, প্রত্যহ দেখা দৃশ্যাবলী, মানুষ, নদী, সমুদ্র, নিঃসঙ্গতার প্রতীক, একাকিত্বের অভিব্যক্তি অজস্র ফোটোগ্রাফির সাহায্যে স্ফুটিত হয়েছে। পাঠক সহজে যে-কোনো একজন কবির কবিতাসহ তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। এরই সঙ্গে রয়েছে ক্ষুদ্রায়তন অথচ মূল্যবান মুখবন্ধ—পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কবি সম্পর্কে। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে, কখনো বা আলাদাভাবে তাঁরা বলেছেন নিজেদের রচনার ইতিহাস। প্রথম কবি হ'য়ে ওঠার কথা। এসব কথাই প্রয়োজনীয় মনে হয় একজন রচয়িতাকে বুঝতে হ'লে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আত্মকথন লেখকের মনের গভীর থেকে উদ্গত ব'লে মনে হয়। মোরগ্যান বলেন, কবিতা এক হিসেবে অজানাকে অনুধাবন করার নেশায় ভ্রমণের মতো, যেন একটা ব্যোমযান, যেন ঘুরে বেড়ানো যাবে নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। কবিতাকে আবার মুহূর্ত ও ঘটনাকে স্থায়িত্ব দেবার উপায় ব'লেও তাঁর মনে হয়। কবিরা তাই করেন। কোনো ঘটনাকে দেখেন, বলা উচিত লক্ষ্য করেন। ক্রমে ঘটনাটির সারাৎসার তাঁর মনের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়। তারপর একদিন হঠাৎ প্রায় কিংবদন্তীর বাল্মীকির মতো তাঁর ভেতর থেকে আবির্ভূত হয় কয়েকটি শব্দ, একটি কবিতা, যার জন্য কবিকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। আর সেই কবিতাটি গ'ড়ে ওঠে প্রায় বিস্মৃত ঘটনাটির কাঠামোর উপর। এই কথাই বলেছেন রাইনের মারিয়া রিল্‌কে তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থ "মালটে রাউরিডস্‌ ব্রিগ্‌গের নোটবুক"-এ। 'এবং শুধুমাত্র স্মৃতিই এখনো সব নয়। যখন স্মৃতির বোঝা অনেক তখন তাকে অনেক বিস্মৃত হ'তে হবেই অসীম ধৈর্যে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সেইসব স্মৃতি ফিরে আসে। কারণ স্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজনীয়। জরুরি—যখন তারা সব পরিবর্তিত হয় কবির ধমনীর শোণিতে, বদলে হয় দৃষ্টি ও ইঙ্গিত, পরিচয়হীন; যখন তাদের পৃথক ক'রে চেনা যায় না—তখন কেবল তখনি ঘটনাটি ঘটে, এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্তে—উদ্গত হয়, আবির্ভাব হয় তাদের মধ্য থেকে একটি কবিতার প্রথম শব্দ।' কিন্তু রিল্‌কেও অনেককাল এই কবিতা লিখতে পারেন নি। তাঁর কবিতার সৃষ্টি হ'তো অন্যসব উপাদান থেকে। সুতরাং তিনি সে রচনাকে কবিতা ব'লে গর্বিত বোধ করতেন না। পরবর্তীকালে রচিত "অরফিয়ুসের সনেটস্‌" গ্রন্থের কবিতাগুলো রচনা অথবা "ডুইনো এলেইজি"র কবিতাসমূহের রচনার পেছনে তেমনি বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির পুনর্জাগরণ কার্যকরী দেখা যায়। স্মৃতি এই আলোচ্য কবিদের ক্ষেত্রে সেই অর্থে কাজ করে নি। পক্ষান্তরে এঁদের বক্তব্য থেকেই পরিস্ফুট হয়েছে যে—এঁদের দেখা চারিপাশের জগৎ—প্রকৃতি, প্রত্যক্ষ দৃশ্যপুঞ্জ সরাসরি এঁদে'র কাব্যের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। এ কখনো আবির্ভাব নয়, নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতিমাত্র।

টেড হিউজেস নিজের কবিতার বিষয় সম্পর্কে লিখছেন, 'কবিতাগুলো পুনর্বার বিবেচনা

ক'রে আমার মনে হয়েছে—প্রাণশক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে যে সংগ্রাম তাই আমার কল্পনাকে জাগরিত করে। আমার কবিতা এই দুই যুধ্যমান দলের পরাজিত যোদ্ধাদের মৃত্যুর উৎসবে মত্ত। এছাড়া—এই পৃথিবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য, আমার অস্তিত্ব পৃথিবীর পটভূমিকায় এবং পৃথিবীর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সভ্যতা প্রমাণের জন্য রচিত হয়েছে এইসব কবিতা। অন্যভাবে বলা যায়—জগৎ-সংসার সম্পর্কে আমার মোহের গভীরতার উৎসব আমার কবিতা।' সংকলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এই কবি বস্তুতই ভিন্ন প্রকৃতির উপাসক। নিজেই বলছেন, 'আমার শৈশবের সবচেয়ে মনোমতো সঙ্গী ছিলো একটি মসীলিপ্ত পর্বতচূড়া।' এই রহস্যময় পর্বতচূড়া ঘিরে গঠিত হয়েছে হিউজেসের অস্তিত্ব। নিয়ত ঘটছে প্রাণশক্তি ও প্রয়াণের তীব্র সংগ্রাম।

স্বপ্নের ভেতর পতন-উন্মুখ আমরাও যেন মদমত্ত
শ্রবণে শ্রবণে, ঘোটকের বজ্রহ্রেষা দেয় যে সান্ত্বনা;
জেগে উঠি চিত্রার্পিত : প্রকাশিত হ'লো বুঝি দিবালোক। (ঘোটকের স্বপ্নে)

অথবা

গবাক্ষে দেখি না আমি কোনো তারকারে;
কিছু যেন আছে কারো কাছে
অন্ধকারে মনে হয় আরো ঘন গভীরতর
নিঃসাড়ে করে প্রবেশ সেই নিঃসঙ্গতা;

শীতল, এবং কালো তুষারের মতো ক্ষীয়মাণ
সেই শৃগালের নাক ছোঁয় ডালপালা, পত্রপুঞ্জ;
দুই চোখে চঞ্চলগতির চিহ্ন, এইমাত্র
আবার এখন, এবং এখন, এবং এখন

তুষারের উপরে রেখেছে স্পষ্ট পদচিহ্ন (ভাবনার শৃগাল)

মৃত্যুর প্রতীক তুষার ও প্রাণের লক্ষণাক্রান্ত চঞ্চল শৃগাল; পর্বতের মতো মৃত্যু, মাতালের মতো অসংলগ্ন ও জীবন, গতির রূপকে অশ্ব হিউজেসের কবিতায় মাঝে মাঝেই উপস্থিত।

এই কবিসপ্তকের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ম্যাক কেইগ। জন্ম ১৯১০ সালে। এডিনবার্গে। পড়াশুনো করেছেন ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে। পেশায় শিক্ষক। কাব্যকলায় তিনি লিরিকধর্মী। তাঁর সুন্দর কাব্যময় মুখশ্রী ও কান্তির মতোই তাঁর কবিতার কান্তিও পাঠককে আকর্ষিত করে। যে-কোনো কবিতার প্রথম ছত্রকটা শব্দ উচ্চারণ করলেই পুরো কবিতাটি পঠনীয় হ'য়ে উঠবে। বস্তুত কোনো কোনো কবি আছেন যাঁরা তাঁদের কবিতাকে এমন শ্রীময় ক'রে তুলতে পারেন যা কবির চরিত্রের গৃহিণীপণার দিকটা ফুটিয়ে তোলে। ম্যাককেইগ তেমনি একজন কবি। 'প্রত্যেকে কিছু না কিছু বানাতে চায়, এমন কিছু যা পূর্বে ছিলো না—হোক না তা চেয়ার, অথবা একটি কবিতা। জানি না কেন একজন কবিতা বানায়, অন্যজন বানায় চেয়ার; কিন্তু নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি সৃষ্টির প্রেরণা-বস্তুটি তাদের কাজের পেছনে সমান প্রবল। হায়, কে সেই চেয়ারে বসবে, যদি আমি একটা চেয়ার বানাই; তেমনি চেয়ারওয়ালা যদি রচনা করে একটি কবিতা—তবে তো একই দশা!.........যখন একটা কবিতা লেখা হয় তখন যদি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রহস্যময় বলি—তবে তা চেয়ার বানানোর রহস্যের

চেয়ে কিছু বেশি নয়। উভয়েরই লক্ষ্য এমন কিছু সৃষ্টি করা যা একই সঙ্গে সুন্দর ও প্রয়োজনীয়।' চমৎকার ক'রে, যত্ন নিয়ে, অব্যর্থভাবে গুছিয়ে বলার স্বভাব নোরম্যান ম্যাককেইগের।

দেখি প্রতিদিন আমার জানালা খুলে
পায়রার দল, ছাদের কার্ণিশে—পুরুষেরা
অস্থির ভারসাম্যের যন্ত্র যেন কামনার। (বুনো ওট)

গাইরোস্কোপসের মতো নিজের জন্য, নিজের কামনার তাড়নায় ঘুরছে নিজের বৃত্তের চারদিকে। যেমন ক'রে পৃথিবী ঘোরে। তেমনি ক'রে অন্ধজীবন ঘুরছে পায়রার রূপকে। আরো গভীর পরিচ্ছন্ন প্রতীকে পায়রাদের উপস্থিতির কথা আছে পল ভালেরির "সাগরের পাশে কারখানায়"। ভ্রমণশীল পায়রা সেখানে যেমন জীবনের প্রতীক, তেমনি মৃত্যুর প্রতীক, মৃতের আধার কারখানা। তবু ম্যাককেইগ আসলে কাব্যধর্মে ওয়র্ডস্বার্থের বংশধর। আর তাই তিনি পূর্বসূরীর সরাসরি বিরোধী বক্তব্যে সোচ্চার।

খুলে ধরি এই দ্বিতীয় খণ্ডটি
এক গোলাপের
দেখি লিপিবন্ধ, শব্দের মালা,
প্রথম শব্দের মতো পরবর্তী সব।

সমুদ্রের ঊর্মিমালা
বিরক্তি জাগায়, একঘেয়ে ক্লান্তিকর;
কেন নয় তা ভাঙা ভাঙা
স্তবকে স্তবকে?

এবং 'কেতাবি' কবিতাটির শেষ স্তবকে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

এলাম রমণী তোমার নিকট ঘুরে ফিরে
প্রকৃতির এই গ্রন্থশালা থেকে
কেবল তাকাই অবাক বিস্ময়ে
তোমার বন্ধ কেতাবখানায়।

খুলে যাবে কবে, আমার সম্মুখে,
করবে প্রকাশ, অর্থবহ হবে সব
দুরূহ শব্দের মালা
যত আছে প্রেম-প্রণয়ের অভিধানে? (কেতাবি)

মহৎ কবিতা যেমন অজস্র রচিত হয় না তেমনি বড়ো কবি প্রত্যেকে হ'য়ে ওঠেন না। অনেক মাঝারি কবি, অনেক সাধারণ কবির অস্তিত্ব, পরিশ্রম প্রকৃষ্ট সাহিত্যের সোপান হ'য়ে ওঠে প্রত্যেক ভাষায়। পাঠকের অভিমান, পাঠকের নিরাসক্তি অনেক কবির পক্ষেই নির্মম। সময় বদলে যায়, কেউ ফিরে আসেন, কেউ হারিয়ে যান নিঃশব্দে। সেটাই লক্ষণীয়।

এই সংকলনটি উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রায় সাম্প্রতিক ইংরিজি কবিতার একটা বিশেষ ধারা এই সাতজন কবির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। সংকলনটি নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদিত। অজস্র স্থিরচিত্র

নিশ্চিতভাবে কবির স্বরূপ, পরিমণ্ডল প্রকাশে সহায়তা করেছে। কবিদের বক্তব্যও পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়।

কমলেশ চক্রবর্তী

কবিতা নিঃসঙ্গপ্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গবেষণা পরিষৎ। কলিকাতা, ৩। মূল্য আট টাকা।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা ও শিক্ষার সংস্পর্শে কলিকাতা-ভিত্তিক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল ক্রমশ তাহা বিভিন্ন চিন্তা ও কর্মধারায় রূপ লাভ করে। কৃষ্ণধন ঘোষের দুই পুত্র মনোমোহন ও অরবিন্দ একই পরিবেশে লালিত হওয়া সত্ত্বেও দুইটি স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন। অরবিন্দ স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পরবর্তীকালে চলিয়া গেলেন যোগসাধনার পথে। আপাতদৃষ্টিতে মনোমোহন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়া মনের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন ইংরাজী ভাষায় কাব্যরচনার মাধ্যমে। মনোমোহন কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই—কবিতার জগৎ শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠিল তাঁহার নিঃসঙ্গ প্রবাসের বাসভূমি। ভারতীয় জীবন তিনি নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম তাহার প্রবেশপথও মনোমোহনের কাছে আজীবন অবরুদ্ধই থাকিয়া গেল। তাই একান্ত নিঃসঙ্গতা ছাড়া তাঁহার আর উপায়ই বা কি। বিশ্লেষণাত্মক জীবনীগ্রন্থ রচনা করিতে গেলে এইসব ঘটনার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়, গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন।

আবার মনোমোহন যে একান্তই একক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন এ কথাটা মনে রাখিলে তাঁহার সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয় গভীরভাবে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্যপ্রেমের অভাব কখনই হয় নাই। মনের কথা বলিতে গেলে ইংরাজী ছাড়া চলে না—এ রোগ তো আজও অনেকেরই। ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অপ্রতুল নয়। কিন্তু স্বদেশ ও স্বদেশীয় জীবনধারার সঙ্গে যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ মনোমোহনের ঘটিয়া গিয়াছিল বলিয়া লেখক বলিতেছেন, এমনটা খুব বেশী ঘটে নাই।

বস্তুতঃ মনোমোহনের ক্ষেত্রেও যে হইয়াছিল সেকথা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। "দি বেঙ্গলী বুক অব ইংলিশ ভার্স" নামক কবিতাসংকলনের সংকলক ডান মনোমোহনকে প্রতীচীর কাছে প্রাচ্যের ব্যাখ্যাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থকারের ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করেন মনোমোহন প্রাচ্যের কাছে প্রতীচীর ব্যাখ্যাতা এবং "টোন অ্যান্ড টেম্পার"-এ তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য, কারণ মনোমোহনের প্রায় সমুদয় রচনাতে সর্বত্রই ইংল্যান্ডের পরিবেশপ্রসূত প্রকরণ, বর্ণবিন্যাস ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার উপস্থিতি প্রকটিত। মনোমোহনের কাব্যে এইসব বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই যে "টোন অ্যান্ড টেম্পার"-এ তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যপ্রভাবিত একথাটা মানিয়া নেওয়া কঠিন। বস্তুতঃ "টোন অ্যান্ড টেম্পার" অনুধাবন করিবার জন্য তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে পর্যাপ্ত

উদ্ধৃতিসহ যে আলোচনার প্রয়োজন তাহা কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে নাই। এই কারণে মনোমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসঙ্গ প্রবাসের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্যও উপলব্ধি করা দুরূহ বলিয়া মনে হইতেছে।

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে যেসব চিন্তা ও কর্মধারার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভিন্নমুখী ও পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ধারার সংঘাতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার পটভূমিকায় মনোমোহনের জীবনকাহিনী আলোচনা না করিলে তাঁহার কবিতা ও নিঃসঙ্গপ্রবাসের সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাইবে না। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রচারের ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উন্মাদনা, বিহ্বলতা ও বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। পশ্চিমী সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে যে উতরোলের কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন তাহার মধ্যে এসবই আছে। কতরূপে যে এগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার কিছুটা এখন আমাদের জানা। ইহার মধ্যে যে ইতিহাস ও সমাজবোধ, দূরদৃষ্টি ও স্থৈর্য বিশেষ ছিল না, সে সময়ের অনেক কর্মকাণ্ডই যে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রচেষ্টামাত্র তাহার ইঙ্গিতও সাম্প্রতিক আলোচনা-গবেষণায় ক্রমশ স্পষ্টতর। এমনি একটা পরিস্থিতিতে পড়িয়া সংবেদনশীল মনোমোহন আপনসৃষ্ট কবিতার জগতে আশ্রয় নিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমনও হইতে পারে। বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ প্রচেষ্টা বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার পারিবারিক যোগ গভীর বলিয়া এ প্রশ্নটা বড় হইয়াই দেখা দেয়। শুধু মনোমোহন নন, তাঁহার সমসাময়িক অনেক শিক্ষিত লোকই সমাজ বলিতে নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীকেই বুঝিয়াছেন। উনবিংশ শতকের প্রভাবছায়ায় বসিয়া আমরাও তো তাহাই বুঝি। ইহার বাহিরে বৃহত্তর সমাজের আশ্রয়ের কথা অধিকাংশ লোকের মত মনোমোহনও ভাবেন নাই।

উনবিংশ শতকের বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমির ইঙ্গিত নিয়া গ্রন্থকার রচনা শুরু করিয়াছেন বলিয়াই এই কথাগুলি বুঝিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার এবং ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালীর কাব্যচর্চা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বইটির মধ্যে পাইতেছি তাহাতে কিন্তু সামাজিক সংঘাতের বিভিন্ন দিক ফুটিয়া উঠিতেছে না।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু মনোমোহনের জীবনকাহিনী যেভাবে গ্রথিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীগত শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংকটাকীর্ণ জীবনের একটা দিক দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনোমোহন ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কোনটাই হইতে পারিয়াছিলেন কিনা এটা বড় কথা নয়। সংবেদনশীল মনোমোহন যে পারিপার্শ্বিকের বাহিরে গিয়া কবিতার রাজ্যে একান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন এইটাই আসল কথা। এই কথাটা আলোচ্য গ্রন্থেও বার বার বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। বৃটিশপ্রীতি, পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি অনুরাগ বা স্বদেশ ও স্বজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অনীহা, পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্ব অর্জনে অক্ষমতা যে কারণেই হোক না কেন মনোমোহন সামাজিক জীবনে নিরাশ্রয়। এ সংকট শুধু মনোমোহনেরই নয়, অনেকেরই। ঠিক কি কারণে বলিতে পারি না, এ সংকট আজ উনবিংশ শতাব্দী অপেক্ষা অনেক বেশী ও গভীর। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্পর্কে গবেষণায় সম্প্রতিকালে নতুন নতুন প্রশ্ন উঠিতেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা দিকেই আজ অনুসন্ধান চলিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সামাজিক আশ্রয়হীনতার সংকট যে মনোমোহনের ব্যক্তিজীবনের এই কাহিনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যাপকতর সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়ত এইসব গবেষণার মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইবে

এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনের প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী সমস্যার মূল কোথায় তাহা জানা যাইবে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

Hope Against Hope. *By* Nadezhda Mandelstam. Translated by Max Hayward. Penguin, London. Rupa, Calcutta, 12. 90 *p.*

কোন দেশের সামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে অকস্মাৎ সাহিত্যশিল্পের চরিত্রপরিবর্তন প্রায় অসম্ভব, যদি না উক্ত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তার দীর্ঘ এবং তন্নিষ্ঠ সমধর্মী মানসিকতার যোগসূত্র থাকে। যে স্বাভাবিক সামাজিক সূত্রে শিল্পচর্চার জন্ম ও বিকাশ তা প্রায়শ স্থিতিশীলতার সপক্ষে কার্যকর; একান্ত ব্যক্তিপ্রয়াস ব্যতিরেকে নতুন চেতনায় উত্তরণ সকল অর্থেই অসম্ভব। মহৎ সাহিত্যের যে-চেতনা সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে ওঠে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের অনুসন্ধান সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বকেই প্রামাণ্যরূপে মর্যাদা দেয়। তদুপরি লেখক-শিল্পীদের রোমান্টিক ধ্যানধারণা সর্বদা বাস্তবের সঙ্গে না মেলায়, তাঁদের প্রতিক্রিয়াও আত্মপ্রকাশ করে অনিবার্যভাবে। আন্না আক্‌মাতোভার বন্ধু, বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য কবি অসিপ্‌ ম্যান্ডেলস্টাম সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবেই প্রযোজ্য।

রুশদেশে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পূর্বাহ্ণেই অসিপ্‌-এর কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ, তাঁর "কামেন" (পাথর) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনায় (১৯১৩)। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "ত্রিস্তিয়া"র প্রকাশ ১৯২২ খৃীস্টাব্দে। স্মর্তব্য, ইতিমধ্যেই বিপ্লব ঘটেছে, এবং দেশ পুনর্গঠনের কাজে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার ভূমিকাও লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উক্ত শাসনব্যবস্থায় এক দশকেরও অধিককাল বলশেভিক পার্টি সাংস্কৃতিক কর্মে কোন কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেনি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে কঠোরতা আরোপিত হয়, 'নতুন আর্থনীতিক নীতি' প্রবর্তনের সূত্রপাতে তাও বহুলাংশে শিথিল করা হয়; কেননা তথাকথিত 'বুর্জোআ বিশেষজ্ঞ'দের উপর নির্ভরতাই ছিল সমকালীন প্রয়োজন। আর ১৯২৮ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পসংস্থাগুলি ছিল স্বশাসনিক এবং পার্টি-নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত। সমকালীন শিল্পসাহিত্য সংস্থাগুলির অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই নিজেদের 'প্রোলেটারিয়ান' হিসাবে দাবি করতো; মুখ্যতঃ কর্তৃত্ব ছিল 'আভাগার্দে', 'ফিউচারিস্ট' ও 'কনস্ট্রাটিভিস্ট'দের হাতে। সাহিত্যের এই 'বুর্জোআ বিশেষজ্ঞ'দের প্রধানত আস্থা ছিল পূর্বেকার সমাজব্যবস্থায় এবং স্বভাবতই অন্য নতুন ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনাসক্তিই স্বাভাবিক। তথাপি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের স্বাধীনতায় তৎকালে কোন হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক ম্যাক্স হেওয়ার্ড অন্যত্র একটি গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত লেখককুল প্রসঙ্গে লেখেন, Politically they ranged from sympathy, through luke-warm acceptance, to downright rejection of the new regime. The instability of their attitudes, their individualism, even more than their bourgeois intellectual origins, naturally made them suspect, and they were tolerated mainly on account of their indispensable professional expertise। কার্যত তৎকালে পার্টি-নীতি ছিল তথাকথিত 'আভাগার্দে' সাহিত্যিক-

দের মানসিক পরিবর্তন ঘটানো বা তার সুযোগদান এবং এদের সহায়তায় নতুন 'প্রলেটারিয়ান'দের সুশিক্ষিত করে তোলা এবং/অথবা একই কর্মযজ্ঞে সামিল ঘটানো। কিন্তু পরবর্তী সামান্যকালের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। এমত প্রেক্ষিতে অবশেষে ১৯২৫ সনে সাহিত্য বিষয়ে পার্টির নীতিবিষয়ক বক্তব্য প্রকাশিত হয় : "....the Party absolutely cannot commit itself to any one trend in the sphere of literary form. While controlling literature in a general way, the Party can no more give support to any one fraction (fractions being classified according to differences of view about style and form) than it can decide by resolution questions of family life....There is every reason to believe that a style consonant with the new era will be created, but it will be created by different methods, and so far there is no sign of a solution of this question. *Any attempt to tie the Party down in this respect at the present stage of cultural development must be rejected.*" (বাঁকা হরফ সমালোচকের) কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেনসর-কর্মে নিয়োজিত নবগঠিত সংস্থা 'ম্লাভলিট' লেখকদের স্বাধীনতা প্রায়শ অক্ষুণ্ণই রাখে।

কিন্তু অকস্মাৎ ১৯২৯ সালে 'নতুন আর্থনীতিক নীতি'র সমাপ্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে (স্তালিনের ভাষ্যে এই সাল 'the year of the great turning point') এবং পার্টি থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনচর্যার সমস্ত কিছুকেই আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন জোসেফ স্তালিন। সুতরাং কৃষকেরা যেমন যৌথ খামারে যোগ দিতে বাধ্য, প্রায় একই অনুশাসনে লেখক-শিল্পীদের বলশেভিকীকরণও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এ হেন পরিপ্রেক্ষিতে অসিপ্ ম্যান্ডেলস্টামের গ্রেপ্তার, কারাবরণ এবং দুঃখময় জীবন যাপন একান্তই স্বাভাবিক। কবির স্ত্রী নাদেজ্দা ম্যান্ডেলস্টাম অসিপের এই বেদনা-ভারাক্রান্ত দিনযাপনের চিত্র এঁকেছেন সমকালীন স্বদেশীয় অবস্থার বিশাল ক্যানভাসে। অসামান্য বর্ণনায়, (হ্যারিসন সোলিস্‌বারির যথার্থ মন্তব্য, 'No work on Russia which I have recently read has given me so sensitive and searing an insight into the hellhouse which Russia became under Stalin....'), চিত্রধর্মী আবেগে এবং বিষয়গত বৈচিত্র্যের সমাহারে এবম্প্রকার গ্রন্থ সর্বদাই দুর্লভ।

বর্তমান গ্রন্থে লেখিকার স্মৃতিচারণার কালসীমা উনিশ বছরের অর্থাৎ মে ১, ১৯১৯ থেকে মে ১, ১৯৩৮ পর্যন্ত। এই সমগ্র বৎসরগুলিতে কবির সঙ্গে মানসিক স্তরে সংযুক্ত থেকেছেন গভীর আন্তরিকতায়; লেখিকার ভাষ্যে, I played the role of 'poet's widow with him—স্বভাবতই একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কিন্তু লেখিকার সার্থকতা অসিপ-কে অতিক্রম করে সমগ্র রাশিয়ায় স্তালিন যুগের চিত্ররচনায়। তদুপরি বর্তমান, কবির নির্বাসনকালের কাব্যচর্চার সমগ্র ইতিহাস।

অবশ্য নাদেজ্দার সঙ্গে পরিচয়ের (১৯১৯) আগেই অসিপ্ ম্যান্ডেলস্টামের কবিখ্যাতিলাভ ঘটেছিল এবং সমকালের শ্রেষ্ঠদের সঙ্গেও তাঁর নামোচ্চারণ লক্ষণীয়। ইতিপূর্বে "আপোল্লন" পত্রিকায় তাঁর প্রাথমিক কবিতা প্রকাশকালেই তিনি নিকোলাই গুমিলেভ এবং আন্না আকমাতোভার সমগোত্রীয়রূপে বিবেচিত হন। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবতার মিল প্রায়শ যেহেতু অসম্ভবই থেকে যায়, সে কারণেই সমকালের স্বদেশীয় শাসনব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। তাঁর একালীন একটি কবিতার উল্লেখ এখানে অনিবার্য :

We live, deaf to the land beneath us.
Ten steps away no one hears our speeches,

But where there's so much as half a conversation
The Kremlin's mountaineer will get his mention.

His fingers are fat as grubs
And the words, final as lead weights,
fall from his lips,

His cockroach whiskers leer
An his boot tops gleam.

Around him a rabble of thin-necked leaders—
Fawning half-man for him to play with.

They whinny, purr or whine
As he prates and points a finger,

One by one forging his laws, to be flung
Like horseshoes at the head, the eye or the groin

And every killing is a treat
For the broad-chested Ossete. (1933)

কবিতাটির যে প্রথম লিখন সরকারের হাতে পে'ৗছয়, সেখানে চতুর্থ লাইনে লেখা ছিল, All we hear is the Kremlin mountaineer,/The murderer and peasant-slayer. এমত উচ্চারণ থেকেই অনুমেয় তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া। বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র নাদেজদা লেখেন, The only thing that worried him in those days, perhaps, was the Party organisation. 'The Party is an inverted church', he said. What he meant by this was that it had the church's hierarchical subordination to authority, but without God. এবম্প্রকার চিন্তাচর্চার কবির মানসিকতা অবশ্যই প্রশ্রয় পায় কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যও ব্যক্তিমাত্রেরই অনুধাবনীয়। দুর্ভাগ্য, অসিপ আজীবন অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বর্তমানকে নস্যাৎ করেছেন। উনিশ শতকের সমাজজীবন হয়ে উঠেছিল তাঁর বিবেচনায় শ্রেয় এবং স্বভাবতই বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী। (দ্রঃ বর্তমান গ্রন্থের ৩০৫-৬ পৃঃ) ছোদিয়েভ বিষয়ক রচনায় এবং The Noise of Time নামীয় প্রবন্ধে অসিপ বারংবার এ-মন্তব্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন। তাঁর পরিণাম অবশ্যই ইতিহাস কিন্তু সুস্থ চিন্তাবাহী হিসাবে মেনে নেওয়া যুক্তিহীন।

নাদেজ্‌দা অবশ্য উক্ত চিন্তাচর্চার সঙ্গে ঐকমত ছিলেন এমত ধারণা করার যুক্তি নেই। কারণ কবির মন্তব্যাদি উল্লেখের ধরনে তাঁর সংশয় প্রকটিত। এবং সমগ্র বিষয়টির ইতিহাসমূল্যই তাঁর বিবেচনায় শ্রেয় হিসাবে পরিগণিত। ১৯৩২ সালে স্তালিন অকস্মাৎ সমস্ত সাহিত্যসংস্থাকে বাতিল করে সমস্ত লেখক-শিল্পীকে Union of Soviet Writers নামীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহী হন এবং শ্রীমতী ম্যান্ডেলস্টামের ধারণায় তিনি সকলকেই তাঁর আজ্ঞাবহে পরিণত করতে চেয়েছিলেন আর যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। শিল্পীর স্বাধীনতা, সমাজের পুনর্বিন্যাসে ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়াবলীর অবতারণা বর্তমান সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিচ বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় তার অবকাশ ছিল যথেষ্ট। উনিশশতকীয় রুশ ধ্রুপদী সাহিত্য সমকালে কতটা অনুপ্রেরণার বাহক সেটিও বিতর্কের বিষয়। এতৎসত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে বর্তমান গ্রন্থটি রুশদেশের একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্য-আন্দোলনের দলিলরূপে প্রামাণ্য এবং সুলিখিত দলিল।

নির্মল ঘোষ

পুরানো লখনউ—আবদুল হলীম 'শরর্‌'। অনুবাদ : মুনীরা খাতুন ও গুরুদাস ভট্টাচার্য। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নতুন দিল্লী, ১৬। মূল্য ১৩·৫০।

সপ্তম শতকের বিখ্যাত চৈনিক ভিক্ষু হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ কথিত ভারতবর্ষের 'মধ্যদেশে' প্রত্যেক প্রদেশের যথাযথ বিবরণী 'নীলপীটে'র হদিস যেকালে অদ্যাবধি মেলেনি তাই মুগল যুগের সভাসদ্‌ কর্তৃক রচিত কাহিনীই কার্যতঃ এদেশে প্রথমে ঐতিহাসিক সাহিত্যের মর্যাদা পায়। বস্তুতঃ বিজেতা মুসলমানেরা সঙ্গে এনেছিলেন বহিরাগত ইতিহাসচর্চার আদর্শ; আর ঐসলামিক সংস্কৃতির পীঠস্থান খোরাসান, বগ্‌দাদ, আল তাহেরা, কোর্‌দোভা থেকে আগত প্রাজ্ঞদের পরিশ্রমী নিষ্ঠায় এ বিষয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে। কার্যকারণসূত্রে বলা বাহুল্য মহ্‌মুদ গজনবী থেকে দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম্‌ অবধি প্রায় আট শ' বছর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কিত এক বিপুল ইতিহাসমালা রচিত হয়েছে। এবং আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় হেন্‌রি মায়ার্জ্‌ এলিয়ট্‌ ও জন্‌ ডাউসনের প্রবল প্রয়াসে আট খণ্ডে *The History of India as told by its own Historians* (এলিয়ট্‌ সাহেবের অকালমৃত্যুর [১৮৫৩] পর তাঁর এই আরব্ধ অমূল্য ঐতিহাসিক মহাকোষের সম্পাদনার জন্য দায়ী ডাউসন্‌) প্রকাশনা; ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই দুর্লভ গবেষকদ্বয়ের অবদানের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গমে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে রচিত যে-কোনও ইতিহাসগ্রন্থের তৌলনিক আলোচনা অনিবার্য। ফলতঃ উপর্যুক্ত গবেষণাকর্মের আনুকূল্য এবং অনুবৃত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল স্ট্যান্‌লি লেন-পুলের *Mediaeval India*।

দিল্লীর সিংহাসনে আকবরের আরোহণ (১৪ ফেব্রুঅ্যারি ১৫৫৬) তথা এদেশে স্থায়ী মুগল সাম্রাজ্যস্থাপন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান ঘটনা। "আকবরনামা," "পাদিশাহ্‌নামা," "আলম্‌গীরনামা," "বাহাদুরশাহ্‌নামা" প্রভৃতি সরকারী ইতিহাসে বাদশাহী মহাফেজখানায় ('বস্তাখানা') রক্ষিত কাগজপত্র : প্রতিষঙ্গ ('ফর্মান্‌', 'হস্‌ব-উল্‌-হুকম্‌' ইত্যাদি), দিনপত্রী, প্রতিবেদন, হস্তলিখিত সংবাদপত্র (ফর্দ-এ-ওয়াকেয়া' এবং পরে 'পারচা-এ-আখ্‌বার' অথবা 'আখ্‌বারাৎ';

উত্তরকালে যেসবের যথাযথ ও বিস্তৃত ব্যবহার মেলে যদুনাথ সরকারের গ্রন্থাবলীতে) এবং নানাবিধ মৌল উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। যদিচ ইতিপূর্বে এমতো প্রামাণ্য ইতিহাসের নজির আদৌ মেলে না; তৎসত্ত্বেও কতিপয় প্রয়াস প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। ঘজনীর সুলতান মহ্‌মুদ সম্পর্কিত "কিতাব-ই-ইয়ামিনি", ঘোরীবংশ সম্বন্ধীয় "তাজ-উল্‌-মাসির"; খিলজীবংশ বিষয়ক "তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী"; শেষোক্ত সুলতানের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিখেছেন শম্‌শ্‌-ই-আফিফ্‌ একই শিরোনামায় এবং "তবকাৎ-ই-নাসিরী" (১২৬০) নামীয় গ্রন্থকে ভারতের মুসলমান যুগের প্রথম ইতিহাস হিসাবে আখ্যাত করা অত্যুক্তি নয়।

আকবরের 'দ্বিতীয় আত্মা' আবুল ফজ্‌ল্‌ (যাঁর রচনাশৈলী ও বাক্যবিন্যাসের কুটত্ব স্বভাবতঃই আমির খস্‌রুকে স্মরণ করায়) রচিত "আকবরনামা" এক আদর্শ সাহিত্যিক নমুনা হিসাবে পরবর্তী দেড় শ' বছর বাদশাহ্‌দের ইতিহাসকারদের লালন করেছিল। অতঃপর মুহম্মদ কাশিম ফেরিস্তার "তারিখ্‌-ই-ফেরিস্তা" বা "গুল্‌সান্‌-ই-ইব্রাহিমি," মুহম্মদ হাশিম (যিনি খাফী খাঁ অভিধায় অধিকতর প্রসিদ্ধ) রচিত "মুন্‌তাখাব-উল্‌-লুবাব্‌ মুহম্মদ শাহী" প্রভৃতি গ্রন্থে দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহ্‌দের বিস্তৃত বিবরণী ব্যতিরেকে প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যগুলিরও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্তমান।

অওরংজীবের মৃত্যুর (৪ মার্চ ১৭০৭) পর মুগল বাদশাহ্‌দের অবস্থা অত্যন্ত তরঙ্গসঙ্কুল হতে থাকল। পাঁচ বছরের ব্যবধানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যু; ঘরোয়া বিবাদ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ এবং সার্বত্রিক নৈরাজ্যের প্রেক্ষিতে নাদির শাহ্‌ ও আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর আক্রমণ; মরাঠাদের উত্তর ভারত অভিযান ও অধিকার; সর্বোপরি জাঠ ও শিখ অভ্যুত্থানের ফলে মুগল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ত্বরান্বিত হল। বলা বাহুল্য বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সত্তর বছরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহের ভূমিকা কার্যতঃ পুতুলসুলভ; সাম্রাজ্যসীমা ক্রমান্বয়ে কতিপয় গ্রামে পর্যবসিত হল; রাজকোষ শূন্য, দেশময় দৈন্য ও অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত। এমতো অবস্থান্তরে আকবর-শাহ্‌জহানী যুগের গৌরবিত ইতিহাসরচনার আকাঙ্ক্ষা যে নিতান্তই আকাশ-কুসুম সে বিষয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই।

আঠার শতকের অকুলীন 'নামা'গুলি প্রায়শঃ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তৎসত্ত্বেও এসবের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দের শেষার্ধে ঘুলাম কাদির কর্তৃক দিল্লী দখল, দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের চক্ষু উৎপাটন, রাজপরিবার অবমাননার রোমহর্ষক আখ্যান স্বভাবতঃই ভারতে ইংরেজদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে পরের বছরের জুলাই মাসে ফরাসী বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণের ইতিহাস প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য। অতএব ইংরেজদের প্রাণনা ও উৎসাহে তাঁদের মুনশীরা মুগল সম্রাটের শেষ পর্বের ইতিহাস রচনায় যত্নবান হলেন। মুহম্মদ শাহের ধাত্রীপুত্র ('দুধভাই') মুহম্মদ বখ্‌শ রচিত উক্ত সম্রাটের ইতিহাস; নাদির শাহের ভারত আক্রমণের চমকপ্রদ বিবরণ এই রচনায় বর্তমান। ইউসুফ আলীর আলীবর্দী খাঁর ইতিহাস। ফকীর খয়ের-উদ্দীনের "ইবরৎনামা," মাহাদ্‌জী সিন্ধিয়া, ঘুলাম কাদির প্রমুখ বিষয়ক মূল্যবান রচনা। ঘুলাম আলীর "ইমাদ-উস্‌-সাদাৎ," মূলতঃ লখ্‌নৌয়ের নবাবদের কাহিনী।

আবদুল হলীম 'শরর্‌' রচিত আলোচ্য গ্রন্থের 'রাজবৃত্ত' অধ্যায়ে অওধ রাজ্যের পত্তন থেকে বস্তুতঃ ওয়াজেদ আলী শাহের কলকাতায় বসবাস বিষয়ক বহুধাবিচিত্র বিবরণী বর্তমান; এতদ্ব্যতীত 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতিবৃত্ত' পাঠ আমাদের পক্ষে প্রায় এক অভিজ্ঞতা। মুনীরা খাতুন ও

গুরুদাস ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহেই ধন্যবাদার্হ যাঁদের দ্বৈতপ্রয়াসে শররের "মশরিকী তমদ্দুন কা আখিরী নমুনা ইয়া গুজিশ্‌তা লখ্‌নৌ"-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ সম্ভব হয়েছে।

লখ্‌নৌ নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে 'লক্ষ্মণপুর' থেকেই বিকৃত 'লখনউ' অপেক্ষা লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ আদিতে লখ্‌নৌতী এবং অবশেষে লখ্‌নৌ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। লংকা বিজয় ও বনবাস অন্তে রাজা রামচন্দ্র যখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করলেন, তখন বনবাসের সংগী প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণকে এই অঞ্চলটি জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। এমতো প্রবাদের প্রামাণিকতা কিন্তু রামায়ণ এবং পুরাণাদি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আদৌ মেলে না।

মুহম্মদ শাহের তরফ থেকে সাদৎ খান বুরহান-উল্-মুল্‌ক্ অওধের সুবাদার নিযুক্ত হন (১৭২৪)। লখ্‌নৌ শহরে সে সময় শেখজাদাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রবল। প্রথমতঃ তিনি শেখদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবন্ধ হন এবং 'পঞ্চমহলা' ও 'মুবারক মহল' ভাড়া করলেন। অতঃপর আপন শক্তিমত্তায় এই অঞ্চলে তিনি শান্তি ও শৃংখলাবিধানে সমর্থ হলেন। সাদৎ খানের মৃত্যুর (১৯ মার্চ ১৭৩৯) পর তাঁর জামাতা সফদর জংগ উত্তরাধিকারী হন। ইতিমধ্যে নাদির শাহের কাছে সম্রাটের আত্মসমর্পণ (ফেব্রুআ্যারি ১৭৩৯); এবং বন্দী মুহম্মদ শাহ্‌ সমেত পারসীক বাহিনীর দিল্লী প্রবেশ তথা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সফদর জংগ দু কোটি টাকার নজরানা পাঠিয়েছেন নাদির শাহ্‌কে। তিনি অওধ থেকে ফয়জাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সফদর জংগের মৃত্যুর (৫ অক্টোবর ১৭৫৪) অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর পুত্র শুজাউদ্দৌলা অওধের নবাব হন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ এবং মরাঠা শক্তিকে বিনষ্ট করার তাগিদে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী যখন বদ্ধপরিকর সুজাউদ্দৌলা সে সময় শেষোক্তের পক্ষাবলম্বন করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (জানুআ্যারি ১৭৬১) মরাঠাদের পরাজয়ের পর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে আশ্রয় দিলেন সুজাউদ্দৌলা; ইংরেজদের কাছে বারংবার পরাজিত বাঙলার নবাব মীরকাসিমও তাঁর আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হননি। কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী বক্‌সারের যুদ্ধে (২৩ অক্টোবর ১৭৬৪) ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরেজরা লখ্‌নৌ ও এলাহাবাদ অধিকার করায় সুজাউদ্দৌলা তাঁদের সংগে শান্তি ও সৌহার্দ্যবন্ধনে বাধ্য হলেন। তাঁর পুত্র অওধের চতুর্থ নবাব আসফউদ্দৌলার আমল (১৭৭৫-১৭৯৩) লখ্‌নৌয়ের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। ফয়জাবাদ থেকে তিনি লখ্‌নৌতে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। 'All the equipments and surroundings of wealth and grandeur were made by degrees transferred to Lucknow,' স্বভাবতঃই। আসফউদ্দৌলার সময়ে নির্মিত সুবিখ্যাত ইমামবাড়া ব্যতিরিক্ত রুমীদরওআজা, দওলতখানা প্রভৃতি 'শানদার' সৌধের সৌকর্য বিস্ময়কর। সর্বোপরি সীমাহীন বিলাসব্যসন নবাবকে অচিরে যেমন প্রবাদবাক্যে পরিণত করেছিল তেমনি তাঁর রাজকোষ হয়ে উঠল শূন্য। অতঃপর আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর (২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯৭) পর নবাবজাদা উজীর আলীর প্রথাসিদ্ধ উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জারজত্ব এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব। ভারতের বড়লাট জন শোরের মধ্যস্থতায় উজীর আলীর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর খুল্লতাত সাদৎ আলী খান (২১ জানুআ্যারি ১৭৯৮)। এবং মাসখানেকের মধ্যেই এক সন্ধিবন্ধে (২১ ফেব্রুআ্যারি ১৭৯৮) নতুন নবাবকে হারাতে হল এলাহাবাদ দুর্গের কর্তৃত্ব। রাজ্যসীমা সঙ্কোচন তথা উপস্বত্বের হ্রস্বীকরণ সত্ত্বেও তাঁর শাসনকাল লখ্‌নৌয়ের পক্ষে কল্যাণকর হয়। 'At his death (11 July 1814) Saadat Ali left behind him the name of 'the friend of the ryot,' and a full treasury' লিখেছেন আ্যারউইন্ সাহেব তাঁর *Garden of India* (লাণ্ডন্, ১৮৮০),

পৃঃ ১০৯) গ্রন্থে। সাদৎ আলী খানের পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দর 'শাহ্' উপাধিলাভে (২১ অক্টোবর ১৮১৯) প্ররোচিত হন; এবং এমতো সম্মানিত পদবীর বিনিময়ে ইংরেজরা নানাবিধ কৌশলে তাঁর রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। গাজীউদ্দীনের মৃত্যুর (১৮ অক্টোবর ১৮২৭) পর, পুত্র নাসীরউদ্দীন হায়দর তাঁর উত্তরাধিকারী হন। ভোগবিলাস সত্ত্বেও নাসীরউদ্দীনের মহানুভবতা ও বদান্যতার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। অতঃপর নাসীরউদ্দীন হায়দারের মৃত্যুর (৭ জুলাই ১৮৩৭) পর তাঁর এক খুল্লতাত মুহম্মদ আলী শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সাধ্যমত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কারসাধনে তিনি যত্নবান হন। ১৮৪২ খৃীস্টাব্দের ১৬ মে মুহম্মদ আলী শাহ্ মারা যান এবং তাঁর পুত্র আমজাদ আলী শাহ্ উত্তরাধিকারী হলেন। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকাল আদৌ ঘটনাবহুল নয়। শাসনকার্যে ক্রমবর্ধমান অবনতি ব্যতিরেকে কোনরূপ পরিবর্তনই প্রকৃত প্রস্তাবে দৃষ্ট হয় না। আমজাদ আলী শাহের মৃত্যুর (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭) পর তাঁর পুত্র ওয়াজিদ আলী শাহ্ অওধের শেষ শাসকরূপে অভিষিক্ত হন। অতঃপর অযোগ্যতার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)। আর মাসাধিক-কালের মধ্যেই অওধের শেষ উত্তরাধিকার চিরতরে লখ্নৌ ছেড়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন (১৪ মার্চ ১৮৫৬)।

আবদুল হলীম 'শরর্' রচিত এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিঃসন্দেহে ওয়াজিদ আলী শাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে মূল্যবান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের নিসৃষ্ট প্রতিনিধিবর্গের কারসাজি, হৃতসর্বস্ব ওয়াজিদ আলী শাহের নিঃসঙ্গ, অসহায়তা এবং শেষাবধি উৎকট বিলাসিতার শিকার হওয়ার মর্মস্পর্শী আখ্যান লেখক বিবৃত করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে গ্রথিত হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি। পারসীকচর্চা, যুদ্ধকৌশল, পশুপক্ষীর লড়াই, নাট্যাভিনয়, বেশভূষা, অলঙ্কার, মজলিশ প্রভৃতি বিষয়ক কৌতূহলী আলোচনা উল্লেখ্য।

পরিশেষে সবিনয়ে জানাই, গ্রন্থের প্রথমাংশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনে অনবধানতাবশতঃ লেখক যেসব অসম্বদ্ধ অব্দের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি শোধিত হলে মনস্ক পাঠক "পুরনো লখনউ" পাঠে অধিকতর লাভবান হবেন। এবং বাঙলা অনূদিত গ্রন্থে রোমক রাশির পরিবর্তে প্রচলিত সংখ্যাপাতই তো স্বাভাবিক!

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের যাত্রার ধ্বনি— আবুল কাসেম ফজলুল হক। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি। ঢাকা, ১। মূল্য আট টাকা।

আলোচ্য বইখানির রচনাকাল ১৯৬৭-৭২ এবং প্রকাশকাল ১৯৭৩। এ কালসীমার মধ্যে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনের জগতে এ কালবৃত্তের মধ্যে যে প্রবল আলোড়ন অনুভূত হয়েছিল তার মননশীল স্বাক্ষর আলোচ্য

গ্রন্থখানি। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর কালের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক পটভূমি গ্রন্থোদ্ধৃত প্রবন্ধগুলির আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়ায় বইখানি একটি ভাব-বিক্ষুব্ধ যুগের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে।

গ্রন্থটিতে মোট আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ লেখকের মননশীল ভাবনায় দীপ্যমান হলেও 'কালের যাত্রার ধ্বনি' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। লেখকের সতর্ক ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক এবং তীক্ষ্ম সাহিত্যিক দৃষ্টি যুক্ত হওয়ায় এ প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে। লেখকের মতে বাংলাদেশের সমকালীন সৃজনশীল সাহিত্যজগৎ বন্ধ্যা। এ বন্ধ্যাত্বের কারণ সৃজনধর্মী লেখকদের 'দৃষ্টি অন্ধ, বিবেক বিশুষ্ক, বুদ্ধি হৃদয়হীন, অনুভূতি বিকৃত, রচনা অন্তঃসারশূন্য।' এমন অবস্থায় লেখকদের পাঠকসংখ্যা হ্রাস পাবে এটা খুবই স্বাভাবিক। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এঁরা তাই মনোযোগী হলেন যৌন-বিকৃতিমূলক অবক্ষয়ী সাহিত্য রচনায়। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন তাঁদের প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে আর্ট সাহিত্যজগৎ থেকে নির্বাসিত হলো, সৃজনশীল সাহিত্যের লেখক, প্রকাশক, পাঠক—সবই ভোগলিপ্সু 'এলিট' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যবিচারের পুরাতন মানদণ্ড বর্জিত হলো, কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মূল্যনির্ণায়ক নতুন কোন মানদণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল না। ফলে বিবেকহীন, শিল্পচেতনাহীন অবক্ষয়ী সাহিত্যকে প্রতিরোধ করবার কোন শক্তিও সাহিত্যজগতে দেখা গেল না।

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে লেখক এ অবক্ষয়ের কারণ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে নবাবী আমলে যে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং যে শ্রেণীসত্তা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত, সে শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিবেশে আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। বৃত্তির দিক থেকে ইংরেজ-প্রভুর পদলেহী বলে এ মধ্যশ্রেণী ছিল চরিত্রভ্রষ্ট, আত্মপ্রত্যয়হীন। এ আত্মপ্রত্যয়হীনতা বিদেশী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অন্ধ অনু-করণের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের একটি অংশ সংকট-বিধ্বস্ত য়ুরোপের অবক্ষয়ী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ অবক্ষয়ী যুগটিকে নতুন যুগ বলে ভুল করে বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ যুগ সৃষ্টির কাজে তাঁরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শান্তরসাস্পদ এবং মঙ্গল-আদর্শের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এঁরা সাহিত্যে 'কলাকৈবল্যবাদী' মতবাদকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। সুস্থ জীবনচেতনা তাঁদের সাহিত্য থেকে বিদায় নিল, প্রবল নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করায় সমুচ্চ মানবমহিমার উপলব্ধি এ পর্যায়ের সাহিত্যে স্তিমিত হয়ে এলো। লেখকের মতে সমুচ্চমানবাদর্শবিচ্যুত ভঙ্গীপ্রধান এ যুগের সাহিত্য অবক্ষয়ী, নতুন কোন যুগচেতনায় স্পন্দমান নয়। সাম্যবাদী রুশ বিপ্লবের প্রভাবে বাঙালী মধ্যশ্রেণীর এক অংশের শিক্ষিত তরুণ মনে যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সঞ্চার হয় এবং তার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে, লেখকের মতে বাস্তবিক পক্ষে তখন থেকেই হয় নতুন যুগের সূচনা। নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টিতে শোনা গেল সেই নবযুগের ধ্বনি। নতুন যুগের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হলো সমাজতন্ত্রের আদর্শ; এ আদর্শপ্রভাবে যে শ্রেণীর নরনারী সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেল তারা শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে আহৃত।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে দুটি সুস্পষ্ট চিত্র দেখা

গেল : (১) একদল লোক প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অবক্ষয়ী সাহিত্য, চলচ্চিত্র প্রভৃতি নির্মাণ করে জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিতে চাইলো, (২) আর একদল মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে প্রগতিশীল মানবতন্ত্রী চিন্তার পথে অগ্রসর হতে চাইলে ভারতের দালাল, কমিউনিস্ট কিংবা রাষ্ট্র-দ্রোহী বলে চিহ্নিত হলো। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় অবক্ষয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচার করে একশ্রেণীর ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বিপুল অর্থের মালিক হলো, আর মুক্তবুদ্ধি সদ্বিবেকী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলো। শামসুর রহমানের মত শক্তিমান কবির কাব্যেও সেই নৈরাশ্য, বেদনা ও বিষণ্ণতার সুর। লেখক মনে করেন বর্তমান সাহিত্যকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণহীন এলিট সম্প্রদায়ের মেকী সৃষ্টিচেতনা অতিক্রম করতে হবে, আর সে জায়গায় সবল অভিব্যক্তি দিতে হবে প্রাণবান শ্রমিক-কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীকে। সে বাণীর বাহনও হবে সহজ সরল সর্বজনবোধগম্য ভাষা। অর্থাৎ নতুন যুগের সাহিত্যের বিষয় হবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার শৈল্পিক প্রকাশও হবে অভীষ্ট সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী। নবযুগের এই নবীন সাহিত্যসৃষ্টি একমাত্র সম্ভব শক্তিমান প্রতিভাবান-দের দ্বারা—বাংলাদেশের সাহিত্যজগৎ এখনও যে প্রতিভাবান স্রষ্টার প্রতীক্ষারত (দ্রষ্টব্য : প্রতিভাবানদের প্রতীক্ষায়)।

লেখকের মতে নজরুল-মানিক সুভাষ সেই নবযুগের নতুন ধারার সাহিত্যদ্রষ্টা—যাঁদের উত্তর-সূরীর সাক্ষাৎ সমকালীন পূর্ববাংলার সাহিত্যে বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন বিশ্ব-দৃষ্টি একালের রচনায় নেই, শ্রেণীগত ভূমিকার কথা লেখক বা পাঠক কেউ ভুলতে পারছেন না, ফলে 'সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে নতুন সাহিত্যধারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তার সামনে বিকাশের পথ কণ্টকাকীর্ণ।' (পৃষ্ঠা ১১১)। নতুন যুগের নবীনতাধর্মী সাহিত্যের বিকাশকে বাধামুক্ত করতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন শ্রেণীসংস্কারমুক্ত প্রতিভাবান লেখকের, তেমনি প্রয়োজন সৎ পাঠকের। সৎ পাঠক সৃষ্টির অনন্যনির্ভর উপায় হিসেবে লেখক দেশের মধ্যে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা বিস্তারের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথাও বলতে ভোলেন নি। গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য : 'তাদেরকে (শ্রমিক-কৃষক-জনতাকে) দিতে হবে জীবন ও সমাজের প্রয়োজনীয় মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক শিক্ষা। শিল্পী সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের এ কাজে অগ্রসর হতে হবে। একাজে আত্মনিয়োগ করলে সে চেষ্টা অর্থময় হবে।......আমাদের সমাজে আজ একজন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে একজন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন অনেক বেশী।'

খুবই খাঁটি কথা। জীবন ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যে অর্থপূর্ণ প্রগতিশীল সৃষ্টির সহায়ক, সাহিত্য-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ আলোচনায় একথা অনেকেই মনে রাখেন না। স্বদেশ- ও স্ব-সাহিত্যপ্রেমিক চিন্তাশীল লেখক ফজলুল হক সাহেব বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আলোচনায় মূল সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই মননশীল ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিপ্রেমিক এবং সাহিত্যস্রষ্টাদেরও চোখ ফুটিয়ে দেওয়া উচিত।

টলস্টয়ের 'On Art' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ (শিল্প প্রসঙ্গে) আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হলেও বাস্তবিকপক্ষে উপযোগিতাহীন নয়। যেহেতু প্রবন্ধটিতে টলস্টয় প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ার শিল্প-সাহিত্যের অবক্ষয়ের অন্তর্নিহিত যে কারণগুলি বর্ণনা করেছেন, লেখকের মতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব বাংলার শিল্প-সাহিত্যের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটেও প্রায় একই

কারণ বিদ্যমান ছিল। এ ছাড়া প্রগতিশীল মহৎ শিল্পসাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে টলস্টয় যে আদর্শানুসারী ছিলেন, লেখকের আদর্শও প্রায় অনুরূপ। অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখক বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান শিল্পসাহিত্য যাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে অসমর্থ, যাঁরা মহত্তর সৃষ্টির আগ্রহী, টলস্টয়ের শিল্পধারণা তাঁদের শিল্পজিজ্ঞাসা ও সৃষ্টি-সাধনায় গতিসঞ্চারে সহায়ক হতে পারে—এই ভরসায় তিনি ক্লাসিকধর্মী প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন।
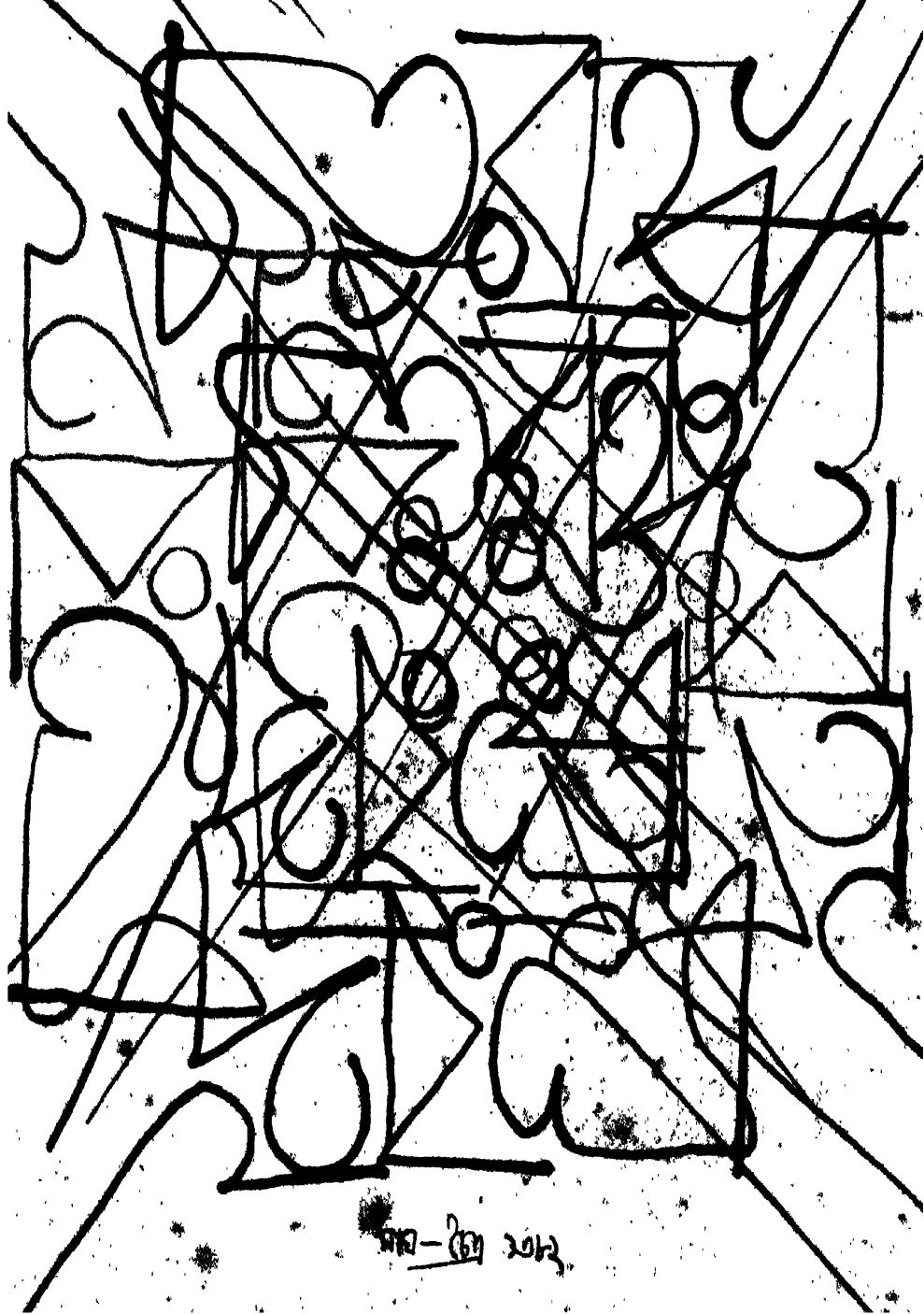
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা
মাঘ—চৈত্র ১৩৮২

আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি.........

পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লব কথাটা এখন আর শুধু কথার কথা নয়, বলা যায় পুরোপুরি খাঁটি। তবু শুধু মুখের কথা নয়, দেখা যাক তথ্যের নিরিখে ঘষলে এই দাবী কতটা সার্থক।

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৯৬·৬০ লক্ষ একর জমিতে আউশ, আমন ও বোরো মিলিয়ে চাল উৎপাদিত হয়েছিল মোট ৩৫·৬১ লক্ষ টন। সে তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে চাষ হয়েছে ১৩৩·৯৩ লক্ষ একর জমিতে এবং চালের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫·৪৩ লক্ষ টনে। ১৯৭৫-৭৬ সালে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৩·৫০ লক্ষ টন এবং আশা করা হচ্ছে যে প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টনের বেশি হবে।

অধিক ফলনশীল বীজের প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম চাষের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ১·০২ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ হয়েছিল এবং উৎপাদন ছিল ৩৪·০ হাজার টন, সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে গম চাষ হয়েছিল ১০·৪২ লক্ষ একর জমিতে এবং ফলনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮·৩৭ লক্ষ টন।

১৯৭৫-৭৬ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ হয়েছে এবং অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ হল ১১ লক্ষ টন। উল্লেখজনক যে এই পরিমাণ হবে রেকর্ড।

১৯৭৫-৭৬ সালে দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন প্রকল্প অনুযায়ী ৪৮০০ অগভীর নলকূপ, ৭৭টি গভীর নলকূপ, ২০টি নদী সেচ কেন্দ্র, ১৯টি অন্যান্য সেচ প্রকল্প এবং ৫০০ পুকুর ও ৬২৫ কূপ খননের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ১৭ হাজার হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সার ব্যবহার করছেন। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে নাইট্রোজেনের ব্যবহার ছয় গুণ বেড়েছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে ফসফেটের ব্যবহার প্রায় চার গুণ এবং পটাশের ব্যবহার প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

নজর করেছেন কি

যে কলকাতার লোকের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে?

কারও মুখ হাঁ, কারও চোখ ট্যারা আর কারও বা নাক কুঁচকে যাচ্ছে? রাসবিহারী, বিধান সরণি আর বেহালায় ডায়মণ্ড হারবার রোডে রাত্রে আলোর ছটা, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, আনওয়ার শা রোড, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, চেতলা আর উল্টোডাঙ্গা ব্রীজ এসব জায়গায় এসে অনেকেই বলে ফেলেছেন, 'কালী কলকাত্তাওয়ালী, আর কত খেলাই দেখাবি?'

মুখ হাঁ হওয়া মানেই মুখ বন্ধ হয়নি। এখনও শোনা যায় সি এম ডি এ-র তো পঞ্চাশ মাসে বছর। প্রায় পঞ্চাশ বছর চুপ করে থাকার পর পাঁচ বছরে ৫০ বছরের কাজটা হচ্ছে সেটা খেয়াল রাখার দরকারটা কি? জনবহুল এলাকায় একটি পাইপ বসাতে কি হাঙ্গামা, তার হিসাব আছে? প্রথম তো পাশাপাশি দুজনের বেশী মজদুর কাজ করতে পারেন না। তারপর মাটি খুঁড়লেই ইলেকট্রিক, টেলিফোন, জল আর গ্যাসের লাইন। সেগুলি সাবধানে সরিয়ে গর্তের নীচটা এবং ধারটা পাকা-পোক্ত করে ঠিক ঢল অনুযায়ী পাইপ বসিয়ে আবার সেই ইলেকট্রিক, টেলিফোন ইত্যাদির লাইন বসিয়ে মাটি চাপা দিতে কত সময় লাগে? শুধু তাই নয়, যতদিন না মাটিটা ঠিক আগের মত 'সলিড' হয়ে বসে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করবার উপায় নেই। করলেই বসে যাবে বা ধসে যাবে। অবশ্য তখন সি এম ডি এ-কে গাল দেবার নতুন ছুতো পাওয়া যাবে। যাই হোক, অস্থায়ীভাবে হলেও আমরা খোঁড়া রাস্তাগুলির ওপর পীচ দিয়ে দেবো যাতে বর্ষার সময় জনসাধারণের অসুবিধা কম হয়। এটা কিন্তু অস্থায়ী ব্যবস্থা, স্থায়ী ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। এই অস্থায়ী মেরামত স্বভাবতঃ খুব পাকাপোক্ত হবে না। তবু আপনাদের অসুবিধার কথাই ভাবছি।

আর কিছুদিন পরেই তো বর্ষা নামবে। তখন রাস্তায় জল জমলেই সি এম ডি এ-কে গাল দেবার আর একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। 'এত টাকা খরচ করেও জল জমা বন্ধ করতে পারল না—রা।' ঠনঠনে কালীতলায় যে ঝাঁকামুটের ঝাঁকাতে করে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতো (কারণ সেখানে একগলা জল), পাইকপাড়ায় যে মাছ ধরা হতো অথবা লেকটাউনে যে নৌকা চলতো সেগুলি কি আমাদের মনে আছে? আগেই সি এম ডি এ-র সাফাই গেয়ে রাখছি, বেশী বৃষ্টি হলে জল জমবেই। তবে যতই জল জমুক যেখানে কাজ হয়েছে সেখানে আগের মত বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। কথাটা মনে না থাকলে কাগজটা কেটে রাখুন।

কাগজে বের হচ্ছে খবর, 'বস্তিতে স্বস্তির নিশ্বাস'। পাকা পায়খানা, পাকা রাস্তা, জল আর বিজলী বাতির কল্যাণে বস্তি আর সে বস্তি নেই। 'কিন্তু তবু বাবুদের মন ওঠে না। তাঁদের নাক কুঁচকেই আছে।' বড় জোর স্বীকার করবেন যে, এখানে হয়েছে বটে তবে ওখানে হয়নি। সামান্য কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে যা দেখেছি.........।

এই সবজান্তা বাবুদের নিয়েই মুশকিল। বাইরের লোক এসে বলে যাচ্ছেন 'কলকাতাকে আর চেনাই যায় না', বেহালা, চেতলা, যাদবপুর, হাওড়া, হুগলী, রিষড়া, ব্যারাকপুর, বারুইপুর সর্বত্র খুশীর আমেজ, বস্তির লোকেরা বেশী খুশী। কিন্তু কুঞ্চিতনাসা বাবুরা বলবেন, 'এ আর এমন কি? আসলে প্রচার বেশী কাজ কম।'

স্বীকার করছি প্রচারটা একটু বেশী। এক তো আমরা চাই বা না চাই, লোকের মুখে মুখে সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। আর প্রচারের প্রয়োজন? নিশ্চয়ই আছে। এখনও অজ্ঞানতার বহর কম নয়। জানতেন কি নর্দমা তৈরীর এত হাঙ্গামা? জানতেন কি যে কলকাতা প্রতি বর্ষাতেই ডুববে? আমরাই তো জানিয়ে

দিচ্ছি। কারণ আপনার জানা দরকার। দয়া করে ডাবের খোলাটা ড্রেনের মধ্যে ফেলে 'সাহায্য' করবেন না। দয়া করে খোলা ট্যাপে জল ঝরাবেন না। নিজের মাথায় জঞ্জাল ফেলবার জায়গা নেই বলে অন্যের মাথায় ফেলবেন না। আমাদের প্রচারের অপেক্ষা না রেখেই তরুণ সমাজ এবার সাফাই আন্দোলনে নামছেন, ভিড়ের বাসে মেয়েদের ও অক্ষমদের 'সীট' ছেড়ে দিচ্ছেন অনেকে। কর্পোরেশন, সি আই টি, রেল, বাস, ট্রাম—সকলেই চেষ্টা করছেন কলকাতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কলকাতার সুনাম যদি সহ্য না করতে পারেন, তাহলে এলোপাথাড়ি সি এম ডি এ-কে বা চেয়ারম্যান ভোলানাথ সেনকে গাল দিন বা আরও সহজে একটা নাটক লিখে ফেলুন। বৃহত্তর কলকাতার উন্নতি দেখে বা না দেখে হাঁ-করা মুখ, ট্যারা চোখ আর কুঞ্চিত নাসিকা 'ক্যারেক্টারের' অভাব হবে না। এটা সি এম ডি এর গ্যারাণ্টি।

কারণ কলকাতায় 'সবজান্তা'দের অভাব নেই। তাঁরা জল জমলে চেঁচান আর জল জমা বন্ধ করতে নর্দমা কাটলে চেঁচান। অবিশ্বাসের বহর এতই বেশী যে বিরাট বিরাট পাইপ বসালেও যে জল সরবে, এটা তাঁরা মনে করেন না। 'বাস' নেই বলেন, আবার পুরো ভাড়াটা দিতে বা কিউ করতে অনিচ্ছা। তাঁদের মতে রাস্তা চওড়া হচ্ছে গাড়ীবাবুদের জন্য (বাস, ট্রামও যে রাস্তায় চলে সেটা ভুলে যান), 'জলকষ্ট' বলে তাঁরা সমালোচনা করেন তবে রাস্তার আর বাড়ীর কলে যে জল নষ্ট হয়, সেটা তাঁরা দেখতেই পান না। এমন কি বস্তির উন্নয়নেও তাঁদের আপত্তি। একটা গাছ কাটা গেলে এঁরা চোখের জল ফেলেন, কিন্তু যে ৪/৫ হাজার নতুন গাছ লাগানো হয়েছে তাতে এক ফোঁটা জল দেন না।

এঁদের নিয়েও কলকাতা। কলকাতা বদলাবে, কিন্তু এঁরা?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী
১ম খণ্ড : পাঁচ টাকা, ২য় খণ্ড : পাঁচ টাকা
৩য় খণ্ড : নয় টাকা

ভারতীয় প্রদর্শশালাসমূহের বিবরণপঞ্জী
২০·০০

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা হস্তশিল্প
২·২৫

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

মূল্য : পাঁচ টাকা

*

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বাংলার উৎসব	১·২৫
বাংলার লোকনৃত্য	২·৯০
বাংলার শিকারপ্রাণী	৩·০০
দেশের গান	০·৫০

হুগলী জেলা গেজেটীয়ার	৪০·০০
বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার	২৫·০০
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গেজেটীয়ার	১৫·০০
মালদা জেলা গেজেটীয়ার	২০·০০

[এই সিরিজের বইয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ১৫%]

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস (পাব্‌লিকেশন ব্রাঞ্চ),
৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

নগদ বিক্রয়কেন্দ্র :
পাব্‌লিকেশন সেলস অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা, ১

Only Chloride could beat Chloride's 'long-life' record!

Chloride India's
•advanced technology presents•

Exide
supreme
Tomorrow's battery here today!

STRIKING THE RIGHT CHORD
DUNLOP INDIA
has been in harmony,
striking the right chord
in the country's
industrial develop
In the service of India's
transport, industry,
agriculture, defence
and exports.
DUNLOP INDIA
keeping pace with progress
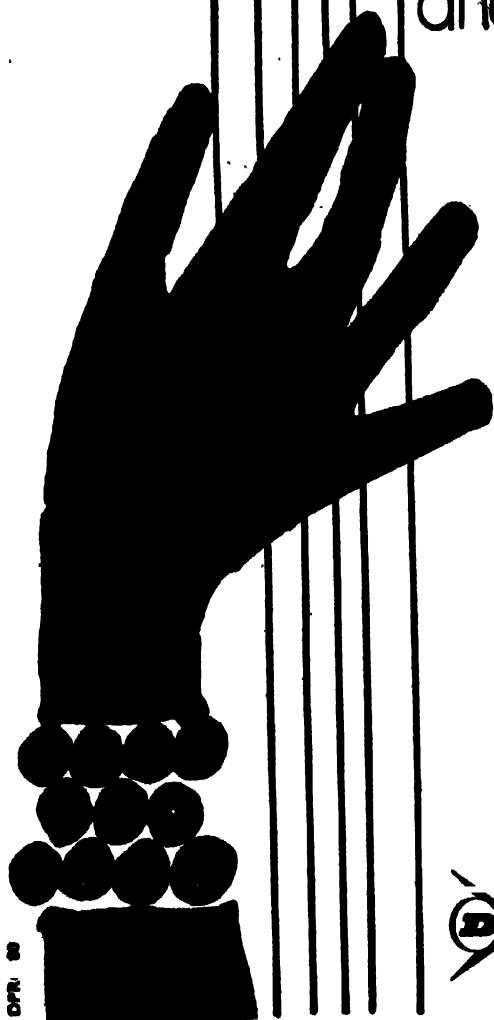
ভারতে এসে টমাস বাটা অসংখ্য ক্ষত ও সংক্রমণে বিধ্বস্ত ওই পাগুলি দেখলেন।..দেখলেন লক্ষ লক্ষ লোক খালি পায়ে চলাফেরা করে।

এদের জুতো পরাতে চাই

আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটা
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লক্ষ্য করেছিলেন
আমাদের দেশে অসংখ্য খালি পা
ঢাকার জন্য দরকার যান্ত্রিক উপায়ে
তৈরী প্রচুর জুতোর।
আজ টমাস বাটার জন্ম শতবার্ষিকী
আমরা পালন করছি।
সেই সঙ্গে বানিয়ে চলেছি
এমন দামে জুতো
লক্ষ-লক্ষ মানুষ যা কিনতে পারে।

Bata

ভালো জুতোর চেয়েও ভালো

বর্ষ ৩৭ মাঘ-চৈত্র ১৩৮২
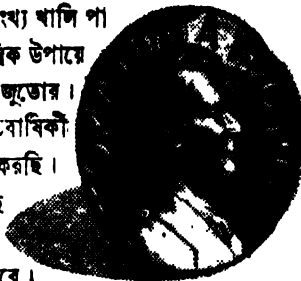
সূচিপত্র

রাজ্যেশ্বর মিত্র । বৈদিক যুগের দেবসভ্যতা ২৯৩
রত্নেশ্বর হাজরা । একা শুভঙ্কর ৩০৫
দিনেশচন্দ্র রায় । বিভাবরী ৩২৫
কিরণশঙ্কর রাহা । ভারতীয় চলচ্চিত্র ৩৩৭
লোকনাথ ভট্টাচার্য । তিমির তরাই-এ পাকাবাড়ি ৩৪২
সমালোচনা । অমলেন্দু বসু, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত ৩৮২

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩৭ মাঘ-চৈত্র ১৩৮২

বৈদিক যুগের দেবসভ্যতা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কিছুকাল হল বৈদিক সংগীতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনায় রত আছি। সংগীত এমন একটি বিষয় যা আরও বহুতর বিষয়কে অধিকার করে আছে। এই সংগীতকে অনুশীলন করতে করতে বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব এবং মনে নানা প্রশ্নের উদয়ও হতে পারে, যার উত্তর পাওয়া কঠিন, অন্তত এতাবৎকাল পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পাওয়া গেছে বলে জানিনে। আর একটি বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা হওয়া আবশ্যক; সেটি হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা, যা একটি বিরাট দর্শনরূপে গণ্য হয়ে এসেছে, তার যৌক্তিকতা কতখানি, সে প্রশ্নও আজ প্রবলভাবে আমাদের চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। যে মন্ত্র অত্যন্ত সরলভাবে স্পষ্ট, যার দ্বিতীয় অর্থ করা সম্ভব নয়, তার বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে কেন তার একটা রূপক অর্থ করা হবে—তাও বুদ্ধির অগম্য বলেই মনে হয়,—অথচ বহু শতাব্দী ধরে তাই করে আসা হয়েছে। বেদের মন্ত্রভাগ কী বলছে, তার বাস্তব ঐতিহাসিক উপাদান কী, সেটাই কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। তা না করে বাস্তবকে অনুমানের বা ইচ্ছাপ্রণোদিত কল্পনার সমর্থনে জটিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ধর্মতত্ত্বে পরিণত করাটা ধর্মসম্মত আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ এই ব্যাখ্যা বহুল পরিমাণে কৃত্রিম এবং উদ্দেশ্যপূর্ণও বটে।

সংগীত নিয়ে শুরু করেছি, অতএব সামগানের কথাটা কিছু বলে নিই। বৈদিক মূলমন্ত্র, যেগুলি বহু শতাব্দী ধরে সুপ্রাচীন একপ্রকার লৌকিক প্রথায় গাওয়া হত, তাদের ভাষা আর মন্ত্রের ভাষা এক নয়। একটা উদাহরণ দিই :

সুপ্রাচীন গেয় মন্ত্রের ভাষা,

ওগ্নাই আ য়াহী বীইতোয়াই গৃণানো হব্যদাতোয়াই।

নাই হোতো সাৎসায়ি বাহীষী॥

(গ্রামগেয় গোতম-পর্ক)

সংস্কৃত পাঠ্য সামবেদের ভাষা—

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥
(সামবেদ প্রথম প্রপাঠক, প্রথমার্ধ, প্রথম মন্ত্র।) ঋক্‌ ৬।১৬।১০।

প্রথমোক্ত মন্ত্রগানের ভাষা যে আদি কথ্যভাষার একটা রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিছক গাইবার জন্যই সংস্কৃত ভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে এরকম ধারণা করলে ভুল হবে। এই যে ভাষা, এইটিই ছিল দেবজাতীয় একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর আদিতম ভাষা। এই ভাষায় অগ্নিকে 'ওগ্নাই' বলা হত, ইন্দ্রকে বলা হত 'আইন্দ্র' এবং এইরূপ বিভিন্ন রকমের উচ্চারণের প্রকারভেদ ছিল। এই ভাষাকেই কোথাও কোথাও মার্জিত, অর্থাৎ সংস্কৃত করে তথাকথিত সংহিতার মন্ত্রভাগ গ্রথিত হয়েছে। এই সুপ্রাচীন গানগুলি ছয়টি স্বরকে অবলম্বন করে একটি বিশেষ লৌকিক রীতিতে গাওয়া হত। পরবর্তী কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিনটি স্বরকে অবলম্বন করে যে পাঠ, তার মূলে কাব্য-আবৃত্তির প্রেরণাই প্রধান ছিল এবং লঘু-গুরু বর্ণের স্থিতিকালকে স্বীকার করেই এই পাঠের নিয়মাদি নিবন্ধ হয়েছিল।

এই যে ছয়স্বরের প্রাচীন লৌকিক রীতির মন্ত্রগান, এর গতি ছিল নিম্নাভিমুখী। এটি সাধারণ রীতির বিপরীত। সংগীত চিরকালই ক্রমিক উচ্চপর্দায় আরোহণরীতিতে আচরিত হয়ে এসেছে এবং গানের মুখ্য অন্তরা-ভাগটিও আরোহণক্রমেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু লৌকিক বেদগানে অবরোহণক্রমটিই স্বীকৃত ছিল। এই রীতি দেবজাতীয়েরা বা তথাকথিত আর্যগণের কোন্‌ শাখা কোথা থেকে এনেছিলেন তা গবেষণার বিষয়। প্রাচীন হুর-মিতান্নি বা হত্তজাতীয়দের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন ছিল কিনা জানি না। যদি সেরকম কিছু ঐক্যনির্ণয় করা যায় তাহলে হয়তো ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে ব্যাবিলন অঞ্চলের সভ্যতার একটি বড় নিদর্শন নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

বেদগান সম্বন্ধে আমাদের আজও কোনো যুক্তিসম্মত ধারণা আছে বলে মনে হয় না, কেননা অবরোহণক্রমে বেদগানের স্বরূপ কী ছিল তা নির্ণয় করতে খুব কম লোকই এগিয়ে এসেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এক ধরনের ধর্ম-আন্দোলনকারী বেদ-বেদান্তের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বগুলি যে কী ছিল বাস্তব-প্রেক্ষণসমন্বিত যুক্তি দিয়ে কিছুমাত্র যাচাই করে দেখেননি, সংগীতের দিক তো দূরের কথা। ফলে, বেদগাননামক আধুনিক কাব্যগীতির প্রচলন করে তাঁরা বহুল পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন মাত্র, কিন্তু ভুলের স্বর্গেই রয়ে গেছেন, আসল স্বর্গের কোনো তত্ত্বই অবধারণ করতে পারেননি।

এইসব লৌকিক মন্ত্রগানের সুর-আরোপ সম্বন্ধে বহুবিধ বৃত্তান্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এইসব আখ্যায়িকা অনুসারে এক-একটি মন্ত্রের এক বা একাধিক নামকরণ হয়েছে। এইরকম একটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা সুগম হতে পারে।

একদা অঙ্গিরসগণ একটি যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁরা স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের যেখানে দেবতারা থাকতেন সেই পথ তাঁরা নির্ধারণ করতে পারলেন না। এঁদের মধ্যে কল্যাণ নামে একজন তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে নিজে সেই পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঊর্ণায়ুনামক এক গন্ধর্বের দেখা পেলেন। সেই গন্ধর্ব তখন অপ্সরীদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন। কল্যাণকে সেই স্থানে উপস্থিত হতে দেখে তিনি বললেন, 'কল্যাণ, তুমি তো দেখছি দলবলসহ স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছ; কিন্তু দেবতাদের বাসস্থান যে পথে সেটি খুঁজে পাচ্ছ না। এই সামটি স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তির পক্ষে খুবই উপযোগী। এটি আচরণ করলে

তোমরা স্বর্গরাজ্যের অভীষ্ট স্থানে পেঁাছোতে পারবে। কিন্তু তুমি যেন একথা বোলো না যে তুমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করেছ।' মন্ত্রটি হচ্ছে এই :

পরিপ্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ॥

(সাম। ৪৭৫)

এর সরল অর্থ হচ্ছে,

জ্ঞানবান যজনশীল কবি এমন দুটি স্থানের মধ্যে আছেন যেখান থেকে তিনি পড়ে যাবেন না। দিব্যলোকের প্রিয় পক্ষিগণ তাঁর সঙ্গে আছে। তিনি বন্ধুর পথ খনন করতে করতে উপরের দিকে চলেছেন।

এই মন্ত্রটিকে সোমরস নিষ্কাশনের প্রসঙ্গে বেদবিভাগকারিগণ পবমান কাণ্ডে সংযুক্ত করেছেন এবং এর অর্থ তখন করা হয়েছে এইরকম :

কবি সোম যজ্ঞস্বরূপ এবং স্বয়ং কবি (জ্ঞানী)। তিনি দুইটি দৃঢ় বস্তুর মধ্যস্থলে অবস্থিত আছেন। দিব্যলোকের প্রিয় পক্ষিগণ তাঁকে খনন করবার উদ্দেশ্যে উপরে আরোহণ করছে।

সোম একরকমের রসালো লতা। তাকে এক জায়গায় সংগ্রহ করে দুটি কাষ্ঠখণ্ড বা ওইরূপ কঠিন দুটি বস্তুর মাঝখানে রাখা হত যাতে লতাগুলির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা রোধ করা যেত। দিব্যলোকে পক্ষী বলতে এখানে প্রস্তরখণ্ডকে বোঝানো হয়েছে, কেননা এই প্রস্তর-খণ্ডগুলিই পক্ষীর মতো শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে নানা বিপদকে নিবারণ করত। এই প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সোমলতাগুলিকে প্রথমে ছেঁচে ফেলা হত, তার পরে বৃহৎ প্রস্তর সহযোগে সেগুলিকে পেষণ করে রসনিষ্কাশন করা হত।

অতঃপর, কল্যাণ তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে এলেন: এসে বললেন, 'স্বর্গরাজ্য এইবার আমাদের অধিকারে এসে গেছে এবং দেবতারা যে পথে অধিষ্ঠান করেন তাও আমি জানতে পেরেছি। তোমরা এই সামটি উচ্চারণ করো, তাহলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।' তাঁর সঙ্গীরা তখন তাঁকে বললেন, 'এই সাম সম্বন্ধে তোমাকে কে উপদেশ দিলেন?' কল্যাণের তখন দুর্বুদ্ধি হল, তিনি সত্য গোপন করে বললেন, 'আমিই এই সামকে প্রত্যক্ষ করেছি।' ফলে, সেই সামটি উচ্চারণ করে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা দেবপথে প্রস্থান করলেন, কিন্তু মিথ্যাচরণের জন্য কল্যাণ নিজে সেখানে যেতে সমর্থ হলেন না। তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং অবশেষে তিনি শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এই মন্ত্রটি ঊর্ণায়ু গন্ধর্বের নামানুসারে ঔর্ণায়ব সাম নামে পরিচিত এবং এর সুরও আরোপ করেছিলেন তিনি নিজে। এইভাবে বহু মন্ত্রই বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে এসেছিল এবং সেই নাম-গুলিই সাধারণভাবে গানের জন্য সংজ্ঞিত হত। যাঁরা বেদগ্রন্থাদি পাঠ করেছেন তাঁরা রথন্তর বা বৃহৎ,—এই দুটি সামের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। সাধারণভাবে এই নাম দুটি বললেই বেদজ্ঞগণ বুঝতে পারতেন কোন্ দুটি মন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। অনুরূপভাবে গেয় মন্ত্রের প্রচলিত নামগুলি বললেই মূল মন্ত্রগুলি বুঝে নেওয়া হত।

এই যে আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হল, এ থেকে আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হই। মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত একাধিক পথ প্রসারিত ছিল, কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করে স্বর্গলোকের অভ্যন্তরে সর্বপ্রদেশে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই দুটি প্রধান পথ হচ্ছে পিতৃযান এবং দেবযান। বহুতর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকলেও, এ দুটি যে দুটি প্রধান সড়ক ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ মন্ত্রভাগ থেকে উদ্ধার করা যায়। এর একটি ছিল পিতৃলোক থেকে

প্রসারিত, অপরটি দেবলোক থেকে বিস্তৃত হয়েছিল। এই পথগুলি যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল এবং এই রক্ষাকার্যটি পর্যবেক্ষণ করতেন গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ। কল্যাণ যখন দেবতাদের বাসস্থল নিরূপণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন দেবতাদের গুপ্তচরগণ তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এই গুপ্তচরদের বলা হত 'স্পশ', যাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পাই। তারাই পথরক্ষক গন্ধর্ব ঊর্ণায়ুকে এই ব্রাহ্মণের অভিযানের খবর দিয়েছিল। ঊর্ণায়ু অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন, কিন্তু প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁরই। তিনি এই ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করে জানলেন এ'র দ্বারা কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। অতএব তাঁকে একটি মন্ত্রগান শিখিয়ে উৎসাহ প্রদান করলেন এবং তাঁদের পথও উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর সহযাত্রীরা যখন অগ্রসর হয়ে এলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁরা অপরাপর পথপ্রদর্শকের সাহায্যে দেবভূমিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হয়তো এই মন্ত্রগানটি দেবলোকে যাত্রার জন্য একটি সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হত। আর-একটি ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে : সেটি এই যে, মন্ত্রগুলি থেকেই সর্বক্ষেত্রে উদ্দীপনা সংগ্রহ করা হত। যিনিই সমস্যায় পড়তেন বা বিপদ্‌গ্রস্ত হতেন, তিনিই কোনো কোনো বিশেষ মন্ত্রকে খুঁজে নিতেন প্রেরণালাভের জন্য। বেদসংহিতা একটি বিরাট সাহিত্য, সেটিই ছিল সর্বক্ষেত্রে উদ্দীপনা, সাহস আর স্থৈর্য সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, স্বর্গরাজ্য দর্শন করবার একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা বহু ব্যক্তির ছিল, কিন্তু যেসব গোপন পথ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত, সেগুলি এত গুপ্ত ছিল যে তাদের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। অন্তত দশ-বারোটি উপাখ্যান বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় যাতে স্বর্গলোকে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এতে কি এইটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে স্বর্গও পৃথিবীর মতোই একটি ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সেখানে বহু উন্নত জাতির বাস ছিল, যাঁদের সম্বন্ধে অপরাপর ভূখণ্ডে অসাধারণ কৌতূহল ছিল?

আসলে বৈদিক মন্ত্রগুলির অর্থ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ এবং স্পষ্ট। সেইগুলিকে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করতে গেলে মন্ত্রগুলির মূল তাৎপর্য প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্য একান্ত-ভাবেই মানবিক। সুখে, শান্তিতে, বিনা দারিদ্র্যে, বিনা কষ্টে সমাজবদ্ধ মানব হিসাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই বৈদিক মন্ত্রসমূহ মুখরিত হয়ে উঠেছে। বেদে আত্মা মানে প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ এই দেহ। মৃত্যুর পরে কী হবে বা বিশ্বজগৎনিয়ন্তা কোনো অদৃশ্য শক্তি আছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথার্থ বৈদিক যুগের দেবসভ্যতা আদৌ চিন্তা করত কিনা, তার কোনও প্রমাণ সুবৃহৎ মন্ত্রভাগ থেকে পাওয়া যায় না। বৈদিক ইন্দ্র দেবসমাজের কাছে মূর্ত বলবীর্যের প্রতীক, তাঁকেই তাঁরা মূল নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এইরকম আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় দেবতা ছিলেন যাঁরা বহুজনের দৃষ্টিগোচর না হলেও তাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না। দেবগণের কেউই অমর অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী ছিলেন না। তাঁরা সকলেই মৃত্যুর অধীন ছিলেন। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বার বার শতবর্ষ জীবিত থাকার কামনা করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ যুগেও যেমন শতবর্ষ আয়ু কাম্য, সে যুগেও তাই ছিল। অমর অর্থে অমৃত-শব্দের প্রয়োগ কালক্রমে চলে এসেছে; কিন্তু খুব সম্ভবত গোড়াতে শব্দটি ছিল 'অমর্ত্য'। এই অমর্ত্য-শব্দটিই বোধ করি রূপান্তরিত হয়েছে 'অমৃত'-শব্দে। সোমরসকে কোনো কোনো মন্ত্রে অমৃত বলা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে সোমপান করলে মানুষ মরণকে জয় করতে পারত; সোমরসের অপরিসীম উত্তেজক ও মদবর্ধক শক্তির জন্যই তাকে অমৃত বলা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে সোমকে ওষধির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যজ্ঞনামক অনুষ্ঠানটি পরবর্তী কালে যেমন বৃহদাকার ধারণ করেছিল, আদিতে এটি সেরকম

ছিল না। দেবতারা নিজেদের মধ্যে উৎসাহসঞ্চারের জন্যই একটি সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান করতেন। এতে পান-ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা থাকত এবং ইন্দ্রসহ সোমপান এর একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। মর্ত্যবাসিগণও যদি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন তাহলে দেবতাগণ খুশী হতেন। এই কারণেই অঙ্গিরসগণ স্বর্গের অভিযানে যজ্ঞানুষ্ঠান করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ উপঢৌকন নিয়ে আসছিলেন। স্বর্গলোকের একটি প্রদেশ হচ্ছে পিতৃলোক, যেখানে সুপ্রাচীন ঋষিরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। অঙ্গিরসগণ পিতৃলোকের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাই বলে তাঁদের সকলেও ইচ্ছামত দেবভূমিতে প্রবেশ করতে পারতেন না, অনেকে পথও জানতেন না। এ-ও হতে পারে যে কল্যাণ এবং তাঁর সহচরবৃন্দ পিতৃলোক থেকেই দেবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

যে 'অমর'-শব্দটির পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও কিছু বলবার আছে। সম্ভবত দেবগোষ্ঠীর একটি জাতির নাম ছিল 'অমর'। এ'রাই বর্তমান সিরিয়া অঞ্চলে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন সুমেরীয়দের পর। এ'দের বলা হয় অ্যামোরাইট (আমুরু)। খৃষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা হামুরাবি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ অনুমান অসম্ভব নয় যে দেবগোষ্ঠীর এই অমরজাতীয় লোকেরা নানা কারণে সিন্ধু-সভ্যতার ভিতর দিয়ে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করে-ছিলেন। কেউ কেউ এ'দের সেমিটিক বললেও, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। তবে মরণজয়ী এই অর্থেই যে 'অমর'-শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে সংস্কৃত ভাষা সুসম্বন্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই এইসব নামকরণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাকে মূল উৎস করে এইসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গেলে ভ্রম হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। মূল নামটি যে কী তা আমরা যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারি না, কেবল দেখি এক সময় 'অমর' বা 'অমুরু' নামক একটি জাতি শক্তিসম্পন্ন হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন।

হিমাচলে প্রতিষ্ঠিত দেবসভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট বাস্তবচিত্র থাকা উচিত ছিল এবং হুরিয়ান, মিতান্নিয়ান, হিটাইট, অ্যামোরাইট প্রভৃতি জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিষয়সমূহের তুলনাভিত্তিক আলোচনায় আত্মনিয়োগ করাও উচিত ছিল। কিন্তু কার্যত তার প্রায় কিছুই হতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। জানিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এসব বিষয়ে কোনো জ্ঞানচর্চার অবকাশ রেখেছেন কিনা। পরন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত—বেদসাহিত্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের আরোপ। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা উপনিষদকে বেদতত্ত্বের সার বলে গ্রহণ করেছি এবং যে ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি, আসলে তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। বৈদিক আদর্শ এবং ঔপনিষদিক আদর্শ ভিন্ন, অথচ উপনিষদগুলিকে এক-একটি বেদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বেদের মতবাদ স্পষ্ট, কিন্তু উপনিষৎ কোনো বিষয়েই স্পষ্ট নয় এবং বহুলাংশে পারম্পর্যবিহীন। যা আমরা অবধারণ করতে পারি না তাকে কী করে একটি বিশ্বাসের ভিত্তি করা যায় সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সত্যকে আমরা কিভাবে অবিশ্বাস্য রূপকে (সিম্বল-এ) পরিণত করেছি তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' নিবন্ধে ইন্দ্র সম্বন্ধে লিখছেন, 'যখন বেদে পড়ি যে, বৃত্র নমুচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের শেবক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছেন তখন অনেক স্থানেই বুঝিতে পারি যে, এইসকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্নমাত্র, বৃষ্টিনিরোধক ক্রিয়ামাত্র।

আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অমনি সে অসুরেরা মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে।...অতএব নমুচি বৃত্র শম্বর অহি প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টিনিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।' বঙ্কিমের এই মতবাদ সম্পূর্ণ স্বকীয়-ইচ্ছা-প্রণোদিত সিদ্ধান্ত। ঋগ্বেদ কদাচ এরকম রূপক বহন করে না এবং বৃত্র, নমুচি, শম্বর—এঁরা যে শক্তিসম্পন্ন অসুরবর্গীয় নেতা ছিলেন, এ সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। ইন্দ্র বৃত্রকে ছল করে ফাঁদে ফেলে হ্রদের অগভীর জলে হত্যা করেছিলেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত ঘটনাটি এইরকম :

ইন্দ্র যখন উষার প্রাক্কালে শর্যণাবতী হ্রদে অবতীর্ণ বৃত্রকে মারবার জন্য বজ্র উদ্যত করেছিলেন তখন তাঁর মাতা পুত্রের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে করতে পুত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন (ঋ ২।৩০।২)। ইন্দ্র উপর থেকে হ্রদের জলে নেমে এলেন। বৃত্রজননী সন্তানকে অবরোধ করে পড়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর পুত্রকে বিষম প্রহার করতে লাগলেন, তারপর বজ্রদ্বারা তাঁর হস্ত-পদ ছিন্ন করলেন। অবশেষে তাঁর সুবিশাল স্কন্ধে সুকঠোরভাবে বজ্রপ্রহার করে তাঁকে হত্যা করলেন। সেই অসুরমাতাও একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন (ঋ ১।৩২।৭,৯)। অতঃপর সেই বীভৎস মৃতদেহের (অথবা দেহ দুটির) উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাঁরা সেইখানেই পড়ে রইলেন দীর্ঘকাল (ঋ ১।৩২।১০)।

এই ঘটনা তো সম্পূর্ণ বাস্তব ব্যাপার। একে রূপকে পরিণত করতে যাওয়া মানেই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করা। ঐতিহাসিকগণ এই অসংগত ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পারেন কি? ইন্দ্র জলের নিয়ামক ছিলেন, একথা সত্য। যেহেতু দেবতাগণ পর্বতবাসী ছিলেন এবং সমস্ত জলপ্রবাহের উৎস পার্বত্যস্থল, সেইহেতু ইন্দ্রকে জলপ্রবাহকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হত। বরুণও একই কার্যে ব্রতী ছিলেন।

বৈদিক সাহিত্য থেকে এ তথ্যও জানা যায় যে অসুরনেতা নমুচি ইন্দ্রকে বিষাক্ত সুরা প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক চিকিৎসায় ইন্দ্র আরোগ্যলাভ করেন। নমুচি সম্ভবতঃ বৃত্রের অধীন সামন্তনায়ক ছিলেন, কারণ তাঁকে বৃত্রের দাস বলা হয়েছে। নমুচি দেবতাদের গোধন অপহরণ করায় ইন্দ্র তাঁর মস্তক চূর্ণ করেছিলেন। দাস নমুচি প্রথমে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে স্ত্রীসৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর অন্তঃপুরে তাঁর দুই সুন্দরী স্ত্রী ভিন্ন আর সব রমণীই এই অবলাসৈন্য-দলে যোগদান করেছিলেন। দুর্ভাগ্য নমুচি প্রায় সকলের সঙ্গেই ইন্দ্রকর্তৃক বিনষ্ট হন (৫।৩০।৯)।

এইসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে অসুরেরা একটি দুর্ধর্ষ জাতি ছিল। ঋগ্বেদ এঁদের 'অদেব' এবং 'অন্যব্রত' আখ্যা দিয়েছেন। অন্যব্রত অর্থে এটা স্পষ্ট হয় যে অসুরদের আচার-ব্যবহার-ব্রত-নিয়ম দেবতাদের থেকে বহুল পরিমাণে ভিন্ন ছিল। তাদের বাসভূমিকে বলা হত 'অসুর্যলোক'। বেবিলনীয় সভ্যতায় আমরা যে আসীরীয়দের ইতিহাস পাই তা থেকে জানা যায়, তাদের পূজ্য ছিলেন 'অসুর' —যার কোনো বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে নেই। প্রকৃতপক্ষে বেদসাহিত্য দেবতা বা দেবজন ভিন্ন আর কারুর কোনো সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করেননি এবং সুবৃহৎ সংহিতাভাগ কেবলমাত্র ইন্দ্রের জীবনকালটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইন্দ্র এবং অপরাপর দেবতাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে লঘু করবার উদ্দেশ্য নিয়েও কোনো কোনো উপনিষদে চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ বা কেনোপ-নিষদের একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোনো একটি যুদ্ধে ব্রহ্ম দেবতাদের জন্য জয় সাধন করলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মের বিজয়

দেবতাদের কাছে অগোচর রয়ে গেল যেহেতু তিনি দেবতাদের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন না। অতএব দেবতারা বিশ্বাস করলেন সেই জয় যথার্থভাবেই তাঁদের এবং তার মহিমাও তাঁদেরই প্রাপ্য। সুতরাং তাঁরা নিজেদের নিয়েই গৌরব করতে লাগলেন। ব্রহ্ম এটি জানতে পারলেন এবং স্বয়ং দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা এই আশ্চর্য মূর্তিটি কার সেটি বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন ইনি একজন শক্তিমান যক্ষ হতে পারেন (কারণ এই ঘটনাস্থল হৈমবত অঞ্চল, যেখানে যক্ষ, রুদ্র প্রভৃতি দেবজন বাস করতেন)। তাঁরা অগ্নিকে তাঁর কাছে পাঠালেন এই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিটির পরিচয় জানবার উদ্দেশ্যে। ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ বীর্যের অধিকারী?' অগ্নি বললেন, 'পৃথিবীর তাবৎ বস্তুকে আমি দহন করতে সক্ষম।' তখন ব্রহ্ম তাঁকে একটি তৃণ প্রদান করে বললেন, 'এটিকে দগ্ধ করো।' অগ্নি সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেও সেই তৃণটি দগ্ধ করতে পারলেন না। তিনি ফিরে এসে বললেন—এ'র পরিচয় জানা গেল না। অতঃপর বায়ুও তাঁর কাছে গিয়ে একইভাবে পরাস্ত হয়ে ফিরে এলেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্র নিজে ব্রহ্মের সমীপবর্তী হলেন। কিন্তু ব্রহ্ম তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হলেন, তাঁর বদলে সেখানে আবির্ভূতা হলেন বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। তিনি ইন্দ্রকে বললেন, 'তুমি যাঁর পরিচয় জানতে চাইছ তিনি ব্রহ্ম। তাঁর প্রদত্ত বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হয়েছ।' এইভাবে ইন্দ্র প্রথম ব্রহ্মকে জানতে পারলেন এবং দেবতারাই প্রথম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন।

এইটি একেবারেই বৈদিক আদর্শ বা প্রিন্সিপল-এর বিরোধী এবং সামবেদে ইন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিপরীত। সামবেদ সংহিতার সমগ্র ঐন্দ্রপর্বে কোথাও ইন্দ্রকে এইরকম নিজের বলবীর্যের প্রতি আস্থাহীন বলে জানা যায় না। দেবতাগণ ইন্দ্রকে তাঁদের নায়করূপে স্বীকার করতেন এবং ইন্দ্র রীতিমত প্রতিনিধিস্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে আলোচনা করে যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়েই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। দেবতাদের ধারণায় অতি-প্রাকৃতিক (সুপারন্যাচারাল) শক্তির স্থান ছিল না। তাঁরা আত্মন্ বা স্বকীয় দৈহিক এবং দলগত শক্তির পরিমিতির উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন। সংহিতায় ব্রহ্ম-শব্দটি বহুবারই প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু তা হয় যজ্ঞ-কারীকে বোঝাত, নয় প্রজাপতিকে (যিনি ইন্দ্রের সচিব ও সেনাপতি ছিলেন) বোঝাত। কখনও কখনও এই শব্দে ইন্দ্রকেও বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ছিলেন ব্রহ্ম। অথর্ববেদ অনুসারে ব্রহ্মের এক অর্থ পুরুষকার, অপর অর্থ জ্ঞান বা 'উইসডম'। উপনিষদসমূহের এবংবিধ প্রচেষ্টায় ইন্দ্র বা দেবগণের মহিমা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি, পরন্তু দেবসভ্যতার যে মানবিক ও বলিষ্ঠ আদর্শ ছিল একটা অস্পষ্ট অধ্যাত্মবাদের আরোপে তাকে স্তিমিত করবার অসংগত প্রয়াসই প্রবল হয়ে উঠেছে। উপনিষদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে তাঁদের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন কিন্তু স্থানে অস্থানে দেবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দুর্বল বা অসার প্রতিপন্ন করবার কোনও কারণ ছিল না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বেদান্তই বৈদিক আদর্শের অন্তকে ডেকে এনেছেন এবং জ্ঞানমার্গ আখ্যা দিয়ে ব্রহ্মনামক পরিকল্পিত এক দুজ্ঞেয় সংস্কার বা কৃত্রিম দর্শনের আড়ালে একটি পলায়ন-পর মনোবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান করেছেন।

বৃত্র বা নমুচির ব্যাপারে ইন্দ্রকে বা দেবতাদের কিছুটা অতিরিক্ত রকমের নিষ্ঠুর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। দেবতাগণ সকলেই একই রাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে একতাবদ্ধ ছিলেন এবং রাষ্ট্রের চোখে তাঁরা সবাই এক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের পোষক। শাসকগণ সকলেই রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তাঁদের

নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হত। যজুর্বেদ 'জনরাট্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে জনগণের রাজা বা জনগণের অনুমোদনে গঠিত রাষ্ট্র,—এই দুটিই বোঝাতে পারে। তবে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'একরাট্'; আবার সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে স্বরাট্ এবং বরুণকে বলা হয়েছে সম্রাট। স্বরাট্ শব্দের অর্থ যিনি স্বয়ং রাজা, আর সম্রাট শব্দের অর্থ যিনি সকলের রাজা। এক্ষেত্রে এইটাই বুঝতে হবে যে ইন্দ্র কারুর অধীনে ছিলেন না, তিনি স্বয়ং বহু ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বরুণ বৈদিক সাহিত্যে সাধারণভাবে রাজা বরুণ নামে পরিচিত। কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহার করা ইন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হত না, কারণ তৎকালীন রাষ্ট্রে সভা ও সমিতির ক্ষমতাও কম ছিল না এবং এইসব রাষ্ট্রীয় সভা-সমিতিতে ইন্দ্র সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুবিচার করতেন (অ ৭। ১২। ১-৩)। অথর্ববেদীয় কয়েকটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে বৃহস্পতি সভা ও সমিতির প্রধান ছিলেন এবং ইন্দ্র সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সুবিচার করতেন; অর্থাৎ স্বর্গবাসী সাধারণ দেবগণেরও এই সভা-সমিতিতে মতপ্রকাশের অধিকার ছিল। বোধ করি মর্ত্যসভ্যতায় এই রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা দেবসভ্যতা থেকেই প্রসারিত হয়।

দেবতারা যে একান্তভাবে সংকীর্ণ জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এটাও ঠিক নয়। কারণ—রুদ্র, মরুৎ, বসু, সাধ্য, গন্ধর্ব, ঋভু, আদিত্য প্রভৃতি বহুতর জাতিকে তাঁরা দেববর্গীয় করে নিয়েছিলেন। এঁরা দেবগণেরও পূর্ব থেকে স্বর্গের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বিশেষ করে গন্ধর্বগণ কোনো কোনো বিষয়ে দেবতাদের চেয়েও অগ্রসর ছিলেন। অশ্বচালনা, সোমরস নিষ্কাশন, বিবিধ কলাবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়েই তাঁরা দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অসুরগণ একটু আপোসের মনোভাব দেখালে তাঁরাও হয়তো দেবজন না হলেও দেবতাগণের বন্ধু বলে গণ্য হতে পারতেন।

যাকে আমরা বর্তমানে মানবতার নীতি বলি সমস্ত সংহিতাভাগ সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। অহিংসা এবং সাম্য—এ দুটি বেদেরই আদর্শ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইটাই যে জীবনধারার এই সরল বাস্তববাদকে ক্রমেই একটা অজ্ঞেয় অধ্যাত্মবাদে পরিণত করা হল এবং উপনিষদে এর পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়েছে। এই 'অধ্যাত্ম'-শব্দের অর্থ যে কী, বোধ করি কেউই নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। আত্মাকে অধিকার করেই তো অধ্যাত্ম শব্দটির উৎপত্তি; কিন্তু এই আত্মার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা কি বেদান্তের কোথাও পাওয়া যায়? সংহিতা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে আত্মা মানে প্রাণসম্পন্ন এই দেহকেই বুঝিয়েছেন।

উপনিষদগুলিও দেবতাদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেখানেও বার বার ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতি দেবতারা গুরুত্বের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক হচ্ছে এইটি :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ব্রহ্মবাদিগণ এই শ্লোক থেকে দুর্জ্ঞেয় তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। আচার্য শঙ্করের টীকা অবলম্বনে এর অর্থ করা হয়েছে এইরকম :

জগতে যা কিছু প্রপঞ্চভূত চলমান বস্তু আছে তা সবই ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদনীয়। এই সমস্ত ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে ভোগকর্ম নির্বাহ করো। কারও ধনের প্রতি লোভ কোরো না।

টীকাকারগণ আর-একটু বুঝিয়ে বলছেন যে সবই ব্রহ্মময় এইটা উপলব্ধি করে বিষয়বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করো এবং পরমাত্মাকে ভজনা করো, ধনাকাঙ্ক্ষী হতে চেষ্টা কোরো না।

কিন্তু এর অক্ষরার্থ কি এইরকম গূঢ়ভাবে নির্দেশ করে? যাঁরা বাস্তবদৃষ্টি দিয়ে বেদের পঠনপাঠন করেছেন তাঁরা এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবেন কি? প্রথমতঃ 'ঈশা'-শব্দের অর্থ যে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। সংহিতা 'ঈশা'-শব্দে সাধারণভাবে ইন্দ্রকে বুঝিয়েছেন। বেদের ইন্দ্র যখনই কোনও ঐশ্বর্য অধিকার করেছেন তখনই তা সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। পুঁজিবাদ বেদের আদর্শের বিরোধী। এমনকি দস্যুদের কাছ থেকে যখন গোধন উদ্ধার করা হয়েছে তাও সকলের কাছে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্র নিজে তাদের অধিকারী হননি। অতএব এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এইরকম ·

জগতে যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আছে তা সবই ইন্দ্রকর্তৃক অধিকৃত। এই সমস্ত ইন্দ্রকে উৎসর্গ করে তোমার প্রাপ্য ভোগ্যাংশটুকুই গ্রহণ করো। কারও ধনের প্রতি লোভ কোরো না।

এই উপনিষদেরই আর একটি শ্লোক :

হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

এরও বিরাট আধ্যাত্মিক অর্থ করা হয়েছে। যথা,

হে পূষন্ (অর্থাৎ সূর্য), তোমার জ্যোতির্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রয়েছে। যিনি সত্যধর্মের অনুষ্ঠাতা তাঁর দৃষ্টির জন্য সেই আবরণ উন্মোচন করো।

এখানে 'সত্যের আচ্ছাদিত মুখ' অর্থে আদিত্যমণ্ডলে যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে তাঁকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সংহিতার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এর অর্থ বিচার করা হয় তাহলে এইটাই অনুমান হয় যে সমগ্র শ্লোকটিতে সঞ্চিত সোমরসকে বোঝানো হয়েছে। বৃহৎ অনুষ্ঠানাদিতে পবিত্র জল-মিশ্রিত সোমরস হিরণ্ময় পাত্রে সুরক্ষিত হত। নিঘণ্টু অনুসারে জলের অপর নাম 'সত্য'। অতএব এখানে সত্য যে সোমরস বোঝাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সত্যধর্মা' শব্দটিও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'হে সত্যপ্রজ্ঞ এবং সত্যধর্মাগণ, তোমরা যজ্ঞে আগমন করো। তোমরা অগ্নির জিহ্বাদ্বারা সোমরস পান করো (ঋ ৫।৫১।২)' এটি প্রাতঃসবন বা বহিষ্পবমান অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় একটি শ্লোক। ঊষায় যে সোমরস প্রস্তুত হত তা হত সর্বোত্তম, কেননা রসাল সোমলতাকে প্রথম স্নিগ্ধ ঊষাকালে মথিত করে টাটকা সুমিষ্ট ঘন রস নিষ্কাশিত করা হত। সেই রস জল, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি বস্তুতে মিশ্রিত হয়ে, সযত্নে রক্ষিত হত উৎকৃষ্ট কলসে। ক্ষেত্রবিশেষে সেটি সুবর্ণকলস হতে পারত, কারণ হিরণ্ময় দ্রব্যের অভাব স্বর্গলোকে ছিল না। তাহলে এই শ্লোকের বাস্তব অর্থ হচ্ছে এইরকম,

সোমরস যে কলসে সঞ্চিত আছে তার মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা ঢাকা রয়েছে। হে পূষন্ (সূর্য), তুমি সত্যধর্মা দেবগণের জন্য এবং তাঁদের পর্যবেক্ষণের জন্য সেই ঢাকা অপসারণ করো।

এখানে সূর্য নিজে কলসের ঢাকনা অপসারণ করবেন—এটা বোঝাচ্ছে না। ঊষাকালে যখন সূর্যের কিরণরাশি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয় তখন পাত্রগুলির আবরণ উন্মোচিত হবে,—এইটাই বোঝাচ্ছে।

এইরকম বহু কষ্টকল্পনার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ থেকে উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে।

উপনিষৎসমূহের আখ্যানভাগও বহু ক্ষেত্রে অসংলগ্ন, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনকনসিস্টেন্ট। কোনো একটা আখ্যায়িকা একভাবে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার পরিণতি হয়েছে অন্যভাবে, অনেক

ক্ষেত্রে আদৌ হয়নি। তত্ত্ব যতই জটিল হবে ততই বুঝবে হবে তা সেই পরিমাণেই কৃত্রিম। এর উদাহরণ ছান্দোগ্য উপনিষদের মধুবিদ্যা, যার কোনও তাৎপর্য নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। মহামহোপাধ্যায় টীকাকারগণ যতই লিখুন না কেন, কোনও স্পষ্ট অর্থ এসব ব্যাপারে নির্ণয় করতে তাঁরা কেউই সমর্থ হননি, কারণ যার ভাষা একান্ত অস্পষ্ট, যার ধারণা আদৌ স্পষ্ট নয়, তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া কোনও পণ্ডিতেরই সাধ্যায়ত্ত নয়। সংহিতা এরকম অস্পষ্টতার প্রশ্রয় দেননি,—এই কারণেই বেদমন্ত্র সকলের কাছে সুবোধ্য কিন্তু উপনিষৎ সেই পরিমাণেই দুর্বোধ্য।

কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'প্রেত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে এক সংশয় আছে,—কেউ বলেন সে আছে, কেউ বলেন তার অস্তিত্ব নেই। আমি তোমার কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেছি, এখন এই পরলোকবিদ্যা সম্বন্ধে জানতে চাই।' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নচিকেতা সেই যুগের লোক যখন লোকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে মৃত্যুর পরে আত্মা যমলোকে যায়। কিন্তু এটা নিছক লোকসংস্কার; আসলে যমের এইরকম অলৌকিক ক্ষমতা কিছুই থাকবার কথা নয়। বেদ অনুসারে যম ছিলেন পিতৃলোকের অধিপতি বা গবর্নর। এটি একটি পদমাত্র। অধুনা মৃতদেহের সংকার সম্পর্কে কর্পোরেশনের যে কাজ, যমের একটি কর্তব্য ছিল সেটি। দেবলোকে মৃতদেহসংকারের ব্যবস্থাদি যমের কর্মচারীরাই করতো। বেচারি যম, যাঁকে নচিকেতা এই উদ্ভট প্রশ্নটি করেছিলেন, তাঁর নিজের আত্মার কী গতি হবে তাই তিনি জানতেন না। আসলে উক্তি তো যমরাজের নয়, যিনি উপাখ্যান রচনা করেছেন তাঁর। তিনি বহু বাগ্‌বিস্তার করে যে সিদ্ধান্তে পেঁৗছোলেন সে হচ্ছে বহুকালের পরিচিত পুনর্জন্মবাদ। যম শেষ পর্যন্ত বললেন :

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্‌॥

এর অর্থ,

দেহিগণের মধ্যে অনেকে আপন আপন কৃতকর্ম ও আপন আপন শ্রুততত্ত্ব অনুসারে শরীর-গ্রহণার্থ যোনিকে আশ্রয় করে। অন্যেরা স্থাণুত্ব, অর্থাৎ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই স্থাণুশব্দের যে কী অর্থ, তা যিনি প্রয়োগ করেছেন তিনিই জানেন। সমগ্র কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। মৃত্যুর পর আত্মা যদি থেকে থাকে তো তা কিভাবে থাকে এবং কিভাবেই তা অন্য যোনিতে প্রবিষ্ট হয়, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। অঙ্গুষ্ঠমাত্র আত্মার যে কী তাৎপর্য তাও আদৌ স্পষ্ট নয়। আত্মা যদি একই হয় তবে সকলেই জাতিস্মর হয় না কেন, সে প্রশ্নও রয়ে যায়।

কিন্তু বেদ যে দেহস্থিত প্রাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, উপনিষদেও সেটি করা হয়েছে, কেননা তাঁরা নতুনতর কোনো চিন্তায় পেঁৗছোতে পারেননি।

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা প্রাগৈতিহাসিক ভারতে দেবতা নামক জাতির সভ্যতা সম্পর্কে কিছু চিত্তাকর্ষক উল্লেখ পাই। কিন্তু এই আলোচনায় আসবার পূর্বে প্রাচীন দেবভূমির মানচিত্র সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা প্রয়োজন।

যে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা পাই না, পুরাণাদিতে উল্লেখকেই অবলম্বন করি, সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ পর্বতশ্রেণী ছিল। সাধারণভাবে বদরিকাশ্রম পেরিয়ে যে বিস্তীর্ণ পার্বত্য ভূভাগ অবস্থিত, তাকে বলা হত হৈমবতবর্ষ। এইটিই ছিল দ্যুলোকস্থিত দেবভূমি। এই পার্বত্য অঞ্চলেই দেবজাতীয়েরা

বাস করতেন। কনখল, বদরি পেরিয়েই যে পর্বতশ্রেণী ছিল তার নাম পুরাণে নিষধপর্বত। এর পশ্চিমাংশে ছিল হেমকূট পর্বতশ্রেণী। নিষধের উত্তরদিকে ক্রমান্বয়ে মাল্যবান, গন্ধমাদন (মন্দর), সুমেরু এবং সর্বশেষে নীলপর্বত অবস্থিত ছিল। আবার হেমকূটপর্বতাবলীর পরেই ছিল কৈলাস (হেমকূট কৈলাস), তারপরে মৈনাক। এর পরবর্তী অঞ্চলে দুটি অতি সমৃদ্ধ দেশ ছিল,—কেতুমাল এবং উত্তরকুরু। এই সমস্ত অঞ্চলটিকে বলা হত হরিবর্ষ। হরষ্-শব্দে তেজ বোঝায়। এই অর্থে হরি-শব্দের প্রয়োগ হত এবং তেজস্বী বলে অশ্বকেও হরি বলা হত। মধ্যপ্রাচ্যের হুরিয়ান এই হরি-বর্ষের কোনও অভিযানকারী সম্প্রদায় হওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

পুরাণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, উশীবরীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত এবং কালশৈল—এই পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গা সপ্তধা হয়ে গিয়েছিল। কালশৈল (কৃষ্ণবর্ণ পর্বতশ্রেণী) অতিক্রম করে ছিল শ্বেতপর্বত এবং মন্দরগিরি, যার অপন নাম গন্ধমাদন। এইসব অঞ্চলে যক্ষ এবং গন্ধর্বগণ বাস করতেন। হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীলপর্বত (যা ছিল বৈদূর্যমণিময়) ও শ্বেতপর্বত—এই বিশাল পার্বত্যভূমি যেন সব মিলিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীলপর্বত ছিল সবচেয়ে দূরতম সীমা এবং নিষধগিরি ছিল নিকটবর্তী অঞ্চল। এই নীল এবং নিষধের মধ্যে ছিল সুমেরুপর্বত, যাকে ঘিরে দেবসভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। এই সুমেরু পর্বতের পাশে ছিল ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু এবং উত্তর-কুরু—এই চারটি দেশ। সুমেরু অঞ্চলে সুবর্ণের প্রাচুর্য ছিল এবং এই অঞ্চলে দেবজনদের গতিবিধি ছিল খুব বেশি। যেসব জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন অতিশয় কান্তিমান। মহাভারত জানাচ্ছেন, কেতুমালের পুরুষ ও রমণীদের গাত্রবর্ণ ছিল সুবর্ণসদৃশ। তাঁদের স্বাস্থ্য ছিল দৃঢ় এবং অটুট। তাঁরা দীর্ঘজীবী ছিলেন। উত্তরকুরুর অধিবাসীরাও ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। ভদ্রাশ্বনামক দেশের লোকেরা ছিলেন শ্বেতবর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং নৃত্যগীতপ্রিয়। এককথায়, এই সমগ্র অঞ্চলে এমন কতকগুলি জাতি ছিলেন যাঁরা অতি প্রিয়দর্শন, সুসভ্য এবং অতিশয় শক্তি-সম্পন্ন। কিন্তু অসুরগণের বাসভূমির কথা জানা যায় না। সংহিতা বলছেন, এঁদের বাসভূমির নাম অসূর্যলোক। এঁদের বোধ করি জোর করেই নিকৃষ্টতর স্থানে বাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই হচ্ছে দেবভূমির একটি মোটামুটি পরিচয়।

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রসঙ্গে আসি। এই উপনিষদ আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষের কথা বলেছেন। এই আদিত্যমণ্ডল সুমেরুকে কেন্দ্র করেই অবস্থিত, কেননা সূর্য সুমেরুর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে থাকে, এইটিই ছিল সুপ্রাচীন বিশ্বাস। আদিত্যের শুক্ল আভা, নীল আভা এবং কৃষ্ণ আভার কথা বলা হয়েছে। আমরা পূর্ব বর্ণনায় দেখেছি পর্বতের বর্ণ অনুসারে তাদের নাম হত শ্বেত, নীল বা কৃষ্ণ (যেমন কালশৈল)। সূর্যকিরণে এইসব অঞ্চলের বর্ণগুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠত। ছান্দোগ্য উপনিষদ জানাচ্ছেন যে এই আভাসমূহকে নির্দেশ করে দেবতারা একটি অক্ষর সুরে গাইতেন,—সেটি হচ্ছে 'সা', যা আজও আমাদের সংগীতের আদিস্বর।

ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে বলছেন, 'এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ অপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ।' আদিত্যের অভ্যন্তরে সুবর্ণময় পুরুষ দৃষ্ট হন। তাঁর শ্মশ্রুসকল সুবর্ণময়, কেশসকল সুবর্ণের ন্যায় এবং তাঁর নখাগ্র থেকে সমস্ত অবয়বই সুবর্ণসদৃশ। তাঁর চক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সে দুটি পদ্মের মতো আরক্তিম এবং পাপহীন। এঁরাই উদ্গীথসমন্বিত সামগান করতেন। এঁরা ছিলেন ঊর্ধ্বতন অঞ্চলের অধিবাসী। এঁরাই সমগ্র ঊর্ধ্বাঞ্চল শাসন করতেন এবং দেবকামনার পূরণ করতেন। অর্থাৎ হৈমবতবর্ষ এবং হরিবর্ষ এঁরাই শাসন

করতেন এবং এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদ এ'দের চাক্ষুষ পুরুষও বলেছেন। অর্থাৎ নিম্নভূভাগের লোকেরাও এ'দের দর্শন পেতেন। 'যে চ এতস্মাৎ অর্বাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাম্ চ ঈষ্টে মনুষ্যকামনাম চ'—এ'রা এ'দের অধস্তন যে সমুদয় লোক আছে তাঁদেরও শাসন করতেন এবং মনুষ্যদের কামনারও পূরণ করতেন, অর্থাৎ তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

মর্ত্যের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক কোনকালেই কঠোর হয়ে ওঠেনি। অসুরগণকে যেমন তাঁরা উৎখাত করেছিলেন, তেমন শত্রুতার সম্পর্ক তাঁদের আর কোনও জাতির সঙ্গে ছিল না। পরন্তু মর্ত্যবাসীকে একদা স্বর্গশাসনেরও ভার দেওয়া হয়েছিল, তার উদাহরণস্বরূপ রাজা নহুষের উল্লেখ করা যায়। নহুষ বৃত্রসংহারক ইন্দ্রের পূর্বে স্বর্গশাসন করেছিলেন। ইন্দ্র ছিলেন যযাতির সমসাময়িক বা তাঁর কিছু পরবর্তী কালের। যযাতির বিতাড়িত পুত্রদের ইন্দ্র আশ্রয় প্রদান করেছিলেন, এমন উল্লেখ সংহিতায় বহুবার পাওয়া যায়। অবশ্য এরকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে, কারণ দেবতাদের বাসভূমি সাধারণভাবে অপরের অগম্য ছিল এবং ইন্দ্র সেই নিরাপত্তাকে অনেক পরিমাণে সুদৃঢ় করেছিলেন।

দেবসভ্যতার এই যে ইতিহাস, এ সম্বন্ধে নতুনভাবে আলোকপাত করা দরকার। সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বেদ ও বেদান্ত সাহিত্যের পঠনপাঠন। আজও আমাদের মনোযোগকে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করছে কতিপয় ভাষ্যকার এবং অধ্যাত্মবাদীদের মতবাদ। এইসব টীকাটিপ্পনী বহুলাংশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অনেকেই নিজেদের স্বকীয় দর্শন এবং তত্ত্ব স্থাপন করবারও প্রয়াস করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁরাও প্রায় দেবতার মতোই পূজিত হয়ে আসছেন। বিংশ শতাব্দী গত হতে চলল, এখন ধর্মের ধুয়া তুলে সত্যভাষণকে বাধা দেওয়াটাই হবে সবচেয়ে বড় অধর্ম। সম্পূর্ণ চিন্তার স্বাধীনতা নিয়ে বেদ এবং উপনিষদ্গুলির যদি সম্পাদনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে আসলে মানবতা, ঐক্য এবং সাম্যের প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল এই বেদ-মন্ত্রের মাধ্যমেই। আর একটি বড় সত্যও হয়তো এই গবেষণায় প্রমাণিত হতে পারে। সেটি হচ্ছে এই যে, আর্যদের অভিযান হিমাচল সভ্যতা থেকেই শুরু হয়েছিল, মধ্য এশিয়া থেকে নয়। যেহেতু আমরা কোনও পাথুরে প্রমাণ পাইনি, সেহেতু দেবসভ্যতা নেহাত মাইথলজি নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব ইতিহাস। একদিন হয়তো পাথুরে প্রমাণও পাওয়া যাবে,—তখন মিলিয়ে নেওয়া যাবে সংহিতায় ইতিহাস বিধৃত হয়েছে কিনা।

একা শুভময়

রত্নেশ্বর হাজরা

[রাত্রি। অনেক দিনের পুরোনো একটা বাড়ির উঠোনে একটা মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। একটা হারিকেন জ্বলছে। মৃতদেহের পাশে তিনজন যুবক। হারিকেনের আবছা আলো তাদের দুজনার মুখের উপর। তৃতীয় জন আলোর বিপরীত দিকে মুখ করে বসা, তার পিঠের অল্প অংশে আলো কাঁপছে। হারিকেনের আলোয় কিছু জায়গা আলোকিত। সেই আলোর বৃত্ত পার হলেই অন্ধকারের শুরু।]

অরূপ। সবাই জেনেছে?
বিপুল। সবাই আর কে! অঞ্জন শুনেছে, আর বিনু তো জানেই—
সুজন দিবাকে আনতে চলে গেছে, আর
যারা যারা বাকি রইল তাদের ভিতর
দু-একজন আসতে পারে—
যতটা সম্ভব আর কি—চেষ্টা করা হল—।
নিশীথ। দিবাকে কে আনতে গেছে?
বিপুল। সুজন, কেন?
নিশীথ। না, কিছু না। তা আমাকে বললেই পারতিস—
দিবা কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গে
আসবে না।
অরূপ। কী করে জানলি?
নিশীথ। মনে হচ্ছে আসবে না, এলে ভালো—
বিপুল। তুই তো এক্ষুনি এলি। সুজন অনেক আগে চলে গেছে
তাছাড়া এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়, বল্
সারারাত অপেক্ষা করা কি সম্ভব!
অরূপ। বেশি জানাজানি হোক চাইও না—অসুবিধে আছে—।
বিপুল। সেই তো বিকেল থেকে বসে আছি, তুই এলি এইমাত্র
সুজন অবশ্য ছিল, আর
বিনু এসেছিল একটু আগে—, এসে চলে গেল।

[বিপুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই শব্দ ছোট হতে হতে অন্ধকারের দিকে চলে গেল।]

নিশীথ। আমি কী করে জানব যে এমনি কিছু ঘটে যেতে পারে
ঘটে গেছে!
বিপুল। এমনি যে ঘটবে তা কে-ই বা জানত
আমরা কি জানতাম নাকি?
অরূপ। তোরা কি ঝগড়ার আর সময় পেলি না!

থাম না এখন।

[অরূপ উঠে দাঁড়াল—হারিকেনের আলোয় তার ছায়া অনেকদূর অবধি লম্বা হয়ে পড়ল। তৃতীয় যুবক নিশীথ, অন্ধকারের দিকে মুখ করে বসে ছিল এতক্ষণ—এখনো তাই রইল। বিপুল একটা শুকনো পাতা নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল। উত্তরে-দক্ষিণে শোয়ানো মৃতদেহ একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা, হাওয়া লেগে কাপড়টা নড়ছে। এখন বসন্তকাল, কোথায় যেন কোকিল ডাকল। অরূপ সিগারেট ধরাল একটা—]

দশ-বারো দিন আগে সন্ধেবেলা, বুঝলি বিপুল
শুভময় আমাদের মেসে এল
যেমন আগেও আসত—ঠিক তেমনি—
মাঝে মাঝে খুব হালকা কথা বলছে—যেমন ও মাঝে মাঝে বলে—।
কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে গেল, তারপর
আর দেখা হয়নি একবারও।
আজকে বিকেলে শুধু—কী জানি কেন যে মনে হল
ওর বাড়ি ঘুরে যাই......। তুই?

বিপুল। আমাকে অতসী বলল টেলিফোনে
অতসী তো এখানেই থাকে
একটু দূরেই......

নিশীথ। তোর তো অতসী আছে—অতসীর টেলিফোন আছে—ফলে তুই
খুব তাড়াতাড়ি খবরটবর পাস। আমার বাড়িতে...

বিপুল। নিশীথ...

নিশীথ। রাগ করছিস? রাগের কী বললাম!

অরূপ। আচ্ছা তোরা কী বল তো?
সামনে বন্ধুর মৃতদেহ—তোরা
সামান্য জিনিস নিয়ে...ছিঃ বিপুল—

নিশীথ। সামনে বন্ধুর মৃতদেহ—বন্ধু কে? শুভময়!
শুভময় মারা গেছে—কে জানে মরেছে কিনা।

অরূপ। নিশীথ, নিশীথ, তুই এতো নিচে নেমেছিস!
বিশ্বাস হচ্ছে না তোর শুভময় মারা গেছে কিনা, ছিঃ নিশীথ, ছিঃ!

নিশীথ। কিছুতে বিশ্বাস নেই, আমি
কোনো কিছু বিশ্বাস করি না—মৃত্যুকেও নয়।
হয়তো করতাম, কিন্তু করতে দিল না।
তোরা কি জানিস, শুভময় কী করেছে আমাদের?

বিপুল। জানবার দরকার নেই। অনেক কিছুই তো
অজানা রয়েছে—থাক—শুভময় কী করেছে তা-ও থাক।

[ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। হারিকেনের আলোয় ছায়া কাঁপছে। ওরা তিনজন যুবক চুপচাপ। শুভময়ের মৃতদেহ ঘিরে সময় এখন মন্থর।]

অরূপ। শুভময় সেই যে গেল না, আমাদের মেসে, বুঝলি বিপুল
সেদিন একবারও কিন্তু বুঝতে পারিনি...
বিপুল। একদিন ও আমাদের বাড়িতেও গিয়েছিল
নীলরঙের জামা-পরা ওকে খুব...
নিশীথ। মিথ্যে কথা। নীলরঙের জামাটামা কখনো পরত না শুভময়।
বিপুল। সেদিন ও পরেছিল।
নিশীথ। কক্ষনো না। স্রেফ মিথ্যা।
বিপুল। আমি কেন মিথ্যে বলব, আমার কী লাভ!
নিশীথ। লাভ কিংবা লাভ নয়—ওসব বুঝি না। তবে
নীলরঙের জামা ও কক্ষনো পরেনি—এটা ঠিক।
অরূপ। তুই বল, বিপুল। নিশীথ, চুপ কর।
বিপুল। সাইড ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি বের করে
আমাকে প্রেজেন্ট করল। ডায়রির ভিতরে ওর নিজের ঠিকানা
লিখে দিল। আরো একটা লাইন লিখল—
কবে যে আবার আসব—কে জানে তা!
নিশীথ। এগুলোও মিথ্যে কথা, বুঝলি অরূপ—
শুভময় কোনো কিছু প্রেজেন্ট করত না, কোনোদিনই না।
একটা সিগ্রেট ও দুই টুকরো করে খেত
চাইলেও একটা টুকরো কখনো দিত না।
তোরা খুঁজে দ্যাখ ওর ডান হাতে কৃপণের চিহ্ন আছে।
বিপুল। তুই ওকে কতদিন ধরে দেখছিস?
নিশীথ। কম করে পনেরো বছর।
বিপুল। পনেরো বছর কিছু বেশি দিন নয়। ওটুকু সময়ে
কার কতটুকু জানা যায়—চেনা যায়...কতটুকু...
অরূপ। আমি জানি, ইচ্ছে হলে শুভময় তার
বিশ্ব দান করে দিত। আমি ওকে
ঢের বেশি দিন ধরে চিনি—।
নিশীথ। জানি না কে ক'টা রাজ্য পেয়েছিস। তবে
একটা ভিখিরী একবার একটা পয়সার জন্য ওর কাছে
মার খেয়েছিল—আমার সামনেই।
অরূপ। মিথ্যে কথা। ও কখনো
অতো রূঢ় হতেই পারত না।
নিশীথ। তবে নয়। এন্তার গুণগান করো তার
আমি আর কিছুই বলছি না।
বিপুল। তোর কি বলার মতো কিছু আছে যে বলবি—
মিথ্যে ছাড়া কিছুই তো বললি না কখনো।

[এতক্ষণ বসে ছিল, এবার উঠে দাঁড়াল, তার মুখ মোটামুটি এখনো অন্ধকারের দিকে—]

নিশীথ। মিথ্যার ভেতর থেকে জন্মেছি যখন, মিথ্যা ছাড়া
কী-ই বা বলতে পারি, বল।
বাবাকে দেখেছি মিথ্যা আবরণে ঘিরে থাকা—মাকেও তো তা-ই...

অরূপ। আমিও দেখেছি তা-ই—আমারও তো
মা-বাবার সম্পর্কটা সত্যের উপরে কিছু প্রতিষ্ঠ ছিল না।
খুব বেশি ভুল ছিল ওদের ভিতরে—বড়ো ভুল—
আমি কোন্ ভুলের সন্তান আমি এখনো জানি না
ওরাও বলেনি, কিন্তু বললে ভালো হত।
[একটু চুপ করে থেকে] তোরা তো বাবাকে দেখেছিস, আমার মুখের সঙ্গে
তার মুখ কোথাও মিলেছে, বল! চুপ কেন? বল না, বল...

নিশীথ। একদম মেলেনি—
আমি কোনোদিন কোনো সত্যকে দেখিনি, তাই—
মিথ্যার কথাই শুধু বলতে পারি। ভুল ছাড়া
কিছুই বলেনি কেউ। ভুল পথ ভুল স্বপ্ন
দেখিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকেই—এখনো দেখায়—খুব ভোরে
ভুল গানে ঘুম ভাঙিয়েছে। আমি তাই
মিথ্যাকেই চিনি—ভুলকেই চিনি—।

বিপুল। যার যা স্বভাব সে তো শুধু তাই চেনে।

নিশীথ। ঠিকই বলেছিস হয়তো।— তোরা কেউ
মিথ্যে করে কিছু বল, ভুল করে কিছু বল—আমি ঠিক
ধরে ফেলে দেব। [ওর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে। কথা
বলতে বলতে নিশীথ ঘুরে দাঁড়ায়। তার মুখে নানা ধরনের আঘাতের
চিহ্ন। বিপুল ও অরূপ চমকে ওঠে—]

অরূপ। কী হয়েছে তোর!

বিপুল। ওগুলো কিসের দাগ?

নিশীথ। আঘাতের দাগ। ওরা সংখ্যায় অনেক ছিল। ওরা
ভুল করেছিল—হয়তো ভুল করেছিল—
বহুদিন ধরেই খুঁজছিল—অনেক বছর—অনেক শতাব্দী, এর আগে
এরকম ঠিক একা—অমনস্ক—পায়নি কখনো—।
আজ শুভময় মারা গেল—মৃত্যু নয়—আত্মহত্যা...
'হাওয়ার ভিতর সেই শব্দ শুনে রাজপথ ধরে একা হেঁটে আসছি
প্রায় ছুটে—নিজের ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসছি—তখন হঠাৎ
পরিচিত বহু হাত আমাকে আঘাত করতে শুরু করল—
তাদের পরনে ছিল নীল জামা, হাতে ডায়রি, খুব দামী
সিগারেট খেতে খেতে ভীষণ হাসছিল ওরা। অরূপ, বিপুল, বুঝলি

প্রত্যেকের মুখগুলো তোদের মুখের মতো।
শুভময় সেখানে ছিল না ঠিকই, কিন্তু আমি জানি
সে তোদের প্রত্যেকের মধ্যে বসে ছিল। শুভময় ছাড়া
অতো বেপরোয়া হাত কারুর ছিল না, কেউ অতো জোরে
মারতে পারিস না তোরা। এই দ্যাখ—[নিশীথের
গলার উপর একটা গোল দাগ অল্প আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল।
সে আরেকটু এগিয়ে এলো—মৃতদেহের অন্য পাশে বসে-থাকা বিপুলের
মুখোমুখি, তারপর গলাটা বাড়িয়ে দিল বিপুলের দিকে—]
এই দ্যাখ, হাত দিয়ে দ্যাখ—[বিপুল স্পর্শ করল না দেখে
অরূপের কাছে যায় নিশীথ—]
—এই দ্যাখ অরূপ, হাত দে, ধরে দ্যাখ—বুঝতে পারবি...

অরূপ। সবটাই রহস্যজনক। তোকে এমনি কারা মারতে পারে!
দাগটা কিসের?

নিশীথ। রহস্যটহস্য কিছু নয়।
শুভময় মারা গেছে—আত্মহত্যা করেছে সে—এমনি খবর
হাওয়ার ভিতর শুনে ছুটে আসছি—পাশে পাশে গোল অন্ধকার
রাস্তার বিভিন্ন মোড়—গলিঘুঁজি—দোকানপত্তর
বিপরীত দিকে ছুটছে। এমন সময়
কারা যেন হঠাৎ জড়িয়ে ধরল, গলাটা বাঁধল, বুঝলি অরূপ
যেন শব্দ থেমে যায়—কণ্ঠস্বর থেমে যায়...। তার চিহ্ন...
প্রত্যেকের হাত উঠল, হাত নামল...। তুইও ছিলি
ওদের ভিতরে তুইও ছিলি—

অরূপ। কী বলছিস!

নিশীথ। [বিপুলের দিকে মুখ করে] তুইও ছিলি...

বিপুল। [দাঁড়িয়ে উঠে ক্রুদ্ধ গলায়] কী বলছিস তুই, মুখ সামলে বল—

নিশীথ। আমি ঠিকই বলছি, বিপুল! আমি প্রত্যেকের মুখই চিনি। তোরা
আমার গলার শব্দ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলি
শুভময়ও তাই চেয়েছিল, কিন্তু ভুল করে। হয়তো সে জানত না
আমি ঢের আগে থেকে ওর সব ইচ্ছেগুলো জানতে পারতাম।

[নিশীথ আবার অন্ধকারের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। রাত বাড়ছে, মৃতদেহের উপর পাতা ঝরছে। হ্যারিকেনের আলো ম্লান হচ্ছে]

এতক্ষণ ধরে তোরা একজন মৃতের নামে বহু মিথ্যা বলে গেলি
তাই ঠিক সামলাতে পারিনি। ঐ দ্যাখ
পাতা ঝরে যায়। শুভময় ঝরে গেছে। তোরা ওর নামে
আর কোনো মিথ্যে কথা কাউকে বলিস না—।

অরূপ। আমি মিথ্যা বলিনি তো!

বিপুল। আমিও না—।
নিশীথ। তোরা কি জানিস ওই মৃত শুভময়, আমাদের বন্ধু শুভময়
নীল রঙ কখনো চিনত না—পাতার সবুজ রঙ কখনো দেখেনি!
অরূপ। সে কী!
বিপুল। কিন্তু ও তো ছবি আঁকত।
নিশীথ। নীল ও সবুজ কোনোদিন ব্যবহার করত না শুভময়।
অরূপ। অথচ সে নীল রঙের জামা পরত!
নিশীথ। পরলেও জানত না সেটা নীল রঙ।
বিপুল। কিন্তু ওর বাগানের শখ ছিল—বাগান করতও!
নিশীথ। কিন্তু শুভময় জানত বাগানের পাতাগুলো সমস্ত হলুদ
ডালগুলো সমস্ত হলুদ, ফুলগুলো সাদা বা হলুদ।
আহ্ শুভময়, তোর রক্তের রঙটাও কিন্তু হলদে ছিল...
[কাছাকাছি কোথাও কারুর হেঁটে আসার শব্দ হতেই ওরা তিনজন চমকে উঠল। নিশীথ একলাফে পাশের একটা চৌকো অন্ধকারের মধ্যে গাছের আড়ালে চলে গেল—]
অরূপ। কে, কে ওখানে?
[শব্দ আরো কাছে আসতে আসতে সুজন বেরিয়ে এলো।]
সুজন। নাঃ, এলো না সে—।
অরূপ। কী বলল, আসবে না?
বিপুল। তুই গিয়ে কী বলেছিস?
সুজন। বললাম, তোমার শুভময় ভীষণ অসুস্থ, দিবা
তার কাছে চলো, সে ডেকেছে—
অরূপ। তারপর?
সুজন। সে বলল, সময় নেই আজ, বড়ো ব্যস্ত
কাল যাব। কাল সকালের মধ্যে
নিশ্চয়ই সে মরবে না।
বিপুল। তারপর?
সুজন। বললাম, তোমার শুভময় মারা গেছে, দিবা
তার কাছে চলো, তাকে দেখবে না?
অরূপ। কী বলল সে?
[তখন ধীরে ধীরে সমস্ত উঠোন গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগল। অন্ধকার যখন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেল তখন দেখা গেল শহরের কোনো বাড়ির উত্তরমুখো একখানা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের দুদিকে দুখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে দিবা বসে আছে, সামনে একগুচ্ছ ফুল, অন্য চেয়ারে একজন যুবক। সুজন ঢুকল—]
দিবা। এই যে সুজন, এসো—। হঠাৎ যে—।
সুজন। কেন, আসতে নেই?
দিবা। অবশ্যই, আছে—একশো বার আছে—

এসো আলাপ করিয়ে দিই—
এর নাম সুজন, আর ইনি সুকেশ বিশ্বাস—একজন ফুলব্যবসায়ী।
ফ্লাওয়ার মার্চেন্ট, বুঝলে সুজন! ফুল ছাড়া
ফলের ব্যবসাও আছে। সুকেশ চাইছে, আমি ওর
ফুলের বাগানে ফুল, ফলের বাগানে ফল হই—
কী বল সুকেশ, তাই না?

সুকেশ। তুমি আজ ভিন্ন মুডে আছ, দিবা। আমি চলে যাই।
তাছাড়া এসব কথা বাইরের লোকের সামনে আলোচিত হোক—
আমি তা চাই না।
দিবা। আরে, আরে কী বলছ সুকেশ, আশ্চর্য তো!
সুজন কি অন্য লোক নাকি। ও তো
আমাদেরই একজন। তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি রেগে যাও,
রেগো না প্লীজ, একটু বোসো—কফি আনছি—

[দিবা ভিতরে চলে যায়, ওর শূন্য চেয়ারে সুজন বসে পড়ে।]

সুকেশ। আপনি বড্ড বেরসিক।
সুজন। কেন?
সুকেশ। না, ঠিক আছে। এমনি আর কী। হঠাৎ এভাবে ঢুকে পড়া...
ঠিক আছে। আমি উঠি—দিবাকে বলবেন—।
সুজন। সে কী! ও যে কফি আনতে গেল।
সুকেশ। তা হোক, আপনি খেয়ে নিন।
সুজন। আমি তো খাবই, আপনিও খাবেন। বসুন বসুন
আপনি চলে গেলে দিবা খুব দুঃখ পাবে।

[কফি নিয়ে দিবা ঢুকল, টেবিলের উপর ট্রে রেখে দিয়ে কফি ঢালতে লাগল]

দিবা। দুঃখ কিসের সুজন, দুঃখ কার?
সুজন। তোমার—।
দিবা। মানে! আমার কিসের দুঃখ! আমার কোথাও কোনো দুঃখ নেই।
সুকেশ। মন থাকলে দুঃখ থাকে, তোমার হৃদয় মন কিছু নেই।
দিবা। তবে তুমি কার জন্য ছুটে আস, সুকেশ, আমার শরীর?
হৃদয় বা মন যার নেই, তার শরীরও তো
শুধু মাংস—ঠাণ্ডা হিম বরফের মতো—
তুমি কি বাগানে সেই মাংসপিণ্ড ঝুলিয়ে রাখবে?
সুকেশ। মূলত মাংসেরই একটা পিণ্ড তুমি, ফুলের পাপড়ি বা গন্ধ নও।
দিবা। তুমি খুব ভালো করে কথা বলতে শিখেছ আজকাল—
তোমার প্রশংসা করি। নাও কফি খাও—।
সুকেশ। তুমি জান কফি খেতে এখানে আসি না!
দিবা। জানি—।

সুকেশ। তবে?
দিবা। আজ তুমি খুব রেগে আছ, আজ কথা থাক। আমি আজ
কিছুই বলব না। দ্যাখো
গভীর সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি নিতে গেলে ভুল হতে পারে।
আরেকটু সময় নাও, আরো একটু ভেবে দেখো।
তুমি কাল এসো একবার। কাল হোক পরশু হোক......
সুকেশ। [উঠে দাঁড়িয়ে] না-ও আসতে পারি আর—।
দিবা। তাহলে তো খুব ভালো, বেঁচে যাই—
সুকেশ। [অবাক হয়ে] মানে!
দিবা। আমি আর খেলতে পারছি না। একা একা কতো খেলা যায়।
তোমরা কেউ সমান বিরুদ্ধ পক্ষ নও। যারা আস প্রত্যেকেই
তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়। তোমাদের সাথে
একটু খেলার পরই ভীষণ হাঁপিয়ে উঠি—।
[সুজনকে] বুঝলে সুজন, এরা একটুখানি খেলা শিখে
নিজেকে ক্যাপ্টেন বলে ভাবতে শুরু করে। সুকেশকে দেখো—
ও যখন আজ এল তখন বিকেল—আমি—
কাপড় পালটাচ্ছি—
ঘরে ঢুকে ঘাবড়ে গেল। আমি বললাম
কী হয়েছে, দ্যাখো না কেমন করে কাপড় পালটাই—
ও দেখি কেমন যেন ঘেমে উঠল—অনড় অসাড়—।
আচ্ছা ভাবো—যে আমাকে মাংসপিণ্ড বলে মনে করে—
সে আমার কাপড় পালটানো দেখে যদি ঘেমে যায়, তবে
কার সঙ্গে খেলব বলো!
[সুকেশ আস্তে আস্তে চলে যায়। দরজার বাইরে চলে যাওয়ার পর দিবা দরজা অবধি আসে, তারপর চেঁচিয়ে বলে—]
কাল একবার এসো কিন্তু—বিকেল পাঁচটায়.........
তৈরি হয়ে অপেক্ষা করব.........[দিবা ফিরে এসে
চেয়ারে বসল] ঠিকই আসবে কাল, না এসে উপায় নেই ওর।
এতো ক্লান্ত যে আঘাতেও ব্যথা পায় না। সুখ নেই দুঃখ নেই
জ্বালা নেই—কিচ্ছু নেই। আছে, ক্ষিধে আছে শুধু—তা-ও
খাবার সাহসটুকু নেই। যাক গে, সুজন,
বহুদিন পরে এলে—এবং একটু অসময়ে
এমন রাত্রিতে তুমি কখনো আস না।
সুজন। দিবা—!
দিবা। বলো সুজন, বলো। খুব ক্লান্ত আমি, তবু বলো।
সুজন। তোমার শরীর থেকে অদ্ভুত রকম একটা গন্ধ আসছে, দিবা.........

দিবা। আমার নাভির মধ্যে কস্তুরী পেকেছে, তার ঘ্রাণ—
তুমি কেন, যে একবার আসে সে-ই পায়, আর
ঐ গন্ধ ধরে ধরে আমার নাভির মধ্যে দু-ঠোঁট ডুবিয়ে দেখতে চায়—
কোথায় কস্তুরী। আঃ
ভীষণ যন্ত্রণা হয় নাভির ভিতরে, আমি ছটফট করি......
হয়তো একদিন এই উঁচু পাহাড়ের কোনো
ঢাল থেকে লাফিয়ে পড়ব—আর খুঁজেও পাবে না কেউ।
কিন্তু তার আগে
একজন শিকারী যদি আমাকে বুলেটবিদ্ধ করে দিত! আহ্ সুজন,
আমার শরীর থেকে গন্ধ ছুটে যায়—তুমি কি পাচ্ছ না!
দেখবে—দেখবে তার উৎসমুখ—দেখবে, বলো
নির্দ্বিধায় দেখাব তোমাকে—সব কিছু, দেখবে উৎসমুখ
কোন্ অন্ধকার থেকে গন্ধ উঠে আসে—নাভির কোথায়
কস্তুরী পেকেছে—তুমি দেখতে চাও
কোন্ অহংকার থেকে গন্ধ আসে—কোন্ অন্ধকারে
অহংকার জন্ম নেয়—দেখবে সুজন
নাভির ভেতরে আমি কস্তুরী দেখাব—এসো.........।
সুজন তোমারো ভয়—তুমি তো পুরুষ—এসো—

[সুজন ভীষণ অস্বস্তিতে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে—দিবা তার দিকে এগিয়ে যায়.........। দরজার বাইরে তখন পায়ের শব্দ শোনা যায়, দিবা মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে এবং সুজনকে বলতে-থাকা 'এসো' শব্দের রেশ টেনেই বাইরের পদশব্দ লক্ষ করে বলতে থাকে—]

এসো নীলাঞ্জন, এসো, প্লীজ কাম ইন্.........

[নীলাঞ্জন ঘরে ঢুকল]

নীলাঞ্জন। কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ভর্তি কাপ—একটুও কমেনি, কী ব্যাপার দিবা!
কার সঙ্গে ঝগড়া হল?
[সুজনকে দেখিয়ে] ইনি! চিনলাম না তো।

দিবা। তোমার চেনার কোনো হেতু নেই, তুমি
দিবা নামে রাত্রিটিকে ছাড়া আর কিছুই চেন না, প্রফেসর—।
এর নাম সুজন—এ
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

নীলাঞ্জন। ও—। তা এতো রাত্রে!

সুজন। ধরে নিন আপনিও যেমন ভিজিটর আমিও তেমনি কেউ—

নীলাঞ্জন। [দিবাকে] তাই না কি!

দিবা। তোমার আপত্তি আছে?

নীলাঞ্জন। যদি থাকে?

দিবা। বেশ হয় তাহলে।

নীলাঞ্জন। কেন?
দিবা। অন্তত একজনও কেউ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়
এটুকু জানলাম—তা
না হয় মিথ্যাই হল, ক্ষতি কী!
[সুজনকে] সুজন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এসো—
ইনি প্রফেসর বোস, প্রফেসর অব সাইকোলজি—
আমার হৃদয় মন স্ফটিক জলের মতো দেখতে পান।
আচ্ছা প্রফেসর, বলো
আমার মনটা আজ কোন্‌দিকে ঝুঁকে আছে—তোমার দিকেই
নাকি অন্য কোনো দিকে—?
নীলাঞ্জন। [কফিভর্তি কাপটা দেখিয়ে] ঝগড়াটা কি বেশি হয়েছিল?
দিবা। বিন্দুমাত্র না। সামান্যই অভিমান—যেরকম
তোমার সঙ্গেও হয়—
একটু আগে চলে গেল, নীলাঞ্জন
তুমি তার কাছে বুঝি দাঁড়াতে পারছ না।
সুজন। আমি চলে যাব, দিবা
ভীষণ দরকার—। একটা কথা শোনো—।
দিবা। আরেকটু অপেক্ষা করো সুজন, আরেকটু দাঁড়াও
একা হতে ভয় করছে আজ—
সুজন। আমি আর বসতে পারছি না, দিবা। বড্ড দেরি হয়ে গেছে—।
দিবা। ভয় করছে সুজন, আরেকটু অপেক্ষা করো—।
নীলাঞ্জন। কী হয়েছে দিবা! তুমি কি অসুস্থ?
[নীলাঞ্জন দিবার কাছে এগিয়ে গেল]
উঃ, তোমার শরীর থেকে গন্ধ আসছে, কী খেয়েছ?
দিবা। কিছুই না। ও গন্ধ আমার
নাভি থেকে উঠে আসছে, নীলাঞ্জন—নাভিতে কস্তুরী
জমা হতে হতে অহংকার—অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—
তুমি ঠোঁট ডুবিয়ে ওখানে একদিন
উৎসমুখ খুঁজে পেতে চাও, আমি জানি নীলাঞ্জন
তাই তুমি রাত্রে আসো—সব চলে গেলে—একা।
বহুক্ষণ ধরে তুমি ওপাশের বকুলতলায় অপেক্ষা করেছ
বলো সত্যি কিনা, বলো—বলো নীলাঞ্জন.........
সুজন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, দিবা, একটা কথা শোনো
শুভময় ভীষণ অসুস্থ, তুমি চলো—।
দিবা। শুভময় কে?
সুজন। শুভময়কে ভুলে গেছ, আশ্চর্য তো!

দিবা। কী হয়েছে তার?

সুজন। কী হয়েছে আমি ঠিক বলতে পারব না, তুমি
আমার সঙ্গেই চলো—

দিবা। আমি যেতে পারব না সুজন, আমার সময় নেই, একটুও না
তুমি যাও—।
আমি কেন যাব? শুভময় অসুস্থ তো কী হয়েছে।

নীলাঞ্জন। শুভময় কে?

দিবা। জানি না।

সুজন। শুভময় কে, তুমি জান না, না?

দিবা। তাই—। যদি না-ই জানি তাকে, যদি না-ই চিনি, তবে
কী হবে আমার? বহু স্মৃতি আজ আর মনে নেই—
মনে করে রাখতেও চাই না।

সুজন। কোনো একদিন কিন্তু খুব বেশি করে জানতে, খুবই চিনতে—।

দিবা। হয়তো জানতাম, হয়তো চিনতাম, তবে আজকে চিনি না।

সুজন। দিবা চল। শুভময় তোমাকে ডেকেছে, দিবা, আমার মিনতি......।

দিবা। না—

সুজন। দিবা চলো—

দিবা। না না।

সুজন। দিবা চলো, দিবা। তোমাকে যেতেই হবে।

দিবা। কিছুতেই না, কেন যাব?

সুজন। শুভময় মারা গেছে।

দিবা। কী হয়েছে?

সুজন। শুভময় মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে সে।

নীলাঞ্জন। কেন, আত্মহত্যা করল কেন?

সুজন। আত্মহত্যা কেন করল কী করে বলব, কেউ-ই তা জানে না
শুভময় নিজেও জানত না হয়তো।
[দিবাকে] কী করবে তাহলে? যাবে কি যাবে না?

দিবা। আমি যেতে পারব না—অসম্ভব—
আমার যাওয়াটা কিছু এমন জরুরি নয়। কোথায় সে?

সুজন। কোনো এক উঠোনে শায়িত—তার দেহ
উত্তরে দক্ষিণে শুয়ে আছে—সাদা কাপড়ের নিচে
চতুর্দিকে শুকনো পাতা ঝরে যায়.........
সাত গজ দক্ষিণে তার গোল অন্ধকার—পুবের ঠিকানা
সাত গজ উত্তরে টানা অন্ধকারে পরিত্যক্ত বাগানের শুরু—।
ভীষণ পুরোনো একটা বাড়ি—কয়েক শো বছর ধরে পড়ে আছে
তার একাকিত্বে শুভময়—পাশে দুইজন বন্ধু ম্লান আলো জেবলে

আমার অপেক্ষা করছে। মূলত তোমারই অপেক্ষায়
তারা বসে আছে।

নীলাঞ্জন। দিবা যাও, ঘুরে এসো।—আমি যাই আজ—
মৃত মানুষের সঙ্গে রাগ কিংবা অভিমান ঠিক নয়।

[নীলাঞ্জন চলে গেল। সুজন দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, পিছনে দিবা—]

দিবা। আমি পারব না যেতে—আমার দু পায়ে অতো জোর নেই—
আমি বড়ো ক্লান্ত আজ, চলে যাও—যাও
আমি যেতে পারব না, কিছুতেই না। [একটু থেমে]
অসম্ভব, কিংবা এ-ই ঠিক [সুজন দিবার দিকে ফিরে তাকায়]
এটা ওর মৃত্যু আর বেঁচে যাওয়া—একই সঙ্গে
বরং বেঁচেছে শুভময়—তবু একটু বেঁচে রইল। না হলে তো—

সুজন। না হলে কী!

দিবা। আরো বেশি করে মরত—রোজ মারা যেত—আমার সামনেই মারা যেত
ওকে যে বাঁচাব আমি এতো জল কোথাও ছিল না।
তোমরা কেউ-ই জানতে না ও কতদিন পুড়ে গেছে
সমস্ত শরীর থেকে ধোঁয়া, লাল আগুনের শিখা, বুঝলে সুজন,
মাংস-পুড়ে-যাওয়া গন্ধ—আঃ
এক-একটা রাত্তির আমি ওকে নিয়ে কীভাবে যে কাটিয়েছি......
ভীষণ যন্ত্রণা হত ওর, সারা মুখ নীল হয়ে যেত
অতো ধৈর্য কী করে যে মানুষের মধ্যে থাকে, আশ্চর্য!
বিশ্বাস করছ না, না? [সুজন দিবার চোখে চোখে তাকায়]
আমি ওকে না সরালে আরো আগে মারা যেত।
ওর পোড়া মাংস লেগে আমার চামড়ায় ঘা হয়ে গেছে
বুকে পিঠে কোমরে তলপেটে—সাদা উরুর চারপাশে—
দাগগুলো এখনো মোছেনি—দেখবে নাকি?
বিশ্বাস হচ্ছে না, না? বিশ্বাস করতে আমি বলিও না।
হয়তো আমি বাঁচাতে পারতাম, কিন্তু
ওকে যে বাঁচাব আমি এতো জল আমার ছিল না—
তাই ওকে সরিয়ে দিয়েছি, না সরালে
আরো আগে মারা যেত শুভময়।
এটা কিন্তু ভালো হল—স্বেচ্ছায় ও নিজেকে বাঁচাল।
সুজন, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাও। আমি আজ কিছুতে যাব না
শুভময় কেউ নয়—ওটা মিথ্যা—কেন এলে
আমার সময় নষ্ট করে দিলে—রাতটাও—
এতক্ষণে নীলাঞ্জন, আমি আর নীলাঞ্জন.........।
অথচ এখন আমি চারদিক থেকে যেন মাংসপোড়া গন্ধ পাচ্ছি......

তোমার শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে শুভময়, সাদা চামড়া পুড়ে যাচ্ছে
[সুজন আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়]
চুলগুলো পুড়ে যাচ্ছে—নাক চোখ মুখ ঠোঁট—তোমার পিপাসা।
প্রেম তুমি কখনো জানতে না শুভময়, প্রেম কাকে বলে
দিন তুমি কখনো চিনতে না, রাত্রিও না
তোমার শরীর থেকে পোড়া চামড়া লেগে লেগে কতো ঘা
আমার শরীরে তুমি কখনো দেখ নি। শুভময়
তোমাকে বাঁচাব আমি—এতো জল আমার ছিল না।
[ঘরের আলো কমে যেতে যেতে নিভে গেল]
এ কী, আলো কে নেভালে! অন্ধকার—ঘন অন্ধকার—
অন্ধকারে শুভময় এসে পড়তে পারে [দিবা চেঁচিয়ে উঠল] সুজন
তুমি কি সত্যই চলে গেছ......নীলাঞ্জন
তুমিও কি চলে গেছ......নীলাঞ্জন তুমি এসো
অন্ধকারে ভয় করছে, বড়ো একা
একা হলে শুভময় এসে পড়ে। শুভময়—এখন এসো না, শুভময়
তোমার শ্মশানে আমি কিছুতে যাব না—কিছুতেই না—কিছুতেই না......
[কণ্ঠস্বর অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে]

[এখন মৃতদেহের দিকে পিছন ফিরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে অরূপ আর পায়ের দিকে বিপুল। সুজন দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। নিশীথ আছে কাছাকাছি অন্ধকারে—]

অরূপ। আমাদের সঙ্গে ওকে সহযাত্রী হতে তো বলিনি
মৃত্যুর সংবাদ শুধু পেঁাছে দেওয়া হল।

সুজন। কিন্তু, আমরা যে তিনজন মাত্র!

বিপুল। তিনজনে হবে না?

সুজন। এ কী বলছিস। শববাহী হোস নি কখনো?

বিপুল। আমি একা একটা দিক নিতে পারব।

সুজন। ঠাট্টা রাখ।

নিশীথ। [অন্ধকারের মধ্য থেকে] অন্ধকার ঘন হচ্ছে, রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে, সুজন
এখন প্রস্তুত হও।

সুজন। [চমকে] কে! কে ওখানে!

অরূপ। ওখানে নিশীথ।

সুজন। বাব্বা, একদম চমকে গেছি। তা ওখানে লুকিয়ে কেন? [নিশীথ বেরিয়ে এল]

নিশীথ। দিবা যে আসবে না, আমি অনেক আগেই জানতাম। তবু
ওরা তোকে পাঠিয়েছে—খবর দিয়েছে—ভালোই তো। তবে
শুভময় মারা গেছে—এ কোনো খবর নয়—কারুর কাছেই নয়—
আসলে কে বেঁচে রইল, কে কে বাঁচবে—সেটাই সংবাদ।
তেমন সংবাদ তোরা কেউ কি জানিস?

কেউ কি জানিস তোরা নিজেরাই কতটুকু করে বেঁচে রয়েছিস?
জানিস তো বল।
অরূপ এদিকে দ্যাখ—[অরূপ মুখ ফেরায়]
শুভময় মারা গেছে তখনো বিকেল। আর
সন্ধে হতে না হতেই তুই সে সংবাদ নিয়ে ওখানে গেছিস—তাই না?
অথচ সুজন, তুই-ই বল
শুভময় মারা গেছে এটুকু সংবাদ দিতে কতক্ষণ লাগে—
এখন অনেক রাত—প্রায় একটা—
দিবা কত দূরে থাকে আমরা প্রত্যেকেই জানি—তাই না!

সুজন। কতক্ষণ লাগতে পারে আমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই
বলারও না। এখন এসব কথা কেন?

নিশীথ। দুর্বল না হলে তুই রাগলি কেন? এখন তাহলে বল
আসলে দিবার কাছে গিয়ে তুই অনেকক্ষণ ভুলে গিয়েছিলি
শুভময় মারা গেছে, বহুক্ষণ মনেই পড়েনি তোর—। ঠিক কিনা বল!

সুজন। বাজে কথা—পুরোপুরি মিথ্যে কথা—

নিশীথ। কিন্তু কফি খেতে বেশ ভালোই লাগছিল, তাই না!

[সুজন অন্য দিকে মুখ ফেরায়]

তাতে কি সুজন, লজ্জার কিছুই নেই—। এই ধর বিপুল—

বিপুল। কী হয়েছে, বিপুলকে টানাটানি কেন?

নিশীথ। না, মানে এই আর কি। আরেকটা খবর আছে—
এখানে আসবার আগে বিপুলও দিবার কাছে গিয়েছিল—।

বিপুল। কে, কে বলেছে?

নিশীথ। উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই—যা যা বলছি সবই ঠিক।
শুভময় মারা গেছে—এ খবর জানার পরেও
এখানে আসবার আগে দিবার ওখানে তুই গিয়েছিলি—সত্যি নয়?

বিপুল। না—কক্ষনো না—

নিশীথ। মিথ্যা! তবে অরূপ সুজন—তোরা দ্যাখ
ওর পকেটের মধ্যে লাল গোলাপ রয়েছে কিনা, দ্যাখ—
দিবা ওকে দিয়েছে বিকেলে—দ্যাখ, খুঁজে দ্যাখ.........

[বিপুল মুখ নামায়]

অরূপ। দিবা আমাদেরও বন্ধু—তার কাছে আমরাও যেতে পারি—
গিয়েছে তো কী হয়েছে?

নিশীথ। অবশ্যই অবশ্যই। তবে তোরা প্রত্যেকেই শুভময়কে বলেছিলি
দিবা তারই থাক—
এবং প্রত্যেকে তোরা দিবার শরীরে হাত রেখেছিস—সত্যি কিনা বল।

[অরূপ অনেক দূরে অন্ধকারের দিকে তাকাল]

আজ বিকেলেও তুই গিয়েছিলি—বিপুল যাওয়ার একটু আগে
কিন্তু তুই দিবাকে পাসনি—দিবা খুব ব্যস্ত ছিল
কোথায় যে ছিল.........

অরূপ। কোথায় যে ছিল সেটা আমি কিন্তু জানি—।

নিশীথ। যার সঙ্গে একা ছিল—দিবা কিন্তু তারও বন্ধু।

বিপুল। কে সে?

সুজন। নাম বল।

অরূপ। কি নিশীথ, বলে দেব?

[নিশীথ চুপ করে রইল। অরূপ একটু অপেক্ষা করল, তারপর এক পা এক পা করে নিশীথের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অরূপকে এগুতে দেখে বিপুল এল তার পিছনে, এবং তার পিছনে এল সুজন। তিনজন নিশীথের দিকে এগিয়ে যেতেই নিশীথ চট করে দূরে সরে গিয়ে চিৎকার করে বলল—]

নিশীথ। তোর পকেটের মধ্যে রক্তাভ গোলাপ আছে—বের কর বিপুল।

বিপুল। করব না, কিছুতেই না—

নিশীথ। তোরও পকেটের মধ্যে রক্তাভ গোলাপ আছে—বের কর অরূপ।

অরূপ। তোরও পকেটের মধ্যে রক্তাভ গোলাপ আছে—বের কর নিশীথ।

নিশীথ। করব না, কিছুতেই না—।

সুজন। করবি না? তবে দ্যাখ—

[সুজন ওর দিকে এগুতেই নিশীথ সরে গেল]

নিশীথ। সাবধান, খুব সাবধান। গায়ে হাত দিতে এলে মেরে ফেলব।

বিপুল। তোকেও ছাড়ব না।

নিশীথ। এখানে আসবার আগে যারা মেরেছিল তারা তোদেরই তো লোক—।
তারা আঘাতের আগে অরূপের নাম নিয়ে আঘাত করেছে—
আঘাত করার আগে বিপুলের নাম নিয়ে আঘাত করেছে
সুজনের নাম নিয়ে আঘাত করেছে, আর
সুকেশ ও নীলাঞ্জন হয়তো ওদেরই মধ্যে ছিল—।

সুজন। তুই ওদের কী করে চিনিস?

নিশীথ। ওদের কাউকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু কে যেন ভিড়ের মধ্যে
নীলাঞ্জন নাম ধরে ডেকে উঠল। অন্যজন সুকেশ সুকেশ বলে
খুব নিচু স্বরে—কী যেন বলছিল!

বিপুল। ওসব চালাকি ছাড়—

সুজন। তোর পকেটের মধ্যে কী রয়েছে দেখবই—

নিশীথ। দেখাব না।

অরূপ। দেখাতেই হবে।

নিশীথ। কক্ষনো না—।

বিপুল। তাহলে আবার তোর সেই অভিজ্ঞতা হবে—এই দ্যাখ—

[তখন সামনে অরূপ পিছনে বিপুল এবং সবার পিছনে সুজন—নিশীথের দিকে ছুটে গেল। নিশীথও

দৌড় দিল, এবং এইভাবে ওরা চারজন অনেকক্ষণ ধরে মৃতদেহটিকে ঘিরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ওরা একজন অন্যজনকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ওদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগল। একসময় ওদের দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শোনা যেতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে চারজন ক্লান্ত যুবক পরস্পরের কাছ থেকে অনেকটা দূরে থেমে গেল।]

নিশীথ। কী হল?

অরূপ। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে গেছি।

বিপুল। আমিও তাই—।

সুজন। কেউ কাউকে ছুঁতেই পারলাম না—
হাত বাড়াতেই দেখি আমার সামনের লোক বহুদূরে সরে গেছে।

নিশীথ। তোর পকেটেও তবে আমাদের মতো কিছু আছে। [সুজন মাথা নোয়ায়]

অরূপ। কী আছে বের কর।

বিপুল। তাই তোর অতো দেরি। বের কর যা আছে—।

[সুজন তার পকেট থেকে একখানা ছোট্ট রুমাল বের করল]

অরূপ। রুমাল যে!

বিপুল। কে দিয়েছে, দিবা?

সুজন। না, দেয় নি সে। না বলে এনেছি।

নিশীথ। দিবা তোকে অন্য কিছু দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তুই
ভীতু বলে নিতে পারলি না।

সুজন। হয়তো তাই, হয়তো তাই নয়।
দিবা বলেছিল তার নাভির ভিতর
কোথায় কস্তুরী আছে আমাকে দেখাবে।
দিবা বলেছিল কোন্ অন্ধকার অহংকার হয়ে ওঠে আমাকে চেনাবে
কোন্ অহংকারে নাভি পেকে যায়—পচে গলে যায়
আমাকে দেখাবে। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে—বুঝলি নিশীথ
পালিয়ে এলাম। তবে লোভ ছিল ঠিকই, এবং জানতামও
তোদের অনেক তৃষ্ণা দিবা মিটিয়েছে—।
বুঝলি অরূপ, তাই আত্মঘাতী শুভময় এখানে রইল
তোরাও রইলি—আর আমি ছুতো করে ওখানে গেলাম
ওকে নিয়ে আসব বলে.........
শেষ অবধি আনতে পারিনি ওকে, সত্যাই এল না—
আমিও ফিরলাম, তবে ফিরে আসবার আগে
ওটা যে কখন আর কিভাবে নিয়েছি, মনে নেই...।

বিপুল। চুরি—!

সুজন। হয়তো তাই—

[সুজন ধীরে ধীরে মৃতদেহটির কাছে এগিয়ে গেল এবং বুকের উপর রুমালখানা বিছিয়ে দিল। তারপর একে একে অরূপ বিপুল আর নিশীথ এগিয়ে গিয়ে তাদের পকেট থেকে একটা একটা লাল গোলাপ বের

করে সেই রুমালের উপর রেখে দিল, এবং মৃতদেহের দুদিকেই দুজন করে দাঁড়াল।]

চারজন একসঙ্গে। আমরা তোকে হিংসা করি শুভময়, আমরা তোকে খুব ঘৃণা করি
আমরা তোকে ভালোবাসি শুভময়, আমরা তোকে খুব ভালোবাসি।

[চারজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল]

নিশীথ। শুভময় নীল ও সবুজ খুব ভালোবাসত—। সমস্ত ছবিতে ওর
নীল থাকত। শুভময়
দান করতে ভালোবাসত খুব—।
নীল রঙের জামা পরে আমাদের বাড়িতে ও এসেছিল একদিন—

বিপুল। নীল জামা পরে ও-তো আমাদেরও বাড়ি গিয়েছিল।

অরূপ। ও কিন্তু কৃপণ ছিল খুব—।

নিশীথ। কক্ষনো না—।
কৃপণের কোনো চিহ্ন ওর হাতে কোথাও ছিল না।

অরূপ। শুভময় তিন দিন আগে মারা গেছে, জানিস নিশীথ?

নিশীথ। জানি—।

বিপুল। আমিও জানতাম, কিন্তু জেনেও বলিনি—
কেন যে বলিনি তা—এখনো জানি না
অথচ বলার খুবই ইচ্ছে ছিল, বুঝলি অরূপ
ও কোন্ বাড়িতে বসে আত্মহত্যা করবে কখন যেন তা-ও জানতাম।
রোজ তোর সঙ্গে দেখা—বলতে গেছি—শুভময় মারা গেছে
সুজনের সঙ্গে দেখা—বলতে গেছি—শুভময় মারা গেছে
দিবার ওখানে রোজ বলতে গেছি—শুভময় মারা গেছে
অথচ পারিনি। কিন্তু, কেন যে পারিনি তা নিজেও জানি না।

অরূপ। সেদিন সন্ধ্যার আগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখলাম বিরাট
শূন্যের ভিতরে শুভময়—মাটি থেকে অনেক উপরে......
ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালাম। পথে তোর সঙ্গে দেখা
অথচ বলিনি—মানে বলতে পারিনি—

নিশীথ। অথচ কোথাও কেউ এখনো জানে না যে
এই নির্জনতা ওকে আমি দেখিয়েছি। এই পোড়ো বাড়িটার নির্জনে কোথায়
অলৌকিক আলো পড়ে.........
হয়তো সেই আলো দেখতে এসেছিল, শুভময়, হয়তো সত্যিই
অলৌকিক আলো দেখেছিল.........

সুজন। আমরা প্রত্যেকেই ঋণী তোর কাছে, শুভময়, আমরা প্রত্যেকেই
অন্তত তিন দিন ধরে একটা মৃত্যুর গল্প না বলে পেরেছি—
জেনেও বলিনি তুই বেঁচে নেই। হায়, আমরা পরস্পর
লুকিয়েছিলাম একটা মৃত্যুর সংবাদ!
দিবাও জানত তোর মৃত্যুর সংবাদ, কিন্তু সে জানত না তার

সবচেয়ে প্রিয় রাত্রি কোন্ উঠোনের মধ্যে একা শুয়ে আছে।
সে তোকে মৃত্যুর খোঁজ নিজে জানিয়েছে, শুভময়, বলেছে সে
তোর তৃষ্ণা মেটাবে যে অতো জল তার কাছে কোথাও ছিল না।

চারজন একসঙ্গে। আমরা কেউ শুভ্র নই, শুভময়, আমাদের বাগানের ফুল
পোকায় কেটেছে। ফলগুলো
ফলের মতন নয়। পাতার সবুজ
সবুজের মতো নয়। আমাদের মধ্যে আমরা কেউ
প্রেমিকের মতো নই—যুবকের মতো নই
নক্ষত্র বা উল্কাপিণ্ড নই—
আয় আমরা শোকের সন্ধানে চলে যাই।

নিশীথ। আমি পূর্ণ অন্ধকার হতে চেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম—

অরূপ। আমি খুব উচ্ছৃঙ্খল হতে গিয়ে রোজ রোজ বাড়ি ফিরে আসি—

বিপুল। আমি খুব ভোরে উঠতে চাই কিন্তু কখনো পারি না

চারজন একসঙ্গে। আমরা কখনো কেউ সুখ নই দুঃখ নই ভালোবাসা নই
গভীর প্রাণের গল্প নই—
আমাদের চারগুলো দুই আর দুইয়ে মিলে হয় না কখনো
দিনের শরীরে দিন পুরোপুরি জড়িয়ে থাকে না।
আমাদের পুরোপুরি বন্ধু কেউ নয়, শত্রু কেউ নয়
আমাদের মধ্যে কেউ আমাদের মতো ঠিক নয়।
আমরা বহুদিন ধরে একটা মৃত্যুর গল্প না বলে পেরেছি
আমরা বহুদিন ধরে শোকের সন্ধানে বেরিয়েছি।

[ওদের কণ্ঠস্বর শেষ হতে না হতেই অনেক দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এবং তার একটু পরেই আরো একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—]

১ম কণ্ঠ। দিবা, তুমি কোথায়?

অরূপ। কে, কার গলা?

সুজন। নীলাঞ্জন। দিবাকে খুঁজছে—

২য় কণ্ঠ। দিবা, তুমি কোথায়?

বিপুল। এটা যেন অন্য গলা মনে হচ্ছে!

সুজন'। সুকেশের গলা। সুকেশও দিবাকে খুঁজছে......।

[নীলাঞ্জন এবং সুকেশের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে আরো কাছে এগিয়ে এল এবং দ্রুততর হয়ে উঠল। ওরা চারজন মৃতদেহটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। ওদের চোখেমুখে এখন একটা প্রচণ্ড অস্থিরতার চিহ্ন। একে অপরের দিকে একবার তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পর পর ওরা উচ্চারণ করল, 'দিবা, তুমি কোথায়!' ওদের গলা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল এবং খুব চড়া কণ্ঠস্বরে সবাই মিলে একবার চেঁচিয়ে উঠল, 'দিবা, তুমি কোথায়!' তারপর গভীর অন্ধকারের মধ্যে চারজন চারদিকে ছুটে মিলিয়ে গেল।

হারিকেনের আলো এখন আরো ম্লান হয়ে গেছে, সেই আবছা আলো-অন্ধকারের মধ্যে দিবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

দিবা। তুমি কোন্ একাকিত্ব, শুভময়, কোথায় রয়েছ
উত্তরে দক্ষিণে শুয়ে। সাদা কাপড়ের নিচে সমস্ত শরীর
চতুর্দিকে পাতা ঝরে। পুবে ও পশ্চিমে গোল অন্ধকারে
বাগানের শুরু—। ম্লান হারিকেন জ্বলে......[দিবা ঢুকল]
আহ্, ওরা কই! ওরা সব চলে গেল!

[দিবা মৃতদেহের কাছে বসল]

তোমার শরীর থেকে পচা গন্ধ উঠে আসছে, শুভময়! আমি জানি
তুমি বহুদিন আগে মারা গেছ—। এই দ্যাখো
আমারও নাভিতে ঠিক অমনি গন্ধ, মাংসপচা গন্ধ, কী বিচ্ছিরি!
কিন্তু তুমি জানো, শুভময়, কস্তুরীর মতো অহংকার
ঘ্রাণ হয়ে জমা হতো আমার নাভিতে...............
তুমি কতোদিন ঠোঁটে মেখেছ তা—মনে আছে? শুভময়
তোমার সমস্ত ঠোঁট নীল হয়ে যেত, কিন্তু চিৎকার ছিল না—
তুমি শুধু পুড়ে যেতে, শুভময়—শুধু পুড়ে যেতে.........

[তখন একটু হাওয়া উঠল, হাওয়ায় মৃতদেহের উপরে সাদা কাপড়টা নড়ে উঠল। দিবা দুর্গন্ধের জন্য নাকে কাপড় চাপা দিল—]

ইস্, একদম পচে গেছে—

[মৃতদেহের কাপড়টা একটু তুলে আবার ঢেকে দিল]

হাড় থেকে মাংস খসে পড়ে যাচ্ছে.........

[দিবা এগিয়ে গিয়ে হারিকেনটা তুলে নিল, তারপর পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে হারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরে বলল—]

শুভময় বহুদিন আগে মারা গেছে, আমি একা। এখানে অরূপ
ফিরে এসো। ফিরে এসো এক্ষুনি, অরূপ.........

[তখন দক্ষিণ দিক থেকে শোনা গেল, 'দিবা তুমি কোথায়'? দিবা তখন দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—]

মাংস গলে পড়ে যাচ্ছে, আমি একা। বিপুল এখানে ফিরে এসো,
এক্ষুনি এখানে ফিরে এসো.........

[তখন পশ্চিম দিক থেকে শোনা গেল : দিবা, তুমি কোথায়? এবং দিবা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—]

ভীষণ দুর্গন্ধ উঠছে, আমি একা। নিশীথ এখানে ফিরে এসো,
এক্ষুনি এখানে ফিরে এসো.........

[তখন উত্তর দিক থেকে শোনা গেল : দিবা তুমি কোথায়? এবং দিবা সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—]

আমি আর থাকতে পারছি না। এখানে সুজন—ফিরে এসো.........
নীলাঞ্জন ফিরে এসো.........কেউ-না-কেউ ফিরে এসো.........
আলো দুটো নিভে যাচ্ছে.........তারাগুলো ডুবে যাচ্ছে.........
জোনাকিপোকাও একটা নেই—। আমি আর
থাকতে পারছি না, শুভময়—

তোমার গলিত দেহ নিয়ে চলে যাও, যাও শুভময়, যাও
ভীষণ দুর্গন্ধ নিয়ে সরে যাও—যাও সরে যাও—ইস্
কী বিচ্ছিরি পচা গন্ধ—আমি পারব না, না, কিছুতেই না
আমি আর পারছি না—অরূপ নিশীথ—নীলাঞ্জন
কেউ-না-কেউ ফিরে এসো—আমি আর পারছি না, পারছি না
আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও...............

[তখন চারদিক থেকে পর পর আবার ওদের গলা শোনা গেল! দিবা, তুমি কোথায়? তোমাকে পাচ্ছি না, দিবা...শুভময় পড়ে থাক—একা থাক—ওকে ফেলে চলে এসো...শুভময় আমাদের কেউ নয়—কেউ নয়—শুভময় নিজেরও ছিল না.........

মৃতদেহের উপরে রুমাল—রুমালের উপর কয়েকটি রক্তাভ গোলাপ—। হ্যারিকেনের আলো নিভে এল। চারদিকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে—শুধু শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দ তখন.........।]

বিভাবরী

দিনেশচন্দ্র রায়

কলেজের বিরাট মাঠে অর্ধেক আলো আর অর্ধেক ছায়া। পশ্চিমের দিকটা শীতের শেষের একটু-বা প্রখর আলোতে আলোময়, তারপর মাঠের মাঝখান থেকে ছায়া। মতিলালবাবু টীচার্স রুম থেকে ছায়াতে নামলেন, তারপর আনমনাভাবে কী যেন ভাবতে ভাবতে আলোতে পড়লেন। আলোর সীমানাতে ঢুকবার সময় মতিলালবাবুর লালচে ঠোঁট, ফর্সা মুখ এবং চশমার কালো ফ্রেমটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাল। হঠাৎ মতিলালবাবুকে আলোতে মাখামাখি লাগল। মতিলালবাবুকে দেখতে দেখতেই দীপু ভাবল, কলেজে দুপুরের দিকটা সবাই একটু অন্যমনস্ক এবং তন্ময় হয়ে যায়। দীপু ওই সময় লক্ষ্য করল, একদল মেয়ে ক্লাস শেষ করে তাদের কমনরুমের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ চুপ করে গেল। তবে কি একটা স্তব্ধ নদী পার হওয়া আর বিকেলের আলো এবং ছায়াতে বিভক্ত সবুজ মাঠ পার হওয়া একই কথা? আসলে নদীর মাঝখানে যে প্রজ্ঞা থাকে, মাঠের মধ্যিখানেও নিশ্চয়ই সেইরকম কোন তিতিক্ষা আছে। তা না হলে চপলা বালিকারাও হঠাৎ চুপ করে গেল কেন? দেবু আর বেণু এখনও ক্লাসে, ওদের জন্য এখনও আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। মাঠে নামতে নামতে দীপু কমার্শিয়াল জিওগ্রাফির ক্লাসে কনকবাবুর গলা শুনতে পেল। সারাটা কলেজ চুপচাপ। শুধুমাত্র কনকবাবুর গলা তীক্ষ্ণভাবে মাঠ পেরিয়ে কলেজের প্রশাসনিক ব্লকের দিকে ছুটে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গমগম করতে করতে আবার ফিরে আসছে। শব্দের এই তড়িৎগতিতে পুবদিকে ছুটে যাওয়া, আবার মুহূর্তের মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে পশ্চিমে ফিরে এসে গড়িয়ে-গড়িয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার পর সমবেত সংগীতের এফেক্ট তৈরি হচ্ছে। কনকবাবুর কণ্ঠস্বরের গতায়াতের এই তীব্র বহমানতার মধ্যে দীপু মাঠের সেই ছায়াময় অংশে একটা জড়বস্তুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। কনকবাবুর কণ্ঠস্বরের প্রত্যাগত প্রতিধ্বনি পুবদিক থেকে তাড়া খেয়ে ধেয়ে এল, মাঝখানে দীপুকে পেয়ে তার ওপর আছড়ে পড়ল—দীপুর চারপাশ ঘিরে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হল। ঘূর্ণিস্রোতের প্রচণ্ড টানে একখণ্ড কুটোর মতো বুঝি এখনই দীপু ভেসে যাবে। আমি যদি ছায়াময় অংশ থেকে ক্রমে রোদ্দুরের এলাকাতে পড়তে পারি তবে বোধহয় এবারের মতো বেঁচে যাব। দীপু শব্দের সেই খরস্রোতকে অস্বীকার করে জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আর দুপা বাড়ালেই রোদ্দুর। দীপু বুক চিতিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে উজিয়ে চলল। তার শরীরের ডান এবং বাঁ পাশের পাঁজরে সেই শব্দপ্রবাহ আঘাত করল, তাতে সাঁই সাঁই শব্দ উঠল, বাধাপ্রাপ্ত শব্দের কুণ্ডলী নাভিকুণ্ডলীর প্রতীক হল।—দীপু! ধুত! এত ডাকছি তবু শুনতে পায় না। দীপু ঘুরে দাঁড়াল, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, গণ্ডদেশে ক্ষিপ্রতা, তার সোজা হয়ে মুখোমুখি হবার প্রস্তুতির মধ্যে দীপু বিশ বছরের যৌবনের অনতিতারুণ্যের পেলবতা থেকে একমুহূর্তে পেরিয়ে প্রক্ষিপ্ত হল। মুহূর্তের খণ্ড অংশ হলেও বিভাবরী অপলক নয়নে দীপুর দিকে তাকিয়ে রইল। দুই চোখ ভরে দীপুকে দেখল।—আপনাকে কখন থেকে ডাকছি আর আপনি শুনছেনই না, বিভাবরী একটু হেসে কিন্তু অনুযোগের সুরে কথা বলল। কথা বলবার সময় ঘাসের দিকে তাকাল। চৈতন্যে নেমে আসার জন্য দীপু কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। সেই অতি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তগুলিতে

দীপু ভাবল, বিভাবরী যখনই কোন কথা তাকে বলে তার মনে হয় কথাগুলো কোন জলাভূমি পার হয়ে আসে। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসা কথাগুলো অলৌকিক হয়। বিভাবরীর কথাগুলো কানে গেলেই দীপুর মনে হয়, গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল। দীপু হাসলো, তারপর আস্তে আস্তে বলল,—কী ব্যাপার?

—ছাত্র সংসদের সভাতে আপনারা আমাকে ডেকেছেন, আমি কিন্তু যেতে পারব না। আমাদের ওদিকের সমস্ত মেয়েরা আমার কাছে চাঁদা জমা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলাতে গিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবেন। ঘাস থেকে দুচোখ আকাশে ঘুরল, তারপর সন্ধ্যাতারার সমস্ত স্নিগ্ধতা হরণ করে দীপুর মুখে চোখে বুলিয়ে দিল বিভাবরী। দোলের দিনের প্রথম আবিরের মতো নরম মিহি একটা অনুভূতিতে দীপু দুপুর রাতের নিশুতিতে ভরে গেল।

—আমাদের আজ আপনাদের এলাকাতেই যাবার কথা ছিল। ভালোই হল, এক জায়গা থেকে সব চাঁদা পাওয়া যাবে, বাড়ি-বাড়ি আর ঘুরতে হবে না, দীপু বিভাবরীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শেষ করবে মনে-মনে এমনি প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু কোন একসময়ে দীপু চুপচাপ পেছু হটে এল, দীপু চোখ নামিয়ে নিল। চোখ নামানোর পর দীপু ভাবল, বিভাবরী আরও কাছে এলে নিশ্চয়ই একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাবে। কিন্তু গন্ধটা কেমন? দীপু দ্রুতগতিতে বিভাবরীর সম্ভাব্য দেহবাসের অনুমান করতে মানসাঙ্ক শুরু করল।

—তা হলে সন্ধ্যেবেলা যাবেন কিন্তু, বিভাবরী কথা শেষ করে কমনরুমের দিকে পা বাড়াল, দীপু দাঁড়িয়ে রইল, ভাবল ঘাড় ঘুরিয়ে বিভাবরীকে আর-একবার দেখে নেয়। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও দীপু আর ঘাড় ফেরাতে পারল না। ঠিক এমনি সময়ে ঘণ্টা পড়ল। নিস্তব্ধ কলেজটা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কোলাহলে টলমল করে উঠল। ছাত্রছাত্রীরা হৈ চৈ করতে করতে মাঠে নামল। পেছনের জলতরঙ্গ আর দীপুর মাঝখানে পুরো আধখানা ছায়া-পরা মাঠ পড়ে আছে। দীপু আরও তন্ময়, রোদ্দুরে মাখামাখি, তারপর দীপু ভাবল—জোছনারাতে ঘুম ভেঙে একদিন না একদিন প্রত্যেকেই কোন না কোন পাখির ডাক শোনে। দীপু লাইনটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবতে লাগল। শেষ শীতে ঘূর্ণিবাতাস মাঝদুপুরে কলেজের মাঠে শুকনো পাতা আর টুকরো কাগজ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

—এ কথাটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমাদের বিরুদ্ধে একটা পাকা ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা যারা কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন চালাচ্ছি তাদের প্রত্যেকটি কাজে অপদস্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, দেবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু প্রাণহরির সরব প্রতিবাদে দেবুকে থামতে হল।—শুধুমাত্র অভিযোগ করলেই হবে না, স্পেসিফিক প্রুফ আপনাকে দিতে হবে।

—প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ আমরা করি না, বিশুদ্ধ সংসদীয় রীতি অনুসরণ করার জন্য সংসদের মিটিংগুলিতে দেবুর নাম আছে, সুতরাং প্রাণহরির দিকে না তাকিয়ে দেবু ইউনিয়নের সভাপতি মতিলালবাবুর দিকে তাকিয়ে তাঁকেই সম্বোধন করে বলে চলল,—এই সরস্বতীপুজোর ব্যাপারে নানাভাবে প্রচার করে সরস্বতীপুজোর চাঁদা না দেবার জন্য সবাইকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। সত্যিই আমাদের চাঁদা একদম উঠছে না।

দেবু থামতেই মতিলালবাবু কথা বললেন। মতিলালবাবুর ঠোঁটদুটো লাল এবং কথা বলার ফলে তাঁর সাদা, সমানভাবে সাজানো দাঁতগুলো কেমন করে যেন ঠোঁট দুটোর মাঝখানে ভীষণ মানিয়ে গেছে। মতিলালবাবুর মাথায় ঘন চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা। কথা বলবার সময় মতিলাল সিঁথির মাঝখানটায় একটু চুলকে শুধুমাত্র ডান হাতের তর্জনীটা দিয়ে চশমার ব্রিজটাতে একটা

ঠেলা দেন; চশমাটার ঝুলেপড়া ভাবটা কেটে যায়, চশমা নাকের ওপর উঠে যায়, তখন মতিলাল ঠোঁটটার ওপরে কী যেন খুঁজতে থাকেন। তারপর আবার তর্জনীটা সোজা সিঁথিতে। এই মুদ্রা-দোষের পুনরাবৃত্তি চলে। ছাত্ররা সেইজন্য মতিলালবাবুর নাম দিয়েছে সাইক্লিক অর্ডার। মতিলাল-বাবুর গায়ে ফিকে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি এবং খয়েরী ধরনের একটা চাদর। মতিলালবাবুর সিঁথির মাঝখানে তর্জনীর পোজিশান্ দেখেই ছাত্ররা চুপ করে গেল। কারণ সবাই বুঝতে পারল মতিলাল-বাবু কথা বলবেন,—আমার প্রস্তাব এই যে চাঁদা আদায়ের জন্য ইয়ার অনুসারে একজন করে ছাত্র-প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক।

—আমার এই প্রস্তাবে আপত্তি আছে, প্রাণহরি কথা বলতে বলতেই দেখল মতিলালের সেই তর্জনী তাঁর ঠোঁটের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে—যারা মেজরটি চাঁদা আদায় করার দায়িত্ব তাদেরই।

—ব্যাপারটা ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে এভাবে ভাগ করা যায় না, মতিলালের তর্জনী দ্বিতীয় সাইক্লে পুনরায় মাথার মাঝখানের সিঁথিতে,—ছাত্র সংসদে সংখ্যাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটাকে কাজে রূপ দেবার দায়িত্ব সংসদের প্রত্যেকটি সদস্যের।

—এটা স্যার আপনি একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যানালিসিস দিচ্ছেন, রিয়ালিটিতে সত্যিকারের সংসদীয় রীতিতে এমনি বিশুদ্ধ ব্যাপার ধোপে টেঁকে না। ততক্ষণে জীবনগতি উঠে দাঁড়িয়েছে, যদিও প্রাণহরি ফ্লোর ছাড়েনি—এটা তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—এতো থিয়োরি ঝাড়লে সরস্বতীপুজোর চাঁদা উঠবে না, পেছন থেকে উটকো মন্তব্যটা যে বেণু করল এটা পরিষ্কার বোঝা গেল, কিন্তু কেউ বেণুর এই চুটকিকে পাত্তা দিল না। জীবনগতি সামান্য ট্যারা, সুতরাং যদিও সে সোজাসুজি মতিলালের দিকে তাকিয়ে আছে তবু মনে হচ্ছে মতিলালের পাশে বসা দেবুকেই সে দেখছে। জীবনগতির দৃষ্টিসংকটের সঙ্গে মতিলালবাবু পরিচিত, স্পষ্টতঃ যদিও মনে হচ্ছে জীবনগতি দেবুর দিকে তাকিয়ে আছে তবু তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ধরে নিলেন যে জীবনগতির দুই চোখ তাঁর দিকেই, দেবু পরিস্থিতিটাকে এড়াবার জন্য সিলিংএর দিকে তাকিয়ে আছে।

—কোন তাত্ত্বিক আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। ইয়ার অনুসারে একজন করে সংসদের সদস্যকে চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট প্রস্তাব আমি হাউসের সামনে রাখব।

মতিলালবাবুর কণ্ঠে এবার দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে সেই প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের জোরে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে,—এটা নিতান্তই একটা রাজনৈতিক কৌশল এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়াকআউট করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, প্রাণহরি অনুচ্চকণ্ঠে কিন্তু স্পষ্ট ভাষাতে কথা বলল।

জীবনগতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রাণহরির দিকে তাকিয়ে তার বক্তব্য শুনছিল এবং প্রাণহরির বক্তব্য শোনার পর তার মুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল। যদিও জীবনগতি প্রাণহরির দিকে তাকিয়ে আছে তবু মনে হচ্ছে তার দৃষ্টি মতিলালের দিকে আর এইজন্যই মতিলালবাবু একটা ভুল করলেন, তিনি প্রাণহরির বক্তব্য শোনার পর তাঁর সুবিখ্যাত সংসদীয় নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ভাবলেন জীবনগতি কিছু বলতে চায়। তিনি বললেন,—জীবন, কিছু বলবে?

—না স্যার।

এদিকে সভাতে উপস্থিত ছাত্ররা একমুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল। সভার পেছন থেকে হঠাৎ একটা গলা শোনা গেল,—জীবনের গতি তোরে বোঝা বড় দায়, তোর পানে চাহিলে মোর

পানে চায়। দেবু মতিলালের পাশে বসে পুরো মন্তব্যটা শোনবার পরে চোখ বুজল। দেবু ভাবল, এখন একটা কেলেঙ্কারি হবে। বেণুটাকে বাইরে গিয়ে ধোলাই দিতে হবে। ছিঃ ছিঃ! দেবু চোখ-বোজা অবস্থাতেই প্রাণহরির চিৎকার শুনতে পেল।

—স্যার, কোন সদস্যের শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে অপর একজন সদস্য যদি ঠাট্টা করেন তবে সেটা নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতা। আমরা এই মুহূর্তে এর বিচার চাই।

ইতিমধ্যে প্রাণহরির ক্যাম্পের আরও তিনটি ছেলে একসঙ্গে চিৎকার শুরু করল। মতিলাল-বাবু কিছু একটা বলতে গেলেন কিন্তু প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যে তাঁর গলা ডুবে গেল। টেবিল চাপড়ানোর শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে প্রায় দুমিনিট সময় সমস্ত সভাটা গুম হয়ে গেল। দু-তিন মিনিট পরে সমবেত চিৎকারটা থামল, কিন্তু প্রাণহরির তীক্ষ্ন কন্ঠস্বরে শরবিদ্ধ সারসের মতো নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করার কথা মতিলালের মনে দু-একবার এল।

প্রাণহরি চিৎকার করে বলতে শুরু করল,—গেম সাবকমিটির সেক্রেটারি ফান্ডের টাকা দিয়ে গরম কোট প্যান্ট বানিয়েছে এটা আমরা হ্যান্ডবিল ছেপে আগামীকালই ছাত্রসাধারণের মধ্যে বিলি করব। যত চোরের রাজত্ব হয়েছে!

—আমরা এই অশালীন মন্তব্যের প্রত্যাহার দাবি করছি। এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর মন্তব্য যদি সংসদের সভাতে হয় তবে আমরা পদত্যাগ করব।

দেবু এতো চিৎকার শুরু করল যে প্রাণহরির গলা চাপা পড়ে গেল। ঠিক এমনি একটা ছিন্ন সেকেন্ডে মতিলালবাবুর ডান হাতের তর্জনী সিঁথির মাঝে উঠে গেল, তিনি অত্যন্ত উচ্চগ্রামে কিন্তু চিৎকার না করে বলতে শুরু করলেন,—জীবনকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় করার জন্য যে জঘন্য শ্রেণীর বিদ্রূপ এই সভাতে করা হয়েছে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি সভার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। মন্তব্যটা আমার কানে গেছে কিন্তু উপস্থিত যে সদস্য এই মন্তব্য করেছেন তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এবং কাপুরুষের মতো লুকিয়ে এই বিদ্রূপটা করেছেন। তাঁকে আমি দেখতে পাইনি। সুতরাং এই ঘটনার দায়িত্ব আমার, জীবনের কাছে আমি এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য মার্জনা চাইছি। মতিলালবাবু থামবার পরও দেখা গেল তাঁর ডান হাতের তর্জনী চশমা ঠেলে ঠোঁটের ওপর এসে লুপ্ত গোঁফের সন্ধানে রত হল।—কিন্তু প্রাণহরি যে অশালীন মন্তব্য করেছে আমি অনুরোধ করব তাকে সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে এবং দুঃখ প্রকাশ করতে। মতিলালবাবুর তর্জনী টেবিলে ফিরে আসবার পরও সভাতে কোন কথাবার্তা কিছুক্ষণের জন্য শোনা গেল না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে মতিলালবাবু বুঝতেই পারলেন না তিনি এই সভার নিস্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন কি না। কারণ প্রাণহরির ক্যাম্পে যদি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তবে স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে। ঠিক এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থাতে মতিলালবাবু মনে মনে প্রিন্সিপালের ওপর ক্ষেপে গেলেন। এই ভদ্রলোক অসম্ভব শয়তান, ইচ্ছা করে আমাকে ছাত্রসংসদের সভাপতি মনোনীত করেছে। ভাবনাটা শেষ হবার পরও মতিলালবাবু যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশের তৃপ্তি পেলেন না, দর্শন এবং সাহিত্যের জোড়া এম. এ. এবং গান্ধীবাদের বিখ্যাত প্রবক্তা মতিলালবাবুর সংযত এবং পরিশীলিত মনে দুটি অশ্লীল শব্দ কালো দুটি ভ্রমরের মতো বারবার গুনগুনিয়ে এল। শব্দ দুটোকে নিজের সজ্ঞান চিন্তার স্রোতে মতিলালবাবু বারবার তুলে নেবার জন্য প্রলোভিত হলেন, অবশেষে প্রাণহরিই বুঝি তাঁকে রক্ষা করল।

—স্যার, আপনার আদেশমত আমি রাগের বশে যে উক্তি করেছি তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং

দুঃখ প্রকাশ করছি।

—আমি প্রস্তাব করছি আজকের সভা মুলতুবি রাখা হোক, আগামীকাল আবার আমরা এই সময় সভাতে বসে সরস্বতীপুজোকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেব। চশমা ঠেলে তর্জনী ঠোঁট ছুঁয়ে চকিতে নিচে নেমে গেল। সভা ভঙ্গ হল।

দেবু, বেণু আর দীপু সভা শেষ হতেই দ্রুত বেরিয়ে গেল। যে পাঁচজন ছাত্রী সদস্য এতক্ষণ সভাতে চুপচাপ বসে ছিল তারা রাস্তাতে কিচিরমিচির করতে করতে চলল। দেবু, বেণু, দীপু খুব তাড়াতাড়ি পা চালাল। তাদের অনেক কাজ বাকি। ছাত্রীদের দলকে পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে আসবার পর হঠাৎ একটা সাইকেল ওদের পাশে স্লো হয়ে গেল, ওরা তিনজনই তাকিয়ে দেখল সাইকেলে জীবনগতি। জীবন সাইকেল না থামিয়ে বলল,—আজকের ঘটনার বদলা আমি নেব। তারপর কথা শেষ করেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দীপু, বেণু, দেবু—তিনজনই জীবনগতির এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব জানে। জীবন সাক্ষাৎ যম। তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। তবু এক অকথিত চুক্তিতে আবদ্ধ ত্রয়ীর মতো ওরা সেই বিকেলে জীবনগতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করল না।

দীপু আর দেবু যখন বিভাবরীদের বাড়িতে ঢুকল তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা, সেই ফাঁকা জায়গাটার একপাশে একটা ছোট্ট পুকুর,—পুকুর না বলে চৌবাচ্চা বলাই ভাল। ঠিক সেই ছোট্ট জলাধারের সামনে একটা কাঠের পোস্টের সঙ্গে লাইট লাগান। ফলে চৌবাচ্চার টলটলে জল একখানা শোয়ানো বড় আয়নার মতো দেখতে। বাকি জমিটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। বিভাবরীদের বাড়ির সীমানার মধ্যে ঢুকেই দীপুর সেই ছোট্ট পুকুরটা চোখে পড়ল। এলাকাটা একেবারে চুপচাপ। একটু দূরেই বাড়িটাতে অনেকগুলো আলো জ্বলছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। শব্দহীন নিস্তব্ধতা সেই ছোট্ট পুকুরেও সমানভাবে পরিস্ফুট, জলটা একটুও নড়ছে না, জলটা জমে যেন একখণ্ড বরফের মতো হয়ে আছে, অন্তত সন্ধ্যাবেলার বাতাস চিরুনির মতো জলটাকে আঁচড়ে দেবে এটাই প্রত্যাশিত দৃশ্য হওয়া উচিত।

দীপু আর দেবু দুজনের কাছেই বিভাবরীদের বাড়ির নিশুতিকে কিছুটা ভৌতিক মনে হল। সবচেয়ে গোলমেলে লাগল ঐ আয়নার মতো মিনিয়েচার পুকুরটা। তবু দুই বন্ধু বাড়ির প্রবেশ-পথের দিকে গুটি গুটি এগুতে লাগল। অনেকগুলো সিঁড়ি সাবেকী রীতিতে একটা উঁচু টানা বারান্দাতে উঠে গেছে, তারপর রেলের টানেলের মতো লম্বা সংকীর্ণ প্যাসেজ, প্যাসেজটা নিশ্চয়ই এমনিতে অন্ধকার থাকে এবং সেইজন্যই সেখানে একটা জোরালো আলো জ্বলছে। সেই সুরঙ্গ প্যাটার্নের অলিন্দ ভেতরে আর-একটা বড় বারান্দাতে শেষ হয়েছে এটা বোঝা যায়। সেই অনেক ধাপ সিঁড়ির শেষ ধাপে ওরা দুজন একজন জীবন্ত মানুষের আশায় দাঁড়িয়ে রইল। অন্তত এমন একজন কি এই এত বড় আলোজ্বালা বাড়িতে নেই যে বিভাবরীকে একটা সংবাদ দিতে পারে?

—কি রে দীপু, চল্ ভেগে পড়ি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না, দেবু ফিসফিস করে বলল।

—মাইরি দেবু, একটা মানুষের গলার স্বর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, কী করব বল্? দীপুর গলা ভীষণ হতাশ-হতাশ লাগল।—সারাদিন আজ ভোগান্তি গেছে, তারপর এমনি তীর্থের কাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। স্বগতোক্তির মতো দেবুর কথাগুলো শোনাল।

—কোন আশা নেই দেবু, চল এবার পালানো যাক। দীপু কথাগুলো শেষ করেই দেখলো একটি চার-পাঁচ বছরের মেয়ে সাদা ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যেভাবে

মজ্জমান মানুষ কুটো ধরে তেমনিভাবে দেবু দ্রুত সিঁড়িগুলো লাফ দিয়ে একেবারে প্যাসেজের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। পরিস্থিতি যা তাতে দেবুর পক্ষে একটু চেঁচিয়ে কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু চারদিকের সুষুপ্তিকে বিঘ্নিত না করার বিবেচনা দেবুর মতো সংবেদনশীল যুবকের পক্ষেই স্বাভাবিক। দেবু অনুচ্চ কণ্ঠে বলল,—খুকু, আমরা বিভাবরীর সঙ্গে দেখা করব, একটু ডেকে দেবে?

বাচ্চা মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সংকীর্ণ কিন্তু দীর্ঘ প্যাসেজের মধ্যে অতি উজ্জ্বল আলোতে মেয়েটিকে বায়বীয় এবং পরী-পরী লাগল। গায়ের সাদা ধবধবে পুরোহাতা সোয়েটার আর ঝাঁকড়া চুলের জন্য মেয়েটিকে রহস্যময় মনে হল। দেবু এবার প্যাসেজের মধ্যে ঢুকে গেল, দেবুর ব্যাকব্রাশকরা চুলে প্যাসেজের আলো চলকে পড়ল, সিঁড়ির নীচ থেকে দীপুকে মেয়েটির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আরও অনেক লম্বা লাগছে। দেবু এবার সেই সাদা-সোয়েটারপরা মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—বিভাবরী—তার মানে বিভা—তোমার কে হয়? মেয়েটি এবার হাসল, তারপর কিছুক্ষণ প্যাসেজের আলোর দিকে তাকিয়ে বলল,—দিদি।

—একটু ডেকে দেবে?

মেয়েটি আর কোন কথা বলল না কিন্তু দৌড়ে ভেতরেও গেল না; আস্তে আস্তে হেঁটে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। দেবু একা একা প্যাসেজের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে শূন্য বারান্দার চত্বর ছাড়িয়ে প্যাসেজে-দাঁড়িয়ে-থাকা একা-একা দেবুকে বেশ দূরের মানুষ মনে হচ্ছে। বিভাবরীর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা এতো অনিশ্চিত হয়ে গেছে যে এখন দীপুর একটুও ভালো লাগছে না। পলায়নের প্রবৃত্তি দীপুকে পেয়ে বসল। দীপু ঠিক করে নিল বাচ্চা মেয়েটির ভেতরে যাবার দুমিনিটের মধ্যে যদি বিভাবরী না আসে তবে ওরা আর একটুও অপেক্ষা করবে না, চলে যাবে। নিচে দাঁড়িয়ে দীপু কল্পান্ত পার হতে লাগল। আর ঠিক এমনি সময়েই একটা শাড়ির ওপর লাল শাল গায়ে জড়িয়ে লজেন্সজাতীয় কোন কিছু চুষতে চুষতে বিভাবরী প্যাসেজের মধ্যে দেখা দিল। দেবুর সঙ্গে হেসে বিভাবরী কী কথা বলল দীপু শুনতে পেল না। দেবু পেছন দিকে হটে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবু এবং বিভা পাশাপাশি বারান্দাতে, দীপু তখনও নীচে, একেবারে শেষের সিঁড়িতে। যেহেতু দেবু প্রায় একই সরলরেখাতে বিভার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সেইজন্যই বিভার পক্ষে ঘাড় ঘুরিয়ে দেবুকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা মুশকিল। বিভা বুঝে নিয়েছে যে দেবুর দিকে তাকানোর অসুবিধা সত্ত্বেও তাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে দেবু এবং দীপু দুজনকেই সম্বোধন করা যায়। দেবু অবচেতনভাবে তার স্থান পরিবর্তন করল, দীপু, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দাতে উঠে গেল। বিভা সেই কৌণিক দূরত্বের সুযোগ নিয়ে বলল,—আপনারা বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন? ওরা দুই বন্ধু হাসলো, কোন জবাব দিল না। বিভা একটা বড় খাম দীপুর হাতে দিয়ে বলল,—খামটার মধ্যে তিনশো টাকা আছে, রসিদের কাউন্টারফয়েলগুলোও আছে। আমাদের এদিকের সব মেয়েরাই চাঁদা দিয়েছে।

খামখানা দীপু হাতে নেবার পর দেবু বলল,—তাহলে আজ চলি। বিভা কোন কথা বলল না, একটু হাসল। দীপু এবং দেবু বারান্দা থেকে যখন সিঁড়ি ভেঙে নামছে তখন বিভাও ওদের পেছু পেছু নামলো এবং শেষ সিঁড়িতে দাঁড়াল। দীপু আর দেবু বাধ্য হয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বিভার মুখোমুখি হল এবং দীপু এই সময় বলল,—আপনাদের এই চৌবাচ্চা অথবা পুকুরটা একটা মেটামরফসিস! ঐ একখণ্ড বরফের শ্ল্যাবের মতো স্থির জলটা ভীষণ সিম্বলিক ব্যাপার।

—ওটা কিছুদিন আগে মাত্র করানো হয়েছে। ওটাকে পুকুর না বলে চৌবাচ্চা বলাই ভালো। কারণ সত্যি সত্যি ওটা পাকা চৌবাচ্চা। বিধান রায়ের বক্তৃতা শুনে উৎসাহিত হয়ে বাবা ওখানে তেলাপিয়া মাছের চাষ করছেন। ওরা যদি সব সময় আলো পায় তা হলে নাকি তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই দেখুন একটা জোরালো লাইট ওখানে সারারাত জ্বলে।

এবার দেবু চুপ করে রইল, দীপুই বলল,—চলি। বিভা প্রথমবারের মতো এবারেও কোন জবাব দিল না, হাসল মাত্র।

রাস্তাতে বেরিয়েই দেবু বলল,—আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

—ক্ষিদে তো আমারও পেয়েছে কিন্তু একটা পয়সাও পকেটে নেই। দীপু জবাব দিল।

—চল্, এই চাঁদার টাকা থেকেই এখন খাই, পরে পূরণ করে দেব। দেবু এমনভাবে কথা বলল যাতে মনে হয় প্রস্তাবের স্বপক্ষে সে মনস্থির করতে পারে নি, দীপুর সমর্থন চায়। কিন্তু দীপু সে কথার কোন জবাব দিল না। দীপু আর দেবু চুপচাপ হাঁটতে লাগল। দেবু ভাবল, দীপুর এই একটা মস্ত বড় দোষ, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ ভীষণ রিমোট হয়ে যায়। তারপর আর কিছুক্ষণ ধরা-ছোঁয়া যায় না। দেবু মনে মনে এই মন্তব্য করার পরও কিন্তু দীপুকে চাঁদার টাকা দিয়ে রেস্তোরাঁয় খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করল না।

বাড়ি ফিরে দীপু দেখল বাড়িতে অনেক ভিড়। বাইরের বারান্দাতে পর্যন্ত প্রতিবেশীরা বসে আছেন অথবা দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়ির সামনের রাস্তাতে দুখানা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই পাশের বাড়ির ভূপেন জ্যাঠামশাই বললেন,—কী রে দীপু তুই কোথায় গিয়েছিলি? পাড়ার ছেলেরা সাইকেল নিয়ে পাতি-পাতি করে খুঁজেও তোর পাত্তা পেল না। যা ভেতরে যা, তোর মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। দীপু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভূপেন জ্যাঠামশায়ের কথাগুলো শুনল। বারান্দাতে সঞ্জয় মেসোমশায় ও যতীনকাকা বসে আছেন। তাছাড়া আরও চার-পাঁচজন ভদ্রলোকও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন। দীপু সোজা ভেতরে চলে গেল। ভেতরের বারান্দা দিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলো। প্রভাত ডাক্তার আর নন্দ ডাক্তার বসে আছে। বাবা লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে আছেন। প্রভাত ডাক্তার এইমাত্র একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ম্যাসেজ করে দিচ্ছিলেন। ম্যাসেজ করার পর সূঁচটা তুলো দিয়ে মুছে জার্মান সিলভারের লম্বাটে কৌটোটার মধ্যে ইনজেকশানের যন্ত্রপাতি সবকিছু গুছিয়ে রাখল। ততক্ষণে নন্দ ডাক্তার মায়ের নাড়ী ধরে চোখ বুজে বসে আছে।

—নাড়ি ঠিক আছে প্রভাতদা, নন্দ ডাক্তার প্রভাতবাবুর দিকে তাকাল। প্রভাতবাবু ততক্ষণে খুব মন দিয়ে যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মায়ের বুকটা দেখছে। নন্দ ডাক্তারের কথাতে প্রভাত কোন জবাব দিল না। একটু পরেই স্টেথোস্কোপ কান থেকে নামিয়ে প্রভাত ডাক্তার চেয়ারে বসল। স্টেথোস্কোপটা ভাঁজ করা বোধহয় মুশকিল, কারণ দু-তিনবার ভাঁজ করতে গিয়েও লম্বাটে রবারের নল দুটো ডাক্তারবাবুর হাত থেকে কেমন পিছলে বেরিয়ে এল। অবশেষে একরকম ঠেসেঠুসে একটা লম্বামত রেক্সিনের ব্যাগে ভরে জিপটা টানতে টানতে ডাক্তারবাবু বলল,—ভাবনার কিছু নেই। শরীরে একদম রক্ত নেই। তাছাড়া পায়ে যে ইরাপশন বেরিয়েছে সেগুলোও বেশ যন্ত্রণাদায়ক। হঠাৎ একটা শকমতো হয়েছিল। সিসটেমেটিক ট্রিটমেন্ট দরকার। আগামী কাল সকালে এসে দেখে যা হয় করা যাবে।

—আজ রাতে যদি খেতে চায় কী খেতে দেব? বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

—গরম-গরম দুধ দেবেন। দু-একখানা রুটি খেতে পারেন। খাবার ব্যাপারে যা উনি খেতে চান তা দিতে পারেন। দুজন ডাক্তারবাবুই বেরিয়ে গেল। বাবা এতক্ষণে দীপুর দিকে একবার

তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। সবাই চলে যাবার পর মায়ের মাথার কাছে দীপুর দুই বোন বসে রইল। সে বাইরে এল এবং বুঝল তাদের সমস্ত বাড়িটা একটা পুরোপুরি সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। মায়ের অসুখটা সেই সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। বাবা বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সবাই প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল,—এখন কেমন?

—ডাক্তার বলল কোন ভয় নেই, প্রভাত ডাক্তার আগামী কাল আসবেন। একটা লঙ্ টার্ম চিকিৎসার প্রয়োজন। বাবা বেশ থেমে-থেমে স্পষ্ট করে কথাগুলো বললেন।

—বাড়ির কর্ত্রী যদি পড়ে থাকে তা হলে ত্রিভুবন অন্ধকার, ভূপেন জ্যাঠামশায় কথাগুলো বলতে বলতে খড়ম পায়ে সিঁড়ি ভেঙে পথে নামছেন, অন্যান্য ভদ্রলোকরা ছোট্টখাট্ট মন্তব্য করে আস্তে আস্তে যে যার বাড়িমুখো। ঠিক এমনি সময়ে সাইকেল নিয়ে গণেশমামা এসে হাজির। গণেশমামা সাইকেলটা দাঁড় করাতে করাতেই দীপুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—মেজদির শরীর নাকি হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে?

—হ্যাঁ হয়েছিল, তবে এখন ভালো। দীপু যদিও গণেশমামাকে একটুও পছন্দ করে না তবু এই মুহূর্তে সে গণেশমামাকে আশ্বস্ত করার মধ্য দিয়ে নিজের একটা ভূমিকা স্পষ্ট করতে চাইল। কারণ মায়ের অসুখের সংকটের সময়ে দীপু বাড়িতে ছিল না, তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি, সে জানে তার মা শয্যাগতা তবু সে কলেজ থেকে বাড়ি না ফিরে সরস্বতীপুজোর কাজে মেতে ছিল, সমস্ত ব্যাপারটা দীপুর মনে একটা পাপবোধের সৃষ্টি করেছে। দেরি করে হলেও সে এ সংকটে নিজের ভূমিকা নিতে চায়। তাই অবচেতনভাবে দীপু গণেশমামার কথার উত্তর শুধু আন্তরিকভাবেই দিল না, তাকে জিজ্ঞাসা করল,—আপনি কার কাছে শুনলেন?

—থানার কাছে কানু মহারাজের সঙ্গে দেখা, সেই বলল। গণেশমামা বারান্দাতে উঠে এল।

বাবা গণেশমামাকে দেখে বললেন,—এসো গণেশ, এসো। তোমার দিদির অবস্থা হঠাৎ খারাপ টার্ন নিয়েছিল। এতক্ষণ একটা তোলপাড় হয়ে গেল। বাইরের বারান্দাতে একটা বড়মত টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার। পাশে গণেশমামা বসল।

গণেশ ছোট্টখাট্ট মানুষ। রোগাটে কিন্তু রংটা পাঁশুটে ফর্সা। তার গায়ের পাঁশুটে রংটা দেখে মনে হয় গায়ের বর্ণটা অনেকদিনের বাসি। রংটার মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত রক্তের কোন দাগ নেই। এই ধরনের পাঁশুটে বর্ণের লোকেরা শীতকালে স্নান করবার সময় খালি গায়ে রোদে দাঁড়িয়ে বগল শোঁকে। সাধারণত এই ধরনের মানুষরা নোংরা গেঞ্জি ব্যবহার করে। গণেশ সোজা সিঁথি করার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা পাকের জন্য চুলগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ কিন্তু স্বাভাবিক। অথচ ঠোঁট দুটোর সংস্থান আশ্চর্য রকমের বাঁকা ধরনের। ফলে গণেশের ঠোঁটে একটা হাসি সব সময়েই লেগে থাকে। হাসিটা তার মুখের, বিশেষ করে ঠোঁটের স্থাপত্যের সংস্থানজনিত ব্যাপার। আসলে সেটা হাসি নয়। নাকের নীচে এবং ঠোঁটের ওপরে মাংসপিণ্ডের ভারসাম্যের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া। ফলে সব সময়ের এই হাসিকে শুনতে শুকনো খুকখুক কাশির মতো, আর এই হাসির জন্যই মনে হয় ভালো কথা বললেও গণেশ দুনিয়ার লোককে হীন বিদ্রূপ করছে। সেইজন্যই গণেশমামাকে দীপু একেবারে পছন্দ করে না। অথচ ভদ্রলোকের কানেকশানস ভালো। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ। ব্যাঙ্কে, পোস্টাফিসে, শহরের শেয়ার মার্কেটে, চাবাগানের অফিসে অনেক কঠিন কঠিন কাজ সহজে করে আসে। তবু গণেশমামাকে দেখলেই দীপুর সমস্ত গা গুলিয়ে ওঠে। গণেশমামা সাধারণত কথাবার্তা বলবার সময় যে-কোন অজুহাতেই হোক গায়ে হাত দেবে। অবশ্য বাবার সঙ্গে কথা বলার

সময় তাঁর গায়ে হাত দেবার কোন ঘটনা দীপু দেখেনি। কিন্তু গণেশমামা প্রায়ই তার গায়ে হাত দিয়েছে। হাতটা ঘামা-ঘামা। দীপুর সেই অভিজ্ঞতার অনুভূতি মনে এলেই সারাটা শরীর শির-শিরিয়ে ওঠে। তাছাড়া গণেশমামা কোন একজন মানুষ বা পরিবারের সঙ্গে প্রথম কিছুদিন খুব ঘনিষ্ঠ হয় তারপর কয়েকদিন যেতেই গণেশমামা তাদের নিন্দা শুরু করে। গণেশমামা বাবা বা অন্য সব বয়স্ক ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলবার সময় অবিরত কারও না কারও নিন্দা করে চলে। যার সঙ্গে গণেশমামার যত ঘনিষ্ঠতা হয় তার সম্পর্কে নিন্দাটাও তেমনি প্রখর হয়। তাছাড়া বাবার সঙ্গে বসে বসে কথা বলতে বলতেও গণেশমামা চারিদিক তেমন ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে দেখছে। মা নিজেও ভালো করে জানে না গণেশমামা কি রকম ভাই, গত কয়বছরে একটা পারিবারিক সম্পর্ক গণেশমামার সঙ্গে গড়ে উঠেছে। কথা বলতে বলতে বাবা দীপুকে ডাকলেন। সে বাবার সামনে দাঁড়াল। বাবা চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন। বাবার বারবেলভাঁজা এবং কুস্তিকরা চেহারা পেশিবহুল। যৌবনে বাবা সিটি কলেজে ব্যায়াম এবং খেলাধুলাতে খুব নাম করেন। দীপু শুনেছে সেকালে বাবা মোহন-বাগানেও দু-একবার খেলেছেন এবং ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিটি কলেজে সরস্বতীপুজো করার জন্য হিন্দু ছাত্ররা দাবি তোলেন, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্রাহ্ম ঐতিহ্য অনুসারে ঐ পুজো করতে দেন না—ফলে একটা ছাত্রবিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। ছাত্র-বিক্ষোভের মোকাবিলা করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বাবাসমেত আরও অনেক ছাত্রকে বহিষ্কার করে। সুতরাং বাবা এই গোলমালে আর বি এস-সি পরীক্ষা দিতে পারেন না। কিন্তু বাড়িতে আগাগোড়া ব্যাপারটা ঢাকঢাক গুড়গুড় করে রাখা হয়েছিল বরং বাবা যে বি এস-সি পাশ—এই মিথ্যা ধারণাটা বড়রাই সৃষ্টি করেছেন। বাবা গ্রাজুয়েট নন—এই সংবাদ কোনদিনই তাদের বাড়িতে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয় না। কিন্তু বাবা অঙ্কে অসম্ভব ভালো, ইংরেজী খুব ভালো লেখেন, ব্যবহারের জন্য সুবিখ্যাত। বাবার জীবন যাপনের মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই। বাবার চারপাশে একটা সহজ স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে। দীপু দাঁড়িয়েই আছে, অথচ বাবা গণেশমামার সঙ্গে কথা বলেই চলেছেন,—আরে বিধান রায়, কিরণশঙ্কর আর নলিনী সরকার নামকরা ব্যক্তি। এঁদের চরিত্রের কথা আর আমাকে বলবেন না, সুরেশদা। গণেশমামাকে আর কথা বলতে দিলেন না বাবা,—তুমি দেখো গণেশ, বিধান রায়ের হাতেই বাংলা দেশের যা কিছু হবার তা হবে, বিধান রায় মরে গেলে কী হবে কে জানে?

—আপনি কি বলেন সুরেশদা, বিধান রায় করবে দেশের উন্নতি? এই উনিশশো তিপ্পান্ন সালে ভর সন্ধ্যেবেলাতে ঘরের তলে বসে বলছি যে বাংলা দেশের সর্বনাশ হবে। গণেশমামা টেবিল চাপড়াল।

—এসব হচ্ছে আমাদের কুৎসা রটনা করার চিরকালের প্রবৃত্তি। আমরা নিজের দেশের মানুষকে কখনও প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পারি না, বাবা ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন। তারপর অন্য একটা স্থানীয় রাজনীতির আলোচনাতে বাবা আর গণেশমামা মশগুল হয়ে গেল। দীপু সরে এসে বাইরের ঘরে ঢুকল। এইখানেই সে পড়াশুনো করে, রাতে শোয়। বাইরের ঘরে ঢুকে দীপু জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তেই তার বাবার রাজনৈতিক মন্তব্যগুলো নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল। লুঙ্গিটা পরে চটি পায়ে দিতে দিতে সে সিদ্ধান্ত নিল, বাবাদের জেনারেশনের রাজনৈতিক মতবাদ একেবারে মধ্যবিত্তঘেঁসা। বাবা একথা ভাবতেই পারেন না যে প্রফুল্ল ঘোষের জায়গাতে বিধান রায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার পেছনে বিগ ক্যাপিটালের ভূমিকাই প্রধান। সোমনাথ লাহিড়ী একটা ডি. সি. মিটিংএ ব্যাপারটা

পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তাছাড়া ডি. সি. সেক্রেটারি দিলীপদা ছাত্রফ্রন্টের মিটিংএ যে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিগ ক্যাপিটালের ভূমিকা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। দীপুর বোন ঠিক এমনি সময়ে এসে তাকে ডাক দিল,—দাদা খেতে চল্, খেতে যাবার আগে মার সঙ্গে দেখা করে যাবি। দীপু রান্নাঘরে ঢোকবার আগে মায়ের ঘরে গেল। মা ওকে দেখেই বললেন,—সেই সকালে বাড়ি থেকে বের হোস, আর ফিরিস সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পর আর ফিরিস না। উনি ভীষণ রাগারাগি করেন।

সরস্বতীপুজোর সেক্রেটারি হয়েছে দেবু, ও একা পড়ে গেছে। তাই আমরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য করছি। আর কটা দিন মা, পুজো হয়ে গেলেই আবার ঠিক সন্ধ্যেবেলাতে বাড়ি ফিরব। এখন তোমার কেমন লাগছে?

—এখন ভালোই লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি। আর একটা কথা বলি, মন দিয়ে শুনবি,—দেবুকে আমাদের বাড়িতে বেশী আসতে না করবি। সেই চিঠিপত্র ধরা পড়বার পর থেকে উনি ওর ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে আছেন। দীপু বুঝল যে দেবু তার বোনকে একটা ছেলেমানুষী চিঠি অনেকদিন আগে লিখেছিল। দৈবদুর্বিপাকে সেই চিঠি কানুদা ওরফে কানু মহারাজের হাতে কী করে যেন পড়ে এবং কানু মহারাজ চিঠিখানা বাবাকে দেখান। সেই থেকে বাবা দেবুর ওপর মহা খাপ্পা। দীপু মায়ের কথাগুলো শুনে গেল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। ও চুপ করে আছে দেখে মা একটু আশ্বাস দিলেন,—অবশ্য কলেজে সরস্বতীপুজোর কাজ করছিস একথা শুনলে উনি রাগ করবেন না। ওঁকে আমি বলে দেব। যা, খেতে যা। সরস্বতীপুজোর ব্যাপারে বাবার দুর্বলতার কথা দীপু জানে এবং নিশ্চিন্ত বোধ করল। মা আবার তাড়া দিলেন,—যা, খেতে যা। দীপু মায়ের তাড়া সত্ত্বেও ঘর থেকে নড়ল না। মায়ের ঘরে সাবেকী আমলের আয়নাবসানো স্টীলের আলমারি আছে। দীপু ঘুরেফিরে সেই আলমারির কাছে দাঁড়াল। তার দুগাল ভর্তি দাড়ি। গোঁফটা চনমনিয়ে উঠছে। চশমার আড়ালে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সোজা নাক, শুকনো মুখটা ভীষণ শার্প লাগছে। দীপু নিজের কাঁচাহলুদের মতো গায়ের রং সম্পর্কে ভীষণ কনসাস্। ও ভাবল, প্রোফাইল থেকে ফটো নিলে তাকে পোয়েট অব থার্টিসের যে কোন কবির মতো দারুণ দেখাবে। দীপু থার্টিসের কোন কবিকেই দেখেনি, এমন কি তাদের ফোটো পর্যন্ত না, অথচ তার কেমন যেন ধারণা ত্রিশের কবিরা ভীষণ তীক্ষ্ম দেখতে। ছাত্রদের মাঝখানে দীপু জানে না কেন স্টিফেন স্পেনডারের নামটা ভীষণ চালু। আজকাল বুদ্ধদেবের 'অ্যান্ একার অব্ গ্রীন গ্রাস' আর 'কালের পুতুলের' নামটা একটা ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাশন সিম্বল হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমনি এলোপাথাড়ি ভাবনা কতক্ষণ চলতো কে জানে, কিন্তু আবার মায়ের গলা শুনে দীপু ঘুরে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখোমুখি হল। দুটো বিরাট বিরাট বালিশে মাথা দিয়ে মা শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার খোলা চুল বালিশ উপচে পড়েছে। অমন সোনার মতো গায়ের রং একটু বা পান্ডুর দেখাচ্ছে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। সেই শুকনো ঠোঁটে একটা আশ্চর্য প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে তিনি দীপুর দিকে তাকিয়ে আছেন। মা যখন এমনি হেসে ওর দিকে তাকান তখন দীপু বিনা দ্বিধাতে মাকে বন্ধুর মতো মনে করে। মা খুব নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করলেন,—আজ এই এতক্ষণ কি কলেজেই ছিলি?

—বিকেল পর্যন্ত কলেজেই ছিলাম, একটা মিটিং ছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতে চাঁদার টাকা কালেকশন করবার জন্য বিভাবরীদের বাড়িতে আমি আর দেবু গিয়েছিলাম।

—বিভাবরী মানে সেই ধীর স্থির, লেখাপড়াতে খুব ভালো মেয়েটি?

—হ্যাঁ, মা।

দীপু লক্ষ্য করল মায়ের সেই নিরাপদ নিঃশব্দ হাসি, রোগে কাতর এবং শীর্ণ ওষ্ঠাধর আরও গভীর হল। মা সব বুঝতে পারেন। দীপুর আয়নার সামনে নিজেকে আর একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভীষণ লজ্জা লাগল।

প্রতিদিন রাতে দীপু বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়ে। নতুন একখানা বই শিগ্গির নাকি বেরুবে, কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। নতুন বইখানা যাতে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পায় তার জন্য লোকসাহিত্য সংস্থার মানিকদাকে অনুরোধ করেছে। তাছাড়া প্রোভাইস ইলেকশনের পর দেবুর কলকাতা যাবার কথা আছে, দেবু কলকাতা গেলে বিষ্ণু দে-র কবিতার নতুন বইখানা অবশ্যই আনতে বলবে। গণেশ-মামা তখনও বাবার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করছে। গণেশমামার গলা একবার পরিষ্কার দীপুর কানে এল,—দিদির সোনা যা আছে তা যেভাবে আপনি বিক্রি করছেন তাতে আর কয়দিন চলবে? একটা কাজকর্ম করুন। দীপু পরিষ্কার বুঝতে পারল বাবার আর্থিক দুরবস্থার জন্য যেসব বিক্রিবাটা গোপনে হচ্ছে সেগুলো বাবা গণেশমামার মাধ্যমে করছেন। বাবা নিজে এগুলো এখনও সাক্ষাৎ মাড়োয়ারীর গদিতে বাঁধা দিতে বা বিক্রি করতে চান না, কারণ তাতে বাবার পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ধন-দৌলত সম্পর্কে একটা ধারণা বাজারে যা চালু আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু গণেশমামা ব্যক্তিত্বে এতো ছোট যে বাবার এই দুর্দিনে তাঁকে কাজকর্ম করতে বলছে। গণেশমামা জানে যে বাবা এখন তহশিলদার বা চাবাগানের বাগানবাবু হতে পারেন না। দীপু যখন কবিতার বই খুলে এসব ভাবছিল তখন তার খেয়াল হল যে বারান্দাতে তখন আর কোন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। তাহলে কি গণেশ শালা চলে গেল? দীপু নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গণেশমামা ভেজানো দরজা খুলে দীপুর ঘরে ঢুকল।

—আজকাল নাকি বন্ধুবান্ধব নিয়ে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ? বাড়িতে মায়ের অসুখ, সেদিকে কি তোমাদের কোন নজর নেই? সেই অব্যর্থ শুকনো খুকখুক কাশির মতো শব্দ করে বাঁকা ঠোঁটে হাসতে হাসতে গণেশমামা কথাগুলো বলল। দীপু সে কথার কোন জবাব দিল না। গণেশমামাও বোধ হয় কোন জবাব আশা করল না, তাই আবার কথা শুরু করল,—কাল সকাল সাতটার মধ্যে কানু মহারাজকে একবার বলবে উনি যেন দশটা-এগারোটার মধ্যে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেন। গণেশমামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল না, সুতরাং দীপু চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে তাদের এই শহরের কালীমন্দিরের কালী-মূর্তির কথা ভাবতে লাগল, চেয়ারে বসে লন্ঠনের সামনে সে চোখ বুজে রইল। এমনি কতক্ষণ দীপু চোখ বুজে বসেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ তার মনে হল বেণু তার নাম ধরে ডাকছে। বারান্দা থেকে বাবা ভেতরে চলে গেছেন। প্যাসেজের সদর দরজা আটকে দিলেই বাইরের বারান্দা আর দীপুর ঘর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে সে দেখল এখনও সদর দরজা বন্ধ হয়নি। চাকরবাকররা খেয়েদেয়ে এলে তবে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হবে। দীপু সেই খোলা দরজার পর প্যাসেজটার অবস্থিতিতে নিজের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগটা মানসিকভাবে অনুভব করল, আমাদের পরিবার সংগঠন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ক্ষুদ্রতম সংগঠন। বারান্দাটা আড়াআড়িভাবে পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে কথাটা ভাবল, এবং আমরা মধ্যবিত্ত যুবকরা ইনহিবিশন আর সেন্টিমেন্টালিটির যোগফল। শেষ সিঁড়ি ছেড়ে মাটিতে নামবার সময় ছাত্র ফ্রন্টে দিলীপদার বক্তৃতাটা বারবার মনে আসতে লাগল। আসলে একখানা নকশি কাঁথাতে আমাদের মুখ, আমাদের বাড়িঘরের

ছবি, আমাদের চিন্তার প্রতীকরূপে কিছু মুখোশ সূঁই সুতো দিয়ে তোলা থাকে, সেটাই আমাদের ইতিহাস—এই লাইনগুলো বেণুর একটা প্রবন্ধে কলেজ ম্যাগাজিনে পড়েছিল দীপু, কাঠের গেটটা খুলতে খুলতে দীপু লাইনগুলো ভাবল। রাস্তাতে এসে দেখল দেবু আর বেণু দাঁড়িয়ে আছে। দেবু জানে এ বাড়িতে দীপুর বাবা সুরেশবাবু তাকে পছন্দ করেন না, তাই দীপুকে সে ডাকেনি, দীপু বসবার জন্য ডাকলেই দেবু ওদের বাড়িতে উঠবে না, সুতরাং সে দেবু এবং বেণুকে ঘরে গিয়ে বসবার জন্য আহ্বান করল না। ওদের তিনজনের মধ্যে এ ব্যাপারে এমন একটা অকথিত বোঝাপড়া আছে যে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে কথা বলাটাকে ওরা স্বাভাবিকভাবে নিল। দীপুকে দেখেই দেবু বলল,—জীবনগতির ব্যাপার নিয়ে একটা ক্রাইসিস হয়েছে, বেণু হোটেল থেকে খেয়ে ফিরবার সময় জীবনগতি সহ চার-পাঁচটা ছেলে ওকে ঘিরে ধরেছিল, জীবনগতির হাতে বিরাট একটা ছোরা ছিল।

দীপু একটু অসহায়ের মতো বলল,—তাই নাকি?

—কোনক্রমে, সোজা বাংলা কথাতে পালিয়ে বেঁচেছে, দেবু বোধহয় একটু আস্তে আস্তে কেটে-কেটে কথাগুলো বলে দীপুকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে চায়; তাই একটু থামল,—তুই বাড়িতে বলে আয় আমাদের হোস্টেলের একটা ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছে সেইখানে আজ তোকে নাইট ডিউটি দিতে হবে।

—কেন?

—ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ডি. সি. সেক্রেটারি দিলীপদার সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করতে হবে। দিলীপদা যদি বলেন তবে ফেডারেশনের একজিকিউটিভদের ডেকে আজ রাতেই সভা করতে হবে।

—এটা একটা অ্যাবসার্ড কথা। এত রাতে তুই কোথায় একজিকিউটিভ মেম্বারদের পাবি?

সে যাই হোক, তুই বাড়ি থেকে পারমিশান নিয়ে বেরিয়ে আয় তো, তারপর চিন্তা করে যা-হয় করা যাবে। আমরা এগিয়ে বড় রাস্তাতে রইলাম।

[ক্রমশ]

ভারতীয় চলচ্চিত্র

কিরণময় রাহা

১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষে কাহিনীচিত্র তৈরীর সংখ্যা ৪৭৫ এবং এই নিয়ে সংখ্যার গুণতিতে পাঁচ বছর ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থানের অধিকারী। কি বিপুল জনতা প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার প্রেক্ষাগৃহে এত ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করে তা সহজেই অনুমেয়। অনুমানে অসুবিধা থাকলে দু একটি সংখ্যার উল্লেখই যথেষ্ট। চার বছর আগে ১৯৭২ সালে টিকিট বিক্রী হয়েছিল ১৭০ কোটি টাকার মত, আর সিনেমাশিল্প থেকে কর আদায় হয়েছিল প্রায় ৭২ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, বছর বছর এ দুয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সাক্ষরতার গণনায় ভারতবর্ষের স্থান ঠিক কোথায় জানি না, তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব উঁচুর দিকে নয়। এখনও অক্ষর-পরিচয় আছে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নীচে।

এই দুটি সাধারণ, আপাতদৃষ্টিতে অসম্পর্কিত, তথ্যের সঙ্গে যদি চলচ্চিত্রের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনুরূপ সাধারণ কয়েকটা কথা মনে রাখা যায় তাহলে বোঝা যায় কেন ভারতীয় চলচ্চিত্র যে ভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং মুখ্যতঃ যে চেহারা নিয়েছে তা প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। চলচ্চিত্রের কোনও মূল ধারা বা চেহারার কথা বলায় অতিসরলীকরণের বিপদ আছে। মাত্র ষাট-সত্তর বছর বা তারও কম সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র যে কত বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে, কত বিচিত্র উপাদানে ও রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, কত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও আবেদনে নির্মিত ও পরিবেশিত হয়েছে তা শুধু বিস্ময়করই নয়, তার অনুধাবনও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তা হলেও কয়েকটি সূত্রের অন্বেষণ বা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা চলে না যদি সাধারণভাবে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করতে হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেই সূত্রানুসন্ধান এক হিসাবে অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় কাহিনীচিত্রের গোত্রবিচার বিশেষ জটিল কাজ নয়। ভারতবর্ষে শতকরা পঁচানব্বই জনের বেশী যে জাতীয় চলচ্চিত্র দর্শনে অভ্যস্ত এবং আগ্রহী তার উপাদান ও অবয়বে বৈচিত্র্য অল্পই। সেটা কি ও কেন হয়েছে স্বল্প-কথায় বলার প্রস্তাবনা হিসাবেই উপরোক্ত চারটি তথ্য ও প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে শেষোক্ত দুটি—চলচ্চিত্র মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য আর আমাদের দেশের প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি—কিছু আলো-চনার অপেক্ষা রাখে।

নতুন কথা কিছু নয়, তাহলেও মনে রাখা ভাল যে চলচ্চিত্র আমাদের দেশে সর্বকনিষ্ঠ মনোরঞ্জক শিল্পমাধ্যম; বয়সের বিচারে সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য, কাব্যসাহিত্য বা লোকনাট্যের তুলনায় অর্বাচীন। সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু এরই মধ্যে সর্বাধিক জনপোষিত। অবসরবিনোদন বা মনোরঞ্জনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ আর সময় সিনেমা দেখায় ব্যয়িত হয় তা আর কিছুতে হয় না। যে সব বৈশিষ্ট্য, শর্ত আর অবস্থার ফলে এটা হয়েছে তার মধ্যে একটা হল যন্ত্রনির্ভরতা। অন্য একাধিক শিল্পও যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি হয় কিন্তু চলচ্চিত্র যেভাবে যন্ত্রনির্ভর সেভাবে আর কোনটা নয়। আমাদের দেশে, অন্ততঃ এখন অবধি, চলচ্চিত্রই একমাত্র যন্ত্রযুগের শিল্প। যন্ত্রযুগের শিল্প তথা একান্তই নাগরিক শিল্প। সৃষ্টির কাজে যে সব বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক সাজসরঞ্জামের

প্রয়োজন তা বৃহদাকার কয়েকটি সহরেই লভ্য। ব্যয়বাহুল্য চলচ্চিত্রের অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আজকাল আট-দশ লাখ টাকার কমে কাহিনীচিত্র করার কথা ভাবেন এমন প্রযোজক বা পরিচালকের সংখ্যা বেশী নয়। যে শিল্পসৃষ্টিতে এত অর্থের প্রয়োজন সেখানে অর্থনীতিগত নানা সমস্যা ও ভাবনা এসে পড়তে বাধ্য। আর্থিক সাশ্রয় ও ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রশ্ন অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে আসে না।

এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত চলচ্চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আবেদনের, তথা জনপ্রিয়তার কয়েকটি একান্ত অনুষঙ্গও মনে করা যেতে পারে। বাস্তব থেকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেতে চলচ্চিত্রের পারঙ্গমতা অসাধারণ ; সাময়িক পলায়নের এমন মসৃণ পথ ও পদ্ধতি দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। রোজ লক্ষ লক্ষ লোককে চিত্রগৃহের দরজায় ঠেলে দিতে পলায়নপ্রবৃত্তি বোধহয় সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি। দুঃখকষ্ট থেকে পলায়ন, দৈনন্দিনতার গ্লানি থেকে পলায়ন, রূঢ় বাস্তব পরিবেশ থেকে পলায়ন, এক কথায় নিজের কাছ থেকে পলায়ন। এই পলায়নী মনোভাবে সিনেমার প্রশ্রয়ী ভূমিকার একটা সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় চার্লস ডেভির "ফুটনোটস টু ফিলম"এ উদ্ধৃত এক ভদ্র-মহিলার চিঠিতে। ভদ্রমহিলা লিখছেন : 'আমি সিনেমা দেখতে যাই...বর্তমানকে ভুলতে, মনকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে, নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে, আমি যাই যখন আমি চিন্তা করতে নারাজ ; আমি যাই যখন আমি চিন্তা করতে চাই অথচ চিন্তা করতে পারি না ; আমি যাই যখন আমি চাই জীবনকে এক রঙীন অবাস্তব চোখে দেখতে ; আমি যাই যখন সারাদিনটা এমন ভজকট তালগোল পাকিয়ে কাটে যে সন্ধ্যায় আকুল হয়ে চাই এমন একটা জীবনের প্রতিচ্ছবি যা একটা ছকে ফেলা, তা সে ছক যতই অবাস্তব ও অসম্ভব হোক ; ...আমি যাই কারণ সিনেমার ঐ চতুষ্কোণ পর্দাটা আমার কাছে একটা আশ্চর্য জানলা যার ভিতর দিয়ে আমি একটা স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি।' ভদ্রমহিলা আরেকটা কারণ যোগ করে দিতে পারতেন। সেটা হল ইচ্ছা-পূরণের অনুচ্চারিত তাগিদ। সুপ্ত, অতৃপ্ত সব বাসনা মিটিয়ে দিতে চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অসাধারণ। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে তাদের সুখ, দুঃখ, বিপদ ও বিপদমুক্তির রস বিকল্পে আস্বাদন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যত অনায়াসে করা যায় তত আর কিছুতে নয়।

এই অদ্বিতীয় আকর্ষণীশক্তির একটা সহযোগী কারণ, মনস্তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন, দর্শন-কালীন অবস্থায় দর্শকের সম্মোহন-লক্ষণাক্রান্ত মানসিক অবস্থা। আমরা যখন সিনেমা দেখি তখন নানাবিধ কারণে (অন্ধকার ঘরের বিচ্ছিন্ন পরিবেশ, চিত্রকল্পের অ-স্থিরতা, স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি) আমাদের মন সম্মোহনের তন্দ্রাচ্ছন্ন গোধূলি জগতের সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করে। চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে মনকে একই সঙ্গে তন্দ্রাভিমুখী ও উত্তেজিত করার, যার ফলে চেতন মন হয়ে পড়ে অকর্মণ্য। যা পরিবেশিত হয় তা মননের রাজ্যে আসে—যদি আদৌ আসে—ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুর ছড়ানো পথ পেরিয়ে। এইসব সম্মিলিত কারণে দর্শককে অভ্যাসের দাসে পরিণত করার ক্ষমতাও চলচ্চিত্রের কম নয়। সাধারণভাবে পর্যবেক্ষিত অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়, সিনেমা দেখার অভ্যাস প্রায় নেশার পর্যায়ে পড়ে।

যান্ত্রিক প্রযুক্তি যে শিল্পসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন, যে শিল্পাবদান পরিবেশিত হয় উত্তেজনা-লোভী জনতার ভোগে, যে শিল্পনির্মাণে প্রভূত বিত্ত ও সেই কারণে ব্যবসায়ী বিত্তবানের প্রয়োজন, যার আবেদন সোজাসুজি, তাৎক্ষণিক ও ইন্দ্রিয়াগম, যা পলায়নীমনোবৃত্তির সহায়ক এবং সর্বোপরি যার স্বাদগ্রহণ মনকে, তথা বিচার ও বুদ্ধিকে, তন্দ্রাচ্ছন্ন করার সম্ভাবনায় পূর্ণ, সেখানে জনপ্রিয়তা

কোন পন্থায় কি কৌশলে অর্জন করা যায় তা আবিষ্কার করা দুরূহ নয় ; দুরূহ হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির কঠিন তাগিদে তা আবিষ্কৃত হতেই হয়।

সব দেশেই হয়, ভারতবর্ষেও হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হয়েছে তা এই জন্য ক্ষোভের কারণ যে চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক উন্নতি ও ব্যবসায়িক বিস্তৃতির সঙ্গে পরগাছাবৃত্তি থেকে এর মুক্তি আসেনি। এটাও হয়ত অবশ্যম্ভাবী ছিল। যে কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মত চলচ্চিত্র নির্মাণেও নিয়োজিত মূলধন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার একে অপরের অপরিহার্য পরিপূরক। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যখন বিপুল পরিমাণে টাকা চলচ্চিত্রনির্মাণে নিয়োজিত হয় তখন চলচ্চিত্রর বাজারও একই সঙ্গে দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। অথবা বলা যায় প্রসারিত বাজারের আকর্ষণে এই শিল্পোৎ-পাদনে প্রচুর মুনাফালোভী টাকা এসে পড়ে। সেই বাজার যাদের নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ যে বৃহৎ দর্শকশ্রেণী সিনেমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারা সহরে থাকুক বা না থাকুক, আপিসে কলকারখানায় কাজ করুক বা না করুক, তাদের রুচিগত উত্তরাধিকার গ্রামীণই থেকে গেছে। আমাদের প্রাচীন কৃষিপ্রধান দেশে মনোরঞ্জনের যে সব লোকানুষ্ঠান যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে—যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, লোকনৃত্য, লোকনাট্য ইত্যাদি—তার আবেদন ভারতীয় মন ও সাধারণের ধ্যানধারণার গভীরে প্রতিষ্ঠিত। লোকসংস্কৃতির এই সব ধারকের আঙ্গিকের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মূল আকারগত ও বিষয়গত ঐক্যও লক্ষণীয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও লৌকিক রূপকথার কাহিনী যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে মনোরঞ্জনের—জনশিক্ষারও বটে—কাজ করে আসছে। এই বিপুল ভান্ডার থেকে আহরিত সম্পদ সমাবিষ্ট জনসাধারণের সামনে যে রূপে ও ভঙ্গীতেই পরিবেশিত হোক কতগুলি প্রথাসিদ্ধ আচার ও সংস্কারে তা চিহ্নিত। সেই প্রচলিত ও ব্যবহারসিদ্ধ রীতির কয়েকটি হল, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠান, মন্থর লয়ে বিস্তার, উপস্থাপনে গান ও সুরের প্রাধান্য, মূল কাহিনীর অন্তর্বর্তী বহু উপকাহিনীর সমাবেশ, নানা পারম্পর্যহীন ঘটনার গ্রন্থনা, নীতি ও উপদেশ, প্রচার ও ধর্মানুগত্য ইত্যাদি। পাঠ্য কাহিনী বা বইয়ের সাহায্যে বিনোদনের সুযোগ যেখানে মুষ্টিমেয়ের অধিকার—আগেও ছিল এখনও আছে—সেখানে দর্শনীয় ও শ্রাব্য মাধ্যমই জনসাধারণের একমাত্র উপায়। ইউরোপ বা আমেরিকায় ছাপার বই ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার ফলে জনমানসিকতার রূপান্তর ঘটার পরে এসেছে চলচ্চিত্র। আমাদের দেশে তা এসেছে আগে। ব্যবসায়ী ভিত্তিতে আর্থিক লাভের মুখাপেক্ষী উৎপাদন স্বাভাবিক নিয়মেই ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী নির্মিত হয়। জনমানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ার ফলে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেই চাহিদার মৌলিক কোন রূপান্তর ঘটেনি। সাধারণ দর্শক সচেতন বা অচেতন-ভাবে যে প্রথাগত সংস্কার ও রীতিতে বহু যুগের সঞ্চিত অভ্যাসে অভ্যস্ত তার প্রতিফলনই চায় বা দাবী করে চলচ্চিত্রের কাছে।

এমতাবস্থায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে রচনা ও বিন্যাসে পরনির্ভরতা এড়ানো হয়ত সম্ভব ছিল না। যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত, তদুপরি সিনেমার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বলে এবং দেশের এক ক্রমবর্ধমান অংশের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জনপ্রিয়তার প্রসার দ্রুতগতিতে হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পরধর্ম ছেড়ে স্বধর্মে আসা দূরের কথা, পরধর্মকেই আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে আঁকড়ে ধরার প্রবৃত্তি বেড়েই চলেছে। নির্মাণের পদ্ধতি ও পরিবেশন আধুনিক যন্ত্রযুগের কিন্তু দর্শকদের রুচি ও চাহিদা অনাধুনিক। এই দুই প্রতীপ ঘটনা মূলতঃ দায়ী ভারতীয় চলচ্চিত্রের দীর্ঘমেয়াদী নাবালক অবস্থার।

চলচ্চিত্র শুধুই যদি ক্ষণিকস্বাদসর্বস্ব মনোরঞ্জক সামগ্রী হত তাহলে বিপুলায়তন ভারতীয় সিনেমার নাবালক অবস্থা নিয়ে চিন্তার কারণ ঘটত না। কিন্তু চলচ্চিত্র যেহেতু একই সঙ্গে সমকালীন যুগোপযোগী শিল্পসৃষ্টির অন্যতম প্রধান মাধ্যম যা অবলম্বন করে চিরায়ত মহৎ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব, সেই হেতু আমাদের চলচ্চিত্রর বর্তমান দৈন্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভাবলে হতাশ হতে হয়। অবস্থা প্রতিকূল ঠিকই কিন্তু বন্ধ্যাত্ব একেবারে অনিবার্য যে ছিল না তার প্রমাণ দু-একজনের, প্রধানত সত্যজিৎ রায়ের, শিল্পকর্ম। অবশ্য এখন অবধি তা এতই ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে যে তা নিয়ে সাধারণ বিচার চলে না। জনাদৃত এবং আর্ট সংজ্ঞার্থে শিল্পসম্মত এই দুই শর্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পালিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেই কর্তব্য মাত্র কয়েকজন ছাড়া যে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেননি তাতে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। চলচ্চিত্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দর্শকের অ-জ্ঞান ও নিম্নমানের রুচির যোগান যত বেশী পরিমাণে আসবে, যা আসছে, ততই বন্ধুর হবে সংসৃষ্টির পথ।

এই উভসংকট থেকে উদ্ধারের উপায় নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা, পঠনপাঠন, গবেষণা হয়েছে। প্রস্তাবনা, পরীক্ষা, প্রয়াসও কম হয়নি। আশার আলো প্রথমে দেখা গিয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রে পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে। গত সাত-আট বছর অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় কিছু ছবি হয়েছে যা থেকে আশান্বিত হওয়ার কথা কিন্তু নির্মাতাদের শিল্পিসত্তার স্বল্পায়ু সে আশা বাঁচিয়ে রাখার সহায়ক হয়নি। মাত্র কয়েকটি ছবি করেই কেন তাঁরা নিঃশেষিত হয়ে যান তার সম্ভাব্য নানা কারণের মধ্যে শর্তপালনের অক্ষমতা, বলতেই হয়, একটি।

চলচ্চিত্রের শিল্পসম্ভাবনা বিরাট। প্রাগ্রসর বিদেশী চলচ্চিত্রে সে সম্ভাবনা কি বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র সৃষ্টিতে উপলব্ধ হয়েছে তার আংশিক পরিচয় আমাদের অজানা নয়। এ নয় যে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি বহু শিক্ষার্থী ও কলাবিদদের জানা নেই ; এও নয় যে মানসিক প্রস্তুতি ও প্রতিভাধর শিল্পী একেবারেই নেই বা যন্ত্রপাতির সর্বাধুনিক সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। তা সত্ত্বেও এবং চলচ্চিত্রের বহিরাবরণের লক্ষণীয় উন্নতি সত্ত্বেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের বন্ধ্যা অবস্থার কোন অবসান হচ্ছে না তার কারণ সাধারণ বাজারচলতি ছবির আকার ও বক্তব্যেই নিহিত। জনমানসে যে প্রাচীন অভ্যস্ত সংস্কার চলচ্চিত্রের সার্থক বিকাশের অন্তরায় ভারতীয় চলচ্চিত্র সেই সব সংস্কারকেই পুষ্ট করে চলেছে। এ এক ধরনের স্ববিরোধী আত্মঘাতী প্রবৃত্তি। পরিবর্তনের সহায় না হয়ে রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষকতা করায় শিল্পগত সম্ভাবনার বিনষ্টি অঙ্কুরেই ঘটছে।

ব্যবসায়ী বিষচক্র এড়িয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সুবিধা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী। উন্নতরুচি চলচ্চিত্রদর্শকের সংখ্যাও মাথাগুনতি হিসাবে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বা তার আশু সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সুযোগ্য পরিচালক অনেকেই সে সুযোগ গ্রহণ করে নতুন ভাবনা ও শিল্পান্বেষণায় মার্জিতরুচির ও চলচ্চিত্রর নিজস্ব ভাষায় ছবি করেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার দর্শকগোষ্ঠী সীমিত থেকেছে সমাজের ক্ষুদ্র একাংশে। তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসা ও উৎসাহ পাবার যোগ্য কিন্তু যতদিন না তাঁরা সততা ও শিল্পশর্তে আপোস না করে সেই একাংশের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর দর্শকশ্রেণীর মাঝে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন ততদিন তাঁরা না পারবেন নিজেরা এগোতে, না পারবেন ভারতীয় সিনেমার উন্নতি ঘটাতে।

হতে পারে সমাজের অর্থনৈতিক ও শিক্ষার পুনর্বিন্যাস না হলে, যন্ত্রযুগের উপযুক্ত বিজ্ঞান-

ভিত্তিক জনমানসের উদ্ভব না হলে চলচ্চিত্রের মত সমাজসম্পৃক্ত মাধ্যমের ব্যবহার ও শিল্পোন্নতি সাধারণভাবে সম্ভব নয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের ভোগ্য যত ভাল ছবিই কল্পিত ও রচিত হোক, যতদিন না সাধারণ দর্শক তা গ্রহণ করছে বা করার প্রস্তুতি অর্জন করছে ততদিন তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এবং কোন দেশের নিজস্ব ধ্যানধারণা উপেক্ষা করে ভাল ছবি করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আধুনিক মানস ও মননের অনধিকারী কারো পক্ষেও তা সম্ভব নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের মূল সমস্যা এইখানে। একই সঙ্গে ভারতীয় এবং গুণগতভাবে শিল্পোত্তীর্ণ ও জনপ্রিয় সৃষ্টির পরিবেশ আমাদের দেশে স্ববিরোধে বিদ্ধ। যতই আমরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী প্রথাগত কাহিনীচিত্র নির্মাণ করতে থাকব ততই এই স্ববিরোধ তীব্র হতে থাকবে যদি না প্রয়োজনোপযোগী সংখ্যায় অসামান্য প্রতিভাধর স্রষ্টার দেখা পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয় প্রতিভার কোন হিসাব নেই। প্রয়োজন থাকলেই প্রয়োজনানুপাতে প্রয়োজনীয় বস্তুর দেখা পাওয়া যাবে, শিল্পের ক্ষেত্রে এমন কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তা যদি থাকত তাহলে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে যখন ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর পরিবর্তন দেখা গেছে এবং সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র সর্বাধিক জনপোষিত মনোরঞ্জক মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের কেবলমাত্র দু-একজনের উপর এত বেশী মাত্রায় নির্ভর করে থাকতে হত না চলচ্চিত্রকে একাধারে জনপ্রিয়তা ও শিল্পৈশ্বর্যের তীরে পৌঁছে দিতে। বিগত দু দশকে যা হয়নি অদূর ভবিষ্যতে তা হবে এমন ভাবার কোন লক্ষণ এখন অবধি অন্ততঃ দেখি না।

তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমি বলি কি, এসো আমরা নিজেদের একটু ভাগাভাগি করে নিই, সর্বপ্রথমেই। ধরো আমরা বেছে নিই আমাদের চারজন কি বড়জোর পাঁচজন—এই ক'জনের মধ্যে নারীকণ্ঠ একটা থাকলে সুবিধে হয়, অন্তত একটা, আর দুটো যদি পাওয়া যায় তো কথাই নেই, চমৎকার। মুস্কিল যা, তা পাওয়া যাবে কিনা সেরকম মেয়ে, যে কথা বলতে পারে, জানে কোন্ কথাটা কখন কেমনভাবে বলতে হয়—এমন মেয়ে যার স্বরে ঝংকার আছে। ঝগড়া করে তো লাভ নেই এখন, কারণ আগের দুয়েকটা শিবিরে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, তাই জানি, পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে এগিয়ে আসার মতো তেমন মেয়ে আমরা খুঁজেছি, পাইনি। হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝতে পারছি, অত ইঙ্গিতের দরকার নেই, ছটফট করে এদিক-ওদিক তাকাতে হবে না, অমন জোরে-জোরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস নিতেও কাউকে বলছি না—আত্মাভিমানী যতই হই না কেন, বোকা তো নই যে বুঝব না একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হয়তো সত্যিই, আমিই জুড়ে বসছি সমস্ত স্থানটা, সমস্ত সময়টা ভর্তি করে তুলছি একমাত্র আমারই কথায়। বেশ তো, এগিয়ে এসো-না তোমাদের যে-কোনো কেউ, আমি জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি—পুং বা স্ত্রী কাকে-কাকে বাছবে বেছে নাও, যে-যার পরিচয় দাও, আরম্ভ করো। শুধু এত বিশৃঙ্খল অবস্থা যখন আজ আমাদের, নৈরাশ্যের ঢেউএ এমন ক্ষতবিক্ষত আমরা সকলে, তখনো, অর্থাৎ এই এখনো, আমার তো মনে হয় দরকার আছে—কিছুটা শৃঙ্খলার—অর্থাৎ চেষ্টাচরিত্র করে যতটা শৃঙ্খলা এখনো জোগাড় করা যায়, ততটার। যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা এককথায় হল এই, যা-খুশি করো তোমরা, কিন্তু সূত্রধার রেখো একজনকে, যাতে কেউ-না-কেউ থাকে যে ভার নিয়েছে অনুষ্ঠানটার, যাতে বক্তব্য যত মর্মান্তিকই হোক তা বলতে পারা যায় একটা ভঙ্গীতে, যাতে গোলমালে কোলাহলে এর-ওর-তার উল্টোপাল্টা আস্ফালনে সেটা পণ্ড না হয়ে যায়।

কী, জায়গা ছেড়ে দিই তবে আমি? তোমাদের কে হচ্ছ সূত্রধার? কেউ না? না সময় নিতে চাও সে-প্রশ্নের বিচারে? বলো তো বিরতি ঘোষণা করে দিই, আবার, দুয়েক মিনিটের জন্যে। অবশ্য বিরতি ঘোষিত হয়েই আছে, বিরতির মধ্যেই রয়েছি আমরা, আপাতত আলোচনাটা চালাচ্ছি নিজে-দেরই মধ্যে—কিন্তু সামনে-পিছনে বা বাঁয়ে-ডাইনে সর্বত্র যত অন্ধকারই থাক, একটু নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেছ কি দেখতে পাচ্ছ কত অজস্র চোখ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তোমাদের ভুরু-নাক-ঠোঁটের ভূগোলে কৌতুকোদ্দীপ্ত বাচ্চা ছেলের মতো সেসব দৃষ্টি কী দাপাদাপিই না করে বেড়াচ্ছে, খুঁটে-খুঁটে দেখছে সে-ভূগোলে কোথায় পায় একটু পাহাড় সন্তর্পণে পা রেখে ওঠার বা একটু খাদ লাফিয়ে পড়ার, বা হঠাৎ এই আনন্দ কি হঠাৎ ঐ বিরক্তির আলোর তারতম্যে কী রঙ খেলা করছে তোমাদের গালের উপত্যকায়, কারণ জ্বালানো সব ক'টা পেট্রোম্যাক্স-ই আজ তোমাদের মুখে, অর্থাৎ এই আমাদের মুখে। তাই বিরতি যদিও বলছি, সমবেত সকলের মনোযোগ যুক্ত আছে আমাদের প্রতি—যা করবে, ভেবে নাও, একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হও, এবং সে-সিদ্ধান্তে যত তাড়াতাড়ি উপনীত হতে পারো, সভার পক্ষে ততই মঙ্গল।

অতএব দেখছি, আমাকেই বলতে দিচ্ছ, সিদ্ধান্ত সেইটাই? তো বেশ, এই গড় হলাম, নত-

মস্তকে মেনে নিলাম। আমার অভিপ্রায়টা বলি তবে এবার, অ্যাঁ? এই সংলাপে চাই বৈচিত্র্য, চাই একঘেয়েমির বর্জন—অর্থাৎ এখন যদি কিছু হেঁড়ে গলা, পরেই তখন কিছু চিঁহি গলা, কিছু কর্কশ গলা, পাশাপাশি কিছু মধুর গলা। এবং এক-আধবার যদি কখনো এই পরস্পরবিরোধী কণ্ঠস্বরগুলো হঠাৎ একে-অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, সমবেত হয়, তবেও আপত্তি নেই, বরং তা ঘটলে এক অর্থে আকর্ষণীয়ই ঠেকা উচিত, নিঃসন্দেহে ঠেকবেও, সেটা জানি—কারণ তা হঠাৎ একটা সিম্ফনির ভাব আনবে, অপ্রত্যাশিতকে হাজির করাবে, এবং আমাদের এই বিবরণের পক্ষে সেরকম একটা প্রস্তাব লোভনীয় ঠেকবে বলেই আমার বিশ্বাস। এখনো এত আমি-আমি বা আমার-আমার চলছে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের এই বাড়াবাড়ি, জানি সেটাকে থামাতে হবে অচিরেই, এবং সূত্রধার যখন থাকতে দিয়েছে আমাকেই, অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার যখন আমি নিয়েছি, তখন কথা দিচ্ছি, সেটা আমি করে ছাড়বই, এই আমি-কে মুক্তি দেবই, কিন্তু জানি সেটা কত প্রচণ্ড শক্ত এক ব্যাপার আমার মতো সর্ব অর্থে এক অতি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে, এক অহংকারীর পক্ষে। তবে একাজে সহায় হবে একদিকে যেমন তোমরা, অন্যদিকে তেমনি সমবেত সভ্যবৃন্দ—সহায় হবেন আমার ও আমাদের বন্দনার দেবদেবীরাও। শুধু যে-প্রণালী গ্রহণ করব, বা বরং তোমাদের সকলের ইচ্ছা ও সম্মতি থাকলে যে-প্রণালীটাকে আমরা প্রতিজনে মিলে এখানে গ্রহণ করতে চাইব, তার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রারম্ভিক কথা পেড়ে রাখলে পরে সুবিধা হতে পারে বলে আপাতত আমার মনে হচ্ছে, এবং সেটা যদি আমি-নামক কোনো ব্যক্তিমানুষ এ-মুহূর্তে বলছে তো তার একমাত্র কারণ হল এই যে সেই আমি-টিকেই তোমাদের সকলের সম্মতিক্রমে আপাতত সূত্রধার করা হয়েছে—শুধু তাই নয়, সেই সূত্রধারেরই প্রসঙ্গ এখন চলছে, তবু বেশিক্ষণ চলবে না, চালাতে আমি দেব না, সেটা আমি দেখবই, তোমরাও দয়া করে সমানই নজর রেখো, যাতে বাড়াবাড়ি করেছি কি এক-কোপে শেষ করতে পারো আমার কথা, চাইলে এক-ধমকে বসিয়েও দিতে পারো আমায়। এবার তবে যা চাইছি, ও যা মোটামুটি এই। নারী-চরিত্রের প্রসঙ্গে পরেই আসছি, যদিও সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, হয়তো এ-মুহূর্তে সব থেকে প্রয়োজনীয়, কারণ সেটা আগে ঠিক না হলে পুরুষ-চরিত্রও ঠিক করা যাবে না, অর্থাৎ পালাটা যেমন হওয়া উচিত, তাকে সেইভাবেই রাখতে যদি চাই, এবং যে-নারী-চরিত্র আমাদের আগের সন্ধ্যাগুলিতে বাদ পড়ে গেছে, বাধ্য হয়েই বাদ রাখতে হয়েছে, যেহেতু চেষ্টা সত্ত্বেও তা মেলেনি—এবং পুরুষ-চরিত্র হিসেবে আজকে কাদের-কাদের বাছব যদিও এখনো জানি না, তবু যাদেরই বাছি-না, যেমন তারা তেমনি অন্যেরা, অর্থাৎ সেই অন্যেরা যাদের বাছা হবে না, আশা করি তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করবে যে কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে আমরা যথার্থই চেষ্টা করেছিলাম একটি বা দুটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীকণ্ঠ খুঁজে পেতে। পাইনি, একটিও না, কোনোবারেই না, সেটা তোমরা জানো, অবশ্য এটা-ওটা নামের প্রস্তাব একাধিকবারই এসেছে, কিন্তু হয় যাদের নাম পাড়া হয় সেই মেয়েরা রাজী হয়নি, নয়তো তাদের পরখ করে নেওয়া বা এগিয়ে আসতে ডাক দেওয়ার আগে আমরা পুরুষেরাই একমত হতে পারিনি সেইসব নাম সম্বন্ধে। আজ এই অবকাশে সে-কথাটা যদি নিজে স্মরণ করছি বা অন্য সকলকে স্মরণ করাচ্ছি তো তার একমাত্র কারণ হল এই যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই, আজকের এই সভাতেই, একসময় হঠাৎ আমার উপর অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে যেটা সমবেত; তাকে আমি নাকি নিতান্ত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারেই ক্রমশ পরিণত করে তুলছি। হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, মার্জনা করবেন যদি যে-বিরতি চেয়ে আপনাদের কাছে অবসর ভিক্ষা করি তা শেষ হওয়ার আগেই এভাবে চেঁচিয়ে আবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—কিন্তু কথাটা বড়

সাংঘাতিক, ব্যথাটা বুকে ভীষণ, তাই শোনাতে চাই, আপনাদের সহানুভূতি চাই। দেখুন তো, এমনিতেই আজ এত কষ্ট আমাদের, সক্কলের, এবং যে-কষ্টের কথা বলব বলেই এখন দাঁড়িয়েছি আপনাদের সামনে, বলুন তো, সেই কষ্টের উপরও নিজের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিত্বের এমন একটা অন্যায় অভিযোগ আগাগোড়া ব্যাপারটাকে কি আরোই দুঃসহ করে তুলছে না?

কী, লজ্জা হচ্ছে কর্তাদের এখন, অ্যাঁ? হাতে চিমটি কেটে আমায় থামাতে চাইছ, কী গো বৃন্দাবন, সমীরণ, এবং কনক ও তোমরা অন্যেরা? আচ্ছা থামছি, এখনো যেটা ঘরেরই ব্যাপার, অর্থাৎ আমাদের দলেরই ব্যাপার, সেটা হাটে প্রচার করা হতে এই নিবৃত্ত হচ্ছি। কিন্তু যদি মনে করো যে আমি তোমাদের থেকে সরে এসেছি বা আসতে চাইছি, বা দল ভেঙে তৃতীয় পক্ষের অন্য এক বৃহৎ জনতার সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে সমর্থন চাইছি নিজের আচরণের এবং তাই ন্যায্যতই এখন তোমরা আমায় শত্রুপক্ষ বলে ভাবতে পারো, তাহলেও একটা প্রচণ্ড ভুল করবে। আসলে যা-কিছু ঘটছে, এই ভুল-বোঝাবুঝির যত অবকাশ, তার সর্বকিছুর জন্যই দায়ী একমাত্র সেই সর্বনাশ যা আমাদের এভাবে ভূপাতিত করেছে। বলা বাহুল্য, আমরা এখনো রপ্ত হইনি আমাদের এই অভিজ্ঞতায় বা সে-অভিজ্ঞতা বর্ণনায় আমাদের এই পৌনঃপুনিক প্রয়াসে—রপ্ত কোনোদিন হব কিনা, হওয়া সম্ভব কিনা, তাও এক প্রকাণ্ড প্রশ্ন যার উত্তর আজ চোখের সামনে নেই-ই, সে-উত্তরের আভাসও অদূরে বা সুদূরে ভবিষ্যতে কখনো পাব কিনা তাও জানি না। বড়জোর যেটা আশা করা যায়, এবং যে-আশাটা এখন করছি, তা হয়তো আমাদের এই প্রচেষ্টাটিকে দিনে-দিনে আরো একটু নিখুঁত, আরো একটু সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব। অন্তত সে-পথে চেষ্টা চালিয়ে যাব, এমন একটা আশাও করতে দোষ কী! আজ তাই সূত্রধারের ভূমিকায় যে-প্রস্তাব পাড়ছি তোমাদের বিবেচনার জন্য, তা গৃহীত হলে আমার তো বিশ্বাস যা-ই করি-না কেন আমরা, যা-কিছুই বলি-না কেন এই ব্যক্তি-মানুষেরা, তা নিছক ব্যক্তিগত না থেকে একটি সমবেত ক্রিয়া বা উচ্চারণের রূপ পাবে। এখন সেটা গ্রহণ করবে কি করবে না, তা বিবেচ্য তোমাদের।

নারী-চরিত্র সম্বন্ধে প্রসঙ্গটা যখন পেড়েইছি, তখন তোমাদের অনুমতি নিয়ে এটুকুও বলে ফেলা যাক। আমার মনে হয়, আগেকালের যাত্রা-টাত্রায় যেমন হত, বা শুনতে পাই আজও হাওড়া সমাজের "নদের নিমাই"-টিমাই-এ যেমন হয়ে থাকে, তেমনি চাইলে নারী-চরিত্রের ভূমিকায় সরাসরি পুরুষকেও নামানো যায়। এই ধরো বিষ্ণুপ্রিয়া ঢ়ুকল এলোচুল বা স্তন ইত্যাদিতে রীতিমতো সম্পন্না হয়ে, এবং বলা বাহুল্য নিমাইএর উদ্দেশে "প্রাণাধিক" "প্রাণাধিক" বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে, আর তুমি আসরে দর্শকের সারিতে একেবারে সামনে বসে আছ বলেই চোখ পাকিয়ে একটু যেই-না তাকাতে গেছ, অমনি আবিষ্কার করছ শাড়ির অন্তরালে ঐ কাঞ্চনবর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়ার ঠ্যাং-দুটি নিতান্তই পুষ্ট শুধু নয়, বা মাংসপেশীতে শক্ত-সমর্থই নয়, তার উপর তরাই-এ দেবদারু বনের মতো ঘন কৃষ্ণ লোমের বৃক্ষরাজিও। কী, ভ্রুকুটি তোলা হচ্ছে কি কোথাও? না ভ্রুকুটি না তুলেই অসন্তোষের ইঙ্গিত দিতে চাচ্ছ কেউ-কেউ? আমার নিজের কথা যদি জানতে চাও তো বলব, না, আমার তো এমন কিছু খারাপ মনে হয় না প্রস্তাবটা, বরং সত্যি বলতে কি, ভাবতে গেলে মোটামুটি ভালোই লাগছে, যেহেতু মোহের সৃজনই যদি হয় অন্যতম লক্ষ্য কোনো পালার বা অভিনয়ের তো পুরুষকে নারী সাজিয়ে সে-মোহ বাড়ানো বই কমানো হল না। তবে বলাই তো, আমি কারুরই ঘাড়ে কিছু চাপাচ্ছি না, যেটা সকলে মিলে পছন্দ করি, সেইটেই করব। শুধু এই অবকাশে কথাটা পেড়ে রাখলাম মাত্র, যাতে যদি দরকার পড়ে তো যথাসময়ে সম্ভাবনাটাকে অন্তত

আমাদের বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অবশ্য আগে দেখব, নিশ্চয় দেখব, নারী-চরিত্রের জন্যে রক্ত-মাংসের নারীই মেলে কিনা—যেটা আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মেলেনি, কিন্তু কে জানে, অসম্ভব তো কিছু নয়, আজ হয়তো মিলতে পারে।

আপাতত থাক সে-কথা। প্রথমত পুং-দের দেখা যাক. এবং সেটা দেখতে গিয়ে আমি এটা ধরে নিয়েই এগোচ্ছি যে মেয়ে দুয়েকটা পাওয়া যাবে. অর্থাৎ পুরুষ-চরিত্র তিন কি চার রাখলেই হয়তো যথেষ্ট হবে। আমাকে নিয়ে যদি ধরো তো চার, আমাকে বাদ দিলে তিন—আমি তো সূত্রধার। এবার আমি ভিন্ন আর সেই তিনজন কে-কে হবে বলো? বৃন্দাবন, তুমি হও এক নম্বর—কেমন? এক নম্বর, কারণ তোমার নামের সঙ্গে বা তার অনুপ্রাস ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্মুখের শ্রোতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই কমবেশি পরিচিত হয়ে পড়েছেন—তাছাড়া তুমি লোকটিও মোটামুটি ভালো. আমার চিরকালই পছন্দ হয়েছে. এবং তোমার গলাটিও বেশ হেঁড়ে গোছের, যাতে যা-ই বলো-না কেন, এমন-কি ফিসফিসও যদি করো. তো অল্প দূরত্বের মধ্যে থাকলে লোকজন তা শুনতে পাবে। সেটা একটা বড় বিবেচনা বটেই. বিশেষত যখন এ-চত্বরে আজ খালি-গলাই সার, অনেক দ্যোতনা-মূর্ছনার অবকাশ থাকবে আমাদের বিবরণটির ব্যাখ্যানের ভঙ্গীতে; আবার তা শুনতে পাওয়া যাবে বলেই শুধু নয়. তোমার ঐ হেঁড়ে গলার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়ে আমি একটি মিহি-গলাও আগে থেকে নির্বাচিত করে রেখেছি। নিশ্চয় বলে দিতে হবে না তোমাদের. এই দ্বিতীয় গলাটি কার। কনকের—বলা বাহুল্য; যে-কনক শুধু তার নামেই নয়. হাবেভাবেও বিপরীত লিঙ্গ হতে-হতে কী জানি কেমন করে হঠাৎ পুরুষে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন-কি মেয়ে যদি শেষ পর্যন্ত না মেলে আজ, এমনও আমি ভেবে রেখেছি যে তাহলে কনককে দিয়েই একটা নারী-চরিত্র নামিয়ে দেব, অবশ্য সে-ক্ষেত্রে পুরুষের দিকে একটা ফাঁক পড়ে যাচ্ছে. আরো-একজনকে সে-জায়গায় বসানো যায়। তবে না-না, এখুনি সে-সব প্রশ্নে যাওয়ার প্রয়োজন নেই. কারণ ধরে নিচ্ছি মেয়ে পাওয়া যাবে, এবং তাই কনককেও রাখা যাচ্ছে পুরুষ-চরিত্রে। হেঁড়ে আর মিহিতে খাসা জমবে, কী বলো বৃন্দাবন, হ্যাঁ-গো কনক? এই দ্যাখো, অমন কটমট করে তাকাচ্ছ কেন বলো তো? বেসামাল কিছু বলে ফেলেছি? ও, বুঝেছি-বুঝেছি, আরে না-না-না, একেবারেই না. মেয়েলি বলে তোমায় অসম্মান করা হচ্ছে না কনক, বিশ্বাস করো! তাছাড়া মেয়েলি বলতে যা বোঝায়. তা তুমি নও. সেটা তো আমরা সকলেই জানি—আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু বলার দোষে তার একটা অন্যরকম অর্থ হয়তো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে অনেক পুরুষ আছে যারা নিছকই পুরুষ, তাদের সীমাগুলো এক প্রকটভাবে চিহ্নিত যে যতই নোয়াও যতই বাঁকাও, প্রাণপণ তাদের নিয়ে এদিক-ওদিক করার চেষ্টা করো, তবু তারা যেটা ঠিক সেটাই থাকবে, তাদের নিয়ে তোমার কল্পনাশক্তিকে তুমি বেশিদূর খেলাতে পারবে না। কিন্তু তুমি কনক, তুমি অন্য জাতের—এই দ্যাখো-না কত কল্পনা করছি তোমায় নিয়ে! ভাবছি তোমাকে কাজে লাগাবো হয় এইভাবে নয় ঐভাবে কিম্বা কী জানি হয়তো আরো-এক তৃতীয় ভাবে—এবং যেভাবেই করতে চাই-না কেন, দেখি সব ভাবেই তুমি খাসা খাপ খেয়ে যাচ্ছ, যেটা বলা চলবে না অনেকেরই ক্ষেত্রে, ধরো এই বৃন্দাবনেরই ক্ষেত্রে. এবং সেটা কি একটা নেহাতই উড়িয়ে দেওয়ার মতো কথা হল? আসলে বলতে যেটা চাই, তা পুরুষ হয়েও তোমার মধ্যে বেশ একটি কমনীয়তা আছে—বুঝলে? না, আর কথা নয়, এবার তৃতীয় জনকে ভাবা যাক। আমি বলব ধ্রুব রুদ্র—কেন ধ্রুব রুদ্র?

কারণ ঐ ছড়ি, ঐ টুপি, ঐ হান্টার জুতো, সূর্য থেকে চোখকে বাঁচাবার জন্যে ঐ মোটা ফ্রেমের কালো চশমা—ধ্রুবের একটা অস্তিত্ব আপনা থেকেই আছে। ও যদি কথা না বলেও দাঁড়ায়, লোকে

তাকিয়ে থাকবে; যদি নিজের পরিচয় নাও দেয়, লোকে চিনতে পারবে, অন্তত আন্দাজে খানিকটা ধরতে পারবে। এগিয়ে আসুন-না স্যার একটু সামনে, ও মশাই, শুনছেন—ধ্রুববাবু? নাঃ, এসব আপনি-ফাপনি আর চলে না, ক্ষমাঘেন্না করে দিন, এখন থেকে তুমি-ই, সরাসরি ধ্রুব-ই, কেমন? তাছাড়া আর লৌকিকতা করব কোথায়? কোন্ সমাজের জন্যে, আর আমাদের রয়েছে-টা কী, থাকবে-টা কী? জানো ভাইসব, আগে-আগে ভাবতে ভালো লাগত মানুষেরা পরস্পরে দূরে থেকে নিকটে আসে সম্প্রীতির মাধ্যমে, পরিচয় গাঢ় হয় যে-হাওয়ায় তার নাম অনুকূল সময়—কিন্তু আজ এসব কী হচ্ছে আমাদের! আমরা কেউ-কেউ আপন হচ্ছি সর্বনাশের ঘণ্টা বাজার পরে, অন্ধকারের ক্রমশ পক্ষ-বিস্তারে! যাই হোক, কর্তা এগিয়ে এসো তবে, আমি যা বলছি তা প্রমাণের জন্য অতএব মুখ না খুলেই শুধু সামনে এসে দাঁড়াও একটিবার—ছড়ি-টুপি-হান্টার জুতোর ধড়াচুড়োয় ফিটফাট তো রয়েছ দেখছিই, শুধু নাকের ওপর কালো চশমাটা লাগালেই এবার তুমি সম্পূর্ণ হবে, এবং সেটা তবে লাগাও, এখন হয় হোক-না কেন অন্ধকার, তবু ঐতো, পেট্রোম্যাক্সগুলো তো জ্বলছে, তোমার নাকের ডগাতেই, অতএব ক্ষতিটা কী, তার আলো থেকেও চোখকে বাঁচাতে চাইতে পারো! এ নয় যে চশমাটা পরলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এই তক্তপোশের ওপর, আর সেটা যদি পড়ো-ও, আমরা তো রয়েছি, সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলছি। এটা যদি তুমি করো তো শোনো আমি বলছি কী ঘটবে। যেই-না পায়চারি সুরু করেছ তুমি, এই তক্তপোশের ওপরেই, তোমার এই বেশভূষাতেই, কালো চশমাতেই, এবং পায়চারি মানে বলা বাহুল্য ছড়িটা দোলাতে-দোলাতেই, অর্থাৎ যেটাই তোমার স্বাভাবিক ভঙ্গী হাঁটার, অন্তত তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়া পর্যন্ত একমাত্র যেভাবেই হাঁটতে তোমায় দেখে এসেছি আমরা, এমন-কি মনে তোমার পড়বে যে যখন একসঙ্গে সকলে পাহাড় ভাঙছিলাম তখনো ছড়িটি তুমি সমানেই দুলিয়ে চলেছিলে, এবং যা দেখে তখন আমরা কেউ-কেউ একদিকে যেমন কৌতুক অনুভব করেছি, অন্যদিকে তেমনি বাহবাও দিয়েছি তোমার শক্তির, যেহেতু ক্লান্তিতে আমাদের অনেকেই যদিও অর্ধমৃত তখন, তোমার ছড়ি সমানেই ঘুরছে—যাই হোক, কী হবে এখন তুমি যদি করো এটা, এই তক্তপোশের ওপর, এবং মুখ যখন তুমি খুলছ না একেবারেই, শুধু পায়চারিটা সুরু করেছ? বলি তবে? এখানে-ওখানে ফিসফাস সুরু হবে—হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি গো, এক্ষুনি, কান থাকলেও তুমিও শুনছ, এ ওকে বলছে, হয়তো ছোটছেলে ছোটমেয়েকে, আরে ঐ তো, অন্ধকারের ঐ অগুন্তি মাথারই কেউ-কেউ, বলছে, লোকটা টুরিস্ট, বুঝলি? শুধু যেটি নেই, তা কাঁধ থেকে একটি ক্যামেরা ঝুলছে, চামড়ার খাপ, চামড়ার ফিতে।

হ্যাঁ গো কর্তা, এককালীন মহামহিম ধ্রুব রুদ্র, যে-তুমি উঠতি পথে সারাটা সময় আহ্লাদে আটখানা ছিলে, এখন শুকনো আমটি চুপসে গেছ, তবে বলে ফেলি কথাটা ওদের, বিশেষত ওরা নিজেরাই যখন প্রসঙ্গটা পেড়ে বসল বা পাড়ছে বলে মনে করছি আমরা? হে ছোটছেলে হে ছোটমেয়ে, তবে শোনো, আপাতত চোখের আড়ালে হলেও ঐ ক্যামেরাটা ধ্রুব-কর্তার ঠিকই আছে, এখন অন্তর্হিত কোন্ ঝোলায় কাপড়চোপড়ে মুড়ি দিয়ে—নিশ্চয় রাখা সযত্নে, তবু ইচ্ছা করেই সেটাকে আপাতত ব্যবহারের আওতার বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং ঘাড়ে ঝুলিয়ে রেখে কী হবে? অবশ্য ওটাকে ব্যবহার করার অভিরুচি হঠাৎ ঘুচে গেল যখন, তারও বেশ কিছু আগে থেকে ঘাড়ে ওটা ঝুলছে না, কারণ যাত্রার প্রথম দিকেই, ক্রমাগত ওঠায়-নামায় লাফানোয়-ঝাঁপানোয়, ঐ ফিতেটি ছিঁড়ে যায়—একবার, পরে দুতিন দিনের মধ্যেই আবার দ্বিতীয়বার। প্রথমবারের পরে অল্প কারসাজি করে তবু জোড়াতালি দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ছিঁড়ল, এবং এবার ফিতের

অন্যত্র, তখন অন্তত সাময়িকভাবে জিনিসটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পারার মায়াটা ছাড়তেই হল। সমতল জনপদ হলে কথা ছিল না, মুচি মিলে যেত, সারিয়ে নেওয়া চলত—এখানে ওসব মিলছে কোথায়? এখানে মানে এ-গ্রামে নয়, যেটা একটা ছোটখাটো পার্বত্য শহর প্রায়, তাই মোটামুটি সবই মিলবে, এমন-কি ছোট একটা ডিস্‌পেন্‌সারিও দেখেছিলাম যেন—না, বলছি মুচি মিলবে কেমন করে সেই জনহীন দুর্গম পথে, ক্রমশই উপরের দিকে, যেখানে মাঝে-মাঝে লোকের আস্তানা থাকলেও তা দুয়েকটা ঘর বই নয়, বা বড়জোর চায়ের বা অন্য সামান্য কিছুর দুটো-একটা ধুসর দোকান। তাই, দ্বিতীয়বার যেই ফিতেটি ছিঁড়ল, তখন থেকে যন্ত্রটি রয়েছে ঝোলারই মধ্যে, এবং তাতে যে ধ্রুব-কর্তার অসুবিধে তেমন হয়েছে তা নয়, অন্তত আমাদের নিজেদেরই নজরে যা পড়েছে তার থেকে বলতে পারি গোড়ার দিকে যেমন দেখতাম, তেমনি পরেও, অর্থাৎ যখন থেকে যন্ত্রটাকে আর দেখা যাচ্ছে না সর্বক্ষণ কাঁধে ঝুলতে, সেই তখনো কত-না বার লক্ষ্য করেছি এই কর্তা দুম্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, যে-চোখটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোঁজা, অন্য চোখটা দেখা যাচ্ছে না যেহেতু ক্যামেরা তা ঢেকে রয়েছে। এবং এখানে খানিকটা অবান্তর হলেও প্রসঙ্গে রয়েছি বলেই বলে ফেলি যে এটা এমন একটা কারসাজি, অর্থাৎ ঐ একটি চোখ অমনি করে বুজে ফেলে অন্য চোখটি দিব্যি খুলে রাখার কায়দা, এটা আমার মতো আনাড়ি কোনোদিন রপ্ত করতে পারল না; এবং সেই কারণেই সাদা বাংলায় যাকে চোখ-মারা বলে, সেটা এ-জীবনে আমার আর শেখা হয়ে উঠল না।

যাই হোক, মাপ করে ফেলো ভাই, আবার একটু অতিরিক্ত ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছিলাম। হ্যাঁ, বলছিলাম তখনো ধ্রুবের আগের মতোই যখন-তখন ক্যামেরাটাকে ব্যবহার করে চলার কথা। এরকমই কোনো-একটা সময়, কারুর কোনো প্রশ্নের উত্তরে, মনে পড়ছে ও বলেছিল যে ফিতে ছিঁড়েছে তো ছিঁড়েছে, তাতে ওর কিছুই আসছে-যাচ্ছে না, যেহেতু যে-ঝোলায় যন্ত্রটা এখন পুরেছে, সেটাও কাঁধে ঝুলছে, অর্থাৎ আগের মতো এখনো যখন-ইচ্ছে ফট্ করে বার করা যায়। এবং, যেহেতু তখন আমরা ক্রমশই আরো উপরে উঠতে রত, আর ফোটো তোলায় ওর আগ্রহটা আগের তুলনায় ক্রমশ বাড়ছে বই কমছে না বলেই মনে হচ্ছিল আমাদের, তাই বেশ মনে পড়ছে কখনো-কখনো ও আমাদের কাউকে-কাউকে রীতিমতো চিন্তাতেও ফেলছিল। কেমন বলব? এই ধরো একসঙ্গে গল্প করতে-করতে চলেছি, মোড় নিয়ে চলেছি একটার-পর-একটা, হঠাৎ মনে হল কই, ধ্রুবের সাড়া যেন পাচ্ছি না কিছুক্ষণ, আছে তো সঙ্গে? ভেবে যেই-না পিছন ফেরা, দেখি কর্তা দারুণ কায়দায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত। এবং দাঁড়িয়ে কোথায়? একেবারে খাদের কিনারে। এবং হিমালয়ের এদিককার পথটায় প্রায়ই কী-সব খাদ যে থাকতে পারে তা যে না দেখেছে তার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। পথে একটু এদিক-ওদিক করেছ কি অনন্ত অতলে হারিয়ে যাবে—কত হাজার ফিট তলায়, মাঝে হয়তো কোন্ গাছে লেগে আটকা পড়তে কি কে জানে সরাসরি গিয়ে ঠেকতে ঐ এখান থেকে দেখতে পাওয়া ধোঁয়ার মতো উপত্যকার কোথায়, ঐ যেখানে সুতোর মতো আঁকাবাঁকা নদীটাকে দেখা যাচ্ছে, তা কারুরই সাধ্য নেই আগে থেকে বলার। এবং হেন সময়ে সবথেকে সাংঘাতিক জিনিস যেটা ধ্রুব করে, তা এমন ভাব দেখাবে যে যেন একমাত্র ছবি তোলাই ওর অনেককালের পেশা—যা সত্য একেবারেই নয়, কারণ আগেই জেনেছি বলেই জানি কলকাতার কোনো-একটা বিদেশী কোম্পানিতে কী বিক্রয়-টিক্রয় সংক্রান্ত ওর কাজ—ভাব দেখাবে, যেন কর্তা এইরকম হঠাৎ উবু হয়ে বসে বা দারুণ কায়দায় এক বিচিত্র ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে পড়ে গত বিশ কি ত্রিশ কি চল্লিশ বছর ধরে ক্যামেরা ঘাড়ে করে পৃথিবীর যত্র-তত্র চষে বেড়াচ্ছে শুধু ছবি তুলতে। যেন রানী এলিজাবেথের অভিষেক বা কী-নাম

যেন সেই আমেরিকান আকাশচারী ভদ্রলোকের যিনি সর্বপ্রথম চাঁদে পেঁাছে ডিগবাজি খেলেন?—যাকগে, যেন এই-এই ঘটনা বা ব্যক্তির ছবি সেই-সেই জায়গায় গিয়ে ধ্রুব রুদ্র তুলে এসেছে। শুধু তাই নয়, সাংঘাতিকের চেয়েও সাংঘাতিক যেটা—ওরে বাবা, ভাবতে গেলে এখনো আমার পেটের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে আসে—তা দাঁড়াবে যখন অমন করে ঐ খাদের কিনারে, তখন প্রায়ই ওর পিঠটা রয়েছে খাদেরই দিকে, দেখছে না যে খাদটা রয়েছে, যেহেতু এক চোখ বুজে অন্য চোখ ক্যামেরার কাঁচে লাগিয়ে যার বা যে-জিনিসের ছবি তুলতে ও ব্যস্ত তখন, তা রয়েছে খাদের উল্টোদিকে। এবং দ্রোণের শিষ্য অর্জুনের পাখির মতন, একমাত্র সেই জিনিসটিই সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করে আছে তখন আমাদের বন্ধুবরের দৃষ্টি, মন, সত্তা।

এবার আসছে এ-প্রশ্নের সাংঘাতিকতম পর্যায়টি, আর সেটি হচ্ছে এই। পিছনেই খাদ, এবং খাদের দিকে ওর পিঠ, আর সেই অবস্থায় কর্তা কখনো-কখনো পিছুও হাঁটতে চায়, যেটা ধরতে চায় ছবিতে সেটা কতখানি ভালো করে ধরতে পারা যায় দেখছে, ক্যামেরার দূরত্ব-জ্ঞাপক কী-কাঁটা কোথায় আছে না-আছে সেটা ঠিক করছে। এবং যেই-না দেখতে পাওয়া সেটা, অর্থাৎ ওর ঐ এক-পা বা দু'-পা পিছু হাঁটাটা, যখন আরেকটু নড়েছে কি পড়ল বলে অতলের অদৃশ্যে, তখন এক ঝলক রক্ত আমাদের বুকের কোন্ রুন্ধ্র দ্বারে এসে আছড়ে পড়েছে, মুহূর্তের জন্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়েছে, একটা নীরব আর্তনাদ আমাদের গলাতে আটকে গেছে কোথাও। হেন মুহূর্তে এক-একবার ভেবেছি, আমি বা অন্য কেউ, অর্থাৎ যাদেরই নজরে পড়েছে ঘটনাটা, যে তাহলে কি ওকে সাবধান করে দিতে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠব একবার? পরেই মনে হয়েছে, পাছে হঠাৎ এইভাবে চেঁচিয়ে উঠলে ফলটা উল্টোই হয়, ও ঘাবড়ে যায়, এবং দুম করে কিছু একটা করে ফেলতে চেয়ে আর টাল সামলাতে পারল না, মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল অতলে? অতএব কিচ্ছু করিনি, এবং ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে এখন, না করে ভালোই করেছি, কারণ এ-দলে অন্তত আমার এলাকায় জানাশোনার মধ্যে সম্প্রতি কালের একটি অনুরূপ ও অতীব দুঃখজনক ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে। মাপ করে ফেলো ভাই, সেটাও যদিও একটু ব্যক্তিগত, তবু এখানে বলতে মন বড্ড চাইছে।

দিল্লীতে হাউজ্-খাস্ বলে একটা জায়গা আছে, যার কথা তোমরা নিশ্চয় অনেকেই শুনেছ, হয়তো আমারই মতো অনেকে অনেকবার সেখানে বেড়াতেও গেছ—ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীর এক সৌধস্থান, এখানে-ওখানে একটু-আধটু ভেঙে গেলেও সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের তদারকিতে মেরামত-টেরামত করা হয়েছে, দেখতে-শুনতে মোটামুটি চমৎকার। শোনা যায় জায়গাটা নাকি তৎকালীন কী-এক ছাত্রাবাস না শিক্ষায়তন ধরনের বস্তু কোনো ছিল, একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীও পাশেই, যা আজ সম্পূর্ণ শুষ্ক বলেই খটখটে জমি বই নয় এবং সৌধের এক অলিন্দ থেকে যে-জমি দেখতে পাওয়া যায় বেশ তলায়, অলিন্দের কিনার থেকে হঠাৎ একশো কি দেড়শো ফুট তলায়, একেবারে সরাসরি খাদ, এবং বলা বাহুল্য অলিন্দের সেই কিনার ঘেঁষে কোনো রেলিংই নেই, এমন-কি আগে থেকে জানা না থাকলে অনবধানতাবশত অতি সহজেই লোকে যে ফট্ করে পড়ে যেতে পারে, সতর্কতা-সূচক এমন বিজ্ঞপ্তির বাণীও কোথাও নেই। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তাই সবসময় বিরাজমান, বিশেষত ছুটিছাটার দিনে, যখন জায়গাটা ও আগাগোড়া পরিবেশটি মনোরম বলেই লোকজনের রীতিমতো ভিড় হয়, কখনো হয়তো পিকনিক-টিকনিক, গোটা একটা ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী, দাপাদাপি দৌড়োদৌড়ি চোর-চোর খেলা বা চোখে রুমাল বেঁধে কানামাছি ভোঁ-ভোঁ যাকে পাস তাকে ছোঁ, ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমি তো যতবার গেছি, বিশেষত এক-আধবার যখন এইরকম কোনো পিকনিক

চলছে-টলছে, যাতে আমি অংশগ্রহণ করছি না, একেবারেই না, শুধু বাইরে থেকে এসেছি একজন প্রতিবারই ভেবেছি বাপরে-বাপ, ছেলেমেয়েগুলো দৌড়োচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, এদিকে এই বিপজ্জনক জায়গা, নেহাতই বাইরের লোক এবং একটু ঘোরাফেরার পর কিছুক্ষণ বাদেই চলে যাব, মনে পড়ে তখন একটু বেসামাল হয়েছে কি কেউ-না-কেউ গেল!

এবং গেলও একজন সেদিন, এই তো কিছুদিন আগেই, চোখেরই সামনে। ছোট ছেলে বা মেয়ে নয়, মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক, এবং যেমন-তেমন হাবাগোবা যে-সে ভদ্রলোকও নন তিনি, বরং সারা পৃথিবী সর্বক্ষণ চষে বেড়াচ্ছেন এমন এক বিচক্ষণ পর্যটক—সে-ভদ্রলোক পা পিছলে পড়লেন, এবং বলা বাহুল্য মারা গেলেন। তখন আর্তনাদ বা লোকের ভিড় বা পুষ্করিণীর সেই রুক্ষ শুষ্ক জমিতে তাজা রক্তের দাগ ইত্যাদির প্রসঙ্গ না-হয় না-ই তুললাম। এবং আমাদের ধ্রুব রুদ্রের সঙ্গে ঐ হতভাগ্য ভদ্রলোকের এমন একটা জায়গায় মিল রয়েছে যাতে একের সঙ্গে অন্যের তুলনাটা বা কী ঘটতে অতএব পারত ধ্রুব রুদ্রেরও, সেই চিন্তাটা আরো সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ভদ্রলোকও ছিলেন ফোটোগ্রাফার, ধ্রুবের মতো শৌখীন ফোটোগ্রাফার নন, রীতিমতো পেশাদার ফোটোগ্রাফার—শুনেছি নাকি তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী, তাঁর তোলা ছবি ছাপা হয় কাগজে-কাগজে আমেরিকায়-ইংলন্ডে-জাপানে। জাতে ফরাসী তিনি, ভারতে তখন পর্যটক, দুর্ঘটনাস্থলে যাঁদের সঙ্গে আসেন তিনি সেদিন, তাঁরাও হয়তো দিল্লীস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূতাবাসেরই লোকজন—আমি চিনি না, দলেও ছিলাম না, শুধু বেড়ানোরই ছলে গিয়ে হাজির হই মাত্র, ভদ্রলোকের যা পরিচয় পেয়েছি, তা পরে, সংবাদপত্রে, অর্থাৎ দুর্ঘটনার পরের দিন সকালে। ঐ যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম যেটা বলব বলেই আরম্ভ করি। হ্যাঁ, ভদ্রলোকের স্ত্রী, যিনি সঙ্গে ছিলেন, চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং যেটা কাছে থেকেও অনেকে শোনেনি, অন্তত আমি তো শুনিনি নিশ্চয়, অবশ্য আমার কথা আলাদা, কারণ আমি বিচ্ছিন্ন পথিক, দলের নই, মনোযোগ তেমন ছিল না। তাঁর স্ত্রীর সেই চেঁচিয়ে ওঠার কথাটাও সংবাদপত্রে পড়ি, দুর্ঘটনার পরের দিনেই—খবরে বলে, ভদ্রমহিলা নাকি চেঁচিয়ে ওঠেন স্বামীকে সাবধান করে দিতে, কারণ আমাদের ধ্রুবের মতোই এক-চোখ বুজে অন্য-চোখ ক্যামেরার কাঁচে নিবন্ধ রেখে ভদ্রলোক যখন পিছু হটছিলেন সেদিন হাউজ্-খাসে, তখন আরেক পা পিছিয়েছেন কি পড়ছেন খাদে, আর তাই ভদ্রমহিলার চিৎকার, এবং চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গেই নাকি হয়তো ভয় পেয়েই বা ঘাবড়ে গিয়েই আর টাল সামলাতে তিনি পারলেন না। কী হত, যদি ভদ্রমহিলা অমন চেঁচিয়ে না উঠতেন, তা নিয়ে এখন তর্ক করা চলে, বলা চলে ভদ্রলোক হয়তো তাহলে পড়তেনই না, হয়তো তাঁর অভিপ্রায়ই ছিল যে ঐ পদক্ষেপটিই শেষ এবং আর তিনি পেছোবেন না, হয়তো আগে থেকে মাপজোখ করে রেখে-ছিলেন ছবিটা তুলতে হলে মোটামুটি ঠিক কতখানি জায়গা আছে তাঁর চলে-ফিরে বেড়ানোর জন্যে—এবং এমন একটা সম্ভাবনার সপক্ষে যুক্তির অভাব থাকা উচিত নয় এই কারণেই যে তিনি অতি-বিচক্ষণ এক জগদ্বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার, এমনই কি এর চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক সৌধস্থানে চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে পিছু হাঁটার অজস্র অভিজ্ঞতা তাঁর নিশ্চয় আছে, এভাবে ছবি তুলেছেন এথেন্সে বা চীনের প্রাচীরে, ও তাই সেসব জায়গায় যখন হুমড়ি খেয়ে পড়েননি, বেঘোরে প্রাণটা হারাননি, তখন এখানে কেন পড়তে গেলেন? অতএব স্ত্রীর ঐ চেঁচিয়ে ওঠাটাই কাল হল, নয় কি? অবশ্য বিপক্ষবাদীদের যুক্তিতেও যোগ দেওয়া যায়, অন্তত সেই স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিতে আমি তো তা সাগ্রহেই দিতে চাইব, যেহেতু একবার ভেবে দ্যাখো তো ভদ্রমহিলার এখনকার হাহাকারটাকে, তার প্রচণ্ডতাটাকে, কারণ স্বামীকে তো তিনি হারালেনই, তার ওপর লোকে অপবাদ দিচ্ছে যে তিনি

অমন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন বলেই নাকি ভদ্রলোক বেঘোরে প্রাণটা দিলেন। যাই হোক, সেই বিপক্ষবাদীদের যুক্তিটা হবে এই যে এমন কিনারে ইতিমধ্যেই হাজির তিনি হয়েছিলেন যে স্ত্রী যদি নাও চেঁচাতেন, পড়াটা তাঁর কেউই ঠেকাতে পারত না, বিশেষত যখন শেষ প্রান্তে এসে আরো পিছু হটতে চেয়ে পা তিনি নিশ্চয় আবার তোলেন, এবং সেই কারণেই স্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন, নইলে হয়তো কিছুই করতেন না তিনি। এবং তা-ই যদি হয়, অর্থাৎ পা-টাই যদি অমন তুলে তিনি ছিলেন, তবে সে-পা পিছনে কোথাও বসাতেই হবে অর্থাৎ পিছনে কোথাও বসাবার চেষ্টা করতেই হবে, এবং সে-চেষ্টা যেই তিনি করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে-সঙ্গে পড়ছেন, কারণ সেক্ষেত্রে শূন্যে তোলা পা'টি তাঁর বসার মতো মাটি যেখানে খুঁজে পেতে পারে এবং অন্য পা'টি যেখানে ইতিমধ্যেই মাটি ছুঁয়ে রয়েছে, উচ্চতায় এই দুই জমির ব্যবধান একশো কি দেড়শো ফুট। তবে তর্কের খাতিরে না মেনে উপায় নেই, এই-ই যদি ঘটে থাকে তো ভদ্রমহিলার তাহলে চেঁচিয়ে ওঠার কোনো অর্থই হয় না। কারণ চেঁচিয়ে স্বামীকে সতর্কই যদি তিনি করতে চেয়ে থাকেন তো তখন যেহেতু সতর্কতা অবলম্বনের আর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু শেষ প্রান্তে পেঁছেও আরো পিছু হটার জন্য তাঁর স্বামী পা আবার ইতিমধ্যেই তুলে বসে আছেন এবং তাই যেহেতু সে-পা এখন ঐ একশো কি দেড়শো ফুট তলায় পড়তে বাধ্য, অতএব সাবধান তবে কাকে করতে চাইবেন আর স্ত্রী? কেন তিনি চেঁচাবেন? নাকি চেঁচিয়ে তবে তিনি ওঠেন ভয়েই, আপনা থেকেই, স্বামীকে আর কিছুতেই বাঁচাবার উপায় নেই, সহসা উদিত তাঁর এই ভয়ংকর জ্ঞানেই?

বললামই তো, কী যে ঠিক ঘটেছিল তা কেউ জানে না, অন্তত আমি জানি না, তাই নানান সম্ভাবনা নিয়ে উল্টোপাল্টা পথে ভাবা চলে, খবরের কাগজের লেখকেরাও সেইটেই করেছে। তবে চেঁচিয়ে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন, এবং সেই চেঁচানোর সঙ্গে মৃত্যুটা যে উল্লিখিত হয় একত্রে, এই যোগসূত্রের স্মৃতিটি আমার মনে তখনো এমনই টাটকা ছিল যে হিমালয়ের খাদের কিনারে-কিনারে ধ্রুব যখন ছবি তুলতে ব্যস্ত, তখন চেঁচিয়ে তাকে কখনো থামাতে যাইনি। বরং রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছি মুহূর্তটা কেটে যাওয়ার, ক্যামেরায় ক্লীক্ করে একটা শব্দ শোনার—এবং ভাগ্যিস্, সে-শব্দ অমন প্রতিবারই শোনা গেছে, পরেই ক্যামেরা চোখ থেকে নামিয়ে কর্তার একগাল হাসি, কালো চশমাটা নাকে লাগাতে-লাগাতে বলা, ফিল্মটা ডেভ্লপ্ হয়ে যখন আসবে না! ইত্যাদি-ইত্যাদি। ফিল্মটা যা-হয় হবে হোক, আমাদের মোদ্দা কথাটা ছিল তখন, যাক বাবা, লোকটা যমের দোর থেকে বেঁচে-বর্তে ফিরে এল! এবং যখন ভাবছি এসব কথা, ততক্ষণে কর্তা আমাদের পাশে এসে হাজির হয়েছে, আবার চলতে সুরু করেছে।

"এখন তাই বলছি তোমায় ধ্রুববাবু, দেখলে তো, কী-রকম উদ্বেগেই-না তুমি আমাদের ফেলে-ছিলে মাঝে-মাঝে! এবং তাই এটাও বুঝছ নিশ্চয়, তুমি আমাদের কতখানি প্রিয়। অবশ্য এর উত্তরে তুমি বলতে পারো, বলা উচিত, যে যাত্রাটা আমাদের এমনভাবে সঙ্ঘবন্ধ করেছে যে আমরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছি একে-অন্যের প্রিয়-পরিজন, প্রায় হরিহরাত্মাই বলতে পারো। আমি মঞ্চ শীঘ্রই ছাড়ছি, স্থান দিচ্ছি একে-একে তোমাদের, তখন শোনার জন্য আমিও কান পেতে থাকব আমাকে নিয়েও কোনো উদ্বেগ তোমাদের কাউকে-কাউকে মাঝে-মাঝে এমনই পীড়িত করেছে কিনা। না, ঐ ফরাসী ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে ধ্রুবের বা ধ্রুবকে নিয়ে আমাদের উদ্বেগের ব্যাপারের মিলটা যদিও আপাত দৃষ্টিতেই প্রকট, ভুললে চলবে না যে তুলনায় ধ্রুবের সর্বনাশের সম্ভাবনাটা বহুগুণে প্রচণ্ডতর ছিল, কারণ কোথায় হিমালয়ের হাজার-হাজার ফুটের অতলান্ত খাদ আর কোথায় হাউজ্-খাসের একশো

কি দেড়শো ফুটের ওপর-নিচু! অবশ্য হরে-দরে হাঁটুজল, যেহেতু মৃত্যুর জন্য একশো ফুট ওপর থেকে পড়াও যা, হাজার বা দু' হাজার ফুট কি দু' মাইল উচ্চতা থেকে পড়াও তা। তবে এটাও সত্য, একশো ফুট ওপর থেকে পড়লে মানুষ কখনো-কখনো বেঁচে যায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সেরকম বাঁচা মরণেরই সামিল বা মরণের চেয়েও সাংঘাতিক। কেন, ঐ হাউজ্-খাসেরই তো আরেকটা ঘটনা, যেটা অবশ্য আমার চোখের সামনে ঘটেনি, কিন্তু সেটাও সাম্প্রতিক কালেরই ঘটনা—আমাদেরই মোটামুটি পরিচিত এক ব্যক্তি, স্থপতি হিসেবে নাম-টাম করেছেন, ভারতীয় ভদ্রলোক, তিনিও অমনি ছবি তুলতে-তুলতে ঐ একই জায়গা হতে পড়ে যান। তবে ভদ্রলোকের কপালের জোরটা দারুণ, হয় মাঝখানে কোথাও আটকা পড়ে যান, নয়তো পড়েন হয়তো কোনো গদীরই ওপর, যদিও সেটা কী করে সম্ভব জানি না, যাই হোক, প্রাণে বেঁচে যান। কোমর-টোমর ভেঙে যায় বা উরু-টুরু খুব জখম হয় বলে যেন শুনেছিলাম, অন্তত ভদ্রলোক হাসপাতালে যে কতদিন পড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই—এই সবেমাত্র আজকাল একটু বাইরে বেরোতে তাঁকে দেখছি-টেখছি, প্রচণ্ড খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটেন, ছড়ি ব্যবহার করেন, হাঁটার সময় অন্য লোকে সঙ্গে থাকে।

যাই হোক, সেটাও হয়নি আমাদের ধ্রুব-কর্তার—বালাই ষাট, হে ভদ্রমহোদয়গণ, মহিলাগণ, দেখুন কর্তা অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে, সেই চোখে চশমা, কাঁধে ঝোলা, পায়ে হান্টার জুতো, সব সব, সেই অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয়। চান তো ক্যামেরাটাও ঝোলা থেকে বার করতে পারে এক্ষুনি, এখানেই অর্থাৎ এই তক্তপোশের ওপরেই অভিনয় করতে পারে খাদের কিনারে যাওয়ার, আগের মতো ভঙ্গী করে দাঁড়ানোর, এক চোখ বুঁজে অন্য চোখ ক্যামেরায় লাগিয়ে পিছু হটার। কী, বলি কর্তাকে করতে? না চাচ্ছেন শুধু ছড়িটা ঘোরাতে-ঘোরাতে একটু হাঁটুকই, এবং তখন আপনারাও ছন্দ রেখে আবহ-সংগীতের ভাবে ডুগডুগি বাজাতে সুরু করুন টাটাক-টাক-টুং টাটাং-টাং? অতএব ওগো ধ্রুব-কর্তা, একটু হয়ে যাক? বেড়ালের মতো গোঁফ পাকিয়ে ফ্যাঁচ্ করে উঠছ কেন ভাই? বলছ ফাজলামিটা একটু বেশি করে ফেলছি? আ-হা-হা চটছ কেন, তোমারও তো সময় আসবে, তখন না-হয় এমনি করেই আমার ওপরও একহাত নিও, কেমন? শোধ-বোধ হয়ে যাবে? পেড়ো আমায় নিয়ে গুচ্ছের আবোলতাবোল প্রসঙ্গ, জনসমক্ষে সর্বরকমে আমায় হাস্যাস্পদ করে তোলার চেষ্টা ক'রো, আর আমি তখন যতই রাগি যতই বিরক্ত হই মুখ খুলতে পারছি না, কারণ দান চলছে তোমার, যেমন এখন চলছে আমার—তবেই খেলাটা তো জমে ভালো, কী বলো? কী, পছন্দ হচ্ছে না? আচ্ছা বাবা, তবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এবং হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমার প্রসঙ্গও শেষ করছি, অন্যের প্রসঙ্গও শেষ করছি, এবং যত তাড়াতাড়ি পারি মঞ্চ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছি, পরে তোমরা যা করবে করো, লাফাবে-ঝাঁপাবে তো লাফাও-ঝাঁপাও, যা বক্তৃতা দেবে দাও। শুধু দুটি কথা বলার অনুমতি চাই। এক, তোমাকে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা একেবারেই করা হচ্ছিল না এতক্ষণ; সেটা যদি হত তো লোকে হাসত, কিন্তু কই, চেয়ে দ্যাখো-না, কেউ হাসছে? উল্টে আমার তো মনে হয়, তোমার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের কিছু স্বরূপই আঁকার চেষ্টা করেছি, এবং সেই চেষ্টায় আমার আন্তরিক সহানুভূতির রঙে অভাব নেই। সত্যি বলছি কিনা, তা বিচার করবেন সমবেত ভদ্রমণ্ডলী। আমার দ্বিতীয় কথাটি হল এই, কিছু প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে পেড়ে ফেলেছি, হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমারই বিষয়েই, যার সম্যক আলোচনা যদি না করি তো আমার বক্তব্যটিই যে শুধু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা নয়, এই শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি নিজের দায়িত্বটুকুও আমি প্রয়োজনমতো পালন করে উঠতে পারব না। কারণ তাঁরা তখন নিশ্চয় বলতে পারবেন, আরে, প্রশ্নগুলো পাড়লো অথচ উত্তর দিল না, এ কোন্ ধরনের সূত্রধার রে বাবা? অতএব কর্তা, তুমি

ভেতরে-ভেতরে গুমরেই ওঠো আর চোখই রাঙাও, না স্যার, শুধু তোমাকে খুশি করার জন্যে মঞ্চটা এখুনি ছাড়তে পারছি না। তাছাড়া সূত্রধার যখন করেছই আমায়—কেন করলে? গোড়ায় তখন আপত্তি তুললেই ল্যাটা চুকে যেত, আমি মঞ্চে আসতুমই না।

কী-সব প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে পেড়ে রেখেছি, বা প্রশ্ন যার উত্তর দেওয়া হয়নি? প্রথমেই ধরো, এক জায়গায় বলি তোমার কাঁধের ঝোলাটার কথা, যার মধ্যে ক্যামেরাটা তুমি পুরলে, অর্থাৎ পুরতে বাধ্য হলে। কেন? কারণ চামড়ার ফিতেটা তোমার ছিঁড়ে যায়, প্রথমে এক জায়গায় ও পরে আরেক জায়গায়। মুচি নেই, ইত্যাদি। এবং মনে পড়ছে, তোমারও মনে পড়া উচিত, তখন ঝোলাস্থিত ঐ ক্যামেরার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের দুটো বিশদ ভাগ করি, একটা আগে ও পরের রেখা টানি, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় ক্যামেরাটা নিয়ে আগের দিকে তুমি কী করছিলে ও পরের দিকে কী করতে থাকলে, বা কী করতে থাকা হতে নিজেকে ইচ্ছা করে বঞ্চিত করলে—এ প্রশ্নটা করেছি কিনা তা এবার তুমি নিজেই বিচার করে দ্যাখো। কী, করেছি তো? কিন্তু উত্তর কি দিয়েছি? দিইনি, এবং সেটা তুমি নিজেও স্বীকার করছ এখন। তাহলে যদি অনুমতি দাও তো আমি আরেকটা প্রশ্ন পাড়ি—শ্রোতৃবৃন্দকে জানিয়ে এদিকে রাখলাম আগেভাগে যে একটা সময় আসে যখন ক্যামেরাটা ব্যবহারের অভিরুচি তোমার ঘুচে গেল, অথচ ওদিকে পরে সে-বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্যই করলাম না, উল্টে হাউজ্-খাসে একদা কী ঘটে না-ঘটে তার আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্তে পঞ্চমুখ হলাম; এতে আমাদের শ্রোতাদের লাভ বা লোকসান কী হল জানি না, কিন্তু যে-প্রশ্ন আমি নিজেই তাদের মনে জাগিয়েছি এবং যার ফলে কত বিচিত্র কল্পনার অন্ধকার অলিতে-গলিতে বেচারারা এখন নিশ্চয় পথ হাতড়ে মরছে, তুমি এবার আমায় বলো ধ্রুববাবু, সে-অন্ধকারে তাদের সামনে আমি কোনো প্রদীপই তুলে ধরব না, বরং ঘুপটি মেরে চুপটি করে কেটে পড়ব মঞ্চ হতে, এবং হেন পিট্টানের মাধ্যমে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবো, হ্যাঁ ধ্রুববাবু, এইটেই আমাকে দিয়ে করাতে চাইছ তুমি এখন, তাই তো? আগেই বলেছি, আবার বলছি, এই যদি প্রস্তাব হয় তোমার তো দুঃখিত, সে-প্রস্তাব এ-অধম মানছে না। কারণ হিমালয়ের খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে তোমাকে ছবি তুলতে দেখে আমার যে-ভয়, সেই ভয়েরই যথেষ্ট কারণ প্রদর্শনের জন্যই আনা হয়েছিল হাউজ্-খাসের ঘটনাটাকে, বা ধরো ঘটনা-দুটোকে, যেহেতু শুধু ফরাসী ফোটোগ্রাফারটিরই নয়, আমাদের ঐ অল্প পরিচিত ভারতীয় স্থপতি ভদ্রলোকেরও যা ঘটে তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়; কিন্তু এ-সবই তো তোমার ঐ পূর্ব পর্যায়ের প্রসঙ্গেরই অনুবৃত্তি, অর্থাৎ সেই পর্যায় যখনো তুমি ছবি তোলা হতে নিরস্ত হওনি—পরের পর্যায়টা সম্বন্ধে কিছুই বললাম না।

বলছ সেটা বলার দরকার নেই? যেহেতু কী ঘটেছে না-ঘটেছে তা আমরা হাড়ে-হাড়ে জানি, এবং এখন বাক্যালাপটা হচ্ছে আমাদের নিজেদেরই মধ্যে, তাতে সম্মুখের জনমণ্ডলী অংশগ্রহণ করছে না? এবং তাই যদি হয় তো প্রশ্ন তুলে উত্তর দিলাম বা না-দিলাম, তাতে কিছুই যাবে-আসবে না, যেহেতু উত্তরটা আমাদের জানা, ভীষণভাবে জানা, তার চাবুকের শপাং-শপাং শব্দ আমরা নীরবে শুনছি সকলেই, সব সময়েই—এই বক্তব্য তোমার? না ধ্রুববাবু, কিছু মনে ক'রো না, আমি একমত হতে পারছি না, কারণ আমার মনে হয় আমাদের শ্রোতৃবৃন্দের দিকে তুমি এখনো ভালো করে তাকাওনি। মানছি, তাকানো কষ্টকর, কারণ অন্ধকার, ও সে-অন্ধকার একটু পেরোলেই পড়ব গিয়ে তরাই-এর অরণ্যের বহুগুণে প্রচণ্ডতর বিচিত্রতর আরো এক অন্ধকারে, যেখানে কোনো জটই খুলবে না, বরং পাকিয়েই যাবে ক্রমশ, যা জটিল তা জটিলতর হবে। মানছি, সব মানছি, তবু একটু কষ্ট

করো, এই দ্যাখো-না আমি যেমন করছি, খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকো, শ্রোতাদের যে-কোনো অংশই বেছে নিতে চাও নাও, কিন্তু তাকিয়ে তোমায় থাকতে হবে সেই একটি দিকেই, একটি জায়গাতেই, নিবিড় দৃষ্টিতে। এবং সেটা যদি করো একবার তো অল্প পরেই দেখবে আস্তে-আস্তে, ঐ অন্ধকারের মধ্যেও একটার-পর-একটা মুখের আভাস যেন জাগছে, টিকলো নাক কোথাও, নাকের নোলক কোথাও, এই শীতেও হয়তো উদ্বেগেই বা ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে কারুর ঠোঁটের আশপাশ জমিতে ঘামের জমাট ভাপ। আজ যখন আলোগুলো সব আমাদেরই মুখে, সে-আলো যতই অল্প হোক-না এবং অল্প বলেই প্রত্যক্ষতার প্রখরতার বদলে তা বরং এক অদ্ভুত আলো-আঁধারিরই সৃষ্টি করুক-না, তখন এই মুহূর্তে মঞ্চের ওপর আমরা যা-ই করি-না কেন, নড়ি বা চড়ি বা মুখই খুলি, আমি বলছি ধ্রুববাবু জেনো, নিশ্চিত জেনো তা সবই নিরীক্ষিত হচ্ছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। হিমালয়ের পথে আমাদের এই যাত্রাটা আরম্ভ করার আগে তোমার সঙ্গে তেমন আমার পরিচয় ছিল না, তাই জানি না গানের আসর-টাসরে উপস্থিত থাকার অভ্যাস তোমার আছে কিনা। যদি থাকে তো তোমাকে বলতে হবে না সে-সব সভায় কী হয়। ধরো এক ওস্তাদের পালা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, আরেক ওস্তাদ এসে বসেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আসরে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি নতুন মুখও, যাঁদের কেউ-বা পাখোয়াজে সঙ্গত করবেন কেউ তানপুরা ছাড়বেন কেউ-বা সারেঙ্গীতে সঙ্গ দেবেন। আর যেহেতু শুধু তাঁরাই মঞ্চে, বা প্রচন্ড ভিড়ের কারণে মঞ্চতেও শ্রোতৃবৃন্দের অনেকে জমা হয়ে থাকলে একমাত্র তাঁরাই যেহেতু সেই সাদা-ধবধবে ফরাস-পাতা উচ্চ জলচৌকিতে আসীন, এবং প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে প্রজ্বলিত আলোগুলোর সব কটাই পড়েছে গিয়ে তাঁদেরই মুখে, তখনো তাই অনেকটা আমাদের এই আজকের মতনই এক অবকাশ। শুধু মাঝ থেকে একলা আমাদেরই ভূমিকাটা পাল্টে গেছে—গানের আসরে সেদিন ছিলাম শ্রোতাদের অন্ধকারে হারিয়ে, আজ নিজেরাই জলচৌকিতে। কিন্তু যা বলছিলাম ধ্রুববাবু, সেদিন ঐ গানের আসরে তুমি বসে আছো শ্রোতাদের দলে, ধরো মঞ্চেতেই কোথাও হারিয়ে, ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে নতুন ওস্তাদ এসে হাজির হয়েছেন, জলচৌকি অধিকার করেছেন—ধরো আমাদের সেই ওস্তাদটি কোনো সেতারবাদক, এবং ধরো তিনি প্রথমে শুনতে চাইলেন তানপুরা-দুটো ঠিক সুরে আছে কিনা। তাই ঝুঁকে-পড়া সেতারবাদকের কানের কাছে সরে এসে যন্ত্রটা ছাড়বেন যাঁরা, তাঁরা তারের ওপর জোরে-জোরে আঙুলের ঘা দিতে সুরু করলেন, গোঁ-গোঁ-ক্যাঁও-ক্যাঁও। ঐ দ্যাখো, একটি তানপুরা সেতারবাদক এবার নিজেই নিয়ে নিচ্ছেন, আরো কষে যন্ত্রের কান-মোলা সুরু হচ্ছে, আরো জোরে শব্দ ধ্বনিত হতে থাকছে গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ। অচিরেই এ-তানপুরাটা ঠিক হল, অন্যটা ধরলেন, সেটাকেও ঠিক করলেন। পরে ধরলেন সুর বাঁধতে নিজেরই যন্ত্রটায়—আঃ, টুং-টাং শব্দ তো নয়, যেন ফুলের পাপড়ি পড়ছে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি অত বোকা নই ভাই, বুঝেছি যে তুমি দেখতে পারছ সাদৃশ্যটা, তাই আর না-হয় নাই বাড়ালাম কাহিনী। সুর বাঁধা চলছে তখন, একটার পর একটা যন্ত্র ধরে, কখন পাখোয়াজেও চাঁটি পড়তে শুরু করল, এদিকে মাইকটাকে আপাতত স্বভাবতই ইচ্ছে করে অকেজো রাখা হয়েছে—আর কাছে-দূরে সামনে-পিছনে তুমি-আমি যত শ্রোতা রয়েছি, আমরা নিজেদের মধ্যে এক-আধজন তখন এটা-ওটা টিপ্পনি কাটছি, কেউ হয়তো বেরিয়ে পড়ল বিড়ি ফুঁকে আসতে কি এক-খিলি পান কিনতে, ইত্যাদি-ইত্যাদি; কিন্তু যে যা-ই করি, বসেই থাকি বা ঘুরেই বেড়াই, কথাই বলি বা চুপ্ করেই থাকি, নজর কিন্তু সবায়েরই ঐ জলচৌকির ওপর, প্রতীক্ষা কখন সঙ্গীত শুরু হয়। বিরতি অথচ বিরতি নয়, মনোযোগ আছে অথচ নেই, এইরকম একটা আবছা-আবছা অবস্থা। এবং,

হ্যাঁগো ধ্রুববাবু, ঠিক সেই একই অবস্থা আজ আমাদেরও এই শ্রোতৃবৃন্দের। ওরা সব দেখছে, বোঝবার চেষ্টা করছে, আমাদের ঘোষিত করে-দেওয়া তথাকথিত এই বিরতিরও মুহূর্তে—অতএব অত হেনস্তা ওদের নাই-বা করতে গেলে, নাই-বা ভাবতে গেলে যে যা-কিছু বলছি-ভাবছি-করছি আমরা, তা সীমাবদ্ধ রয়েছে একমাত্র আমাদেরই মধ্যে। হল তো? তবে এ-তর্ক আমরা আর করছি না, অন্তত আপাতত না, এবং আমি ফিরি আমারই পাড়া প্রশ্নগুলির উত্তরে।

যাক, যেহেতু ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে একসময় ধ্রুব ছবি তুলছিল ও পরে একসময় এল যখন ছবি আর সে তুলছিল না, এ-কথায় শ্রোতাদের কেউ পাছে ভেবে বসে যে ছবি তোলা যদি ও বন্ধই করে থাকে তো তার কারণ হয়তো ছিল ফিল্ম ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল, এখানে তাড়াহুড়ো করে দুটি সামান্য কথা তাই যোগ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন ঘন-ঘন কর্তা ছবি তুলছিল, তাতে ফিল্ম ওর ফুরিয়ে যেতে খুবই পারত, কারণ এত বড় যাত্রায় হাজার হলেও কত ফিল্মই-বা মানুষ সঙ্গে নিতে পারে। আর এখানে একবার ফিল্ম ফুরোলে ফিল্ম পাচ্ছ কোথায়! তবু শুনতে আশ্চর্য ঠেকলেও বলে রাখছি সত্য কথাটা, যারা চায় পরখ করে নিতে পারে—অব্যবহৃত ফিল্ম এখনো বেশ কিছু পড়ে আছে হয় ওর ঝোলারই মধ্যে, নয় অন্য কোনো মালপত্রের ভিতরে, যেসব মালপত্র এই পাহাড়ী পথে বহন করার জন্য দুয়েকটা কুলি আমরা নিই যাত্রার প্রারম্ভেই। বলা বাহুল্য, কুলি বহন করছে ধ্রুবের একলারই মাল নয়, এমন আমাদের অনেকেরই। না, ছবি তোলা যদি ও বন্ধ করে থাকে তো ফিল্ম ফুরিয়ে যায়নি বলে নয়। কারণ ও জিনিসটা দেখে, আমরা সকলে দেখি, একদিন পৃথিবীর ছাদের ওপর উঠে। এবং সেটা দেখেই ওর মনে হয়, আমাদের সকলের মনে হয়, যে এমন দৃশ্য আর ভূভারতে রইল না যাকে ভবিষ্যতের জন্যে ধরে রাখতে ইচ্ছা জাগতে পারে, হয় ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরায়, নয় চিত্রীর তুলিতে, নয়তো লেখকের লেখনীতে। শুধু তাই নয়, দ্যাখো ধ্রুববাবু কথাটা ভাবতেই আমার সর্বশরীরে কেমন রোমাঞ্চ জাগছে, পা কাঁপতে সুরু করছে থর-থর করে, বলো ধ্রুববাবু যা বলছি তা সত্যি কিনা, বলো যে-ফিল্মগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো নিয়েও কী আতঙ্ক তোমার! মিথ্যা যদি বলি তো আমাকে থামিয়ে দাও, যদিও অন্যান্যবারের মতোই, জানি নিশ্চয় জানি, মিথ্যা আমি এবারও বলছি না। তবে বলি তোমার আতঙ্কটা? মনে পড়বে তোমার, তুমি এ-সম্বন্ধে আজও মুখ খোলোনি আমার কাছে, আমাদের কারুরই কাছে, ফিরতি পথে না-কোনো অগ্নিপ্রভ দুপুরে, না-কোনো অন্ধকার রাত্রে তাঁবুর গুমরে-গুমরে কাঁপা নীরবতার হাহাকারে। কথাটার সত্যতা যাচাই করা দরকার তাই।

যখনই অন্যমনস্ক তুমি—যেমন এই এখনই, দেখতে তো পাচ্ছি মুখ তোমার বদলে যাচ্ছে, আমার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেও চোখ তোমার ক্রমশই দেখছে না আমায়—বলো ধ্রুববাবু, এইরকম যখনই আনমনা হয়েছ বা হচ্ছ তুমি, একমাত্র সেই কথাটাই তুমি ভেবেছ বা ভাবছ কিনা, অর্থাৎ সেই তোমার কৃষ্ণকরাল আতঙ্কের কথাটাকেই মনে-মনে ওল্টাচ্ছ-পাল্টাচ্ছ কিনা। ধ্রুববাবু, ভাবছ তুমি, যে-ছবিগুলো ইতিমধ্যেই তুলেছ, সেগুলো যেই ডেভ্যলপ্ করতে দেবে, অর্থাৎ যদি কোনোদিন দাও-ই, সেরকম কোনো অভিরুচি যদি এখনো থেকে থাকে তোমার, তো দেখবে ফিল্মগুলো হয় ঝলসে পুড়ে গেছে নয়তো সেখানকার আগের গাছ-গাছড়া পার্বত্য-প্রকৃতি বা সকালের সূর্যালোকের হিমশীতল আভাস এখন পরিণত বিভীষিকায়, ভেংচি-কাটা দানবে, বিকলাঙ্গী বলাৎকৃতা অপ্সরায় —বিষ্ঠায়-প্রস্রাবে-থুথুতে। এক-একসময় এটাও ভাবছ তুমি যে এমন হবে কী করে, হতে পারে না, যেহেতু বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ছবি যখন তোলা হয় তখন দৃশ্য যেমন ছিল, ছবি যখন ডেভ্যলপ্

হবে তখনো দৃশ্য তেমন থাকবে। আবার কখনো এমনও ভাবছ, ইতিমধ্যে দৃশ্য স্বয়ং যেহেতু উল্টে-পাল্টে গেছে, অতএব সেই ওল্টানো-পাল্টানোর প্রভাব ছবিতেও কিনা পড়ে থাকতে পারে, তা সে-ছবি দৃশ্য পাল্টাবার আগেই তোলা হয়ে থাকুক বা না-থাকুক কী এসে-যায়! নাকি সে-দৃশ্য আসলে পাল্টায়নি, ছবি তোলার সময় যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে—সেসব স্থানে কোনো পরিবর্তন একেবারেই সাধিত হয়েছে কিনা, তা আবিষ্কারের জন্য ফিরতি পথে ধ্রুববাবু কি তাকিয়েছে ভালো করে, বা আমরাও কি কেউ কখনো তাকিয়েছি? এ-প্রশ্নটা ধ্রুববাবু তুমি যেমন তোমাকে করছ, আমিও তেমনি আমায় করেছি; আমরা আমাদের করছি। আসলে কিছু পাল্টেছে কিনা, তা ফিরতি পথে দেখার অভিরুচিও ছিল না, এত ক্লান্ত তখন আমরা, এত বিভ্রান্ত, নৈরাশ্যে এতই পর্যবসিত। কখনো-কখনো ধ্রুব এ-চিন্তাও হচ্ছে তোমার যে উঠছিলে যখন, তখন মন রঙীন, ফলে যা দেখেছ তা-ই ভালো লেগেছে, মনে হয়েছে আ-হা-হা, এত সৌন্দর্য বোধহয় সত্যিই কল্পনার অতীত—আসলে গন্তব্যে পৌঁছোলে যেটা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখতে পাব বলে তখনো ধীর প্রত্যয় ছিল, মনে সেই বস্তুটিরই চিন্তার অনুক্ষণ উপস্থিতি যা-কিছু দেখছি তার উপর এক সৌন্দর্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আমি জানি, আরো কত-কী ভাবছ তুমি, দুলছ কত সন্দেহে, করছ কত প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজতেও পাড়ছ পাল্টা-প্রশ্ন। নিজেরি অবিরাম অসিচালনায় খান-খান মুহূর্তে তোমার, ছিন্নভিন্ন অন্ত্রে-যন্ত্রে রক্তে আশপাশ একাকার। অবশ্য আমি এসব বলছি কেন, যখন তুমি স্বয়ংই রয়েছ, মুখ্য পাত্র-পাত্রীদের একজন হিসেবে তোমাকে যখন মনোনীত করা হয়েছে আজ এবং সে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তুমিও স্বীকৃতি দিয়েছ—তাই ধরে নিচ্ছি, যথাসময়ে তোমার বক্তব্য তুমি নিজেই পেশ করবে। আমি যা বললাম, তা শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তোমার কিছুটা পরিচয় দিতে চেয়েই।

আরো একটা ছোট্ট ব্যাপার রয়ে যাচ্ছে, যেটা ভুল করে বলে ফেলেছিলাম ও যার সংশোধন কাম্য ঠেকতে পারে। বলেছিলাম, ঐ শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে-থাকা এক ছোটছেলে বা নাকে নোলক-পরা এক ছোটমেয়ে তোমায় দেখিয়ে পার্শ্ববর্তীর কানে হয়তো ফিসফিস করছে এই বলে যে চোখের কেমন চশমাটা দ্যাখ্? বা হাতের ছড়িটা দ্যাখ্? এক্কেবারে পাক্কা একখানি টুরিস্ট, না রে? টুরিস্ট কথাটা উচ্চারণ করে ফেলেছি বলে ক্ষমা চাই, কারণ ও-কথাটা ওদের মুখে বেমানান হবে—এর মানে এই নয়, নিশ্চয় নয়, যে টুরিস্ট ওরা নিত্যই দেখছে না হরদম, কারণ তা ওরা দেখছে নিশ্চয়; শুধু টুরিস্ট কথাটার চলন ওদের ঐ ছোট্ট নিষ্পাপ মুখে তো নয়ই, ওদের পিতার বয়সীদের মধ্যেও এখনো নেই, অন্তত নেই বলেই আমার বিশ্বাস। হাজার হলেও জায়গাটা এত দূরে, একটার-পর-একটা পার্বত্য শ্রেণীতে লুপ্ত—এখানে সমতলের লোকালয়ের কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোলাহল আমাদের মতো যাত্রীর মাধ্যমে যদিও নিত্যই এসে পৌঁছচ্ছে, তবু আধুনিক যুগের হাব-ভাব কথাবার্তা অভ্যাস-আচরণ এখনো বহুলাংশে নিশ্চয় অপরিচিত। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে পাপ বা নিষ্পাপ, এসব কথা উচ্চারণ করারও কোনো অর্থ আমার হয় না, কারণ আধুনিক যুগ ভালো কি মন্দ বা টুরিস্ট কথাটার সঙ্গে পরিচয় থাকা বা না-থাকা উচিত কি অনুচিত, এমন নৈতিকতার কোনো প্রশ্নই আমি এখানে তুলছি না—এমন-কি নৈতিকতার কোনো প্রশ্ন যে থাকতে পারে এখানে, সেটাও মানছি না।

কিন্তু এসব কী-আজেবাজে কথার তুচ্ছতায় আমাদের এই এত প্রার্থিত মিলনটিকে আজ আমরা পর্যবসিত করতে চলেছি! টুরিস্ট কথাটা বললাম কি বললাম না, এবং সে-কথা বলা বা না-বলায় শোভনতার দ্বার লঙ্ঘন করলাম কি করলাম না, অথবা হেন প্রসঙ্গটিকে আমি-নামক বিরাট

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি কোনো নৈতিকতার পর্যায়ভুক্ত বলে মানতে চাইব কি চাইব না, হায়-হায়-হায়, শেষে কি এমন সন্দেহে বা আপশোসে বা যুক্তির লড়াইএ মাটির ওপর পা ঠুকে আত্মপক্ষ সমর্থনেই এখন আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত করব!

হে ভদ্র মহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, বিশ্বাস করুন, যখন উঠেছিলাম খাড়াই-এ, তখন আমাদের চোখে অন্য জ্যোতি ছিল, মুখে অন্য বাণী ছিল, হৃদয়ে অন্য চিন্তা ছিল। আজ সভার প্রারম্ভে প্রার্থনা করেছি, যাতে শক্তির স্খলন না হয়, তবু কেন এই পতন! এমন নয় যে দেখছি না সূর্যের সুরটিকে হাতের শিরায়-শিরায়, তবু ধরতে যেই চাচ্ছি, দেখি সে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দলের আপনজন, এই মঞ্চে আমরা এতগুলো লোক, এসো ভাই সকলে আবার নতজানু হই, যাচ্ঞা করি আশীর্বাদ এই রাত্রির, দিকদিগন্তে আঁচল-বিছানো এই অন্ধকারের, যাতে যেন বাঙ্ময়ী বাক্ আমাদের এই জড় অপ্রাণ ওষ্ঠে প্রস্ফুটিত পদ্ম হয়ে ওঠে, ধুলোর দেহখানি হয় মন্দির, যেন সমবেত এই জনমণ্ডলীর অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি—বলো, যেন পূর্ণ করতে পারি। সামনের সারিতে এ-গ্রামের পিতৃস্থানীয় যাঁরা আছেন, এ-সভা ধন্য করেছেন, করযোড় হই তাঁদের প্রতি, আশীর্বাদ চাই তাঁদেরও, যত যত পুণ্য স্মৃতি তাঁদের আছে পূর্বদিনের, তা আমাদের এই ভয়ে-সন্দেহে দোদুল্যমান মুহূর্তটিকে বিশ্বাসে সম্পন্ন করে, যেন তাঁদের নিশ্বাসে মেলে আমাদের নিশ্বাস, নদীতে নদী, যেন যজ্ঞের ঘৃত হতে পারে আমাদের সমস্ত অসাফল্য, হাহুতাশ, বিশাল ভূমিখণ্ডে সহসা পরিব্যাপ্ত এই অভিশাপ।

শোনো ধ্রুব রুদ্র, কনক ও বৃন্দাবন, এবং আমাদের অন্য যারা সকলে রয়েছ তারাও নিশ্চয়, এবার আমাদের কার্যক্রম আরম্ভ না করলেই নয়—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরতে হবে সমগ্র এই শ্রোতৃবৃন্দের, শেয়াল তো বটে, ব্যাঘ্রও থাকতে পারে অদূরের অরণ্যে। বিশেষত যখন শ্রোতাদের কেউ-কেউ হয়তো এসে থাকতে পারেন আশপাশের অন্যান্য গ্রাম হতে। আমার মনে হয়, নারী-চরিত্রের ব্যাপারে একটা নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে আজ, অন্তত চেষ্টা করতে দোষ নেই। ধরো এ-প্রশ্নের কোনো মীমাংসাই করলাম না আমরা এখন, নারীদের বললাম যেন সময় হলে তারা আপনা থেকে যে চায় সে উঠে আসে, এতে শেষ পর্যন্ত যদি কোনো নারীই না উঠে আসে তো তাও সই—আর উঠে যদি কেউ আসে, অন্তত সে-আশাটা আমরা রাখছি, তো পালাটা জমবে ভালো, তা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, কী বলো? আরম্ভ তবে করে দেওয়া যাক, তোমরা তিনজন ও আমি সূত্রধার। পরিচয় তো সকলেরই দেওয়া হয়ে গেছে—সুতরাং?

ঐ দ্যাখো, ঠিক-ঠিক বৃন্দাবন, ঠিক কনক, নিজের পরিচয়টাই দিইনি। আসলে এমন মাতব্বর আমি ভাবি নিজেকে যে অপরিচিতদের কাছে অন্যান্যদের মতোই আমিও যে সমানই অপরিচিত ঠেকতে পারি, হেন সম্ভাবনাটা পর্যন্ত আমার মনে কখনো জাগে না। যখন অসামান্য একেবারেই নই, তখন নিজেকে এমন অসামান্য ভাবা এক অসামান্য দৈন্যেরই পরিচায়ক, যার জন্য হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা করি। জানবেন, এ-অধম তুচ্ছ হতেও তুচ্ছ, ধূলি হতেও ধূলি, এবং সেই কারণেই এত ব্যর্থ অহংকার তার—মরেও মরে না, কারণ মরার আর কী বাকী আছে তার, অর্থাৎ এই আমার, এবং আমাদের সকলেরও, এমন-কি ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, আপনাদেরও। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা সবাই মৃত, এটা মৃতদের সভা, প্রেতের মিছিল—আলো ঘেঁষে এই-যে দাঁড়িয়ে আছি ও তার ফলে আমাদের এই-যে লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েছে আপনাদের গালে-চোয়ালে-চিবুকে, ঐ ছায়াগুলোই হয়তো আরো সত্য আমাদের রক্ত-মাংসের কনুই-কোমর-বগল থেকে।

থাকগে, সেসব কথায় আসছি—ধৈর্য ধরুন, একটু, অ্যাঁ? কী বলছেন, ছায়া কী করে সত্য হবে যদি যার ছায়া সে সত্য না হয়? আসলে উপমাটা দিতে পারিনি ভালো করে, যুক্তিতে একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে, আমাদের মাথাটা কারুর ঠিক নেই, বুঝলেন! যেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তা যে-কাহিনী শুনছেন তা সত্য হলেও যাদের মুখে শুনছেন তারা মিথ্যা হয়ে গেছে—শুধু তাই নয়, আপনারা যাঁরা শুনছেন তাঁরাও ইতিমধ্যে সমানই মিথ্যায় পরিণত। থাক, সময় যখন আসবে, তখন ধীরে-ধীরে এ-রহস্যের জালটা আপনা থেকেই কেটে যাবে—এখন নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই।

মনে কি পড়ে আপনাদের কারুর, কিছুক্ষণ আগে এক লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ ওঠে? হ্যাঁ, আমিই সেই অধম। তখন অবশ্য কায়দা করে বলি, আদালতের পেয়াদার মতো হাঁক দিয়ে দেখব নাকি একবার হে-এ-এ-ই লোকনাথ ভট্টাচার্য হা-জি-ই-ই-র? ভাবখানা তখন ছিল, এমন চেঁচিয়ে উঠলে সাড়াশব্দ মিলবে না, যেহেতু এ-দলে লোকনাথ ভট্টাচার্য বা ভোলানাথ গুঁই বা ক্ষান্তমণি দাসীর মতো সম্পূর্ণ অনুপ্রাসহীন নামের কোনো ব্যক্তি হাজির নেই। দেখছেন তো, মিথ্যা বলে-ছিলাম—অন্তত সরাসরি মিথ্যা না বললেও কলে-কৌশলে সত্যটা এড়াতে চেয়েছিলাম। যাক, নামটাই কেবল শোনেননি, নইলে আমাকে দেখছেন আপনারা অনেকক্ষণ, আমার কথা শুনছেন, হাত-পা নাড়া পর্যবেক্ষণ করছেন, কত দিকে আমার কত ভয়াবহ দুর্বলতা তার সম্বন্ধেও একটা মোটামুটি ধারণা করে নিয়েছেন—এখন আর-কী জানাবো বলুন, বিশেষত নামটাও যখন জানানো হয়ে গেল? বিশেষত যখন আমাদের সকলেরই সম্বন্ধে, এবং আমি স্বয়ং সূত্রধার বলেই আমার সম্বন্ধে তো বটেই, আরো অনেক কিছুই অচিরেই জানতে পারবেন এ-বৃত্তান্তের মাধ্যমে? তাই অনুমতি যদি করেন তো আপাতত আত্মপরিচয়ের এখানেই ইতি টানি।

আরম্ভ করব কী দিয়ে, অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে-ব্যাপারটা হয়তো পাত্র-পাত্রীদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন হবে। এমন-কি কোনো পদ্ধতি তারা একেবারেই অনুসরণ করবে কিনা, তাও থাকুক একমাত্র তাদেরই বিবেচনার আওতায়—আমার তো মনে হয় সূত্রধারের এখানে নাক না গলানোই উচিত হবে, বিশেষত যখন ইতিমধ্যেই একটা অভিযোগের ভাব রয়েছে অনেকের মধ্যে যে আমি বোধহয় বেশ একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, জায়গা একবার পেয়েছি কি সে-জায়গা কিছুতেই ছাড়ছি না সেই অন্যদের জন্যে যাদের নিজেই কত আদিখ্যেতা করে ডেকে এনেছি আহ্বান জানিয়ে—না, তাই আমি আবার কেন, এ-ব্যাপারে ওরা এবার যে যেমন চায়, সে তেমন-তেমন সিদ্ধান্ত নিক। এর ফলে আরম্ভটা যদি একটু হঠাৎ ঠেকে, বা আরম্ভ হয়েও আগে থেকে সুচিন্তিত হয়নি বলেই জিনিসটা দানা বাঁধতে সময় লাগে, কি হয়তো গোড়াতেই তিনজনে একসঙ্গে কথা বলে উঠল ও যার ফলে কে যে কী বলল তা শোনা গেল না বা বোঝা গেল না, কিংবা মঞ্চ যখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছেই ওদের জন্যে এবং কর্তারা এসে হাজিরও হয়েছে, তখন তিনজনের প্রত্যেকেই ঠিক কী বলে সুরু করবে ভেবে না পেয়ে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে রইল ও তাই দর্শক ও শ্রোতা মহলের কৌতুক অচিরেই প্রায় অধৈর্য ও বিরক্তিতে পরিণত হতে চলল, না-না-না বাবা, এসব নিয়ে আমি আগে থেকে কোনো টীকাটিপ্পনী করছি না, করতে চাইছি না, উল্টে এ-সন্ধ্যার মঞ্চকে ছেড়ে দিতে চাই তার নিয়তিরই হাতে।

তবু যেহেতু আমরা সব-তাতেই ঐক্য খুঁজি, সাম্য খুঁজি, সুষমা খুঁজি, এবং যেহেতু যে-ঐক্য ইত্যাদির কিছু কম প্রয়োজন নেই আমাদের আজকের এই সভাতেও, আমি তাই করযোড় অনুনয়ে মাত্র দুটি কথা পেশ করতে চাই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য—রবাহূত হয়ে কোনো

পরামর্শ-দানের অভিপ্রায় নয়, নির্দেশ তো নয়ই; শুধু কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আজকে একদিকে যেমন আমাদের অন্যদিকে তেমনি শ্রোতাদের হয়তো সুবিধে হতে পারে, সে-সম্বন্ধে আমার নিজের সামান্য ভাবটা বা ধারণাটা জানিয়ে রাখতে চাওয়া, আর কিছু নয়—এতে আমার দলের গুণধরেরা যেন অযথা ব্যথিত না হন, যেন না ভাবেন যে আমি অনধিকার চর্চা করছি, এই কামনা।

পদ্ধতিরই যদি প্রশ্ন ওঠে, অর্থাৎ আগাগোড়া ব্যাপারটাকে নিছক খেয়াল-খুশির হাতে ছেড়ে দেব না এমনই ধরে নিতে যদি প্রস্তুত থাকি, তো আমার মনে হয় এখানে মোটামুটি দু'রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা চলতে পারে—অর্থাৎ দুটোই একসঙ্গে নয়; হয় এটা, নয় ওটা। প্রথম পদ্ধতি বলতে যা সঙ্গে-সঙ্গে মনে আসছে তা হয়তো একটা কালানুক্রমিক বিবরণ খাড়া করার চেষ্টা, অর্থাৎ যখন থেকে যাত্রার কথাটা মনে আসে বা যাত্রা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেই সময় হতে শুরু করে ধাপে-ধাপে এগোনো এবং সেই এগোনোর মাধ্যমে অনেক আলাপ-পরিচয়ের ইতিবৃত্ত রচনা করে চলা, নতুন মুখের ক্রমশ আপন হয়ে ওঠা, পথের সংলাপ, ইত্যাদি-ইত্যাদি; অর্থাৎ যে-পদ্ধতিটা হবে সৎ, সহজ, সোজাসুজি, সাধারণ। অবশ্য ভাবতে বসলে যে গণ্ডগোল জাগবে না তা নয়, কারণ সততা বস্তুটা কী, সে-সম্বন্ধেই প্রথমত নিঃসন্দেহ হওয়া দুষ্কর মনে হতে পারে—কারণ কালানুক্রমিক কোনো বিবরণ খাড়া করতে গেলেই বাইরে থেকে একটা বিশেষ প্রয়াস ও তাই একধরনের এক কৃত্রিমতা এসে যেতে বাধ্য; কারণ সে-ক্ষেত্রে আগে-পরের ঘটনাগুলোকে যথাযথ সাজাতে বসতে হয়, আগের সূত্রের সঙ্গে পরের সূত্রের যোগস্থাপনের জন্যে কখনো-কখনো এক অত্যধিক কসরতও করতে হয়। এটা হয়, যেহেতু জিনিসটা যখন ঘটে ও যখন সেটাকে লিপিবদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে, একটা সময়ের ব্যবধান অনতিক্রম্য কোনো দেয়ালের মতো এই দুটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে, এবং তাই ঘটার সময় যে-ঐক্য বা সূত্র স্বাভাবিক ছিল, সাবলীল ছিল বা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, লেখার সময় তাকে মনে হতে পারে কষ্টপ্রসূত ও তাই কৃত্রিম ও তাই এককথায় হয়তো কিছুটা অসৎও। এবং এই যুক্তিতে সেটা আর ততটা সৎ থাকল না, সেটা আর ততটা সহজও থাকল না, সাবলীলও থাকল না, সাধারণও থাকল না—বরং ঠিক উল্টোই হয়ে দাঁড়াল। আমাদের আজকের পালার বিষয়টার কথা যদি ধরি তো সে-ক্ষেত্রে এরকম একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়তো আরোই শক্ত ঠেকবে—শুধু শক্তই না, অস্বাভাবিক ঠেকবে—কারণ স্মৃতির বিভিন্ন পর্যায় হতে কিছু-কিছু ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে নির্বাচন করে পরে তাদের কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করতে চাওয়ায় যে-অত্যধিক এক কসরত কখনো-কখনো পরিলক্ষিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলুম একটু আগেই, এখানে সেই কসরতটি তখন সীমাবদ্ধ থাকছে না মাত্র একটি লোকের মধ্যে, যেমন শুধু আমার বা শুধু বৃন্দাবনের বা শুধু কনক ইত্যাদির মধ্যে, উল্টে তাকে ছড়িয়ে পড়তে হচ্ছে সমানভাবে সকলেরই মধ্যে। তাছাড়া আরো জটিল যা, তা তখন সেই কসরতটা আমরা সকলে একসঙ্গে করছি না—যেমন করে অনেক কুলিমজুরে মিলে একটা প্রকাণ্ড ভারী জিনিস ঠেলে, হেঁই-মারো হেঁই-মারো বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে—বরং সে-কসরতটা তখন আমরা প্রত্যেকে করছি একলা-একলা, যে-যার নিজের মতন করে। কারণ কনক সাজাচ্ছে তার স্মৃতি, তুমি সাজাচ্ছ তোমারটা, আমি সাজাচ্ছি আমারটা, এবং এইভাবে নীরবতার অন্তরালে যখন সাজানো হয়ে গেছে যার-যার নিজের মালপত্রগুলি, একমাত্র তখনই আমরা পারব সমবেত এক প্রচেষ্টায় সেগুলিকে একটি-একটি করে উদ্‌ঘাটিত করতে উপস্থিত ঐই ভদ্র-মণ্ডলীর একাগ্র দৃষ্টির সামনে, এই লণ্ঠনের আলোছায়া আলোয়, এই মঞ্চের উপরে। একমাত্র তবেই-না পারব সেই ঐক্যের সঙ্গীতটি ধ্বনিত করতে, সেই সুষমার রশ্মিতে শ্রোতা-বা-কথক কি

দৃশ্য-বা-দ্রষ্টা আমরা সকলে বিচ্ছুরিত হতে! নইলে হবে ব্যর্থতারই পসরা সাজানো; এবং সে-ব্যর্থতার রূপটা তখন কেমন হতে পারে, তার একটা সামান্য উদাহরণ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা চলে। ধরুন আমরা অন্যেরা কেউই নই, শুধু কনক একলাই সাজিয়েছে তার ব্যাপারটাকে, সুরু হতে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত, মাঝের কোন্-কোন্ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা এ-বিবরণে উল্লেখযোগ্য বলে ঠেকেছে সেগুলিকেও তার কালানুক্রমিক খেপে-খেপে যথাযথ প্রাধান্য দিয়ে রেখেছে এমন নাগালের মধ্যে যে দরকার পড়েছে কি হাত বাড়িয়েছে, আর হাত বাড়িয়েছে কি জিনিসটা ছুঁয়েছে, এবং ছুঁয়েই সেটাকে টেনে এনে ঠিক যেখানে বসানোর সেখানে বসিয়েছে, যেটা বৃন্দাবন, তুমি করোনি বা লোকনাথ, আমি করিনি; ও ফলে হয়তো যখন পাত্রপাত্রী সকলে এসে দাঁড়িয়েছি মঞ্চে, পরস্পর পরস্পরের চোখে তাকিয়ে বুঝে নিয়েছি মুখ খোলার সময় হয়েছে, তখন আমিই যেহেতু প্রথমে মুখ খুলছি, শুরু করে দিলাম সোনপ্রয়াগ-না-কী-যেন-সেই-জায়গাটায় তাড়াহুড়োয় প্রত্যুষের অন্ধকারে আমার পা পিছলে পড়ে-যাওয়ার ঘটনাটা, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাগ্যিস টর্চটা নিয়ে ধ্রুব রুদ্র বেরিয়ে এল, নইলে ভগবানই জানেন কী হত...যাকগে, যা হত তা হত, কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে এ-ঘটনাটা হঠাৎ এভাবে উল্লেখ করায় যে-কনক এমন পাঁয়তাড়া কষে মঞ্চে এসেছিল, তার অমন সাজানো সৌধটিকে কি আমি নিমেষে ভূমিসাৎ করে দিলাম না? এবং এখানে এটাও মনে রেখো, ঘটনাটা যে অতর্কিতে এমন পেড়ে বসলুম তা আমার কোনো নিছক স্বার্থান্ধতার দরুন নয়, অন্ধকারে পড়ে যাওয়ার ফলে যেহেতু আমি-নামক ব্যক্তিটির চোট লাগল সেই কারণেই নয়, বরং আমি ভিন্ন পাত্রপাত্রীদের মধ্যে অন্তত আরো একজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল জানি বলেই মনে হল যে এটা হয়তো আরম্ভ হিসেবে সংলাপের একটা সূত্র আমাদের দিতে পারে এবং তাই বলে বসলাম, বলো তো ধ্রুববাবু, কী-কাণ্ডটাই না হল সেদিন!

কিন্তু মুস্কিলটা যা হচ্ছে এখানে, তা আমার ধ্যানধারণাগুলোকে আমি যেহেতু আগে থেকে সাজাইনি, এভাবে এমন একটা উক্তি করে বসায় তাই বিবরণটিকে এখন কোন্ পথে যেতে হবেই, বা বরং কোন্ সর্ব পথহীন জটিল অরণ্যের মধ্যে এখন তাকে বারে-বারে দিকভ্রান্তই হতে হবে, সেই নির্দেশটাই দিয়ে দিলাম। এবং এতে যে-কনক এমন তৈরী হয়ে এসেছিল, শুধু তারই যে সব পরি-কল্পনা বানচাল করে দিলাম তাই নয়, ধ্রুবকেও হঠাৎ অগাধ জলে হাবুডুবু খেতে বাধ্য করলাম; কারণ হতে খুবই পারে যে গোড়ার সংলাপ হিসেবে ঐ ঘটনাটির যোগ্যতা ওর কাছে প্রকট তো নয়ই, বরং তাকে ওর নেহাত তুচ্ছ বলেই মনে হয়। কিন্তু তুচ্ছ হোক বা না হোক, এখন ফেলে তো তোমায় দিয়েছি, হয় হাবুডুবু খাও নয়তো সাঁতার কেটে হোক বা অন্য যে-কোনো প্রকারে হোক দ্যাখো কী করে পার পেতে পারো—অর্থাৎ ধ্রুবের প্রতি ভাবখানা যেন আমার এমনই। কনক তখন বলবে, অন্তত বলা উচিত ওর, যেহেতু আমাদের মধ্যে একমাত্র ও-ই যথারীতি আগে-পরের ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসে ও আমার একটিমাত্র উক্তিতে ওর সেই সব প্রস্তুতি লণ্ডভণ্ড করে দিলাম, ও তখন তাই একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলবে, দাঁড়াও-দাঁড়াও, কোত্থেকে কোথায়, আগে গোড়ার কথাটা বলো! এবং ধ্রুবও যেহেতু ততটা প্রস্তুত ছিল না, ও-ও তাই বরং সায় দিয়ে বসবে কনকেরই কথায়, যদিও আমারই মতন ওরও মনে আসেনি কোনো কালানুক্রমিক পরম্পরার প্রশ্ন বা এ-প্রসঙ্গে তার বাঞ্ছনীয়তা কতখানি—অর্থাৎ আমি না হয়ে যদি কনকই সুরু করত কাহিনীটা, এবং গোড়াতেই পেড়ে বসত ওর মতে কালানুক্রমিক অর্থে যেটা হওয়া উচিত যাত্রার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিন্দু তাহলেও কিন্তু ধ্রুব কিছু কম অপ্রস্তুত বোধ করত না। তবু তা সত্ত্বেও এবার আমার বিপক্ষে ঐ

কনকের কথাতেই ও সায় দিতে যাচ্ছে কেন? কারণ এসব ক্ষেত্রে সচরাচর এরকমই ঘটে থাকে, ও যে প্রস্তুত নেই এবং দেখছে কনকও ওর মতনই সমানই অপ্রস্তুত, তাতে ওর অপ্রস্তুতি হতে রেহাই পাওয়ার ও একটা অজুহাত পেয়ে গেল, এবং তাই কনকের কথাটা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, আরে যা-যাঃ, সুরু করবার মতো এটা কি একটা প্রসঙ্গ হল, দূর-দূর! উভয়ের ঐ আকস্মিক ও আমার পক্ষে সম্পূর্ণঅপ্রত্যাশিত প্রতিবাদে আমাকেও তাই খানিকটা হকচকিয়ে যেতেই হল—হল কিনা?—এবং টাল সামলাতে না পেরে তখন আমিও হয়তো বলে ফেললাম, ও-হো-হো, বুঝেছি-বুঝেছি, এটা ঠিক হচ্ছে না, না? তবে ধরো সেই ঘটনাটা দিয়ে সুরু করলে কেমন হয়?—বলেই আকাশ-পাতাল ভাবতে বসি কোন্ বিশেষ ঘটনাটার কথা পাড়া যায় তবে এবার। শ্রোতা যারা আকুল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, আমাদের কথাগুলো গিলে খাচ্ছিল, এতক্ষণে তারা আস্তে-আস্তে আগ্রহ হারাতে সুরু করেছে, অস্বস্তি বোধ করছে, কেউ হয়তো নিজের হাঁ-করা মুখের সামনে হাতটাকে এনে সশব্দে হাই তুলেই বসল—এবং তাদের সেই প্রতিক্রিয়ার জন্যে তখন দোষী যদি কেউ হয় তো তা আমরাই। কারণ মঞ্চে নেমেই আমাদের প্রাথমিক কর্মটি যা হয়েছে, তা সর্ব-সমক্ষে আমাদেরই পারস্পরিক একটি মতানৈক্যকে প্রকট করে তোলা, গোড়াতেই সেই বিভ্রান্তি ও উলটপালট, যার ফলে শ্রোতা যারা প্রত্যাশা করে আসে যে শুনবে মহান ঐক্যের কোন্ এক সুর বা মানুষের ব্যথিত অন্তরের কোন্ গম্ভীর নিনাদ, এখন তারা নিজেদের মধ্যে স্বভাবতই তাই চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে, জানতে চায় পালার বিষয় কি তবে ব্যঙ্গ বা নিছক প্রহসনই একটা? আমরা তখন তিনজন বা চারজন যারা মঞ্চে আছি, মাথার চুল ছিঁড়তে থাকি, ভাবি সন্ধ্যাটিকে এখনো রক্ষা করা যায় কিনা।

বন্ধুগণ, হে ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, জানবেন সময়ের এক ভয়াবহ অভাবের মধ্যে যুদ্ধ করছি, তাই কার্যক্রম এখনো আরম্ভ না করতে পারার জন্য মার্জনা চাওয়ার মতো মুখ আমার নেই; তবু এমনই আত্মাভিমানী আমি, এমনই তুচ্ছ এক নারকী কীট যে নিজের সমস্ত অসামর্থ্যগুলো এমন প্রকটভাবে সকলের সামনে যখন তুলে ধরছি, তখনো চাইছি শ্রোতা ও দর্শকদের অনুকম্পা-সহানুভূতি, এমন-কি এখনো যদি পারি নিজের সপক্ষে কিছু বলার তো সে-যুক্তি মরীয়া আবেগে টেনে চলতে ছাড়ছি না। বিরাট ধর্ম-মন্দিরে নতজানু ভক্তদের সামনে প্রার্থনার সঙ্গীত আরম্ভ হোক, লাল-নীল প্রকাণ্ড কাঁচের জানালা ভেদ করে নবারুণ-রশ্মি আমাদের মুখচোখ উদ্ভাসিত করুক, আমরা অবশেষে পার পেয়ে যাই এই দৈন্য হতে, নীচতা হতে, রিক্ততা হতে, আমার মতো পশুদের এই আত্মাভিমানের গ্লানি হতে। হ্যাঁ-হ্যাঁ নিছকই পশু যে, আমি আত্মাভিমানী যে, তাই দেখুন-না এখন বোঝাতে চাচ্ছি কেন সেই আমার হঠাৎ পিছলে পড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা পাড়তে চেয়েছিলাম—আরে ঐ তো সেইটা, ভুলে মেরে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই? বলছিলাম-না যে হয়তো আমি হঠাৎ সুরু করে দিলাম সেই সোনপ্রয়াগ-না-কী-যেন-জায়গাটার ভিতরের অন্ধকারে আমার পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা দিয়ে? এবং সেটা শুনেই প্রথমে কনকের ও পরেই ধ্রুবের এক সম্ভাব্য আপত্তির উত্থাপন—কী, এবার মনে পড়ছে? হেন প্রসঙ্গের কথা কী করে জাগতে পারল আমার মনে, এবার হাতজোড় করে নিজের সপক্ষে সেই যুক্তিটার কথা বলছি। খেয়াল করে থাকলে আপনারা নিশ্চয় ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে আমারই হোক বা অন্য কারুরই হোক, উঁচু থেকে তলার দিকে পড়ে যাওয়ার যে-কোনো স্মৃতি যা সম্ভাবনার প্রতি আমার একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, যেন প্রসঙ্গটা আমায় টানে চুম্বকের মতো। বলা যায় না, হৃদয়ের নিভৃত স্বপ্ন হতে, বহুকালের এক কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হতে এই-যে বিরাট

ভয়ংকর পতনটা আমাদের সম্প্রতি ঘটেছে, হয়তো তারই কারণে যত কথা বা তুলনায় প্রসঙ্গ এখন জাগছে আমার মনে, তার সবই উঁচু হতে নিচুর দিকে পড়ার একটা ঘটনা বা সম্ভাবনা নিয়ে। আপনাদের মনে পড়বে খাদের কিনার ঘেঁষে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ধ্রুবের ছবি তোলা ও তজ্জনিত প্রতিবারই আমার এক বিচিত্র ভয় নিয়ে এই-তো কিছুক্ষণ আগেই কী আলোচনাটাই-না আমি করেছি! মনে পড়বে, হাউজ্-খাসে একইভাবে ছবি তুলতে গিয়ে ফরাসী ফোটোগ্রাফারটির পড়ে যাওয়া ও মৃত্যুর ঘটনা—এবং ঐ হাউজ্-খাসেই আমাদের এক অল্প-পরিচিত স্থপতি ভদ্রলোকের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার বৃত্তান্তটি। অতএব বুঝছেন তো, কোন্ ইঙ্গিতটা করতে চাচ্ছি তবে এখানে? আর সেটা যদি বোঝেন তো আশা করা নিশ্চয় চলে যে মার্জনাও তাহলে আমায় করছেন। আমি আগাগোড়া ব্যাপারটাকে আগে থেকে মনে-মনে খাড়া করে নিয়ে আসিনি, ভাবিনি জিনিসটার সুরু কোথায় মধ্য কোথায় শেষ কোথায়, অন্তত সেই সুরু-মধ্য-শেষ সম্বন্ধে নিজের মনে ধারণাটা স্পষ্ট থাকলেও এই বিশেষ অবকাশের জন্য তা নিয়ে মাজা-ঘষা কিছু করিনি, আসলে জিনিসটাকে যে এমন পরম্পরা অনুযায়ী কালানুক্রমিকভাবেই উপস্থাপিত করতে হবে তেমন চিন্তা পর্যন্ত জাগেনি একটিবারের জন্যেও—এদিকে দ্যাখো, সূত্রধার হয়ে বসে আছি, আরম্ভের ভার আমার! তাই বলা বাহুল্য, একটা কিছু দিয়ে আরম্ভ করতে হবে যখন জানি তখন যে-ভাবটা মনের উপরিভাগে দুধের সরের মতো ভাসছিল সেইটেই পেড়ে বসলাম, বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করে কনককে বললাম, কী-কাণ্ড সেদিন সোনপ্রয়াগে, অ্যাঁ, ঐ ভোরের অন্ধকারে কী-পড়াটাই না পড়লাম!

আমার মনে হয়, আমাদের সম্ভাব্য প্রথম পদ্ধতি বলে যেটাকে অভিহিত করেছি কিছুক্ষণ আগে, বর্তমান উপলক্ষের পক্ষে তার ব্যবহারের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে এখন আমাদের কারুরই মনে আর কোনো সন্দেহই থাকা উচিত হবে না। এবং সন্দেহহীন সেই সিদ্ধান্তটি হল এই যে, যে-তিনজন বা চারজন আমরা মনোনীত হচ্ছি মঞ্চে থাকার জন্য, তাদের প্রত্যেকেই যদি ঐ একই কালানুক্রমিক পদ্ধতিটিতে আগে থেকে রীতিমতো প্রস্তুত না হয়ে এসে থাকি তো বিনা বাক্যব্যয়ে এবার সেটিকে আমাদের বিবেচনার বহির্ভূত করতেই হবে, নইলে যেমন আমাদের তেমনি সামনের এত শ্রোতা ও দর্শকের এক উত্তরোত্তর বিভ্রান্তিরই খোরাক জোগাবো।

বাকী রইল দ্বিতীয় পদ্ধতিটি, এবং বন্ধুগণ, সেইটিই হল আমার তুরুপের তাস। আমি বলি কি, সুরু করা যাক একেবারে শেষ ঘটনাটা দিয়েই, মানে সেই সর্বনাশেরই ঘটনাটা দিয়েই, কেমন? ধ্রুব রুদ্র. ধরো যে-তুমি ছড়িটা সমানই দুলিয়ে চলেছিলে, আগের অনেক ভীতিজনক ইঙ্গিত সত্ত্বেও, কিন্তু সেই তোমারই যে-ছড়ি সহসা অচল হয়ে গেল যখন আমরা অবশেষে মুখোমুখি গিয়ে পড়লাম জিনিসটার সামনে, সেই পৃথিবীর ছাদের একটু অংশের এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর সহসা অতিরিক্ত রিক্ত আমরা কয়েকটি মানুষ, অর্থাৎ যখন ইঙ্গিতের প্রশ্ন নেই আর, নিষ্ঠুর সত্যই ন্যাংটো হয়ে নাচছে চোখে ও দৃশ্যের ভয়াবহতার জন্যই যে-চোখের দৃষ্টিও অচিরেই ঝাপসা হয়ে আসছে, ধরো ধ্রুব রুদ্র, কনক বা বৃন্দাবন, ধরো আমাদের আজকের এই আরম্ভ হিসেবে সেই মুহূর্তটিকেই আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হলুম? সব অবগুণ্ঠন-মোচন, সমস্ত সন্দেহ-ভঞ্জন, সবেমাত্র দেখেছি আমরা দৃশ্যটা, দেখছি, অ্যাঁ? কে কেমন দেখলাম, এবং দেখেই কার কী ভাব বা অনুভূতি জাগল না-জাগল, অ্যাঁ?

• জোর করছি না, ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি না—ভেবে দ্যাখো তোমরা; পছন্দ হলে নাও, নয় ফেলে দাও। নয় না-হয় নিজেরাই ভাবো অন্য কিছু, ফিকির-ফন্দী, ভাব বা ভঙ্গী, ছল বা কৌশল—এবং

আমাকে তেমন-তেমন নির্দেশ দাও, আমি আরম্ভটাকে সেইভাবেই খাপ খাইয়ে নেব, অবশ্য তখনো যদি চাও আমিই থাকি সূত্রধার, আমিই আরম্ভ করি।

এমন প্রস্তাব পাড়ছি কেন, তার সপক্ষে আমার নিজের যুক্তিটা বলে নিই, এবং সে-যুক্তিটার মোটামুটি তিনটে অংশ। এক, ঘটনা বলতে যা আছে আমাদের, তা একমাত্র সেইটাই; তা আমাদের বাড়ি থেকে বেরোনো নয়, আজ এখানে পৌঁছনো নয়, এই শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলীর সামনে এমন হাত-পা নাড়ানো নয়, এমন-কি আমাদের এই আগাগোড়া যাত্রাটাও নয়। দুই, এইটেই যেহেতু মুখ্য ঘটনা, না-না মুখ্য নয়, পুনরুক্তি হলেও বলছি একমাত্র ঘটনা যা আমাদের সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তাই এইটে ধরে আরম্ভ করলে আমার তো মনে হয় আমাদের বৃত্তান্তটা আপনা থেকেই একটা ঐক্য অচিরেই পেয়ে যাবে। তিন, এই ঘটনাটা বলব বলেই তো এসে দাঁড়িয়েছি এখানে—এখনো যদি সেটা না বলি তো শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কী, রাজী সকলে? চমৎকার। তবে হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, বিরতির মুহূর্ত শেষ—পালা আরম্ভ হচ্ছে। এবং বিরতির মুহূর্ত হলেও আমাদের সব বাক্যালাপই যেহেতু আপনারা অধীর আগ্রহে শুনছিলেন বসে-বসে, তাই অনুমতি যদি করেন তো ধরে নিই আমার সূত্রধারের কর্তব্য ইতিমধ্যেই পালিত হয়েছে—এবং যেটা বলে মিথ্যা কিছু বলছি না, বরং অতীব এক সত্য কথাই বলছি, কারণ পাত্রপাত্রীদের পরিচয়ই বলুন বা কী ঘটতে চলেছে না-চলেছে তার ইঙ্গিতই বলুন, অনুরূপ তাবৎ প্রসঙ্গের অবতারণা নানাভাবে একাধিকবার করা হয়ে গেছে, এখন মঞ্চ ছেড়ে দিই এই ধ্রুবের হাতে, কনক ও বৃন্দাবনের হাতে। আমি রইলাম, ইচ্ছে বা সময় হলে হয়তো দেখবেন যোগ দিচ্ছি পাত্র হয়েই—এবং শুধু আমিই-বা কেন, আমাদের সকলেই রইল, মেয়েরা পর্যন্ত, এমন-কি হয়তো হে শ্রোতামণ্ডলী, আপনাদেরও কেউ-কেউ, যোগ দিতে কারুরই বাধা নেই।

ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্। আরম্ভ। সামনে সেই বিকট দৈত্য।

তার আগে, এই গড় হলাম। এ-কথার উচ্চারণে, এ-ক্রিয়ার কারণে স্ফূর্তির স্রোতস্বিনী আমাদের শিরায়-শিরায়, মধুবাত আমাদের অন্তরের অরণ্যে।

কে বলবে?

আমি বলছি। আমারই নাম কনক, জানেনই তো। লোকনাথের মতো কেতাদুরস্ত নই, অত ঢঙ জানি না; তবু বলছি, হে ভদ্র মহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সমবেত জনমণ্ডলী, এই গড় হলাম।

হ্যাঁ, মোড়টা যেই নিয়েছি, মানে শেষ মোড়টা, মানে সেই মোড়টা যেটা একবার নিলেই গিয়ে পড়ছেন হঠাৎ অনন্ত আকাশের তলায়, দেখি যে-আশঙ্কা করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে তা সত্যি। দেখি হঠাৎ পোড়া কয়লার সেই স্তূপ.........

—আমি বলছি। আমারই নাম ধ্রুব, জানেনই তো। এই গড় হলাম। না কনক, পোড়া কয়লা ততটা নয়, আমি বলব গন্ধকের পাহাড়.........

—আবার আমি লোকনাথ, ক্ষমা করবেন। আসলে তোমরা দুজনেই ঠিক, কনক ও ধ্রুব রুদ্র, কারণ পোড়া কয়লাও বটে গন্ধকও বটে.........

—আমি বৃন্দাবন, এই গড় হলাম। কয়লাও নয়, গন্ধকও নয়, আমি বলব চাঁদের পৃষ্ঠের যেসব ছবি আমরা সম্প্রতি দেখেছি, এখানে হাঁ ওখানে হাঁ, এক খটখটে কুৎসিত রুক্ষতা, অনেকটা যেন সেইরকম।

—হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের কথাটাই সত্যি। দূরে দিক হতে দিগন্তে পরিব্যাপ্ত সেই ভয়ংকর বিরাটের নানা অংশ আছে, তাছাড়া আছে সেইসব অংশের উপর সূর্যালোকের খেলাও, তা তাই কোথাও গন্ধক, কোথাও-বা পোড়া কয়লা, কোথাও চাঁদের পৃষ্ঠতল। কিন্তু এটাকে আমরা তর্কের বিষয় করছি না, বড় কথাটা আমাদের বিস্ময়, আমাদের সেই হঠাৎ টুঁটি-টিপে-ধরা নৈরাশ্য......

—নিশ্চয়, নিশ্চয়; কিন্তু কনক, ঐ নৈরাশ্যটাকে তোমার কি খুব হঠাৎ বলে মনে হল? জানো আমি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই......

—আরে বাবা, লোকনাথ, এখন তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই! নিশ্চয় তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই। আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই—প্রথমেই বললাম না?

—তোমাদের দুজনের কথা জানি না, আমি কিন্তু বাবা অনেকক্ষণ থেকে নয়।

—তোমার কথা ছেড়ে দাও ধ্রুব রুদ্র, তুমি একটি অতীব আশাবাদী, তুমি একটি অতীব সরল প্রকৃতির লোক। তুমি কোম্পানির কাজ করো......

—কোম্পানির হয়ে ক্রিকেট খেলো...

—তুমি হাতে ছড়ি ঘোরাও...

—তুমি মাথায় টুপি পরো...

—তুমি কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝোলাও...

—তুমি খাসা এক গোঁফ-যুগল সমন্বিত...

—এবং গোঁফের উপরেই নাকখানিও তোমার সমানই মিলিটারি...

—এবং নাকের উপরই মোটা-ফ্রেমের কালো-কাঁচের চশমা...

—কী, কালো চশমা পরেছি বলে টিটকিরি কাটা হচ্ছে! বেশ করেছি চশমা পরেছি, তোমার তাতে কী? তুমি পরোনি? তোমরা পরোনি? কই, আমি তখন কিছু বলতে গেছি?

—আ-হা-হা ধ্রুব রুদ্র, আস্তিন গোটানোর কোনো দরকার নেই। মানছি, তোমার প্রতি এই একটার পর একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত বিশেষণগুলোর প্রয়োগ খুব উচিত কর্ম হয়নি, বরং আমাদের পক্ষে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছিল—কারণ তুমি ঠিকই বলেছ, কালো চশমা আমরা কে পরছি না? এ-যাত্রায় সকলকেই পরতে হয়, নইলে চোখ ঝলসে যায়।

—আসলে ধ্রুব সম্বন্ধে বলছিলাম যেটা, তা ওর ঐ টুপি আর ছড়ি আর চশমা আর হ্যানো-ত্যানো নিয়ে মানুষটি সম্বন্ধে এমন একটি সম্পূর্ণ ছবি জেগে ওঠে...

—আবার কনক! আমাকে যদি সূত্রধার করে থাকো তো কথা মানতেই হবে, এ-প্রসঙ্গের ইতি টানতেই হবে। আমরা সব ছেড়ে দিয়ে এখন একে-অন্যকে কি যা-তা বলতে সুরু করব?

—মাপ করো লোকনাথ, মাপ করো ধ্রুব, এই হাতযোড় করছি। আসলে যা-তা বলার অভিপ্রায় আমার একেবারেই ছিল না—বৃন্দাবন, নিশ্চয় তোমারও ছিল না, কারণ তুমিও তো নাকটা মিলিটারি বললে?

—বলা বাহুল্য না, একেবারেই না, যা-তা বলতে যাব কেন? ঠাট্টা করছিলাম।

—আসলে ঠাট্টাও ততটা নয়। কথাগুলো উঠল ওরই একটা কথার উত্তরে—কারণ ও কেন বলতে গেল ওর কিছুই মনে হচ্ছিল না?

—বা-বা-বা, তোবা-তোবা! এমন কথা আবার আমি কখন বলতে গেলাম?

—সে কি, বলোনি! আশ্চর্য! একটা টেপ-রেকর্ডার থাকলে বাজিয়ে তোমায় শুনিয়ে দিতাম।

—দূর, টেপ-রেকর্ডারের দরকার কী, এই-তো এত শ্রোতা-দর্শক বসে আছেন, এঁরাও শুনেছেন। একবার জিজ্ঞেস করেই দ্যাখো না!

—বেশ, আমি ধ্রুব রুদ্র, আমি তোমাদের আহ্বান মেনে নিচ্ছি। অতএব হে ভদ্র মহোদয়গণ, হে মহিলাগণ, সমবেত জনমণ্ডলী, আপনারা যাঁরা সকলই শুনছেন তাঁরা বলুন আমি কি একবারের জন্যও বলেছি আমার কখনো কিছুই মনে হচ্ছিল না? উল্টে যা বলি তা কি শুধু এইটুকুই নয় যে আমি কনকের মতো নই, আমি লোকনাথের মতো নই, আমি বৃন্দাবনের মতো নই?

—আ-হা-হা, ধর্মের অবতার এলেন গো! ন্যাকামি রাখো ধ্রুব রুদ্র, আর অমন করে সমবেত জনমণ্ডলীর দোহাই পাড়তে হবে না, কারণ এখন যা বললে তুমি, সেটা একটা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা।

—মিথ্যা কথা?

—নয়তো কী? কখন তুমি বলতে গেছ তুমি আমার মতো নও, তুমি কনকের মতো নও, তুমি লোকনাথের মতো নও?

—এবং সেটা যদি বলেই থাকো তো তা বলে কী এমন আহামরি কথামৃত ছাড়ছ বাপু?

—তাছাড়া সেটা ধ্রুব বলেনি, সুতরাং প্রশ্নটাই ওঠে না।

—জানি, জানি। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে সেটা যদি ও বলেও থাকত তো সে-ক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয় এমন হত না যা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—এবং তর্ক যেহেতু উঠেছে, তার মানেই কথাটা ও বলেনি। ব্যস্, ফরিয়ে গেল—প্রমাণ তো রয়েছে হাতে-হাতেই।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, ঠিক কী বলতে চাচ্ছ একটু বুঝতে দাও আমাকে।

—এতে এমন বোঝাবুঝির কিছু নেই ধ্রুব রুদ্র। ঐ আমরা বলাবলি করছিলাম না যে তুমি একটি অতীব সরল প্রকৃতির লোক? সেইটেই আরো একবার প্রমাণিত হল।

—অর্থাৎ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার একটা টিটকিরি কাটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র সম্বন্ধে, ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এইরকম, তাই তো?

—কী সর্বনাশ! কোত্থেকে কোথায়! সরল প্রকৃতির লোক বললে কাউকে অপমান করা হয়?

—শোনো ধ্রুব, জটটা একটু খোলার চেষ্টা করা যাক, অ্যাঁ?

—বেশ তো, বলো না, আমি কান খাড়া করেই রয়েছি।

—তুমি বললে, জনমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে দোহাই পাড়লে, যে খানিকক্ষণ আগে যা তুমি বলেছিলে তা শুধু নাকি এই যে তুমি লোকনাথের মতো নও, তুমি বৃন্দাবনের মতো নও, তুমি আমার মতো নও। সত্যি?

—সত্যি।

—তাহলে এখানে আমাদের কথা হল এই যে নিশ্চয়, বলা বাহুল্য, তুমি আমাদের তিনজনের কারুরই মতো নও। কে বলতে গেছে যে তুমি আমার মতো বা তুমি লোকনাথের মতো বা তুমি বৃন্দাবনের মতো? আমরাই-বা কি কেউ বলতে যাচ্ছি তোমাকে যে আমি তোমার মতো নই বা লোকনাথ তোমার মতো নয় বা বৃন্দাবন তোমার মতো নয়? এবং বলা বাহুল্য, যেটা আমরা কেউই নিশ্চয় নই। কী লোকনাথ, একমত?

—বলা বাহুল্য।

—বৃন্দাবন?

—বলা বাহুল্য।

—শুধু তাই নয় ধ্রুববাবু, আমিও লোকনাথের মতো নই, বা বৃন্দাবনের মতো নই...

—যেমন আমিও বৃন্দাবনের মতো নই, বা কনকের মতো নই—আমি লোকনাথ।

—আ-হা-হা, এটা তো অতি সত্য কথা—এ নিয়ে কে তর্ক করছে? এই তোমরা বললে যে আমাকে সরল প্রকৃতির লোক বলে যদি অভিহিত করে থাকো তো তা আমাকে টিটকিরি কাটার জন্যে নয়। কিন্তু এখন ক্রমশই যেসব প্রসঙ্গ পাড়ছ তাতে তো মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কিছু হিসেবেই আমাকে তোমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও।

—লাও ঠেলা! এটা আবার কখন বলা হল, বা ভাবা হল! মনে হচ্ছে, তোমার পরিচয় পেতে এখনো আমাদের রীতিমতো বাকী রয়েছে।

—মানে?

—মানে তুমি হয়তো জ্যোতিষীও, যেটা আজ পর্যন্ত জানতাম না। কী লোকনাথ, জানতে নাকি?

—না।

—বৃন্দাবন?

—আমি না।

—আশ্চর্য, আশ্চর্য! শ্রীমান কনক, তুমি তো দেখছি ভয়ংকর লোক হে! শেষকালে আমার নিজের সম্পূর্ণ পরিচয়টা কী, সেটা দেখছি এখন তোমার কাছেই শিখে নিতে হবে! এবং লোকনাথ ও বৃন্দাবন, তোমরাই-বা কী, ও যা-খুশি বলবে আর সব ব্যাপারেই ওকে এমন মদত দিয়ে যাবে তোমরা?

—না-না, মদত-টদতের কোনো প্রশ্ন এখানে নেই...

—বাজে ব'কো না বৃন্দাবন, নিশ্চয় প্রশ্ন, আলবত প্রশ্ন। আমার তো মনে হচ্ছে একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সৃষ্টি করছ তোমরা, একদিকে কুরুপক্ষ অন্যদিকে পাণ্ডবপক্ষ, বা শুধু অর্জুনই, সারথিবিহীন।

—অর্থাৎ সেই অর্জুনটি তবে তুমি, আমাদের শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র, এই তো? বাঃ, বেছে-বেছে ভূমিকাটি নিয়েছ সুন্দর—কে বলে তুমি সরল প্রকৃতির?

—আমাকে বলছ বাঃ! তোমাদেরই বাহবা দেওয়া উচিত আমার। কারণ আশ্চর্য কৌশলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চলেছ একটার-পর-একটা, তীরের পর তীরে বিধ্বস্ত হচ্ছি, একটু নিশ্বাস নিই সে-সময়ও দিচ্ছ না।

—আহা রে, আমাদের বৎসটিকে এবার আমরা শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেই বুঝি ফেললাম!

—অতএব শরণ নিচ্ছি এখন আপনাদের—হে ভদ্র মহোদয়গণ, মহিলাগণ, বিচারের ভার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

—মাপ করো, এবার সূত্রধারকে মাথা গলাতেই হচ্ছে। এ কী ছেলেমানুষি হচ্ছে আমাদের, অ্যাঁ? রকমসকম দেখে শ্রোতারা এবার আস্তে-আস্তে উঠে যেতে থাকবে। বোঝবার চেষ্টা করো ধ্রুব রুদ্র, এ-সভা ডেকেছি আমরা, আমাদের বৃত্তান্ত শোনবার জন্যেই এই নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত। এদিকে শুরু হতে-না-হতেই বৃত্তান্ত চুলোয় যাচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে আমরা বিচিত্র বচসার সূত্রপাত করছি, এবং স্বপক্ষে সাক্ষী মানার জন্যে কেবল দর্শকদের দোহাই পাড়ছি। হে তাত, উচিত কি তব এ-কাজ?

—ন্যাকামি রাখো লোকনাথ। সাক্ষী মানতে আমার বয়ে গেছে। তুমি যদি সূত্রধার তো তোমার বোঝা উচিত, আমাদের মধ্যে একজন অথবা আরেকজনকে নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করা কিংবা একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগানো, এ-সবের কোনো অধিকার তোমার নেই।

—ভালো রে ভালো! আমি পক্ষপাতিত্ব করছি! আমি একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছি? না, এ অভিযোগ নীরবে মাথা পেতে নেওয়া চলে না। কনক, তোমার কিছু বলবার আছে?

—কী বলব? এ-ধরনের অভিযোগ যে উঠতে পারে, তোমার বিরুদ্ধে বা আমার বিরুদ্ধে বা আমাদের যে-কোনো কারুর বিরুদ্ধে, সেটা আমার কাছেও কিছু কম প্রহেলিকা ঠেকছে না। কী হল আজ ধ্রুবের?

—এবং তুমি বৃন্দাবন, ধ্রুবের এই অভিযোগ সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে চাও?

—কনক যা বলল তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

—তাহলে দ্যাখো ধ্রুববাবু, এবার তুমিই বিচার করো।

—আমার আর বিচারের কী আছে! আমার বিরুদ্ধে তোমরা সকলে লেগেছ, এটা তো স্পষ্ট। এবং তুমি যেহেতু সূত্রধার, তোমার কাছ থেকে আমি আরেকটু নিরপেক্ষ ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলাম, এবং সেটা পাচ্ছি না দেখেই দর্শকদের শরণাপন্ন হই—দেখতে চাও তো তুমিই দ্যাখো, এখনো দেখার সময় আছে।

—আমি সবসময় দেখতে প্রস্তুত আছি। তার আগে বলো, অভিযোগ যে করলে আমরা সকলে একজোট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে লেগেছি, দৃষ্টান্ত কিছু দিতে পারো?

—ক'টা দৃষ্টান্ত চাও?

—আহা, একটা দিয়েই শুরু করো-না!

—বেশ, সর্বশেষটাই দিচ্ছি। এই-যে কনক আমায় জ্যোতিষী বললে হঠাৎ?

—কী ছেলেমানুষ তুমি ধ্রুব, সত্যি! জ্যোতিষী বলল তো কী হয়েছে? তাতে এত রাগবার কী আছে? আমার তো চিরকালই তোমাকে একটা বেশ হাসিখুশি মানুষ বলে মনে হয়েছে—যাওয়ার পথে মনে পড়ে তুমি প্রায়ই এটা-ওটা খোশগল্পে আমাদের মাতিয়ে রাখতে, এর-ওর ছোটখাটো মন-খারাপ হাসিঠাট্টায় উড়িয়ে দিতে—কথা নেই বার্তা নেই, সেই ধ্রুবই আজ এমন ভাবপ্রবণ! হঠাৎ মুখ-গোমরা, কেন?—না ওকে জ্যোতিষী বলা হয়েছে! বাঃ!

—আর জ্যোতিষী যদি আমি বলেও থাকি...

—ব'লে থাকোনি মানে? এখন কি সেটা অস্বীকার করতে চাও?

—বাব্বা, এমন আগুন হয়ে আছ? তোমার সঙ্গে তো কথা বলাই দুষ্কর দেখছি। নাও লোকনাথ, তুমিই এবার সামলাও কর্তাকে।

—লোকনাথের আবার সামলানোর কী আছে এতে? তুমি আমাকে জ্যোতিষী বলোনি?

—আমি কি অস্বীকার করছি?

—তো এক্ষুনি আবার কেন বলতে গেলে যে তা বলেও যদি থাকি ইত্যাদি?

—কিন্তু তখন তুমি আমায় কথাটা শেষ করতে দিলে না কেন?

—বেশ, এখন শেষ করো।

—মনে পড়বে তোমার ধ্রুব রুদ্র, তুমি হঠাৎ বলে বসলে যদিও আমরা তোমায় সরল প্রকৃতির লোকই বলছি এবং সেটা বলছি কিছু নিন্দাসূচক অর্থে নয়, তবু যেসব প্রসঙ্গ পাড়ছি আমরা,

তাতে তার ঠিক উল্টোটাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি।

—জানি না, হয়তো বলে থাকতে পারি, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—নিশ্চয় বলেছ, আমি মিথ্যা বলছি না। হয়তো ঠিক এই কথাগুলোই উচ্চারণ করনি, কিন্তু মোটামুটি ভাবখানা ছিল এইটাই।

—আমার মনে আছে, বলি?

—বলো তো বৃন্দাবন।

—কথা হচ্ছিল, ধ্রুব আমার মতো নয়, ধ্রুব তোমার মতো নয়, ধ্রুব লোকনাথের মতো নয়। কী, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে এবার। এবং সে-কথাটা আমরা কেউ তুলিনি প্রথমে, ধ্রুবই তোলে। এবং তোলে কেমন করে? সেটাও এক কাহিনী।

—ঠিক-ঠিক, যা বলেছ! এ-কথাটা ও তোলে গোড়ার একটা প্রসঙ্গের সূত্র ধরে। এবং সে-প্রসঙ্গটা যখন পাড়ে গোড়ায়, তখন কিন্তু ও যে লোকনাথের মতো নয় বা আমার মতো নয় বা তোমার মতো নয়, তেমন কথা ওঠেইনি একেবারে।

—যদিও পরে বলে, গোড়ার সেই প্রসঙ্গটা নাকি ও একেবারেই পাড়েনি, তার জায়গায় শুধু যা বলে তা নাকি ও লোকনাথের মতো নয় তোমার মতো নয় আমার মতো নয়। হ্যাঁ ধ্রুববাবু, তোমারও মনে পড়ছে আশা করি?

—নিশ্চয় পড়ছে। নিজে যেটা বলেছি সেটা আমি পরে কখনো অস্বীকার করি না। কিন্তু এখানেও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে আমার, ও কথাটা উঠল কেন, কেন হঠাৎ বলতে গেলাম আমি লোকনাথের মতো নই কনকের মতো নই তোমার মতো নই।

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, সূত্রধার আবার নাক গলাতে বাধ্য বোধ করছে, কারণ জট না খুলে যেন ক্রমশই পাকিয়ে উঠছে—আগে জ্যোতিষী সংক্রান্ত প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে যাক। কনক, তোমার বক্তব্য শেষ করো।

—হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট মনে পড়ছে কী ঘটেছিল না-ঘটেছিল, কেন আমি জ্যোতিষী কথাটার উল্লেখ হঠাৎ করতে গেলাম। ও লোকনাথের মতো নয় ইত্যাদি বলার উত্তরে আমরা প্রত্যেকেই একে-একে বলি, তা তো বটেই, সেটা কেন হতে যাবে? অর্থাৎ ও কেন লোকনাথের মতো হবে?

—এবং যার উত্তরে আমি লোকনাথ স্বয়ং বলে বসি আমিও পছন্দ করব না যদি কেউ আমায় বলে যে আমি এর মতো বা ওর মতো বা তার মতো। কারণ আমি লোকনাথ, স্বভাবতই আমি কনক নই, বৃন্দাবন নই, ধ্রুব রুদ্র নই।

—ঠিক-ঠিক। এবং সেটার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্তা তখন দুম করে বলে ওঠে যে যদিও ওকে সরল প্রকৃতির লোক বলে আমরা চালাতে চাইছি এবং তেমন বিশেষণে অভিহিত করে ওর প্রতি টিটকিরিও কাটছি না বলছি, তবু একের পর এক যেসব প্রসঙ্গ পাড়ছি আমরা, তাতে আসলে যে ওকে নির্বুদ্ধির চরম বলেই আমরা গোড়া থেকে ধরে নিয়েছি, একমাত্র সেইটেই প্রমাণিত হচ্ছে—অর্থাৎ সেটা আমরা বলছি না, ও বলছে; ওর মতে, এইরকমই ওর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। কী ধ্রুব রুদ্র, মিলিয়ে নিচ্ছ তো? ভুল বলছি না?

—না, মনে হয় ঠিকই বলছ।

—ঐ দ্যাখো, এটাও তুমি পুরোপুরি স্বীকার করবে না, এখনো তোমার 'মনে হয়'।

—আচ্ছা বেশ, পুরোপুরিই মেনে নিলাম, এইরকম কথাবার্তা হয়েছিল।

—বেশ। তখনই আমি তুলি জ্যোতিষীর প্রশ্নটা। তুলি কিনা?

—হ্যাঁ, ঠিক তখনই তোলো।

—এখন আমার প্রশ্ন, কেন তুলি?

—বা রে, উত্তরটা চাও তবে আমিই দিই?

—উত্তরটা এত সোজা যে তা যে-কেউ দিতে পারে, অর্থাৎ যে-কোনো সুস্থমস্তিষ্কের লোক দিতে পারে।

—আ-হা-হা কনক, আমার সূত্রধারের দায়িত্বটা খামাখা কেন শক্ত করে তুলছ আবার?

—কেন, কেন?

—সুস্থমস্তিষ্ক-টস্তিষ্ক বলার আবার কী দরকার? তার মানে কি এই যে তোমার ঐ উত্তরটা ধ্রুব যদি এখন চটপট ভেবে উঠতে না পারে তো ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তাহলে সন্দেহ করা চলবে? না-না, এসব আপত্তিজনক উক্তি করার কোনো অধিকার আমাদের কারুরই নেই।

—দ্যাখো তো তবে! ঠিক এইরকম উক্তিই ওরা করে চলছিল আমার সম্বন্ধে একটার পর একটা —ধ্রুব এই, আর ধ্রুব ওই, আর ধ্রুব সেই। এখন আমি যদি লাগি কনকের পিছনে, বলতে থাকি ঈশ্বর তোমায় নারী গড়তে-গড়তে পুরুষ গড়ে ফেললেন কেন, তখন? সেটা ওর খুব ভালো লাগবে?

—ঠিক বলছ তুমি ধ্রুব, আমি সম্পূর্ণ একমত। না কনক, তোমার কথাটা প্রত্যাহার করে নাও।

—নিলাম।

—হ্যাঁ, যে-প্রশ্নটা করেছ তার উত্তরটা তবে এখন তুমিই দিয়ে দাও কনক। জ্যোতিষী প্রসঙ্গের মীমাংসাটা চিরতরে হয়ে যাক—আর যেন এসব কথা না ওঠে আজকের সভায়, অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। আমি নিজেই অধীর বোধ করতে শুরু করেছি—জানি না শ্রোতাদের অবস্থাটা কী।

—হ্যাঁ, জ্যোতিষী কথাটা আমি তুলি, কারণ ধ্রুব যা বলল তার মর্মার্থ হল এই যে ওর সম্বন্ধে সামনাসামনি আমরা কী বলছি না-বলছি সেটাই শুধু নয়, তার বাইরেও ওর সম্বন্ধে আমরা কী ভাবছি না-ভাবছি বা কী ভাবতে পারি না-পারি, সেটাও ও আগে থেকে জেনে বসে আছে। আর তাই জ্যোতিষী কথাটা আপনা থেকেই আমার জিভে এসে চেপে বসে, কারণ যেটা আমরা ভাবছি বা ভাবতে পেরে থাকি, সেটার কথা ও জানল কেমন করে যদি নিজে ও গণৎকার না হয়!

—দ্যাখো ভাইসব, এখানে সূত্রধার হিসেবে আমাকে কিছু বলার অনুমতি যদি দাও তো বলি, আমার তো মনে হয় আগাগোড়া ব্যাপারটা এত তুচ্ছতায় চিহ্নিত যে এটা নিয়ে এত সময় নষ্ট করা আজকের এই মহান সভার পক্ষে খুবই অনুচিত হয়েছে। কারণ কথার সূত্রটা যেভাবে চলছিল, তাতে জ্যোতিষী প্রসঙ্গের অবতারণাটা কনকের পক্ষে যেমন এক অতীব তুচ্ছ ও হাল্কা ধরনের উক্তি হয়েছে, তাতে অমন ক্ষুব্ধ ও পীড়িত বোধ করাটাও ধ্রুবের পক্ষে তেমনি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি বলি কি, এ-প্রসঙ্গের ইতি আমরা এখানেই টানি, আমরা একে অন্যকে মার্জনা করি—কেমন? আগে তোমারই ক্ষমা চাই ধ্রুব, কারণ পীড়িত বোধ করায় তোমার যুক্তি থাক বা না-থাক, আমাদের কিছু কথা একমাত্র তোমাকেই আহত করেছে। সুতরাং তুমিই বলো প্রথমে যে ক্ষমা করলে, ভুলে গেলে।

—ক্ষমা করলাম, ভুলে গেলাম।

—বৃন্দাবন?

—ক্ষমা করলাম, ভুলে গেলাম।

—দ্যাখো সূত্রধার, আবার সেই ধ্রুব রুদ্রকেই অভিযুক্ত করা হবে যদি সে এখানে প্রশ্ন তুলতে চায়, সে-প্রশ্ন না তুলেই-বা আমি যাই কোথায়?

—কেন, আবার কী-প্রশ্ন তুলবে তুমি এখানে?

—বৃন্দাবন এখানে ক্ষমা করার কে? কী বলেছি আমি ওকে যার জন্যে ও আমায় ক্ষমা করবে?

—অর্থাৎ একমাত্র তুমিই ওকে ক্ষমা করতে পারো, ওর পক্ষে তোমাকে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, এই কি বক্তব্য?

—নিশ্চয়, কারণ যা-কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে তা আমারই বিরুদ্ধে, আমি কারুরই বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে যাইনি।

—মাপ ক'রো, তোমাদের ব্যবহার দেখে দুঃখে আমার বুকটা ভরে যায়—জানি না, হয়তো আমিও সমানই দোষে দোষী, কিন্তু নিজের বিচার নিজে করা শক্ত। তবু যা বলছি, সেটাকে আমার নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য করতে চাই। ধ্রুব রুদ্র, কনক ও বৃন্দাবন, এবং আমাদের অন্য সকলে, আমার মনে হয় আজ আমরা এক তিমির হতে ক্রমশই এক গভীরতর তিমিরে নিজেদের নিক্ষিপ্ত করছি। হয়তো এটাই একমাত্র স্বাভাবিক গতি এখন আমাদের, কারণ যে-রশ্মি মানুষের সকল কর্ম ও বাক্যকে মহিমায় উন্নীত করে, মনে হচ্ছে আজ তা আমাদের জীবন থেকে নিজেকে নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন করেছে, হয়তো তা চিরতরে নির্বাপিতই—তাই এই প্রেতের মতো ব্যবহার আমাদের, যেন অনেক যত্নে অনেক অধ্যবসায়ে নির্মাণ করে চলা তুচ্ছতার সংলাপের বীভৎস গম্বুজ। এই হাত-পা নাড়া, লণ্ঠনের আলোছায়া আলোয় তক্তপোশের উপর লাফানো-ঝাঁপানো, এবং এরি জন্য দূরে-দূরে ঐ উৎসুক দৃষ্টির সারি, একাগ্র শ্রবণ। কী প্রহসন! সত্যিই, সত্যিই, কী প্রচণ্ড মর্মান্তিক প্রহসন!

—আমার কোনো কথায় যদি দুঃখ জেগে থাকে তোমার তো ক্ষমা চাইছি ভাই, মাপ করো লোকনাথ!

—না-না তোমার একলার কোনো কথা নয় ধ্রুব রুদ্র, কথা আমাদের সকলের—এই আমার, ঐ কনকেরও, ঐ বৃন্দাবনেরও, এবং কথা তাদেরও, আমাদের দলের সেই অন্যেরা যারা নীরব হয়ে আছে, আমরা যা বলছি না-বলছি তা গোগ্রাসে গিলছে, যেন তা সরস পান্তুয়া এক বা অরণ্যের শ্রেষ্ঠ মধু। না, সে-পাপ হতে আজ হয়তো কারুরই নিস্তার নেই।

—আমি বৃন্দাবনকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করলাম বলেই কি তুমি এ-কথা বলছো?

—খানিকটা তাই, তবে সবটা নয়। কারণ সেটা আমাদের সামগ্রিক অসামর্থ্যের একটিমাত্র উদাহরণ বই নয়। মনে পড়ে ধ্রুব রুদ্র, সেই প্রারম্ভিক দশদিক বন্দনার একটি চরণ আমাদের?

—কোন্‌টি? বৈরাগ্যের বাউল?

—চমৎকার! ঠিক ধরেছ তো! আশা তবে এখনো হয়তো আছে, এসো প্রার্থনার মন্ত্রটি আবার আবৃত্তি করি সকলে মিলে—গলা দাও তুমিও কনক, তুমি বৃন্দাবন, এবং দলের অন্যান্য বন্ধুগণও, এবং শুধু তারাই-বা কেন, শ্রোতা দর্শকমণ্ডলীর আপনারাও যাঁরা চান, কারণ আপনারাও তো শুনেছিলেন সকলে, মনে নেই? কী, ঠিক কথাগুলো স্মরণ হচ্ছে না? বা ভয় পাচ্ছেন হয়তো উচ্চারণে বা সুরের দ্যোতনায়-মূর্ছনায় ভুলভাল হয়ে যাবে? হয় হোক, যেমন সাধ্য সেভাবেই বলুন, আসুন আমরা সকলে বলি, এবং বললেই দেখবেন শক্তি যেন আবার ফিরে আসছে, স্বপ্ন যেন আবার ফিরে আসছে, বিশ্বাস ফিরে আসছে এই পৃথিবীর এক অজেয় মাধুর্যের প্রতি, যদিও এই ফেরাটা হয়তো এক লহমারই জন্য, হয়তো মরীচিকা মাত্রই—তবু, তবু তবু! আসলে জানেন, সব কথাগুলো ঠিক

আমারও মনে নেই, তাছাড়া বাঁধা-ধরা কথাও তেমন কিছু নেই, কারণ, এক সভা হতে আরেক সভায় সেগুলোকে আমরা নিত্যই নতুন করে বলি—তাই আজ যা বলেছিলাম, তা একইভাবে গতকাল বলিনি, অর্থাৎ হয়তো বলিনি, কারণ বলেছিলাম কি বলিনি তা মনে নেই। আর সুরের দ্যোতনা-মূর্ছনা? সেটা আমাকে অনুসরণ করুন—গলাটা হেঁড়ে, তাই শুনতে পাবেন। বলি তবে একসঙ্গে? আরম্ভ করলাম। এখনো কী ভীষণ ক্রোধ আমাদের, খোপে-খোপে কী সন্দেহ, কী আত্মাভিমান! কাটো কাটো কাটো, এ-বন্ধন ছিন্ন করো! বৈরাগ্যের এই-যে বাউল স্বর আমাদের ভিতরে থেকে-থেকে আপনা-আপনি বেজে ওঠে, সকল মালিন্যের আস্তরণের অসীম ঊর্ধ্বে ভাসমান সেই অস্তসূর্যের গৈরিক রাজপুত্র-মেঘ, এই গড় হলাম তার প্রতি, তাকে নাম দিলাম আমাদের পশ্চিম দিক, বন্দনার দ্বিতীয় চরণ। কী, দেখলেন তো, কেমন সুন্দর বলা হল? ভালো লাগছে না এখন, কী কনক?

—নিশ্চয়। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করেছি, অথবা আমাদের কেউ-কেউ যারা ভুল করেছিলাম, তারা অন্যদের ক্ষমা চেয়েছি, চাইছি।

—এবং সে-ক্ষমা এই সমবেতভাবে চাওয়া হল, এই সমবেতভাবে প্রদত্ত হল। বলো ধ্রুব, তুমিও, কারণ বৃন্দাবন সম্বন্ধে একটু আগেই তুমি একটা উক্তি করেছিলে।

—সে-ক্ষমা এই চাওয়া হল, সে-ক্ষমা এই প্রদত্ত হল।

—বৃন্দাবন?

—চাওয়া হল, প্রদত্ত হল।

—কনক?

—চাওয়া হল, প্রদত্ত হল। কিন্তু সূত্রধার মশাই, এখানে একটা ছোট্ট কথা ছিল।

—ছোট হোক বড় হোক ক্ষতি নেই, যতক্ষণ-না তা অন্যকে আবার আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

—না-না আক্রমণ নয়, একেবারেই নয়, আমাদের ঐ সমবেত ক্ষমা চাওয়া ও করার মূল সুরটির বিরোধীও সে নয়।

—তবে বলে ফেলো, তাড়াতাড়ি। কারণ মূল প্রসঙ্গে আমাদের ফিরতেই হয়।

—বলছিলাম-না, জট পাকিয়ে গিয়ে থাকে তো সেটা খোলার দরকার?

—হ্যাঁ, সেটা তুমি একলাই বলছিলে না, আমরা সকলেই বলছিলাম।

—কথা হচ্ছে, সেই জটটা বোধহয় এখনো কিছু রয়ে যাচ্ছে। এবং আমার মনে হয়, শ্রোতাদের প্রতি যদি কোনো দায়িত্ববোধের বাঞ্ছনীয়তা আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি তো সেই জটটুকুও খোলার দরকার রয়েছে।

—বেশ, আপত্তি নেই।

—আমাদের মনে পড়া উচিত যে ধ্রুবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমার যে-তর্কটা লাগল, এবং যেটা এক অতীব অবাঞ্ছিত ব্যাপার হল নিশ্চয়ই, সেটা কিন্তু ওঠে আসলে ধ্রুবেরই অন্য একটা কথার সূত্র ধরে।

—অর্থাৎ তর্কটা তুমি আবার তুলতে চাও?

—না লোকনাথ, শুধু জটটা খুলতে চাই। কারণ একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, যার উত্তর দেওয়া হয়নি। এবং সে-প্রশ্নটা আবার একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত আমাদের মূল প্রসঙ্গটির সঙ্গে—মানে, প্রশ্নটা তুললে আমাদের বা শ্রোতা ও দর্শকদের কারুরই সময় নষ্ট হবে না, বরং আমরা মূল বিষয়েই থাকব।

—মূল বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছ জানি না, আজ সন্ধ্যা থেকে তো দেখছি সব বিষয়ই মূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে—অথচ খেই বারবার হারিয়ে ফেললাম, কে জানে আবার কখনো ফিরে পাব কিনা।

—সেই পৃথিবীর ছাদের উপর উঠে যে কী দেখলাম, অর্থাৎ যে-বক্তব্য সামনে রেখেই আমাদের সংলাপ শুরু করি, এ-প্রশ্ন খোদ সেই প্রসঙ্গটির সঙ্গে জড়িত।

—বেশ, অতি উত্তম। বলে ফেলো।

—ধ্রুব একসময় বলে, ও নাকি তোমার মতো নয়, আমার মতো নয়, বৃন্দাবনের মতো নয়। এবং ও তখন বলে যে একমাত্র ঐ কথাটাই নাকি ও কিছুক্ষণ আগে বলে, যেটা আমাদের মতে ও একেবারেই বলিনি। জানি না, জিনিসটা তাই পরিষ্কার করতে ও হয়তো এখন নিজেই চাইতে পারে।

—চাইতে পারি মানে? আমি তো চাইছিলামই, আমাকে তোমরা মুখ খোলার সময়ই দিলে না। দেখছ তো লোকনাথ, এখন উল্টো চাল চালা হচ্ছে। ভাবখানা যেন, আমি প্রশ্নটা তুলে নিজেই এড়াবার চেষ্টা করছি, এবং তাই এখন আমার দায়িত্বের কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

—দাঁড়াও লোকনাথ, তুমি কিছু বলার আগে আমি ব্যাপারটা আমার দিক থেকে যতটা পারি খোলসা করে ফেলতে চাই। না ধ্রুব, কনক আবার তোমার বিরুদ্ধে নতুন কোনো অভিযোগ আনছে না। বরং তার কথায় সেরকম কোনো আভাস যদি সে দিয়ে থাকে তো তার জন্যে সে এই দ্যাখো কর-যোড় হচ্ছে, তোমার মার্জনা ভিক্ষা চাইছে। বলো ধ্রুব, সে-ভিক্ষা তুমি দিচ্ছ?

—আমিও মার্জনা চাইছি তোমার কনক, কিছু মনে ক'রো না ভাই। হ্যাঁ, সেই কথাটা—তা কেন আমি বলি, এই তো তোমার প্রশ্ন?

—মোটামুটি তাই। এবং শুধু আমার একলারই প্রশ্ন নয়, হয়তো সকলেরই প্রশ্ন। কারণ আমারই মতো হয়তো সকলেই ভাবছে এমন একটা কথা তুমি হঠাৎ তুলতে গেলে কেন। কী বৃন্দাবন, ঠিক বলছি কিনা?

—হ্যাঁ, শোনার জন্যে আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব।

—তাহলে ফিরতে হয় একেবারে গোড়ার কথায়। মনে পড়ে, তোমরা কেউ বললে পোড়া কয়লা, কেউ বললে গন্ধক, কেউ আবার বললে আরো যেন কী?

—এই দ্যাখো, ভাগ্যিস আমার স্মৃতিটা তোমার থেকে ভালো।

—মানে? ভুল কিছু বললাম নাকি?

—আসলে সূত্রধার করেছ যখন, তখন নজর আমাকে রাখতে হয়ই একটু। না, ভুল তেমন কিছু বলোনি তুমি ধ্রুব, শুধু গন্ধকের পাহাড় কথাটা উচ্চারণ যে করে, সে কিন্তু তুমি স্বয়ং। নাকি আমিই ভুল করছি? কনক?

—কিচ্ছু ভুল করছ না, তুমি ঠিকই বললে। ধ্রুব বলে গন্ধকের পাহাড়, আমি বলি পোড়া কয়লা, আর তুমি লোকনাথ তুমি বলো এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে।

—মানে আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে জায়গায়-জায়গায় তাকে পোড়া কয়লা মনে হতে পারে, অন্যত্র আবার তা গন্ধকও বলে ঠেকতে পারে।

—এবং বৃন্দাবন তখন বলে, ওর মতে সেটা পোড়া কয়লাও নয়, গন্ধকও নয়, বরং চাঁদের পৃষ্ঠ-তলের মতো।

—ঠিক-ঠিক, মাপ করো ভাই। নিজে যা বলেছি সেইটেই শেষে গুলিয়ে ফেললাম! জানি আমার ভীমরতি ধরতে শুরু করেছে, কারণ বিশ্বাস করো, এমন কাণ্ড আগে কখনো হয়নি। ধরো খেলার

মাঠে কে কত রান্ করেছে বা কোন্ দেশের হয়ে কোন্-কোন্ বছরে কোন্-কোন্ খেলোয়াড় নামে, আগে-আগে এ-সবের যাবতীয় খুঁটিনাটি আমার ওষ্ঠাগ্রে সবসময় প্রস্তুত থাকত। আর আজ নিজেরই মাত্র কিছুক্ষণ আগে বলা একটা কথা মনে করতে পারলাম না!

—আমার তো মনে হয় না ব্যাপারটা নিয়ে তোমার এমন দুঃখ বোধ করা উচিত হবে। আসলে এখন আমাদের প্রত্যেকেরই ধ্যানধারণায় একটা ওলটপালট ঘটে গেছে, একই কোনো বিষয় নিয়ে আগে যা ভাবতাম এবং এখন যা ভাবি, তার মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এবং যেহেতু সেই ব্যবধানটা প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছে, তাই মাত্র একটু আগেই যে-কথাটা তুমি নিজে উচ্চারণ করেছ, এখন তোমার মনে হচ্ছে সেটা হয়তো অন্য কেউ উচ্চারণ করেছিল। অন্তত আমি তো পরিবর্তনটাকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করব।

—তুমি আমাদের সান্ত্বনায় এখনো সঞ্জীবিত রাখতে চাও লোকনাথ—প্রীত হলাম তোমার মনোভাবে। কিন্তু ভেবে দ্যাখো একবার, এমন একটা ঘটনা, সেদিন ঐ পৃথিবীর ছাদের উপর, এবং তা দেখে যে-ধারণাটা আমার মনে জাগল ও যেটা মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমি নিজেই প্রকাশ করলাম, এখন বলতে গিয়ে একবার মনেও পড়ল না যে কথাটা আমারই ছিল? এবং জানো লোকনাথ, সেই কারণেই আমার সন্দেহ ধরতে শুরু করেছে, ঐ-যে তখন গন্ধকের পাহাড় বললাম, ওটাও কি সত্যি? অর্থাৎ হঠাৎ সেই প্রথম যখন জিনিসটাকে দেখলাম, তখন সেটাকে কি সত্যিই আমার গন্ধকের পাহাড় বলে মনে হয়েছিল?

—হয়তো হয়েছিল হয়তো হয়নি, আমার তো মনে হয় না তাতে এমন কিছু আসবে-যাবে। বড় কথা যেটা, তা কারুর মনে হয়েছিল গন্ধক, কারুর মনে হয়েছিল পোড়া কয়লা।

—এবং অন্য কারুর মনে হয় চাঁদের পৃষ্ঠতল।

—এবং আরো একজনের মনে হয়, জিনিসটা একসঙ্গে এগুলোর সব ক'টাই। সূর্যের আলো বুঝে কোথাও তা গন্ধক, কোথাও পোড়া কয়লা, কোথাও চাঁদের হাঁ-করা গাত্র।

—তবু সব বিশেষণ এখনো উজাড় করা হয়নি, কারণ আরো কত-কী মনে হয়ে থাকতে পারে, মনে হয়েছে, এবং যতই জিনিসটা সম্বন্ধে ভাবা যাবে, ততই আরো কত-কী মনে হবে, হতে থাকবে।

—আসলে জানো ধ্রুব, যা ঘটেছে তা আমাদের স্মৃতির রাজ্যেও এক বিপর্যয়। অনুভূত ধারণা-গুলোও ইতিমধ্যে পাত্র-বদল করেছে কিনা জানি না, কিন্তু উচ্চারিত কথাগুলো স্থান বদল করেছে। অর্থাৎ আমি যেটা বলি, এখন মনে হচ্ছে সেটা তুমি বলো।

—কে জানে হয়তো একইভাবে অনুভূত ধারণাগুলোও পাল্টে গেছে; একজনের ধারণা আজ অন্যজনের হয়েছে। যেটা তখন তুমি অনুভব করো বলে ভাবো এবং অন্য যেটা আমি অনুভব করি বলে ভাবি, সেই তোমারটি আজ আমার হয়েছে, আমারটি তোমার হয়েছে।

—অতএব আপত্তি কী যদি গন্ধক আসলে তোমার মনে হয়নি, কিন্তু পরে বলতে গিয়ে মনে হয় ও-ধারণাটা তোমারই মনে জাগে—শুধু তাই নয়, খানিকক্ষণ বাদে প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপিত করতে গেছ যেই, দেখছ ততক্ষণে আবার পরিবর্তন হয়েছে, মনে হচ্ছে ধারণাটা যেন মূলে জাগে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মনে।

—আমি বলি কি ধ্রুব রুদ্র বা লোকনাথ ভট্টাচার্য, এবার বাদ দাও ভাই, আলোচনাটা চলছে এত সূক্ষ্ম খাতে যে তাতে আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির অংশগ্রহণের আর কোনো অবকাশই থাকছে না।

—থাক কনকবাবু, সরল প্রকৃতির লোক বলে শুরু করো আমাকে, এখন সূক্ষ্ম বলেও সম্মান দিচ্ছ? ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার যুক্তিটা মানছি। প্রসঙ্গে ফেরা যাক। মনে পড়ে আমাদের কেউ বলে, বোধহয় লোকনাথই, যে জিনিসটা গন্ধক হয়েই জাগুক বা পোড়া কয়লা হয়েই জাগুক, কিংবা অন্য যা-কিছু হয়েই জাগুক-না কেন, সেটাকে আমরা তর্কের বিষয় করতে চাচ্ছি না এখানে, কারণ জিনিসটা দেখার ফলে হঠাৎ যে-নৈরাশ্য আমাদের, যে-বিস্ময়, যে-বজ্রাহতের অবস্থা, মুখ্য বক্তব্যটা হল একমাত্র তা-ই।

—ঠিক-ঠিক, আমিই বলি কথাটা।

—কী বাজে বকছ লোকনাথ, তুমি কোথায় বলতে গেলে কথাটা? আমি কনক, আমি বলি।

—ঐ দ্যাখো, এবার আমারও গুলিয়ে যেতে শুরু করেছে। তবে বললামই তো, এই খুঁটিনাটি-গুলোকে এত প্রাধান্য না-হয় আমরা না-ই দিলাম! কার মনে কী-চিন্তা জেগেছে, কে ঠিক কোন্ কথাটা বলেছে, এ নিয়ে চুলোচুলি বা হাতাহাতি করার কোনো দরকার নেই। কারণ বড় যা, তা চিন্তাটা কারুর-না-কারুর মনে জেগেছে, তা কথাটা, কেউ-না-কেউ বলেছে। হ্যাঁ, এগিয়ে চলো ধ্রুব রুদ্র, যা বলছিলে বলো।

—এবং সেই সময় একজন কেউ বলে, হয়তো লোকনাথই...

—তোমার সবই কেবল ঐ একমাত্র লোকনাথই, যেন আর কেউ কিছু বলতে পারে না, বলেনি!

—আচ্ছা বাবা বেশ, না-হয় তুমিই তবে কথাটা বলেছিলে কনক?

—কী কথা না শুনে আমি কেমন করে বলতে যাবো বলেছিলাম কি না বলেছিলাম?

—আচ্ছা ঝামেলা তো! তাহলে আগে থেকে বাগড়া দাও কেন? কথাটা আমার শেষ করতে দাও, তখন নিজেই বুঝবে সেটা তুমি বলেছিলে না অন্য কেউ বলেছিল।

—মানছি, এবার না-হয় বাগড়া দিই। কিন্তু এখুনি তো দেখলে দুয়েকবার, লোকনাথের বলে চালাচ্ছিলে কিছু কথা যা লোকনাথ একেবারেই বলেনি। কী লোকনাথ?

—দ্যাখো কনকবাবু, এবং ধ্রুব রুদ্র, এবং অন্য সকলে—শোনো। আমার মনে হয়, এইসব অর্থ-হীন বচসার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হবে এই যে এখন থেকে আগে কখনো উচ্চারিত কারুর কোনো উক্তি যখন আমরা উদ্ধৃত করছি, তখন ঠিক কোন্ ব্যক্তিটি সেই উক্তির অধিকারী, তার নাম আমরা দেব না—শুধু বললেই হবে, কথাটা আমাদেরই কেউ বলে। কারণ, এক নম্বর, উক্তিই বলো আর ধারণাই বলো, তা আমাদের ক্ষেত্রে আর ব্যক্তিগত হয়ে থাকছে না, বরং ক্রমশই সমবেত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দু নম্বর...

—আমি সেই একই কনক আবার বাগড়া দিচ্ছি, মাপ করো—কিন্তু বাগড়া না দিয়ে এখানে উপায় নেই। তুমি বললে, এই সবকিছুই আমাদের ক্রমশ সমবেত হতে চলেছে—বেশ, চলুক। কিন্তু তাহলে একই সঙ্গে আবার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা বা অভিজ্ঞতাগুলোর পুনরুত্থাপন করতে চাইছ কেন?

—আমরা কে কী অনুভব করলাম, বা কেমন বিভিন্নভাবে অনুভব করলাম জিনিসটাকে, সেই প্রসঙ্গেরই কি কথা পাড়ছ এখন?

—হ্যাঁ, মানে সেই প্রসঙ্গের ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাটার কথা পাড়ছি। কারণ একদিকে তুমি বলছ, উক্তি-ফুক্তি যা করেছি আগে, তা এখন সব সমবেত: অন্যদিকে বলছ, এই ধ্রুব, এই কনক, এই বৃন্দাবন, জিনিসটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই তোমরা কে কী অনুভব করলে বলো তো? এখানে আমার বক্তব্য, তোমার মনোভাবটি একটি নয়, দুটি; এবং একটি অন্যটির সম্পূর্ণ বিরোধী।

—যুক্তি তোমার আছে কনক, মানছিই। তবে প্রশ্নটা গোলমেলে—আমি বলি কি, এর উত্তরটা আমরা দেবার চেষ্টা করব আস্তে-আস্তে, অ্যাঁ? সরাসরি নয়, বরং আমাদের এই আজকের কার্যক্রমের উদ্ঘাটনের মাধ্যমে- অ্যাঁ? আসলে ঐ সমবেতের যে-ব্যাপারটা বললাম-না, সেটাও বিভিন্ন সুরেরই সমন্বয়ে; যে-ঐক্য খুঁজছি, তা ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টির পারস্পরিক বিরোধের মাধ্যমে। আসলে ব্যাপারটা জটিল, এবং যদি একমাত্র যুক্তি দিয়েই তাকে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতে চাই তো যতই যুক্তি পাড়ব, ততই জটিলতর হয়ে উঠবে। এর চেয়ে ভালো, যে-কথাটার সূত্রপাত ধ্রুব করে, সেটাকে চলতে দেওয়া। হ্যাঁ ধ্রুব রুদ্র, কী যেন বলছিলে তুমি? আবার একটা উক্তির প্রসঙ্গ পাড়ছিলে, বলছিলে উক্তিটা যেন আমিই করি। আমার নামটা ক'রো না, উক্তিটা বলো।

—দাঁড়াও, ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করি কী বলছিলাম। হ্যাঁ, বড় সেই বজ্রাহতের অবস্থাটাই। তখন আমাদেরই একজন বলে ওঠে, সেই নৈরাশ্যটা বোধহয় ততখানি হঠাৎ ছিল না। কী, ঠিক বলছি?

—হ্যাঁ, ঠিক। কারণ বলা হয়, আমরা কেউ-কেউ বেশ কিছু আগে থেকেই ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম।

—এই এই এই। ঐ ইঙ্গিত কথাটা থেকেই গোলমালের শুরু। কারণ তখুনি কনক বলে উঠল —কনকই তো? না বৃন্দাবন?—থুড়ি, আবার নাম এসে যাচ্ছে, মাপ করো। অর্থাৎ আমাদেরই কেউ, মানে আমি ভিন্ন অন্য কেউ একজন বলে উঠল যে ইঙ্গিতটা সেও নাকি বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাচ্ছিল; এবং সে যেই বলেছে হেন কথা, অমনি আরো একজন সায় দিয়ে বসল।

—ও যার উত্তরে তুমি শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র বলে উঠলে যে তুমি বাপু কিন্তু কিছুই তেমন টের পাওনি—ও, থুড়ি, আবার নাম করে বসলাম।

—না-না আমার নাম করেছ বেশ করেছ, কারণ এখানে আমার নামটা আমি চাই, কারণ সত্যিই, উক্তিটা আমিই করি, এবং তার চেয়েও যা বড়, তা উক্তিটা করতে-না-করতেই তোমরা একে-একে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। আর যেহেতু ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের বর্তমান বাগ্বিতণ্ডার সূত্রপাত, ধোঁয়া ও জটিলতার সৃষ্টি, জট তাই খুলতে গেলে পেঁছোতে হবেই সেই প্রথম বিন্দুটিতে, অর্থাৎ উক্তিটিতে, এবং যথাযথভাবে চিহ্নিতও করতে হবে উক্তির অধিকারীকে। তোমাদের মনে পড়বে, কথাটা তখনো আমি শেষ করিনি, শুধু পেড়েছি মাত্র, বলতে যাচ্ছি যে তোমরা অন্যেরা যা বললে, ঐ আগে থেকে ইঙ্গিত পাওয়া-টাওয়া সম্বন্ধে তোমাদের একধরনের নিশ্চিতির ভাব, তখন আমি যেই বলতে গেছি আমার অভিজ্ঞতাটা হয়তো তোমাদের থেকে একটু আলাদা, অমনি একটার-পর-একটা তীরে আমায় বিঁধতে আরম্ভ করলে তোমরা, কেউ বললে আমি কোম্পানির কাজ করি, কেউ বললে আমি কোম্পানির হয়ে ক্রিকেট খেলি, কেউ বললে আমি নাকি মাথায় টুপি পরি, হাতে ছড়ি ঘোরাই...

—তা এগুলো তো সবই সত্যি কথা, এতে এত খেপে যাওয়ার কী আছে?

—খেপে যাওয়ার আছে, কারণ কথাটা সত্যি কি মিথ্যে তা এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে কথাটা কেন হঠাৎ এখানে বলা হল, কোন্ সুরে তা বলা হল, কোন্ আলোচনার সূত্রে বলা হল।

—বেশ তো, হাত-যোড় আগেই করেছি, এখন গলবস্ত্রও হচ্ছি, এতই যদি আঘাত দিয়ে থাকি তোমায় তো আমাদের এবারের মতো মাপ করো। চাও তো নাক মুলছি কান মুলছি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এমনটি আর করব না।

—এই দ্যাখো! ক্ষমা তোমরা আগেই চেয়েছ জানি, আমরা সকলেই সকলের ক্ষমা চেয়েছি। এখন কোনো মান-অভিমানের প্রশ্ন আর ততটা নয়, আমি শুধু বোঝাতে চাইছিলাম কেন হঠাৎ

বলতে গেলাম আমি লোকনাথের মতো নই কনকের মতো নই বৃন্দাবনের মতো নই। নই, কারণ যে-ইঙ্গিত লোকনাথ পেয়েছে বা বৃন্দাবন পেয়েছে বা কনক পেয়েছে, সে-ইঙ্গিত আমি ধ্রুব রুদ্র পাইনি, অন্তত পেয়েছি বলে আমার মনে হয়নি—ব্যস্, ব্যাপারটা এত সোজা।

—যাকগে, এ নিয়ে তর্কাতর্কি আর করব না; এখানেও তর্কের কারণটা অতীব তুচ্ছই মনে হচ্ছে। এই নিয়ে যে এত সময় নষ্ট করলাম তার জন্যে যেমন আমাদের শ্রোতাদের তেমনি আমরা প্রতি-জনা অন্য প্রতি-জনার মার্জনা ভিক্ষা করছি। কিন্তু এখানে একটা কথা বলো ধ্রুব রুদ্র। যেটা আমি বললাম পেয়েছি, কনকও বলল পেয়েছে, বৃন্দাবনও বলল ঐ একই কথা, সে-ইঙ্গিতটা কি তুমি সত্যিই একেবারেই পাওনি, একটি বারের জন্যও নয়?

—আসলে ইঙ্গিত বলতে কী বোঝাচ্ছ...

—তার আগে এখানে একটু বলে রাখতে চাই যে প্রশ্নটা যদি করছি, তার মানে এই নয় যে তোমার কথাটাকে সন্দেহ করছি, ভাবছি যে-কোনো কারণেই হোক তোমার সত্য অনুভূতিটা তুমি চেপে যাচ্ছ। কিন্তু জানো ধ্রুব, এমন হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় যে যেমন নাকি হয় আমাদের, তোমারও মনে ঠিক তেমন করেই সম্ভাবনাটা ঝিলিক মারছিল বেশ কিছুক্ষণ থেকেই, শুধু তুমিই তাকে পাত্তা দিতে চাওনি; আর পাত্তা দাওনি বলেই সম্ভাবনার ঐভাবে ঝিলিক মারার ঘটনাটা পরে ধীরে-ধীরে তোমার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে, এত মুছে গেছে যে এখন মনে হচ্ছে সম্ভাবনাটা জাগেইনি তোমার মনে, একটি বারের জন্যও না। শুনেছি এমন কখনো হয় নাকি মাঝে-মাঝে; মনস্তত্ত্ববিদরাও নাকি বলে থাকেন যে মানুষ যেটা মনে রাখতে চায় না, যেটা তার মন গ্রহণ করে না, সে সেটা ভুলে যায়।

—অর্থাৎ এখানে বক্তব্য তোমার, ব্যাপারটা হয়তো সত্যিই ঘটেছিল, কিন্তু আমিই পরে ভুলে গেছি। তাই এখন যেন মাথা ঠাণ্ডা করে বিষয়টা আবার বিচার করতে বসি—এই তো?

—হ্যাঁ, খানিকটা তাই। তবে বিচার মানে এও নয় যে এখন গালে হাত দিয়ে দশ ঘণ্টা তুমি ভাবতে বসো। শুধু জানতে চাই, আমার কথাটা তুমি শুনলে, কিন্তু শোনার পরেও আগে যা বলেছিলে তুমি, এখনো তাই বললে—অর্থাৎ কোনো ইঙ্গিতই পাওনি?

—এর উত্তরটা একভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরো আমার ঐ ছড়ি ঘোরানোটা, যেটা নিয়ে তোমরা কম টিটকিরি কিছু কাটলে না সকলে মিলে।

—না-না টিটকিরির কথা ভুলে যাও। কী হল সেই ছড়ি ঘোরানোটার?

—আমার স্পষ্ট মনে আছে, ছড়িটা আমি সমানে ঘুরিয়ে যাই, এমন-কি তখনো পর্যন্ত যখন প্রায় পৌঁছে গেছি, শেষ মোড়টা নিলাম বলে। এবং মোড় যেই নিয়েছি, জিনিসটার সামনে পড়েছি, সঙ্গে-সঙ্গে হতবাক, স্তম্ভিত, হাতটাও অচল—সেই প্রথম বার।

—আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য।

—কিন্তু এমন আশ্চর্য বোধ করবে কেন তোমরা, সেটাও তো আমি বুঝতে পারছি না। কারণ কই, অন্যান্য উপসর্গের তেমন অভাব কিছু ঘটেনি?

—যেমন?

—এই ধরো যতই ওপরে উঠছ, মাথাটা ততই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, অর্থাৎ সূর্যালোকে নয়, হাঁটতে-হাঁটতে যেই ছায়ায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছ, তখন।

—বুঝলাম। আর কিছু?

—কিংবা নিশ্বাসের কষ্টের ব্যাপারটাই ধরো-না কেন!

—সেটা তো স্বাভাবিকই—তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ যতই ওপরে উঠবে, ততই অক্সিজেনের অভাব ঘটবে।

—তাছাড়া ভাই, হিমালয়ের সমস্ত তুষার যে হঠাৎ লোপাট, এমন আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ডের কথা কেউ কি কখনো আগে থেকে কল্পনা করতে পারে?

—কে কাঁদছে?

—কই?

—এখন আর শুনছি না। কিন্তু মনে হল যেন কেউ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কনক, তুমি শুনলে?

—কই, না তো।

—বৃন্দাবন?

—কী জানি বাবা, আমিও তো কই কিছু শুনলাম না।

—তবে নিশ্চয় আমারই শোনার ভুল। ধ্রুব, তুমিও কিছু শোনোনি, না?

—এবারে না।

—এবারে না মানে?

—মানে এবার যে আমি নিজেই কথা বলছিলাম, তাই কেউ যদি কেঁদেও থাকে তো তা শুনব কী করে?

—কিন্তু 'এবার' কথাটা ওভাবে কেন ব্যবহার করছ? ও-কথাটার সম্পর্ক কী এখানে?

—'এবার' মানে এবার শুনিনি, অন্যবার শুনেছিলাম।

—কী শুনেছিলে?

—একজনের কান্নার শব্দ।

—কান্নার শব্দ?

—হ্যাঁ, ঐ যেমন বললে-না তুমি? ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

—কোন্ অন্যবার শোনো তুমি সেই শব্দ?

—একেবারে আসল বার।

—মানে?

—মানে পৃথিবীর সেই ছাদের উপর, যখন আমরা সকলে হতচকিত, স্তম্ভিত, কারুর মুখে টুঁ শব্দটি নেই, যখন ঐ উচ্চে দিকে-দিগন্তের উন্মুক্ত ব্যাপ্তিতে হাওয়াও যেন বইছে না, অন্তত বইছিল বলে এখন মনে তো পড়ছে না।

—আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য। তুমি কিছু শুনেছিলে কনক?

—সেদিন ঐ ছাদের ওপর?

—হ্যাঁ।

—না।

—বৃন্দাবন, তুমি?

—আমিও না।

—কে কেঁদে থাকতে পারে ওখানে? দূর থেকে ভেসে-আসা কোনো শব্দ? হ্যাঁ ধ্রুব?

—না-না, নিশ্চয় আমাদেরই দলের মধ্যে থেকে কেউ।

—নারী না পুরুষ?

—বলা শক্ত, কারণ শব্দটা গোঙানির মতো, গোঙানিরও এক বিশেষ পর্যায়ের শব্দ—এমন পর্যায় যখন স্বর শুনে সেটা নারীর না পুরুষের, আর বলা যায় না। অনেকটা কেমন জানো? ধরো মড়াকান্না কাঁদতে-কাঁদতে কেউ যখন অতীব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবু তখনো কেঁদেই চলেছে, ধিকোতে-ধিকোতে একটানা ক্রমশই অস্ফুট বিলাপ এক, ঠিক যেন সেইরকম।

—আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য।

—কেন বলো তো?

—কারণ আমি যে-শব্দটা শুনলাম-না, মানে এখুনি, অর্থাৎ শুনলাম বলে আমার মনে হল, সেটাও ঐ জাতেরই। অথচ শব্দটা যদি এমন কারুর হয় যে কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে তার কান্নার আগের শব্দগুলো শুনলাম না কেন?

—হ্যাঁ, সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

—তার মানে কথাটা তোমার মনেও জাগে সেদিন?

—জাগেনি, কিন্তু এখন তুমি বলছ বলেই মনে হচ্ছে, জাগতে পারত। জাগেনি, কারণ সেই অন্য ভীষণ বিস্ময়ের সামনে পড়ে এতই হতচকিত বোধ করি তখন যে ওদিকটায় তত খেয়াল ছিল না। শুধু শব্দটা শুনি, সেটা মনে আছে।

—অবশ্য শোনার ভুলও হতে পারে।

—যেমন তুমিও এখুনি ভুল শুনে থাকতে পারো।

—নিশ্চয়।

—আবার ভুল নাও হতে পারে।

—হ্যাঁ, নাও হতে পারে।

—বিশেষত যখন আমি একলাই শুনিনি, তুমিও শুনেছ—দুজনে দুই বিভিন্ন বার। এবং শব্দটাও ঠিক একই, হয়তো আসছে একই জনের কাছ থেকেও।

—সম্ভব, খুবই সম্ভব।

—এখানে একটা ব্যাখ্যা কী হতে পারে জানো?

—বলো।

—শব্দটা যার, সে হয়তো অনেকক্ষণ কাঁদছিল ভিতরে-ভিতরে, মানে নিজেরি ভিতরে, নীরবে, গুমরে-গুমরে। এবং এইভাবেই কাঁদতে-কাঁদতে সে একসময় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ, হতে পারে, খুবই হতে পারে।

—পরে কখন আর পারল না, সেই কান্নাটা তাই এবার নীরবতার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে এক অস্ফুট গোঙানির শব্দ হয়ে বেরিয়ে এল।

—হতে পারে, খুবই হতে পারে। কী যে হল ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা কনক, বৃন্দাবন, হঠাৎ কেমন গা ছমছম্ করছে, না?

—কই, না তো।

—কই, না তো।

—তবে কি আমিই ভুল করছি, ধ্রুব?

—ও, আমি বুঝেছি কী হয়েছে।

—বুঝেছ? কী হয়েছে?

—লোকনাথ, কথাটা আমরা এতক্ষণ ধরে এড়াবার চেষ্টা করছিলাম, একটা ভয়ংকর কথা সেটা, এবং তা এড়াতে গিয়ে সন্ধে থেকে আজেবাজে কত-না প্রসঙ্গই পাড়লাম। শেষে সে-কথাটা তোমরা আমার মুখ থেকেই বার করে নিলে, এই তো, কিছুক্ষণ আগেই, বেরিয়ে গেল কথাটা দুম করে বজ্রের মতো। তাই গা ছমছম নয়, বলো এক বিচিত্র কম্পন আমরা অনুভব করছি সকলে।

—ঠিক-ঠিক, কথাটা বড় ভীষণ, বড় ভীষণ।

—কিন্তু সত্যটা যে আবার ভীষণতর।

—সত্যি, ভীষণতর।

—আমার মনে হয়, যখন বেরিয়েই গেছে কথাটা তো এসো সেটাকে আওড়াই বারবার, সত্যের সম্মুখীন হবার চেষ্টা করি, একে-একে, প্রত্যেকে, একবার দু'বার তিনবার, একটু-একটু করে ধাতস্থ হই, কথাটাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি আমাদের যার-যার জিভের সঙ্গে—যাতে পরে এগোনো চলে অন্য আলোচনায়। দেখি লোকনাথ, তুমিও বলো, একেবারে ন্যাংটো করে সত্যটাকে বলো এইবার, কী দেখলাম আমরা যেই ছাদে উঠলাম?

—আমরা দেখলাম হিমালয়ে কোনো তুষার নেই আর--দেখলাম, যেখানে থাকা উচিত একটার পর একটা ধবল শৃঙ্গ, সেই শৃঙ্গের সারি যাদের পুণ্য নামে আমাদের শৈশব-কৈশোর ছিল গুঞ্জনময়, আজ সেখানে দেখি দিক হতে দিগন্তে পরিব্যাপ্ত পোড়া কয়লার দেয়াল, গন্ধকের পাহাড়, চাঁদের পৃষ্ঠতলের মতো বিরাট-বিরাট গর্ত। বলো কনক, তুমিও বলো।

—দেখলাম, সত্যিই দেখলাম, হিমালয়ে আর তুষার নেই।

—তুষার নেই।

—তুষার নেই।

—আচ্ছা কনক, ধরো সেই ইঙ্গিত পাওয়ার ব্যাপারটা। আমি বললাম পাইনি, তোমরা বললে পেয়েছিলে। কিন্তু পেয়ে যদি থাকো তো কই, তা নিয়ে যেতে-যেতে বলাবলি করেছ বলে তো আমার কানে আসেনি।

—না, এ নিয়ে আমি অন্তত কথা বলিনি—তবে লোকনাথ হয়তো বলে থাকতে পারে, বা বৃন্দাবনও। কী বৃন্দাবন?

—না, মুখ ফুটে কিছু বলিনি, কেউ বলেছে বলে শুনিওনি। এবং মুখ ফুটে বলারই বা কী দরকার? ভিতরে-ভিতরে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল, বেশ কিছুক্ষণ থেকেই, আর সেইটেই আমি বলব ইঙ্গিত। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা যেন, এবং আশঙ্কা যে হচ্ছে, তার কারণও যেন রয়েছে, মনে-মনে অনেকটা এইরকম একটা ভাবের উদয়। ঠিক বোঝাতে পারছি না, হয়তো লোকনাথ পারবে, অবশ্য জানি না লোকনাথেরও একই রকম অনুভূতি হয়েছিল কিনা।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বৃন্দাবন, যা বলছ তা ঠিকই। আসলে এসব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী হয় জানো? ধরো উঠতে-উঠতে বেশ উঁচুতে তুমি পৌঁছে গেছ, ধরো আট-হাজার কি ন'-হাজার ফিট ওপরে রয়েছ, এবং সমানে আরো ওপরে উঠে চলেছ, উঠেই চলেছ—তখন সেরকম উচ্চতা থেকে দূরে-দূরে অবস্থিত ও আরো বহু উচ্চের চির-তুষারাবৃত পাহাড় দেখতে পাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—অর্থাৎ সবসময় নয়, হঠাৎ-হঠাৎ। না কনক?

—ধরো হয়তো বাঁক নিতে যাচ্ছ একটা জায়গায়, এবং সেই বাঁকের কাছটায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁক রয়েছে, যে-বিশাল পাহাড়টা তার ঘন অরণ্য নিয়ে এতক্ষণ দৃষ্টি আটকে ছিল, বাঁকের মুখটায় সে-পাহাড় হঠাৎ সরে গেছে...

—এবং সে-জায়গা জুড়ে বসেছে তখন একগাদা আকাশ...

—এবং ঐ আকাশেরই এক কোনায় হঠাৎ কোত্থেকে মাথা ফুঁড়ে উঠেছে দুটো-তিনটে-চারটে ঝকঝকে-ধবধবে বরফের শৃঙ্গ।

—জানোই তো ধ্রুব রুদ্র, হিমালয়ের পথে হেন দৃশ্য বারবার পাওয়া যায়. এবং হেন দৃশ্যের জন্যেই পথিকের চোখ সর্বদা জাগরূক থাকে।

—যেমন এবারও আমাদের ছিল...

—এবং আমরা কিছুই দেখিনি।

—যদিও বাঁক অনেক এসেছে, বাঁকের ফাঁক দিয়ে অমন দূরের ও বহু উচ্চের পাহাড়ও দেখা গিয়েছে—কিন্তু সে-পাহাড়ের গাত্রে বা চূড়ায় কোথাও এতটুকু সাদা কখনো দেখিনি, বরং তার এক খটখটে রুক্ষতায় প্রতিবারই চোখ পীড়িত বোধ করেছে, চূড়াগুলো ঠেকেছে যেন কৃষ্ণকরাল তীক্ষ্ন অসির মতো, আর সেইসব মুহূর্তে কী-এক বিচিত্র ভয়ে যেন পেটের মধ্যে আমাদের হাত-পা সেঁদিয়ে গেছে। দূর ছাই, আমার আবার ভাষাও আসছে না, কী-যে মাথামুণ্ডু বকছি জানি না—এই কনক, তুমি বলো-না বাপু একটু!

—বাঃ, বেশ ভালোই তো বললে লোকনাথ, একেবারে ঠিকই বললে—আমারও মনের ভাবটা দেখছি তোমার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর এই ভাবগুলো যখন জাগছিল, তখনই আমরা এক-ধরনের ইঙ্গিত যেন পাচ্ছিলাম—এখন বুঝছ ধ্রুববাবু?

—হ্যাঁ বুঝছি। খুবই স্বাভাবিক। কথা তা নয়, কথা একেবারে মূল জিনিসটাই। ধ্যুৎ!

—কী হল আবার?

—সত্যি, এখনো বিশ্বাসই করতে পারছি না।

—কী বিশ্বাস করতে পারছ না ধ্রুববাবু?

—যে যেটা দেখেছি সেটা সত্যি।

—তবু দেখলাম তো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখলাম তো। এবং দেখলামই নয়, সকলে মিলে দেখলাম। আর তাইতেই ব্যাপারটা আরো জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে।

—কেন বলো তো?

—কারণ এমন যদি হত যে যদিও সকলেই হাজির ছিলাম, তবু তুমি দেখেছ কিন্তু আমি দেখিনি, বা তুমি-আমি দেখেছি অথচ কনক-বৃন্দাবন দেখেনি, বা আমরা সকলেই দেখেছি তবু একজনের দেখার সঙ্গে অন্যজনের দেখাটা মিলছে না, তো সে-ক্ষেত্রে তখন তর্ক করা চলত, সন্দেহ উঠত—যেটা সত্য, যেটা স্বপ্ন, যেটা আদর্শ, যা নিয়ে আমাদের এত রূপকথা এত কিংবদন্তী, এক-কথায় যা আছে বলে এই দেশটা আছে, সেটা তবে তখন আমাদের কাছে অমন একমুহূর্তে ধসে পড়ত না।

—শুধু তুমি-আমি বা কনক-বৃন্দাবনই নয়, আমাদের দলের প্রতিজনই দেখেছে। সন্দেহ এখন তুলবে তুমি কী করে?

—আচ্ছা এমন-কি একেবারেই হতে পারে না লোকনাথ যে হয়তো আমরা সকলেই ভুল করছি? যে হয় ক্লান্তির দরুন হয়তো অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে সাময়িকভাবে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়? এবং যার ফলে যেখানে তুষার সত্যিই রয়েছে, সেখানে তার বদলে দেখি আমরা এক খটখটে রুক্ষতা?

—কী বলছ! এতগুলো চোখ একসঙ্গে এই ভুল করবে?

—আরো একটা কথা। ওদিকের পাহাড়ে যখন ছিলাম, ঐ কেদারনাথের দিকে, গঙ্গোত্রীর পথ ধরার আগে—মনে পড়ে তোমার? তখন তো দিব্যি বরফ দেখলাম।

—হ্যাঁ, তা দেখেছি।

—তাহলে মানেটা কী, জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে কী? তার মানে কি শুধু গঙ্গোত্রীর দিকেই বরফ নেই? এবং এমন একটা কাণ্ড যদি ঘটে থাকে তো সেটা নিশ্চয় খুব হঠাৎই ঘটেছে, অর্থাৎ খুব সম্প্রতি ঘটেছে।

—আমারো তাই ধারণা। কারণ এক এই আমাদের দলটি ছাড়া আর কারুর কিছু নজরে পড়েছে বলে তো মনে হল না।

—এই তো নামার পথে একটার-পর-একটা গ্রামে রাত কাটাচ্ছি, প্রতি রাতেই নিত্যনতুন গ্রামবাসীদের কাছে বৃত্তান্তটা শোনাচ্ছি, এবং আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা যা, তা সে-বৃত্তান্ত শুনে সকলেই আকাশ থেকে পড়েছে। এ-গ্রামেও নিশ্চয় পড়বে।

—তা তো পড়বেই, কারণ এটা তো তলার গ্রাম, এমনিতেই কিছু দেখা যায় না এখান থেকে—আমরা যা বলব, তাই বিশ্বাস করবে।

—এবং ঠিক সেইটেই প্রশ্ন আমার, মহামান্য সূত্রধার মহাশয়।

—কোন্‌টে প্রশ্ন তোমার, অন্যতম নায়ক শ্রীমান ধ্রুব রুদ্র?

—নামার সময় প্রথম রাত কাটাই গঙ্গোত্রীর গ্রামে, মনে পড়ে?

—পড়ে।

—বৃত্তান্তটা বলি, সেই প্রথম বার, মনে পড়ে?

—পড়ে।

—এবং শুনেই ওরা চমকে ওঠে, মনে পড়ে?

—পড়ে।

—আমার প্রশ্নটি তবে শ্রীমান লোকনাথ ভট্টাচার্য, এটি কেন হবে?

—কোন্‌টি কেন হবে?

—ওরা চমকে কেন উঠবে?

—কেন উঠবে না?

—কারণ গঙ্গোত্রী থেকেও তো বরফের পাহাড়গুলো দেখা যায়, যায় না? অন্তত মাতৃ শৃঙ্গ দেখা যায়, সুদর্শন শৃঙ্গ দেখা যায়—আরে বাবা, ওরাই তো বলছিল।

—বেশ তো, তাতে কী?

—তার মানে হঠাৎ সেখানে বরফ যে নেই, সেটা হয় ওরা তখনো লক্ষ্য করেনি, তাই আমাদের কথায় চমকে উঠল; নয়তো আমরাই ভুল দেখেছি, যেহেতু অত কাছে থেকেও কই জিনিসটা তো ওরা লক্ষ্য করেনি ও তাই আমাদের কথায় চমকে উঠছে।

—এটার উত্তর সোজা, ধ্রুব। তখনো ওরা দেখেনি, এতক্ষণে নিশ্চয় দেখেছে। ওখানে হাহাকার পড়ে গেছে।

—তবে কেদারনাথে বরফ দেখলাম কী করে?

তুমি কি তবে বলতে চাইছ যে জিনিসটা যদি ঘটেও থাকে তো তা ঘটেছে হয়তো হিমালয়ের মাত্র একটা সামান্য অংশে, তা ঘটেনি কেদারনাথের দিকে বা আলমোড়ার দিকে বা দার্জিলিঙের দিকে?

- আমি শুধু সত্যে পেঁছোতে চেয়ে নানান বিকল্প সম্ভাবনার বিচার করছি।

—ধ্রুব রুদ্র, ভাববার চেষ্টা করো, গোমুখে গিয়ে পড়লে যখন তুমি, তখন দেখছটা কী। তুমি তখন এক বিরাট ব্যাপ্তির সামনে রয়েছ, যেন অগাধ সমুদ্রের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে দেখছ এধারে-ওধারে শত-শত মাইল ধরে উঁচু-নিচু ঢেউয়ের মতো একটার-পর-একটা তুঙ্গ শৃঙ্গের সারি, যেখানে শুধু মাত্র শৃঙ্গই নয়, বা সুদর্শন চক্রই নয়, বা শিবলিঙ্গ কি কেদারনাথই নয়, তোমার চোখে সূর্যালোকে ঝকঝক করে নাচছে সারাটা চৌখাম্বা শ্রেণী—চোখের সাধ্য যদি থাকত তো দেখতে পেতে আরো দূরে-দূরান্ত; পাওনি, কারণ মানুষের দৃষ্টি যায় না ততদূর।

কী বলতে চাইছ তুমি?

—বলতে চাইছি, আমরা তো পেঁছেছিলাম ঐ ব্যাপ্তির সামনে, ঐ গোমুখে, তুমি-আমি সকলেই—কী, পেঁছোইনি?

—হ্যাঁ, পেঁছোই তো।

—এবং কী দেখেছিলাম তখন? বরফ? তুষার? তার কণামাত্র কোথাও?

—না, না, না। আমরা আজ ধুলায় মিশিয়ে-যাওয়া মানুষ।

—আমরা সেখানে দেখলাম শুধু দিকে-দিগন্তে পরিব্যাপ্ত পোড়া কয়লা, গন্ধকের পাহাড়, চাঁদের পৃষ্ঠতলের মতো বিরাট-বিরাট গর্ত।

—এমনটা হল কার অভিশাপে?

—কোন্ জাতির পাপে? কোন্ নরের পাপে? কোন্ নারীর পাপে?

—আরে, আবার সেই গোঙানির শব্দ?

—কে কাঁদে?

—ঐ দ্যাখো, ডুকরে কেঁদে উঠল এবার।

—আরে-আরে! এ তো দেখছি আমাদের সুভদ্রের স্ত্রী, না? কাঁদছেন কেন? এগিয়ে আসুন-না!

[ক্রমশ]

স মা লো চ না

অবনীন্দ্র রচনাবলী—প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশ ভবন। কলিকাতা, ১২। মূল্য কুড়ি টাকা এবং বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আমার বাল্যবয়স থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কিছু রচনা কোথাও পেলেই পড়ে এসেছি। 'শাজাহানের স্বপ্ন' ছবিটি দেখেছিলাম "প্রবাসী" পত্রিকায়, দেখে যেন এক আত্মলোপী সৌন্দর্যের জগতে চলে গিয়েছিলাম। "রাজকাহিনী" পড়তে পড়তেও ভেবেছিলাম আমার ধ্যানের জগৎ নেমে এসেছে আমার কাছে। পরিণত বয়সে দু-চারবার অবনীন্দ্রনাথের রচনা-কারু সম্পর্কে লিখেছি, লেখার সময় বারংবার দুঃখবোধ করেছি, এত বড়ো একজন ভাষাশিল্পী, তাঁর রচনাবলী কেন এক সংস্করণে সুনিবন্ধভাবে পাওয়া যায় না? সুহৃদ্বর পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে কিছু বই পেয়েছিলাম এবং তারই নির্ভরে অন্তত একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেকবার ভেবেছি, বঙ্গীয় প্রকাশকদের এনটারপ্রাইজ নেই কেন? আজ দেখছি আমার সংশয়ী প্রশ্ন গ্রাহ্য নয়। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ ভবন থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাবতীয় রচনাবলী কয়েকটি পৃথক খণ্ডে সংকলনের সাধুকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এই কর্মের দুরূহ অংশের (অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সম্পাদনাকর্মের) জন্য সাহায্য নিচ্ছেন পুলিন সেন মহাশয়ের এবং শঙ্খ ঘোষের। সংস্করণ প্রস্তুতির দুরূহ আঙ্গিকে এঁরা দুজনেই অতি নিপুণ। আলোচ্য দুটি খণ্ডের শেষদিককার 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশ দুটি সতর্কভাবে পড়লে এঁদের দুজনের আঙ্গিক-নিপুণতার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকাশক মহাশয়কে ধন্যবাদ যে তিনি কেবল এই সংস্করণ-প্রকাশের জন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করছেন এমন নয়, তিনি দুজন অতীব দক্ষ ও সংবেদনশীল সাহিত্যরসিকের সাহায্য নিয়েছেন।

রবিকা বলতেন, 'অবন একটা পাগলা।' (১/২৫৩)

গুরুদেব হেসে উঠলেন, বললেন, 'পাগলা বেগতিক দেখে পালালো।' (১/৪১২)

এই স্নেহসিক্ত বিশেষণটির গভীরে একটি সত্যবিচারও আছে। অবনীন্দ্রনাথের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার ধারা কখনোই হিসেবী সংসারী মানুষের কড়াক্রান্তির নিক্তিতে বাঁধা পড়েনি। "ঘরোয়া" বইখানার (প্রথম সংখ্যা রচনাবলী) অতুলনীয়া শ্রুতিধরীর লিখন-প্রসাদাৎ আমরা কিছু আভাস পাই কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'পাগলা' বলেছিলেন। যিনি বলতে পারেন, 'সবাই দুর-বীনের সোজা দিক দিয়ে দেখে, কিন্তু উল্টো পিঠ দিয়ে দেখো দিকিনি, কেমন মজার খুদে খুদে সব দেখায়' (১/৭৬); যিনি 'আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদের ঘরে' ঢুকেছিলেন (১/৯০); যাঁর 'পরীস্থান আকাশের পারে ছিল না, ছিল একতলায় সিঁড়ির নীচে একটা এঁদো ঘরের মধ্যে' (১/১৯২); 'বারান্দা যেন একটা জীবন্ত মিউজিয়াম: নানা চরিত্রের মানুষ দেখতে রাস্তায় বেরোতে হত না, তারা আপনিই উঠে আসত সেখানে' (১/২৩৭); মৃত মতিবাবুর সম্পর্কে বলছেন 'আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা, তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন' (১/২৩৯), তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাঁর ভিতরে ছিল divine frenzy, যে আবেগগাঢ়তার সুবাদে শেক্স্-

পিয়র উন্মাদ, প্রেমিক ও কবিকে সমপর্যায়ী করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের তুল্য সৃজনীশক্তি (আমি এ-প্রবন্ধে তাঁর ভাষামাধ্যমের সৃজনীশক্তির কথাই বলছি) আমাদের সাহিত্যেও অজস্র নয়।

অবনীন্দ্র-রচিত সাহিত্যের প্রধানতম কথার (আমার বিনীত বিচারে) দুটি শাখা : (ক) এই সাহিত্যে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ ও বিকাশ তাঁর চিত্রকলা থেকে ন্যূন নয়; (খ) বিষয়বস্তুতে, রচনাশৈলীতে, মনোভঙ্গিতে, কল্পনায়, এই সাহিত্য যে বৈচিত্র্য ও উত্তুঙ্গতা লাভ করেছে তেমনটি আমাদের ঐশ্বর্যশালী বাংলা সাহিত্যেও অতীব অসাধারণ। "বিশ্বভারতী পত্রিকা"র মাঘ-চৈত্র ১৩৫০ সংখ্যায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ শুরু করেছিলেন একটি বাক্য দিয়ে, 'অবনীন্দ্র-নাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।' মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও আমি তাঁর কথা মানতে পারছি না। অবনীন্দ্রনাথ নিজে কোন দ্বৈততা করেননি আঁকাতে, লেখাতে। তিনি বলেছেন, 'ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে **লিখি ছবিটি**।' (১/২৪৫, স্থূলাক্ষর আমার)। আসলে একই জীবনবীক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, সমশক্তিসম্পন্ন নিপুণতা সহকারে, চিত্রণে এবং লেখনে। 'লিখি ছবিটি', ছবি আঁকা এক ধরনের লেখা, লেখা এক ধরনের ছবি আঁকা,—কোনো প্রভেদ নেই আত্মায়, প্রভেদ শুধু বহিরঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথের রচনার পরে রচনায়, পাতার পরে পাতায়, অতুলনীয় চিত্রলতা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির পরে ছবিতে, আঁকার পরে আঁকায় অনুপম কাব্যশক্তি, কথনমায়া। মহত্তম সৃজনীশক্তিতে শিল্পের আঙ্গিক কোনো মস্ত কথা নয়, সে-আঙ্গিক সিঁড়ি মাত্র, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। অবীন্দ্রনাথের দ্বিরাঙ্গিক শিল্পে একই মানসিকতা, একই সাফল্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথায় আমরা পৌঁছই রচনার বৈচিত্র্যে। এখানেও অনেক পূর্বসূরীর অভিমতের উল্লেখ করতে হচ্ছে। "বিশ্বভারতী পত্রিকা"র মাঘ-চৈত্র ১৩৫১ সংখ্যায় প্রমথ বিশী মহাশয় "অবনীন্দ্রনাথের বাংলা রচনা"-শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা।'—তাঁর এই উক্তি আমার পক্ষে মানা কঠিন। আলোচ্য রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখতে পাচ্ছি স্থান পেয়েছে (অন্যান্য রচনার মধ্যে) "শকুন্তলা", "রাজকাহিনী", "নালক"। এর কোনোটিকেই কি আমরা রূপকথা বলতে পারি? এই খণ্ডের 'সংযোজন' পর্যায়ে বেশ কিছু রচনা আছে, যেগুলিকে রূপকথা বলা যায় না : 'আলেখ্য', 'আইনে চীন্-ই', 'জয়শ্রী', 'সূত্রপাত', 'বাপ্পাটা', 'উদয়াস্ত', 'সুখতারা' ইত্যাদি। বিশী মহাশয় 'সব কথাই রূপকথা' বলার পরে আরো বলছেন, 'অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলিয়া কোনো একখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়।'

এহেন কথা বলা যায় কেবল সেই দার্শনিক অভিধায় যা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছত্রে :

যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
*		*		*
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ, যেমন জগতের সর্বরূপের যোগসূত্র, তেমনি যাবতীয় শিল্পকলারও এক সর্বধাত্রী ধ্যান আছে। সে-অর্থে এক গান শুনলে অন্য গানও শোনা হয়ে যায়, এক কবিতা পড়লে

অন্য কবিতা পড়া হয়ে যায়। সর্বক্ষেত্রেই একই চিদানন্দ, একই রসাস্বাদ। কিন্তু বিশী মহাশয় খুবই সম্ভবত সে-অর্থে অবন ঠাকুরের এই বইয়ে অন্য বইয়ের মাধুর্য পাননি। বস্তুত, যদিচ অবনীন্দ্রনাথের তুল্য মহৎ রূপকথাকার বাংলায় কেন, অন্য কোনো ভাষায়ও আছে কিনা সন্দেহ, তিনি যে নিয়ত রূপকথা রচনাই করেননি, তাঁর সৃজনীপ্রতিভা যে বিচিত্র সাহিত্যরূপের জটিল পথে পথে অনায়াসে বিচরণ করত, তার প্রমাণ এই রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডেই যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। যখন আরো খণ্ড প্রকাশিত হবে তখন আমরা অনেক বৈচিত্র্য দেখতে পাব। বৈচিত্র্য না থাকলে অবনীন্দ্রনাথ গৌণ লেখক হতেন। বৈচিত্র্য আছে বলেই তিনি বাংলা ভাষার ও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

অমলেন্দু বসু

Poet and Ploughman. *By* Leonard Elmhirst. Viswa-Bharati, Calcutta, 71. Rs 25.00

লিওনার্ড এলমহার্স্ট তাঁর শ্রীনিকেতনের দিনলিপিতে, ১৯২২ সালের ২৬শে জুলাই, লিখছেন :

Yesterday witnessed the expulsion from our school of Satyen and Subir, the voluntary withdrawal of Niteswar, Sanat and Motru, an attempt to organise a strike among lesser staff and labourers, which came to nothing and the almost total nervous exhaustion of the Director himself.

ঘটনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর *Poet and Ploughman*-এর স্মৃতিচারণ পরিচ্ছেদে এলমহার্স্ট ঘটনাটির সামান্য বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

সত্যেন বোসকে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন অ্যানড্রুজ। গুজব, বর্মাতে সত্যেন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত ছিল। সত্যেনের দাবি ছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের শোকবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে দিতে হবে এবং সেই উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রদের পুরো দিন ছুটি দিতে হবে। শ্রীনিকেতনের Department of Rural Reconstruction-এর ডিরেক্টর তখন এলমহার্স্ট। শোকবার্ষিকী উদ্‌-যাপনে এলমহার্স্টের আপত্তি ছিল না, কিন্তু ধরনে আপত্তি ছিল। স্বরাজের জন্য ছুটি না নিয়ে পুরো দিন গ্রামের কাজ করলেই ভালো হয় না কি, এই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি জিজ্ঞাসা। স্কুলের রাস্তাঘাট ব্যবহারের অযোগ্য, গোরুর গাড়িতে ভারি মালপত্র বহনের পরিপন্থী। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর গ্রহণ করে কিন্তু রাস্তা মেরামত করে না। এলমহার্স্ট, রবীন্দ্রনাথ, কালীমোহন ঘোষের সংকল্প ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে অনুরোধ করা, রাস্তা মেরামত করার জন্য। কিন্তু অ্যানড্রুজ এবং শান্তিনিকেতনের আরো কয়েকজন এতে আপত্তি করলেন, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার আন্দোলনের সঙ্গে এই অনুরোধ সংগতিপূর্ণ নয়।

এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হল আরো একটি সমস্যা, সুবীর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে, সুবীর তখন বালক, স্কুলের ছাত্র। 'দুপুর পর্যন্ত হাতে-প্যায়ে কাজ করি', 'হালুয়াতে মাছি থাকে', ইত্যাদি লিখত সুবীর তার ঠাকুমাকে বড়াই করে, কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছেন কুলিধাঙর হয়ে যাওয়া নাতিকে উদ্ধার করে নিয়ে

যেতে। সুবীরকে বলেছেন প্রত্যেকদিন রাত্রে লুকিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সঙ্গে শোয়ার জন্য। সুবীর এবং তার আর দুজন সঙ্গী তাই যেত। এটা স্কুল বিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত। এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন এবং নির্দেশ পেলেন, ছাত্রশিক্ষকদের জানিয়ে দিতে, নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করার পরিণাম বহিষ্কার। সত্যেনের এবং জ্ঞানদানন্দিনীর প্ররোচনায় সুবীর তার রাতে-পালানো অব্যাহত রাখল, সঙ্গে আর একটি ছেলে। এলমহার্স্ট তাদের জানিয়ে দিলেন, তাদের স্কুল ছাড়তে হবে পরের দিনই। যারা নিয়ম মানবে না তাদের সবাইকেই স্কুল ছাড়তে হবে। সত্যেন ধর্মঘট আহ্বান করল। কেউ সাড়া দিল না। পরের দিন, ২৫শে জুলাই, স্কুলের দশটি ছাত্রের মধ্যে চারজনই বহিষ্কৃত হল, বোলপুর স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল ফোর্ড গাড়িতে নীতেশ্বর, সুবীর, সনৎ, মোত্রুকে। সত্যেনও আছে গাড়িতে। তার অভিপ্রায় শান্তিনিকেতনের কাছে এসে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে শান্তিনিকেতনে আন্দোলন শুরু করবে। কিন্তু গাড়ির চালক, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু), বোলপুর যাওয়ার শর্টকাট ধরেছেন। সত্যেন তখন আরো দুজনের সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়ে শান্তি-নিকেতন অভিমুখে যাত্রা করল। সুবীরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলমহার্স্ট তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে এসে সমস্ত ব্যাপার জানালেন, সত্যেন তখনও এসে পৌঁছয়নি। তারপর, এলমহার্স্ট লিখছেন,

The Poet immediately called to Charlie Andrews in his room across the passage. 'Charlie', he said, 'this is all your doing. You are responsible. Whilst I was away you turned my school over to politics. You must now help us to get out of this trouble. Take Alu and the lorry right away. Meet those three boys on the road. Tell them we can on no account have any of them back at Santiniketan. Take Shotyen to the station and telegraph his people. I will call the staff together and will explain to them just what has happened and the steps I am now taking.

১৯১৯ সালের ৩০ মে রবীন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে চিঠি লিখে পাঞ্জাবের সরকারী নীতির প্রতিবাদে স্যর উপাধি ত্যাগ করেন। এটা তিনি করেছিলেন এমন সময়ে যখন Defence of India আইনের কবলে পড়ার ভয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের মতো নেতাও এ-বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন :

We shall refuse to own moral defeat by cherishing in our own hearts foul dreams of retaliation. (বীর্যের কবি রবীন্দ্রনাথ, অমল হোম, গ্রন্থজগৎ, মে ১৯৬০)

১৯২০ সালের ২২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে অ্যানড্রুজকে চিঠি লিখছেন : 'পার্লা-মেন্টের উভয়কক্ষে যে ডায়ার বিতর্ক হল, তার ফলে ভারতের প্রতি এদেশের শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে। এতে বোঝা গেল, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রতি যতই অমানুষিক অত্যাচার করুন না কেন, এতে পার্লামেন্টের সদস্যদের মনে বিন্দু-মাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। এসব সদস্যদের মধ্য থেকেই তো আমাদের শাসকরা নির্বাচিত হন।

'সেই নৃশংস অত্যাচারের যে নির্লজ্জ সমর্থন তাদের সংবাদপত্রে ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে, তা বিসদৃশ ও বিগর্হিত। ইংরেজের অধীনে থাকার অবমাননাবোধ গত পঞ্চাশ বছর কি তারও আগের থেকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছে। কিন্তু তখনো একটা সান্ত্বনা এই ছিল যে,

ইংরেজ জাতের ন্যায়পরতায় আমাদের বিশ্বাস ছিল।...আশা করি আমার দেশবাসীরা এতে নিরাশ না হয়ে, দৃঢ়তা ও অপরাজেয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের পূর্ণ শক্তি দেশের সেবায় লাগাবেন।

'যা ঘটে গেছে তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের মুক্তি আমাদের নিজেদেরই হাতে। একটি জাতির মহত্ত্বের ভিত্তি কখনো দীনতার অবজ্ঞার কৃপণ দানের উপর নির্ভর করে না। একের সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করাই যখন অপরের স্বার্থ, সেই স্বার্থসর্বস্ব লোকদের মুখাপেক্ষী হয়ে উন্নতির রাস্তা খোঁজে আপন শক্তিতে আস্থাহীন ব্যক্তিরাই। দুঃখ ও আত্মত্যাগের কঠিন পথেই সার্থকতা আসে। যে-শক্তি দুঃখবিপদকে তুচ্ছ করে, সেই অমৃতময় শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে। তারই জোরে আমরা সব শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো লাভ করি।'

এই চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিরকালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করতে গেলে প্রথম দরকার আত্মশক্তি জাগ্রত করা। আত্মশক্তি না থাকলে রাষ্ট্রশক্তি আসবে না, এলেও প্রথম ধাক্কায় তা নষ্ট হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি আবার ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে অ্যানড্রুজকে লিখলেন :

'পাঞ্জাবের ব্যাপার এবার আমাদের ভোলা চাই। কিন্তু একথা যেন না ভুলি যে নিজেদের ঘরের সংস্কার না করলে উপর্যুপরি এ ধরনের বিপর্যয়ে অপদস্থ হতেই হবে।'

রবীন্দ্রনাথ foul dreams of retaliation চাননি, একথার এই অর্থ নয় যে তিনি ইংরেজের অন্যায়ের কথা ভুলেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাঁর কাছে মোক্ষ ছিল না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পন্থা মাত্র, লক্ষ্য আত্মিক শক্তির, চারিত্রিক শক্তির, মনুষ্যত্বের প্রকাশ। এইজন্যই তিনি অ্যানড্রুজকে লিখলেন, নিউ ইয়র্ক থেকে ৪ নভেম্বর ১৯২০ সালে :

'একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে শান্তিনিকেতনকে দূরে সরিয়ে রাখুন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। জানি সে সবের প্রভাব দূরে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। তবু মনে রাখতে হবে, রাজনীতির পথ আমাদের নয়। আমি যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি তখন আমি শান্তিনিকেতনের নই।

'রাজনীতি চর্চা করায় কিছু বিশেষ দোষ আছে বলি নে, তবে আমাদের আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে তা খাপ খায় না।'

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ছিল না, ছিল তাঁদের প্রতি যাঁরা বক্তৃতা করেই রাজনৈতিক কর্তব্য শেষ করেন। অনেক সরকার-উৎপীড়িত তরুণ শান্তি-নিকেতনে আশ্রয় পেয়েছিল। এমনই এক তরুণের কথা আছে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালের রবীন্দ্র-নাথের অ্যানড্রুজকে লেখা একটি চিঠিতে :

'আমাদের আশ্রম সেই নিগৃহীত রাজপুত ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। দেশের লোকদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়াতেই যে সে নিজেদের ঘর খুঁজে পেয়েছে, এটি যেন সে বোধ করতে পারে।'

অ্যানড্রুজ শান্তিনিকেতনে রাজনীতি আমদানি করেছেন বলে সত্যেন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার করেছেন, অ্যানড্রুজও সেই তিরস্কার মেনে নিয়েছেন। অ্যানড্রুজ কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেশবিদ্বেষী, ইংরেজভক্ত, সংকীর্ণমনা, রাজনীতিভীরু বা আত্মবিলাসী মনে করেননি, যদিও ভারত-বর্ষে ইংরেজ-বিতাড়ন ব্যাপারে অক্লান্তকর্মী ছিলেন অ্যানড্রুজ। একটি বিষয়ে অ্যানড্রুজ রবীন্দ্র-নাথকে মান্য করতেন, যে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই চিঠি লিখেছেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ সালে!

A great part of your mind's burden consists of useless refuse and fragments of daily cares which have to be swept away at least twice a day in order to enable you to maintain the clearness of life's perspective. I am by nature impatient, anxious and often fretful and therefore I never wish to miss the daily opportunity of coming into touch with the Truth which is Peace. It has saved me so long from utter breakdown, from the tyranny of the insignificant, from the fetters of the fragmentary. The load of the immediate needs and the distractions of miscellaneous at once lose their weight when you can bring them to the Eternal.

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার শোকদিবস পালন বা স্মৃতিচিহ্ন অমর করে রাখার, বা শান্তিনিকেতনে রাজনীতি চর্চার বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই যে এখানে তৈরি হবে 'মহামানবের' আসন। সেই মহামানব কোনো বিশেষ দেশের নয়, রাজনীতির উপরের স্তরের। The world is too much with us—ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই পঙ্‌ক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় পঙ্‌ক্তি। সংসারের ক্ষুদ্র সমস্যাগুলো আচ্ছন্ন করে তোলে সত্য ও শান্তির সাধনাকে। এই সত্য ও শান্তি অবশ্য বৈরাগ্যের সত্য বা শান্তি নয়। যে-জন্য রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ সমর্থন করেননি। ১৯২১ সালের ৫ মার্চ শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন অ্যানড্রুজকে :

'ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ অর্থাৎ বিলুপ্তি।...মুক্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সত্যের অস্তিত্বের দিকে আর নির্বাণ করে তার বিপরীত দিকে।...বৈদিকযুগের শিক্ষা ছিল জীবনের আনন্দকে পূতপবিত্র করে তোলা আর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ছিল আনন্দকেই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেওয়া।...অসহযোগের ভাবটি হল রাজনৈতিক উগ্রতপস্যা। আমাদের ছাত্ররা এই যে আত্মনিবেদন করছে, সেটা কার কাছে? পূর্ণতর শিক্ষার কাছে তো নয়, বরং অশিক্ষার কাছে।'

'স্বদেশী, স্বরাজ্য—এ শব্দগুলি সাধারণভাবে আমাদের দেশের লোকের মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করে। কেননা এ-সবের মধ্যে উদ্দামতার আগুন রয়েছে। এর উত্তাপ এবং গতি আমাকে স্পর্শ করে না বললে ভুল বলা হয়। তবে কবির বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী আমি এগুলিকে জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে পারি নে। ওরা আমাদের কাছে পাওনার অতিরিক্ত দাবি করে। কিছুদিন পরেই তাই আমি দল ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হই। আমার আত্মা এই বলে কেঁদে ওঠে, স্বদেশপ্রেমিক বা নীতিবিদদের কাছে সম্পূর্ণ মানুষটিকে বলি দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।' (১৪ জানুয়ারি, ১৯২১)

'চিরন্তন মানবের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করাই হল শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য।' অসতো মা সদ্‌গময়' এই প্রার্থনা যুগে যুগে ধ্বনিত হবে।' (১৮ অক্টোবর, ১৯২০)

শান্তিনিকেতন আশ্রম, বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতনে যে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের বেদী তৈরি করে যেতে পারেনি, সেটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুধু শেষ বয়সেই নয়, মধ্যজীবনেই অনুমান করেছিলেন। ১৯১৫ সালের ৭ জুলাইতেই তিনি অ্যানড্রুজকে লিখেছিলেন : 'শান্তিনিকেতনে আমার কতকগুলি চিন্তাধারা জড়বস্তুরূপে পর্যবসিত হয়েছে।' এ-কথা শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, তাঁর অনুরক্তরাও উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যতম ভক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে তাঁর শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী গ্রন্থে লিখেছেন : 'তাঁহার গভীর ধ্যানময় জীবনে আর্ট ছিল সাধনারই অঙ্গ, প্রাকৃতজনের মধ্যে আর্টটাই হইয়া উঠিল প্রবল। শান্তিনিকেতন হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক হইয়াছেন—কিন্তু এখানকার ধর্মাত্মা ব্যক্তি কেহ সুনাম অর্জন করিয়াছেন বলিয়া জানি না।'

আর-একজন ব্যক্তি, জসীম উদ্দীন লিখেছেন তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়' গ্রন্থে, 'কবির জীবনে কিছু শক্তি আর অর্থের অপচয় ঘটিয়াছে তাঁর শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পরিগঠনে। এ কাজ কবি না করিলেও অপরে করিতে পারিত। এই দুটো প্রতিষ্ঠান না থাকিলে কবি হয়ত আরও অনেক সাহিত্যিক দান রাখিয়া যাইতে পারিতেন।'

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের জীবন-বিবর্তনে এবং সাহিত্যিক-দৃষ্টি গঠনে অনেকটাই অংশ নিয়েছিল। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী উপলক্ষ্য করেই তাঁর শেষের জীবন তৈরি হয়ে উঠেছিল, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশেও এই দুয়ের ছাপ স্পষ্ট। তবে এটা অন্য প্রসঙ্গ। বর্তমান প্রসঙ্গ এই, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা এবং যদি অসম্ভবও হয়ে থাকে তাহলেও তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল ছিল কিনা। প্রশ্নটা এই, রাজনীতি জীবনের সমস্ত নয়, কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে 'সমস্ত'কে পাওয়া যায় কিনা। রাষ্ট্রশক্তি বনাম আত্মশক্তি এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল আত্মশক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি। এই উত্তরেই তিনি গ্রামসংগঠনে জোর দিয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি এলমহার্স্টকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন শ্রীনিকেতন গঠনে। এই শ্রীনিকেতন গঠনেও তাঁর আত্মশক্তিগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এলমহার্স্ট লিখছেন,

He said he wanted me to be away from Surul long enough to give the staff there a chance to find their own feet and to take full responsibility for progress in my absence.

এলমহার্স্ট শান্তিনিকেতনের বড়োমা, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা ঠাকুরের কাছে বাংলা শিখতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললেন :

Stop your Bengali lessons. If you learn too much Bengali yourself, you'll want to go on your own to the village to ask them your questions. You will then make the great mistake of trying to become indispensable to this enterprise like any foreign missionary. I want you never to go alone to any village but to take with you either a student or a member of your staff to act as interpreter. Only in this way will they learn what kind of questions you ask and just how the farmers and villagers frame their answers. These answers they will then have to interpret back to you. In this way they will never forget the experience.

১৯২২এর ২২শে জানুয়ারি দিনলিপিতে এলমহার্স্ট লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তার আশেপাশের স্থানের কোনো সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছে আর-একটি পরীক্ষা-পাশের স্কুল। গ্রাম থেকে চাকর সংগ্রহ করা ছাড়া গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোনো সংযোগ নেই। পিয়ারসন চেষ্টা করেছিলেন সাঁওতালদের সাহচর্যে আসতে। সেখানে স্কুল করেছিলেন তিনি, সাঁওতালদের আমন্ত্রণ করতেন শান্তিনিকেতনে ফুটবল খেলতে, যাদের কাছে হেরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা মর্মাহত হয়েছিল, চাষার ছেলেদের কাছে হেরেছে বলে। সন্তোষ মিত্র গ্রামে একটা ছোটো খামার করেছিলেন, সন্তোষ মজুমদার চেষ্টা করতেন অনুর্বর জমিতে ফসল ফলাতে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ ওইটুকুই। নন্দলাল বসু সবসময়ে চেষ্টা করতেন তাঁর ছাত্রদের গ্রামে গিয়ে ছবি আঁকাতে, কিন্তু

ছাত্রদের পছন্দ ছিল আর্ট স্কুলের ঘরে বসে রাম ও সীতা এবং সীতা ও রামের ছবি আঁকা। এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টকে নিমন্ত্রণ করলেন শ্রীনিকেতন তৈরি করার জন্য। শ্রীনিকেতনে বসে কাজ করলে হয়তো বোঝা যাবে গ্রামের ক্রমাগত অবক্ষয়ের মূল কারণ কী?

ভারতবর্ষের উন্নতির প্রধান ধাপ পল্লী-উন্নয়ন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচার প্রশ্নের অবকাশ রাখে না, এই সমস্যা আজকের ভারতেরও সমস্যা। কিন্তু অর্থনীতির বিকাশে রাজনীতি বহির্ভূত করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? রাজনীতি বাদ দিয়ে কি আদৌ সম্ভব? যে-কোনো সমাজবিজ্ঞানীই বলবেন, অর্থনীতির বিকাশ ছাড়া রাজনৈতিক উন্নয়ন যেমন অসম্ভব, রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক বিকাশও তেমন অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জীবনযজ্ঞের ব্যর্থতার কারণ এখানেই। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন, আত্মশক্তির উদ্বোধনের ব্যর্থতার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর দেশবাসীর, যে দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের কর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। শান্তিনিকেতনে রাজনীতি চর্চা চলতে দিলেও যে সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে পড়ত এমনও নয়। বরং তদানীন্তন কংগ্রেসী রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োজিত হলেও, শান্তিনিকেতনসমেত, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো হেরফের হত এমন ভাবনারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু ঘটনা হল, রাজনীতিকে তাঁর কর্ম-যজ্ঞের বাইরে রাখাতে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই জীবনদর্শন খণ্ডিত হয়েছে, যার ফলে, তাঁর জীবনের অবিরাম জটিলতা ও দ্বন্দ্ব। এই জটিলতা ও দ্বন্দ্বের ফলে বারবার তাঁকে জীবনযুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসে করুণভাবে বলতে হয়েছে, আমি কবি। অসংখ্য উদাহরণের কয়েকটি দেখা যাক। ৩০শে জুন ১৯১৫ সালে লেখা অ্যানড্রুজকে চিঠি :

'কয়েক বছর ধরে অনেক রকম জনহিতকর পরিকল্পনার পর এখন আমার জীবন আবার দায়-দায়িত্বের বাধাবন্ধনহীন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চায়—সেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত আছে। সেখানে বনফুল আছে। কিন্তু সেখানে কোনো কমিটি মিটিং নেই।'

'সামনের সপ্তাহে যখন পদ্মায় ভেসে বেড়াব, তখন এই চিন্তাটাই ভুলে যাব যে, মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্যে সৃষ্টির বিরাট সভাতলে আমার উপস্থিতি একান্তই দরকার।' (১১ জুলাই, ১৯১৫)

'আমি কি কবি নই? তা ছাড়া অন্য কিছু হবার আমার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি রাস্তার ধারের একটা সরাইখানার মতো—কবিপথিককে তার অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে রাত কাটাতে দিচ্ছি। কিন্তু এই সরাইখানার মালিকের কাজ কিছুই লোভনীয় নয়। এখন সেই কাজে অবসর নেবার আমার সময় এসে গেছে। (৯ জুলাই, ১৯১৭)

'আমার নিজের মধ্যে কবি ও প্রচারকের যে চিরকালের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই সূত্রেই কথাগুলি বলছি। এদের মধ্যে একটির নির্ভর প্রেরণায়, অন্যটির নির্ভর সচেতন প্রয়াসে। সেই সচেতনতার উপর বেশি চাপ দিলে চিত্তের অসারতা আসে। তাকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।' (৮/১/১৯২১)

চিঠির সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে লাভ নেই। এই দ্বন্দ্ব কীভাবে তার সাহিত্যকেও ব্যাহত করেছিল, তার উদাহরণ, "চার অধ্যায়" যার ব্যর্থতার কথা ভোলার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল,

'চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতার অংশ।'

'আমি কবি, রবীন্দ্রনাথের এ-কথার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কবি ক্ষণিকের অনুভূতি ধরে রাখেন, প্রেরণার বশবর্তী হয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকের কবিতার সঙ্গে কালকের কবিতার মিল পাওয়া যায় না। শুধু কবিতাই

নয়, চিঠিপত্রেও রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যাবে না, কেননা চিঠিপত্রও ক্ষণিকের প্রকাশ। ১১ জুলাই ১৯১৫তে তিনি অ্যানড্রুজকে লিখেছিলেন, মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্যে তাঁর উপস্থিতির কী দরকার, তার বারোদিন পরই লিখছেন শিলাইদা থেকে,

'আশ্রমের জীবন আমাকে কেবল একটি শিক্ষকে পরিণত করে তুলেছিল। তাতে আমি খুশি হইনি। কারণ সে জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে জনকল্যাণের সহায়ক হতে হবে। দূর হতে শুধু ভাবের আদানপ্রদান করলে চলবে না, জনগণের সঙ্গে বাস করতে হবে।'

কবিতা নয়, চিঠিপত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে যেতে হবে তাঁর উপন্যাসে, কারণ উপন্যাস রচনা করার জন্য চাই বড়ো প্রস্তুতি, সচেতন প্রয়াস। তাতেই লেখকের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতম পরিচয় অবশ্য পাওয়া যাবে উপন্যাসের চাইতেও বেশি তাঁর শান্তিকেতন-বিশ্বভারতী গঠনের প্রয়াসে, কারণ এই গঠনপ্রয়াস তাঁর বহু বছরের সাধনার প্রকাশ। শান্তিনিকেতন গঠনের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাদ্বন্দ্বের চিন্তাসংশয়ের অজস্র চিহ্ন রয়েছে. কিন্তু শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি কখনও দ্বিমত প্রকাশ করেননি : 'অতীত-কাল ছিল মানবসাধারণের, ভবিষ্যৎ হল মহামানবের।' 'আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ আপনি নিজেকে সীমিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন। 'নতুন পৃথিবী গড়তে হবে' এ যুগের সে নির্ঘোষ আপনি শুনেছেন। এই সুমহান কাজের ভার আমরা নেব। দেশে দেশে এই কর্মসহযোগীদের শান্তিনিকেতনে আহ্বান করতে হবে। অন্য সব কাজ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারে। এই যুগের অতিথি যিনি, সেই মহামানবের স্থান করা চাই।' (২৫ নভেম্বর, ১৯২০)

কিন্তু শান্তিনিকেতন মহামানবের পীঠ হয়ে ওঠেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথের যেটা একক সাধনার ফল, সে ফল তিনি আশা করেছিলেন সমূহের মধ্যে ব্যক্ত হবে কেবল তাঁর দৃষ্টান্তের সাহায্যে। তাঁর নিজের জীবন রাজনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিনি রাজনীতি বর্জন করেছিলেন। এই দ্বিরাচরণতা তাঁর দৃষ্টান্তকে আদর্শ করে তুলতে পারেনি। তাঁর শান্তি-নিকেতন শেষ পর্যন্ত ইউটোপিয়া থেকে গেল, রাজনীতিবর্জন তার অনেক কারণের একটি।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা, ৯। মূল্য ৪·০০

কবিতার সার্থকতা বিচারে কাব্যপাঠের আনন্দকেই দায়ী করেছিলেন ডিলান টমাস; শুধু আনন্দ, তার আবশ্যিকতা বা সে-কবিতা টিকবে কি না, তা নিয়ে কোনো ভাবনার প্রশ্রয় দেননি। রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক, যে-কোনো কবিতারই একমাত্র আবহ মানুষের সুখ-দুঃখ-অভিমান-অনুভূতিজাত চিরন্তনের স্বতোৎসারিতায়, এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই তার। কিংবা, থাকলেও, তা হবে এইরকম : তাই হলো কবিতা যা পড়ে আমার হাসি বা কান্না পায়, কিংবা হাই ওঠে, যার সংস্পর্শে ঝকমক ক'রে ওঠে বুড়ো আঙুলের নখ, বা ইচ্ছে করে এটা-ওটা করতে—। ডিলান একা নন; এই

কথাটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন আরও অনেকে। অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ভালো লাগার সঙ্গে আনন্দবোধের সম্পর্ক আজকের নয়, বহুকালের। আর ডিলান যাকে বলেছেন চিরন্তনের স্বতোৎসারিতা, রূপের পরিবর্তনসাপেক্ষ তা কি শুধু কবিতার জন্যেই নির্দিষ্ট! আনন্দ, এখানে, যে-কোনো অনুভূতির শুদ্ধতারই পরিপূরক নয় কি?

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার বিচারও, যদি করতে হয়, হবে এই শুদ্ধতারই নিরিখে। তাঁর কাব্যচর্চার ব্যাপ্তি কমদিনের নয়; বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও "নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি" তাঁর তৃতীয় সংকলন। তথ্য হিসেবে এগুলি স্মর্তব্য হলেও সময় বা সংখ্যার গরিমায় তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত হবে। কবির উৎকর্ষ নির্ণয়ে স্বাতন্ত্র্যের যদি কোনো ভূমিকা থাকে, বলা ভালো, এই ভূমিকা প্রণবেন্দু পালন করেছেন প্রায় নৈয়ায়িকের সংকল্পে—তাঁর সমসাময়িক কবিদের সকলের সম্পর্কে এই তথ্য প্রযোজ্য নয়। বস্তুত, তথাকথিত পঞ্চাশের কবিদের 'চীৎকারের দর্শন' যতো দিন যাচ্ছে ততোই হয়ে উঠছে তরল: একত্রযাত্রার কুশীলবদের মধ্যে অনেকেই ভ্রান্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ চার-পাঁচজনকেই এখন যা চেনা যায় বিশিষ্ট ক'রে, হয়তো বা আরও বেশী স্বাতন্ত্র্যে। আর যাঁদের কাছে আশা ছিল, তাঁদের মধ্যে উৎপলকুমার বসু বিচ্ছিন্ন হয়েছেন আগেই, মানস রায়চৌধুরী প্রায় স্তব্ধ; বিনয় মজুমদারের রহস্যজাল ছিন্ন হয়নি আজও। এ'দেরই সঙ্গে, বা মাঝে, নিশ্চিতভাবে চেনা যায় প্রণবেন্দুকেও। লিরিকের অন্তরালে তাঁর কবিতার শব্দানুভূতির শুদ্ধতা যে-হেতু হৃদয়গ্রাহ্য, রহস্য যেহেতু ভোরবেলার নদীর মতোই স্বচ্ছ অথচ অস্পষ্ট, চর্চাও যে-হেতু সংগঠনের আড়ালে, তাই, তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো ধারণায় পৌঁছুতে হয়তো একটু বেশীই সময় লেগেছে আমাদের; তবে তা কোনো দুর্ঘটনা নয়। শুধু কবিতা কেন, শিল্পচর্চার যে-কোনো রূপারোপই অপেক্ষা চায় বাহ্যিক আবরণ খসে পড়ার, তাৎক্ষণিক ও অব্যবহিতের দূষিত রোম ঝ'রে যাবার। কিংবা, পুনরাবিষ্কারেরও। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য কম নেই।

প্রণবেন্দুর কবিতার অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিতের আভাস দেওয়া হয়েছে আগেই। অসুবিধে হলো এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্পষ্ট ক'রে চেনা। তাঁর কবিতার বহিরাঙ্গিক বিন্যাস মিতকথনে অভ্যস্ত থাকার হেতু এবং বিষয়-ভাবনা বিবৃতির পরিবর্তে একান্তে উপলব্ধ চিত্রকল্পে নির্ভর করার জন্যে অনেকেই ভাবতে পারেন তিনি এক নির্জলা গৃহবাসী, সমসমাজের কোনো অন্ধকারই ধরা পড়ে না তাঁর কবিতায়। আমি নিঃসন্দেহ, মাঝখানের অনেকগুলি বছর অকবিতার হৈ-চৈয়ের মধ্যে থেকে এখন কবিতার দিকে ফেরা হয়ে পড়েছে কঠিন; ইঙ্গিতের পরিবর্তে চমক ও বিবৃতিই যেখানে বুঝে ফেলার সহজতম উপায়, সেখানে কিঞ্চিৎ ধুলো মেখে আবিষ্কারের দিকে ধাবিত হবেন পাঠকরা, তা এখনই ভাবা যায় না। এই জন্যেই প্রণবেন্দুর কবিতার ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়। কিন্তু, ক্রমাগত ঘুম ও জাগরণের অস্বস্তি জড়ানো বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে-অনুভূতিকে বারবার স্পর্শ ক'রে গেছেন প্রণবেন্দু তা কোনো নিভৃতবাসীর চৈতন্যে উদ্ভূত নয়, বরং রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত, হঠাৎ-জিজ্ঞাসায় কিছু বা হতচকিত। তা নাহ'লে 'এখন কোথায় জেগে উঠবো একা?'র প্রশান্ত উচ্চারণের পরই কেন আসে নিম্নোদ্ধৃত সংশয়!

> আমায় কারা ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলো?
> এখন আমি হিসেব চাইবো। কোনো নিয়ম এক নিয়ম নয়।
> আরো যারা জেগে উঠছে, তাদের সঙ্গে আমার কথা আছে॥ (জেগে উঠছি/ পৃঃ ৯)

কমবেশী এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতাতেই আছে আপাত-রোমান্টিকতার আড়ালে সন্দেহ ও সংশয়, কখনো বা তীব্র শ্লেষোক্তি, যা কি অভিমান, না রাগ? কিংবা কাফ্‌কার অনুষঙ্গ, কী তার তাৎপর্য?—

তোমরা খুব ভাল করছো, আমি জানি;
একটি কথাও আর তোমাদের আমি বলবো না।

ততোদিনে কলকাতা কাফকার গল্পে পাল্‌টে যাক—
মানুষ লুকিয়ে হোক পতংগমাকড়, আর নিষ্পাপ যুবক
ধীরে ধীরে চ'লে যাক মৃত্যুর ফাঁদের মাঝামাঝি।

ততোদিনে বৃষ্টি পড়ুক, খেলা হোক;
খুড়তুতো বোনের স্বামী বিষ দিক সবার খাবারে;
অমুক মেয়ের হোক প্রহরীর মতো দুই প্রেমিকযুগল।

এইমাত্র! আর কিছু নয়—
একটি কথাও আর খুলে বলবো না।
তোমাদের মনে নেই কাফকার গল্প, আমি জানি॥ (কাফকার কলকাতা/পৃঃ ২৬)

এসব কবিতায় হাসি বা কান্নার উপলক্ষ নেই, কিংবা নেই বুড়ো আঙুলের চকচকে নখের দিকে তাকিয়ে আত্মদর্শন। 'যে আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে যেন আমার পুণ্য হয়', এই স্বগতোক্তি অভিজ্ঞতার রূপান্তরে ও শেষে কোন তাৎপর্যে উন্নীত হবে, আপাতত তাই লক্ষ্য করবার বিষয়।

দিব্যেন্দু পালিত